শ্রীরাজমালা

। প্রথম লহর ।

শ্রীরাজমালা

[ত্রিপুর-রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত]

প্রথম লহর

সটীক ও সচিত্র

সেনাপতি রণচতুরনারায়ণ কথিত

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক
সম্পাদিত

"প্রজা সুখে সুখী রাজা তদ্দুঃখে যশ্চ দুঃখিত।
ন কীর্ত্তিযুক্তো লোকেহস্মিন্ প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে।।"
—বিষ্ণু সংহিতা।

উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার
আগরতলা

শ্রীরাজমালা
(ত্রিপুর-রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত)
প্রথম লহর

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দ
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জানুয়ারী, ২০০৩
তৃতীয় সংস্করণ ঃ জুন, ২০২০

ISBN : ৯৭৮-৯৩-৮৬৭০৭-৬০-৪

মূল্য ঃ ১২০০ (এক হাজার দুইশত টাকা)

কম্পিউটার সেটিং ঃ শব্দচিত্র
ভাটি অভয়নগর, আগরতলা

মূদ্রন ঃ কালিকা প্রেস প্রাঃ লিঃ, কলকাতা

নিবেদন।

'রাজমালা' সম্পাদনের অনুষ্ঠান সুদীর্ঘকাল পূর্ব্বে গোলোকপ্রাপ্ত মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের প্রযত্নে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু তৎকালে 'রাজরত্নাকর' নামক অপর গ্রন্থ সম্পাদন জন্য মনোনিবেশ করায়, রাজমালার কার্য্য স্থগিত থাকে। রাজরত্নাকরের প্রথম খণ্ড প্রচারের অল্পকাল পরে মহারাজ পীড়িত হন, এবং সেই পীড়াই তাঁহার জীবনান্তকর হইয়া দাঁড়ায়। এই সকল কারণে, সেইবার রাজমালার স্থগিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ ঘটে নাই।

অতঃপর গোলোকগত মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য বাহাদুর রাজমালা প্রকাশের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হন। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এতদ্বিষয়ক কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রযত্নে রাজমালার প্রুফ কপিস্বরূপ অল্প সংখ্যক মূলগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল মাত্র। নানা কারণে তিনি এই কার্য্যে এতদতিরিক্ত অগ্রসর হইবার সুযোগপ্রাপ্ত হন নাই। পণ্ডিত মহাশয়ের সম্পাদিত 'শিলালিপি সংগ্রহ' বিশেষ মূল্যবান সঙ্কলন ; তদ্দ্বারা তাঁহার কার্য্যকাল সার্থক হইয়াছে। জীর্ণ মন্দিরের গাত্রস্থিত ভগ্ন প্রস্তরফলক হইতে অস্পষ্ট লিপির পাঠোদ্ধার করা হত আয়াসসাধ্য, ভুক্তভোগী ব্যক্তি ব্যতীত তাহা অন্যে বুঝিবার নহে। এই সংগ্রহ ত্রিপুর ইতিহাসের উদ্ধারসাধন পক্ষে বিশেষ উপকারী হইয়াছে। মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের অকালে আকস্মিক পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গে এইবারও রাজমালার কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়, পণ্ডিত মহাশয় কার্য্যান্তরে যাইতে বাধ্য হন।

ইহার পর অনেক কাল রাজমালার কার্য্য স্থগিত ছিল। মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য বাহাদুরের শাসনকালে, মহারাজকুমার স্বর্গীয় মহেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মণ বাহাদুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উক্ত কার্য্যে পুনর্ব্বার হস্তক্ষেপ করেন। পণ্ডিত স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়, কুমার বাহাদুরের সহকারীরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোনো কাজ করিতে সমর্থ হন নাই। কার্য্যের সূত্রপাতেই তাঁহাদের হস্ত হইতে উঠাইয়া রাজমালা সম্পাদনের ভার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যাচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করা হয়। অমূল্যবাবু দীর্ঘকাল এই কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁহার সমস্ত কার্য্যই পণ্ড হইয়াছে।

অমূল্যবাবুর কার্য্যকালেই স্বর্গীয় মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের আদেশানুসারে কতিপয় অপ্রকাশিত প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনের নিমিত্ত আমাকে অন্য কার্য্য হইতে বর্ত্তমান পদে আনা হয়। মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ বাহাদুরের ঐকান্তিক উৎসাহই এই অনুষ্ঠানের প্রধান ভিত্তি হইয়াছিল। উক্ত কার্য্যে ব্রতী হইয়া, প্রথমতঃ বৈষ্ণব মহাজন ঘনশ্যাম দাসের সঙ্কলিত সুবৃহৎ ও দুষ্প্রাপ্য পদাবলী গ্রন্থ 'গীত-চন্দ্রোদয়' সম্পাদন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম।

তখন ভ্রমেও ভাবি নাই, রাজমালা সম্পাদনের গুরুভার আমার ন্যায় অক্ষম ব্যক্তির হস্তে পতিত হইবে। ভগবানের বিধান মানব বুদ্ধির অগোচর। যাঁহার কৃপায় মূকের বাচালতা লাভ সম্ভব হয়—পঙ্গু গিরিলঙ্ঘনে সমর্থ হয়, একমাত্র সেই সর্ব্বনিয়ন্তার ইচ্ছায়, রাজাজ্ঞা

শিরোধার্য্য করিয়া আমি আরব্ধকার্য্য স্থগিত রাখিয়া, রাজমালার সম্পাদন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। পূর্ব্বোক্ত যোগ্যতর ব্যক্তিবর্গের পর এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া, পদে পদে নিজের অক্ষমতা উপলব্ধি করিতে লাগিলাম ; কিন্তু এই শঙ্কটাপন্ন অবস্থায় অনেক উদারচেতা মহৎ ব্যক্তি অভাবনীয় সহানুভূতি ও সাহায্যদানে আমাকে ধন্য করিয়াছেন, তাঁহাদের স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদই এই কার্য্যে আমার প্রধান সম্বল। ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী সম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত রায় প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত বাহাদুর বি-এ. স্বর্গীয় মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রাণা বোধজং বাহাদুর, এবং শিক্ষাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক শ্রীযুক্ত সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা এম্-এ. (হার্ভার্ড) মহাশয়গণের সাহায্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কার্য্যারম্ভের অল্পকাল পরেই গুরুতর বিঘ্ন উপস্থিত হইল, মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর অকালে লোকান্তরিত হইলেন। এই শোচনীয় ঘটনার গভীর বিষাদ-ছায়া রাজ্যময় ছাইয়া পড়িল। নবীন ভূপতি অপ্রাপ্তবয়স্ক, রাজ্যের অবস্থা কি ঘটিবে, ছোট বড় সকলে এই চিন্তায়ই ব্যাকুল, তখন কাজের চিন্তা কে করে? মনে হইল, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় এবারও রাজমালার কাজ এইখানেই শাসন পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষগণ সকলেই এই কার্য্যের বিশেষ পক্ষপাতী। উদ্যমশীল সদস্য মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ বাহাদুর এই দুর্দ্দিনে রাজমালার কার্য্যভার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। তাঁহারই উৎসাহবাণী, আমার উদ্যমহীন হৃদয়ে পুনর্ব্বার নবোৎসাহ উজ্জীবিত করিয়াছিল। পরে উত্তরোত্তর দেখা গেল, নবীন ভূপতি পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য বাহাদুরও এই কার্য্যের বিশেষ পক্ষপাতী এবং উৎসাহদাতা। তিনি দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থান কালেও সর্ব্বদা রাজামালা সংক্রান্ত কার্য্যের সংবাদাদি লইয়া থাকেন। ইতিহাস সংসৃষ্ট প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থনিচয় স্বয়ং আলোচনা করিতেছেন এবং রাজমালা মুদ্রণের সঙ্গে সঙ্গেই মুদ্রিত অংশগুলি ক্রমশঃ আলোচনা করিতেছেন। ইহা সামান্য আশাপ্রদ বা অল্প আনন্দের কথা নহে। আমার হৃদয়ের দোদুল্যমান অবস্থার কালে শ্রীশ্রীযুতের বাণী বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল, এখনও সেই আদেশবাণী হৃদয়ে ধারণ করিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছি। প্রকাশিত প্রথম লহর সেই কার্য্যের আংশিক ফল।

শ্রীভগবানের কৃপায় এই কার্য্যে সর্ব্বদাই সুবিধা প্রাপ্ত হইতেছি। যত্ন এবং পরিশ্রমেরও ক্রুটী ঘটিতেছে না, কিন্তু যোগ্যতার অভাবে আশানুরূপ ফল সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইলাম না। সুযোগ্য ব্যক্তির হস্তে এই ভার পতিত হইলে কার্য্যটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবার সম্ভাবনা ছিল। এই কার্য্যের গুরুত্ব বুঝাইয়া বলাও এক দুরূহ ব্যাপার। যাঁহারা রাজমালা একবার মাত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, এই গ্রন্থের সম্পাদন কার্য্য কত গুরুতর। অনেক উল্লেখযোগ্য অতীত ঘটনার ইঙ্গিত মাত্র রাজমালায় পাওয়া যায়। এবম্বিধ ইঙ্গিতবাক্য অবলম্বনে সুদূর অতীতের ইতিহাস সংগ্রহ করা কি যে দুঃসাধ্য ব্যাপার, ইতিহাসবেত্তাগণ তাহা বিশেষভাবে অবগত আছেন। রাজমালায় উল্লেখ নাই, অনুসন্ধানে এমন অনেক প্রাচীন বিবরণ এবং বিস্তর কার্য্যের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। অনেক ঘটনার আভাস পাওয়া গেলেও তাহার উদ্ধার সাধন বর্ত্তমানকালে অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে।

ত্রিপুর-পুরাবৃত্ত সংসৃষ্ট রাজদত্ত বিস্তর উপাদান পার্ব্বত্য-পল্লীর অনেক নিভৃত গৃহে সঞ্চিত আছে, অনেক পুরাতন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ জনপ্রাণীহীন গভীর অরণ্যাভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে, অদ্যাপি তাহার সম্যক উদ্ধার বা অনুসন্ধান করা যাইতে পারে নাই। এই সকল কারণেও আমার কার্য্য অঙ্গহীন হইয়াছে। এই ত্রুটী ক্ষালনের নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্নবান আছি, কার্য্যের শেষ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টিত থাকিব।

রাজমালার পাঁচখানি পাণ্ডুলিপি মিলাইয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত পাঠোদ্ধার করা হইয়াছে ; এবং যে-সকল স্থলে পাঠান্তর পাওয়া গিয়াছে, তাহা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কথা পাদটীকায় সন্নিবেশ করা হইয়াছে। যে-সকল বিবরণের পাদটীকায় স্থান হওয়া অসম্ভব, মূলের পশ্চাদ্বর্ত্তী টীকায় তাহা প্রদান করা গিয়াছে। রাজরত্নাকর, কৃষ্ণমালা, শ্রেণীমালা, চম্পকবিজয় ও গাজিনামা প্রভৃতি হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থাদি, শিলালিপি, তাম্রশাসন, সনন্দ ও মুদ্রার সাহায্যে পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ পক্ষে সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করা গিয়াছে। কিন্তু এই দুরূহকার্য্য যথোপযুক্তরূপে সম্পাদন করিতে পারিয়াছি, এমন কথা বলিবার উপায় নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভবিষ্যতে উত্তরোত্তর অনেক লুপ্তপ্রায় প্রাচীন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। সেই আবিষ্কারজনিত সৌভাগ্য যাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে, তিনি যশস্বী হইবেন, সন্দেহ নাই।

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন মতের সমাবেশে আমাদের ইতিহাস উদ্ধারের পথ এত দুরধিগম্য হইয়াছে যে, এই পথে বিচরণকারীর প্রতিপাদবিক্ষেপে বিপন্ন বা পথভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে ; ত্রিপুর ইতিহাসের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। এরূপ স্থলে যথাসাধ্য যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা বিরুদ্ধ মতগুলি খণ্ডনের চেষ্টা করা হইয়াছে ; এই কার্য্য সমীচীন হইল কিনা, তাহা সুধীসমাজের বিচার্য্য। কোনো কোনো ব্যক্তির মতের বিষয় জানা থাকিলেও তাহা জনসমাজে প্রচারিত হয় নাই বলিয়া, তৎসম্বন্ধে কোনো কথা বলা হইল না। এস্থলে উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করি যে, প্রকৃষ্ট প্রমাণ ব্যতীত, ত্রিপুরার প্রচলিত ইতিহাস উপেক্ষা করিয়া, তাহার বিরুদ্ধমত গ্রহণ করা রাজমালা সম্পাদকের পক্ষে অসম্ভব। বিশেষতঃ যে-সকল বিরুদ্ধমত দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তৎসমস্তের যুক্তি-প্রমাণ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ; সুতরাং তাহা গ্রহণ করিবার উপায় নাই। এই ক্ষেত্রে যে-সকল ব্যক্তির মত খণ্ডনের চেষ্টা করা হইয়াছে, অজ্ঞতাবশতঃ তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অশিষ্ট ভাষা প্রযুক্ত হইয়া থাকিলে তজ্জন্য বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ; কাহাকেও মনঃক্ষুণ্ণ করা আমার উদ্দেশ্য নহে।

কোনো কোনো ব্যক্তি জানাইয়াছেন, তাঁহারা ত্রিপুরার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাইবার আশা করেন। এরূপ আশা নিতান্তই সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। কিন্তু এ স্থলে নিবেদন করিতে হইল যে, রাজমালা সম্পাদন, এবং ত্রিপুরার পুরাবৃত্ত সঙ্কলন––এতদুভয় কার্য্যে বিস্তর পার্থক্য রহিয়াছে। রাজমালায় যে-সকল কথার উল্লেখ বা আভাস নাই, এরূপ কথার অবতারণা করিতে যাওয়া সম্পাদকের পক্ষে অসম্ভব। রাজমালা প্রধানতঃ রাজগণের ইতিহাস––রাজ্যের ইতিবৃত্ত নহে। ইতিহাসের সম্যক উপাদন ইহাতে নাই। তবে, প্রসঙ্গক্রমে যে-সকল কথার উল্লেখ করিতে পারা গিয়াছে, তৎসমস্তের আলোচনাপক্ষে যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটী ঘটে

নাই। এতদ্দারা ত্রিপুর ইতিহাসের ভবিষ্যৎ সংগ্রাহকগণ কিঞ্চিন্মাত্র সাহায্য লাভ করিলেও শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

'রাজমালা' নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' ব্যবহৃত হইল। এরূপ করিবার তিনটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ১ম—পূত চরিত্র নিষ্ঠাবান পণ্ডিতগণ ভগবানের গুণানুকীর্ত্তনদ্বারা শ্রদ্ধা-সহকারে যে ধর্ম্ম ও নীতিগর্ত্ত গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহা বিশেষ পবিত্র আখ্যায়িকা। ২য়—উত্তমশ্লোক মহাপুরুষগণের চরিতাবলী যে গ্রন্থের প্রধান উপাদন, সেই গ্রন্থকে পবিত্র এবং পুণ্যময় বলিয়া গ্রহণ করা একান্ত স্বাভাবিক। ৩য়—ইহা চন্দ্রবংশোদ্ভব মহামহিমান্বিত রাজন্যবর্গের আখ্যায়িকাপূর্ণ গ্রন্থ। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে রাজা সাক্ষাৎ নারায়ণ। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"অলক্ষ্যমাণে নরদেব নাম্নিরথাঙ্গ পাণায়ঙ্গম লোকঃ।
তদাহি চৌরপ্রচুরো বিলঙ্ক্ষ্যন্তরক্ষমাণোহবিরব্রূথবৎক্ষণাৎ।।"

শ্রীমদ্ভাগবত—১ম স্কন্ধ, ১৮শ অঃ, ৪২ শ্লোক।

এতদ্দারা বলা হইয়াছে, চক্রপাণি ভগবানই অলক্ষিতভাবে নরদেবতারূপে ভূমণ্ডলে বিরাজমান। শ্রীভগবান স্বয়ংও তাহাই বলিয়াছেন,—

"উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মাম মৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্।। ইত্যাদি

শ্রীমদ্ভাগবদগীতা—১০ম অঃ, ২৭ শ্লোক।

নারায়ণরূপী রাজন্যবর্গের আখ্যায়িকা যে গ্রন্থের মুখ্য উপাদান, তাহা যে সুপবিত্র এবং শ্রীসম্পন্ন, সেকথা বলাই বাহুল্য। এই সকল কারণে গ্রন্থের নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' ব্যবহার করা বোধহয় অসঙ্গত হইল না।

রাজমালা ক্রমান্বয়ে ছয়বারে রচিত হইয়াছে। প্রতিবারের রচিত অংশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার নিমিত্ত সেগুলিকে 'লহর' আখ্যা প্রদান করা হইল। বক্ষ্যমান অংশ রাজমালার প্রথম লহর ; পরবর্ত্তী লহরগুলি ক্রমশঃ প্রচার করিবার সঙ্কল্প আছে। প্রত্যেক লহরে, মূল অংশের পশ্চাদ্ভাগে সন্নিবেশিত টীকার নাম দেওয়া হইয়াছে—'মধ্য-মণি'। এই 'লহর' ও 'মধ্যমণি' নাম আমার প্রদত্ত, সুতরাং ইহাতে কোনোরূপ অসঙ্গতি ঘটিয়া থাকিলে তজ্জন্য আমিই সম্পূর্ণ দায়ী। এই কার্য্যের নিমিত্ত কেহ রচয়িতা কিম্বা পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যানুষ্ঠাতাগণের প্রতি দোষারোপ না করেন, ইহা প্রার্থনীয়।

এই কার্য্যে যে-সকল মহাত্মার সাহায্য লাভ করিয়াছি, তন্মধ্যে ত্রিপুরা শাসন পরিষদের মহামান্য সদস্যবর্গের কথাই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। পরিষদের সুযোগ্য সভাপতি মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীযুত নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মণ বাহাদুর সর্ব্বদা উৎসাহ প্রদান এবং সময় সময় কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা এই অভাজনকে কৃতার্থ করিতেছেন। স্থানীয় পূজ্যপাদ পণ্ডিতমণ্ডলী হইতে বিস্তর সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে ত্রিপুরেশ্বরের দ্বারপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ, রাজপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন কাব্যরত্ন, উমাকান্ত একাডেমীর প্রধান সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার কাব্যতীর্থ, পুরাণবেত্তা শ্রীযুক্ত যদুনন্দন

পাঁড়ে ভাগবতভূষণ, রাজ জ্যোতির্ব্বিদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রমণি জ্যোতিঃসাগর ও শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর শিরোরত্ন প্রভৃতি মহাশয়বৃন্দের নাম কৃতজ্ঞহৃদয়ে উল্লেখ করিতেছি। শ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্-এ, সি-আই-ই ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্-এ, বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ের অধিকাংশ শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদক ও সম্পাদক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটির সুযোগ্য অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ তর্কচুড়ামণি মহাশয় প্রভৃতির অসীম কৃপায় অনেক বিষয়ে আমার সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে। যখন যে-বিষয়ে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া ইঁহাদের দ্বারস্থ হইয়াছি, তখনই তাহারা সদুত্তর দানে আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। শ্রদ্ধাভাজন মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ বাহাদুর, শ্রীলশ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ বাহাদুর, শ্রদ্ধেয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর বি-এ, ডি-লিট্, এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত দেওয়ান বিজয় কুমার সেন এম্-এ, বি-এল, এম্-আর-এ-সি (লণ্ডন) মহোদয় এই লহর সমগ্র আলোচনা করিয়া আমাকে যথাযোগ্য উপদেশ দানে উপকৃত করিয়াছেন। শাস্ত্রদর্শী পূজ্যপাদ পরমহংস শ্রীলশ্রীমৎ গৌরগোবিনন্দানন্দ ভাগবত স্বামী মহোদয় মূল্যবান সস্নেহ উপদেশ দানে অনেক নূতন পথ প্রদর্শনদ্বারা এই অনুরক্তজনকে ধন্য করিয়াছেন। শ্রদ্ধাভাজন শ্রীলশ্রীযুত কুমার সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মণ বাহাদুর, সংসার বিভাগের সহকারী শ্রীযুক্ত ঠাকুর ভগবানচন্দ্র দেববর্ম্মণ মহোদয়, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রসন্নলাল দেববর্ম্মণ মহাশয় এবং সীতাকুণ্ডের খ্যাতনামা তীর্থ-পুরোহিত ও সাহিত্যিক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরকিশোর অধিকারী মহাশয় প্রভৃতির সাহায্য লাভে এই ক্ষেত্রে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। সংসার বিভাগের অন্যতর সহকারী প্রীতিভাজন শ্রীমান সত্যরঞ্জন বসু বি-এ, এবং আমার সহকারী স্নেহাস্পদ শ্রীমান মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়দ্বয় এই কার্য্যে বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন। এই সকল মহাশয় ব্যক্তির নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক ব্যক্তি হইতে অল্পাধিক পরিমাণে আনুকূল্য লাভ করিয়াছি, বিস্তৃতিভয়ে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিতে পারিলাম না। এই গুরুতর ত্রুটীর নিমিত্ত তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রাথনা করিতেছি।

এই কার্য্যে গ্রন্থ-সাহায্য লাভের কথা বলিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধেয় মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীযুত রণবীরকিশোর দেববর্ম্মণ বাহাদুরের নাম স্মৃতিপথে উদিত হয়। তাঁহার গ্রন্থাগারের যে-সকল গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহার কোনো কোনো গ্রন্থ বর্ত্তমানকালে দুষ্প্রাপ্য। যাহা পাওয়া যায়, সেগুলি সংগ্রহ করিতে বিস্তর ব্যয় ও আয়াস স্বীকার করিতে হইত। গ্রন্থ সাহায্য ব্যতীত, মহারাজকুমার বাহাদুর কষ্ট উপেক্ষা করিয়া এই লহরের নিমিত্ত কয়েকখানি আলোকচিত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই সহৃদয়তা কখনও বিস্মৃত হইব না।

প্রথম লহরের সম্পাদন কার্য্যে যে-সকল গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা ইহার পশ্চাৎভাগে সংযোজিত হইল। তদ্ভিন্ন আরও এমন অনেক গ্রন্থ আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি, যাহার সমগ্র ভাগ পাঠ করিয়া কার্য্যে লাগাইবার উপযুক্ত কিছুই পাওয়া যায় নাই। এই কার্য্যে কঠোর পরিশ্রম এবং সুদীর্ঘ সময় ব্যয় করিতে হইয়াছে। যে-সকল গ্রন্থাকারের গ্রন্থ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহাদের নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের

সঙ্কলিত ‘শিলালিপি সংগ্রহ’ ও ‘কৈলাসহর ভ্রমণ’ প্রভৃতি পুস্তিকা এবং শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যাচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে কোনো কোনো বিষয়ে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এবং শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-এ, বিদ্যানিধি মহাশয় কর্ত্তৃক স্থানীয় ‘রবি’ সাময়িক পত্রে লিখিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলী কোনো কোনো বিষয়ে আমার কার্য্যের সহায়তা করিয়াছে।

গ্রন্থের এই অংশ কলিকাতায় মুদ্রিত হইল। দূরবর্ত্তীস্থান হইতে প্রুফ সংশোধন করিয়া মুদ্রণ কার্য্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা কত কঠিন ব্যাপার, ভুক্তভোগী ব্যক্তিগণ তাহা সহজেই বুঝিবেন। গ্রন্থখানি মুদ্রাকর প্রমাদ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করা হইয়াছে এবং তজ্জন্য কার্য্য অগ্রসরের পক্ষেও অন্তরায় ঘটিয়াছে, কিন্তু এত করিয়াও ইহাকে প্রমাদশূন্য করা যাইতে পারিল না। মূলে ভুল করিয়া সুদীর্ঘ শুদ্ধিপত্র প্রদান করিবার সার্থকতা নাই। কিন্তু কোনো কোনো শব্দের এমন অবস্থা ঘটিয়াছে যে, শুদ্ধিপত্র ব্যতীত তাহা বুঝাই কঠিন হইবে। এজন্য কতিপয় শব্দের শুদ্ধিপত্র প্রদান করিতে বাধ্য হইলাম।

আমার অযোগ্যতাবশতঃ গ্রন্থের সম্পাদন কার্য্যে নানাবিধ ভ্রম প্রমাদ এবং বিস্তর ত্রুটী পরিলক্ষিত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। বিশেষতঃ ঐতিহাসিক মতবিরোধ স্থলে যে মত গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাই বিশুদ্ধ বা প্রমাদশূন্য, এ কথা বলিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। সহৃদয় পাঠকবর্গ এবং প্রথিতযশা ঐতিহাসিক সমাজ আমার কার্য্যে যে সকল ভ্রম-ত্রুটী লক্ষ্য করিবেন, দয়া করিয়া তাহা জানাইলে তাঁহাদের নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব। তাঁহাদের অভিমত বিশেষ উপকারে আসিবে এবং ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ ইতিহাস সঙ্কলয়িতাগণের পক্ষেও কল্যাণকর হইবে বলিয়া আশা করি।

ভগবানের কৃপায় রাজমালার অবশিষ্টাংশ সম্পাদন ও প্রচার করিতে সমর্থ হইলে নিজেকে ধন্য মনে করিব।

আগরতলা—‘রাজমালা’ কার্য্যালয়,
লক্ষ্মী-পূর্ণিমা, ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দ।

শ্রী কালীপ্রসন্ন সেন

প্রমাণ-পঞ্জী।

(যে-সকল গ্রন্থাদি হইতে প্রথম লহরের সম্পাদনকার্য্যে প্রমাণ বা উপাদান গৃহীত হইয়াছে তাহার তালিকা)

সংস্কৃত গ্রন্থাদি

অগ্নিপুরাণ।
অথর্ব্ববেদ (গোপথ ব্রাহ্মণ)।
অদ্ভুত রামায়ণ।
অমর কোষ।
আনন্দ লহরী (শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য)।
উদ্বাহ তত্ত্ব।
ঊনকোটী মাহাত্ম্য (হস্তলিখিত)।
ঋগ্বেদ সংহিতা।
এড়ু মিশ্রের কারিকা।
কঠোপনিষদ।
কামন্দকীয় নীতিসার।
কামাখ্যা তন্ত্র।
কায়স্থ কৌস্তুভ।
কালিকাপুরাণ।
কাশী খণ্ড।
কুব্জিকা তন্ত্র।
কুলার্ণব।
কূর্ম্মপুরাণ।
গরুড়পুরাণ।
জ্যোতিস্তত্ত্ব।
জ্ঞান সংহিতা।
তন্ত্র চূড়ামণি।
তন্ত্রসার।
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ।
দত্তবংশমালা।
দায়ভাগ।
দুর্গামঙ্গল।
দেবীপুরাণ।
দেবীভাগবত।
নারদ পঞ্চরাত্র।
নৈষধেয় চরিতম্ (শ্রীহর্ষ)।
পত্র কৌমুদী (বররুচি)।
পদ্মপুরাণ।
পরাশর সংহিতা।
পীঠমালা তন্ত্র।
পুরোহিত দর্পণ।
প্রয়াগ মাহাত্ম্য।
প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব।
বরাহপুরাণ।
বামনপুরাণ।
বায়ুপুরাণ।
বারাহিসংহিতা।
বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকা।
বিক্রমোর্ব্বশীয় নাটক।
বিষ্ণুপুরাণ।
বৃহন্নীল তন্ত্র।
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।
বৃহৎ সংহিতা।
বৈদিক সংবাদিনী (হস্তলিখিত)।
ব্রহ্মপুরাণ।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।
ভবিষ্যপুরাণ।
মৎস্যপুরাণ।
মনুসংহিতা।
মনুসংহিতাভাষ্য (মেধাতিথি)।

মনুসংহিতা ভাষ্য (কল্লুকভট্ট)।
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।
মহাভাগবত পুরাণ।
মহাভারত (মূল)।
মার্কণ্ডেয় পুরাণ।
যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।
যোগিনী তন্ত্র।
রঘুবংশ।
রাজতরঙ্গিণী।
রাজরত্নাকর (হস্তলিখিত)।
রাজরাজেশ্বরী তন্ত্র।
রাজ্যাভিষেক পদ্ধতি।
রামজয়ের কুলপঞ্জিকা।
রামায়ণ (বাল্মিকী মূল)।
লিঙ্গপুরাণ।
শক্তিসঙ্গম তন্ত্র।
শব্দকল্পদ্রুম।
শান্তিস্বস্ত্যায়ন কল্পদ্রুম।
শিবচরিত।
শিবপুরাণ।
শুক্রনীতি।
শুক্ল যজুর্ব্বেধ।
শ্রীমদ্ভাগবত।
শ্রীমদ্ভাগবদগীতা।
সংস্কৃত রাজমালা।
সম্বন্ধ নির্ণয়।
স্কন্দপুরাণ।
হরিবংশ।
হরিমিশ্রের কারিকা।

বাঙ্গালা গ্রন্থাদি।

আদিশূর ও বল্লাল সেন।
আসাম বুড়ুঞ্জী।
আসামের ইতিহাস।
আসামের বিশেষ বিবরণ।
ঊনকোটী তীর্থ (প্যারীমোহন দেববর্ম্মণ)।
কাছাড়ের ইতিবৃত্ত (উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ)।
কামরূপ বুড়ুঞ্জী।
কৃষ্ণমালা (হস্তলিখিত)।
কৈলাসবাবুর রাজমালা।
গাজিনামা (হস্তলিখিত)।
গৌড়রাজমালা।
গৌড়ে ব্রাহ্মণ।
চণ্ডী (কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম)।
চট্টগ্রামের ইতিহাস (পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী)।
চম্পকবিজয় (হস্তলিখিত)।
চৈতন্যভাগবত (শ্রীমৎ বৃন্দাবন দাস)।
জন্মভূমি (মাসিক—১২৯৯।১৩০০)।
জামিউত্তারিখ (অনুবাদ)।
ঢাকার ইতিহাস (যতীন্দ্রমোহন রায়)।
তবকাৎ-ই-নাসেরী।
তারিখ-ই-বরণী।
ত্রিপুর বংশাবলী (হস্তলিখিত)।
দুর্গামাহাত্ম্য (মাধবাচার্য্য)।
দেশাবলী।
নব্যভারত (মাসিক—১২৯৯।১৩০০)।
পার্ব্বতীয় বংশাবলী।
পৃথিবীর ইতিহাস (দুর্গাদাস লাহিড়ী)।
প্রকৃতিবাদ অভিধান (রামকমল বিদ্যালঙ্কার)।
প্রতাপাদিত্য (নিখিলনাথ রায়)।
প্রাচীন রাজমালা (হস্তলিখিত)।
ফরিদপুরের ইতিহাস (আনন্দনাথ রায়)।
বঙ্গদর্শন (মাসিক—নবপর্য্যায়, ১৩১২)।
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (রামগতি ন্যায়রত্ন)।
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (নগেন্দ্রনাথ বসু)।
বাকলা (রোহিণীকুমার সেন)।

বাঙ্গালার ইতিহাস (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)।
বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত (পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)।
বিশ্বকোষ (নগেন্দ্রনাথ বসু)।
ভারতী (মাসিক—৭ম ভাগ)।
ভ্রমণবৃত্তান্ত (ধনঞ্জয় ঠাকুর)।
ময়নামতীর গান (দুর্ল্লভ মল্লিক)।
ময়মনসিংহের ইতিহাস (কেদারনাথ মজুমদার)।
যশোহর খুলনার ইতিহাস (সতীশচন্দ্র মিত্র)।
রাজস্থান (অনুবাদক অঘোরনাথ বরাট)।
রাজাবলী (হস্তলিখিত)।
রিয়া (কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর)।
রিয়া জুস্‌-সলাতীন (অনুবাদ)।
শিলালিপি সংগ্রহ (চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ)
শ্রীশ্রীযুতের কৈলাসহর ভ্রমণ (ঐ)।
শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি)
শ্রেণীমালা (হস্তলিখিত)
সন্দ্বীপের ইতিহাস (রামকুমার চক্রবর্ত্তী ও আনন্দমোহন দাস)।
সাময়িক সমালোচনার সমালোচন ও মীমাংসা।
সায়ের উল্‌-মুতাক্ষরীণ (অনুবাদ)।
সাহিত্য (মাসিক—১৩০১)।
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (২৬শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা)।

হিন্দীগ্রন্থ।

তুলসীদাসের রামায়ণ।

ইংরেজী গ্রন্থাদি।

Arnold's Lectures on History.
Assam District Gazetters Vol. II
Asiatic Researches, Vol. IV.
Analysis of the Rajmala. (J.A.S.B., Vol. XIX.)
Bengal & Assam, Behar & Orrissa,--Complied
by Somerest Playne. F.R.G.S.
(The Foreign & Colonial Compiling & Publishing Co.) London.
Calcutta Review No. XXXVI.
Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta Vol. II.
Dulton's Ethnology of Bengal.
Dionysiaka or Bassarika.
History of Tripura (by E. F. Sandys.)
History of Assam (by Gait.)
Hunter's Statistical accounts of Bengal. Vol-I, VI.
Hunter's Orrissa. Vol. II.
Intercourse between India and the Western World.
Indian Antiquary Vol. XIX.
Indoche Liter.
Initial Coinage of Bengal.

Journal of Asiatic Society of Bengal
Vol. III., XIX, XXII, 1873, 1876, 1896, 1898, 1909, 1913
Journal of the Royal Asiatic Society, 1909
Kern–Geschichte Vol. IV
Lecture of the Royal Anthropological Institutes–delivered
by Prof. W. J. Sollas.
Lewin's Hill tracts of Chittagong. Vol. III
Mc. Crindle's ancient India.
Mr. Ralph Leke's Report (11th March 1783).
Mr. C. W. Bolton's Report.
Periplus of the Erythracan Sea.
–Ptolemy, Book VII.
Report on the Progress of Historical
Researches in Assam–1897
Settlement Report of Chakla Roshnabad (J. G. Cumming)
Stewart's History of Bengal.
The Golden Book of India. (Sir Roper Lethbridge.)
The Geological Dictionary of Ancient
Mediaeval India (By Nondolal Dey)

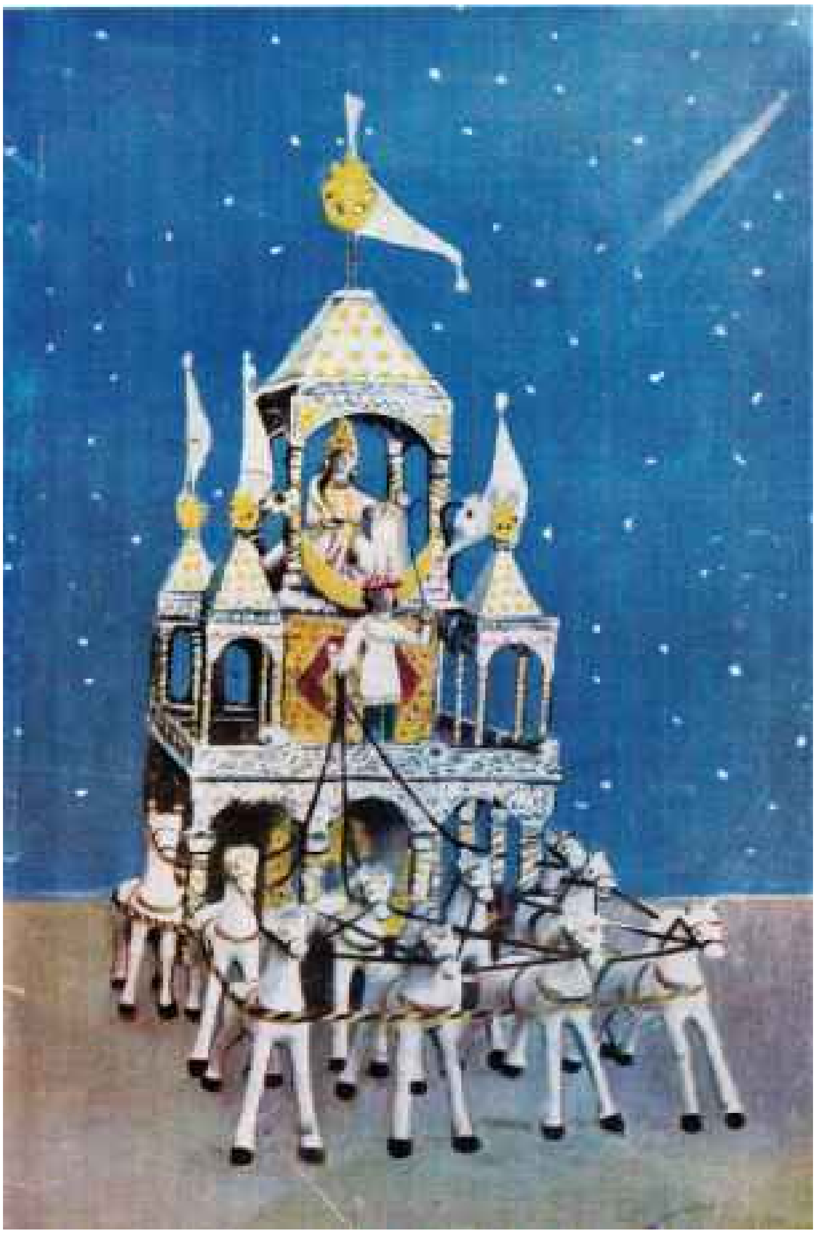

শ্রীশ্রীচন্দ্রমা দেব।
সামুদ্রং বৈশ্যমাত্রেয়ং হস্তমাত্রয়ং সিতাম্বরম্।
শ্বেতং দ্বিবাহুং বরদং দক্ষিণং সগদেতরম্।।
দশাশ্বং শ্বেত পদ্মস্থং বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতম্।
জলপ্রত্যধিদৈবঞ্চ সূর্য্যাস্যমাহ্বয়েত্তথা।।

ত্রিপুর-ইতিহাসের উদ্ধার প্রয়াসী
স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য।

দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণের ভূমিকা

শ্রীরাজমালা বা রাজমালা ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত। ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন রাজবংশের এই ইতিকথা প্রথম লহর থেকে চতুর্থ লহর সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ রাজাদেশে নিবিষ্টচিত্তে সম্পাদনা করেন। এই মহাগ্রন্থ প্রকাশনার জন্য রাজধানী আগরতলায় রাজমালা কার্যালয় ছিল এবং সেখান থেকে এই মহান গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। রাজ-আমলে এই মহাকাব্যিক রাজ-ইতিহাস জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থান অধিকার করে। পার্বত্য ত্রিপুরাসহ চাকলা রোশনাবাদের রাজভক্ত জনসাধারণের প্রতিটি গৃহে এই গ্রন্থ শোভিত হত। রাজন্যবর্গের এই সুবৃহৎ বিস্ময়কর ইতিহাস শুধুমাত্র রাজাদের কীর্তিকাহিনী নয়, ত্রিপুরার রাজতন্ত্রের ধারাবাহিক ইতিহাসের ফাঁকে ফাঁকে সমকালীন বৃহত্তর ত্রিপুরার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসও বর্ণিত হয়েছে এই সুমহান আকরগ্রন্থে, যা চিরকালীন গবেষণার বিষয় হিসেবে দেশে-বিদেশে সমাদৃত হয়ে আছে অত্যন্ত মোহনীয়ভাবে। সেই হিসেবে এই গ্রন্থ অতীব মূল্যবান হিসেবে প্রতিভাত।

ত্রিপুরার রাজতন্ত্রের অবসানের পর প্রথমবার ২০০৩ ইংরাজীতে এই দুষ্প্রাপ্য সুপ্রাচীন জনপ্রিয় গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং এক সহস্র কপি ছাপানো হয়।

বর্ত্তমানে মুদ্রিত গ্রন্থ নিঃশেষিত হওয়ায় আবারও সুধী পাঠক সমাজের জন্য ত্রিপুরা সরকারের উপজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র শ্রীরাজমালার লহর চতুষ্টয় পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বর্তমান অংশটি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত শ্রীরাজমালার প্রথম লহর। উক্ত লহরটির প্রকাশনা সাল ১৩৩৬ ত্রিপুরাবদ্ধ (1926-A.D.)।

আশা করি, শ্রীরাজমালার পুনর্মুদ্রিত প্রথম লহরখানি সকল অংশের মানুষের প্রত্যাশা পুরণ করতে সমর্থ হবে।

ইতি
ভবদয়ী

আগরতলা
২০ জুন, ২০২০ইং

(ধনঞ্জয় দেববর্মা)
অধিকর্তা
উপজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার।

পূর্ব্বাভাষ

যে প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা গিয়াছে, তাহা ভগবান চন্দ্রমার বংশসম্ভূত ভারত-বিশ্রুত সুপ্রাচীন ত্রিপুর রাজবংশের পুরাবৃত্ত। ইহা রাজগণের বিবরণসম্বলিত বলিয়া গ্রন্থকারগণ গ্রন্থের নাম রাখিয়াছেন---'রাজমালা'।

সম্পাদিত গ্রন্থের নাম

অন্য কোন কোন রাজবংশের ইতিহাসও ''রাজমালা'' আখ্যা লাভ করা প্রকাশ পায়। কাশ্মীর-রাজবংশের ইতিহাসের নাম 'রাজতরঙ্গিণী'। 'রাজাবলীকথে' মহীশূরের প্রাচীন ইতিবৃত্ত। কোন কোন রাজবংশের ইতিহাস 'রাজাবলী' নামে পরিচিত। শেষোক্ত নামে ত্রিপুরারও এক প্রাচীন ইতিহাস ছিল, তাহা আটশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা গদ্যভাষায় রচিত হইয়াছিল। এখন সেই গ্রন্থের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে।

ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের ইতিহাস গ্রন্থের বিভিন্ন নাম

ত্রিপুরার অন্য প্রাচীন ইতিহাসের নাম 'রাজ-রত্নাকর'। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিতায় দুইখানা গ্রন্থ রচিত হয়, উক্ত উভয় গ্রন্থের নাম 'রাজমালা'। তন্মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত রাজমালাই আমাদের সম্পাদ্য গ্রন্থ।

এস্থলে একটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। রাজরত্নাকর গ্রন্থ স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রযত্নে পণ্ডিত মণ্ডলীর সমবায়ে সম্পাদন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। তৎকালে উক্ত গ্রন্থের প্রথমখণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, এই সূত্রে অনেকে মনে করেন, ইহা বীরচন্দ্রমাণিক্যের আদেশে বিরচিত আধুনিক গ্রন্থ। এই মত পোষণকারীদিগকে অন্য কথা না বলিয়া, স্বয়ং মহারাজের উক্তি জানাইয়া দেওয়াই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পত্রের উত্তরে, ১২৯৬ ত্রিপুরাব্দের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে মহারাজ বীরচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—

রাজরত্নাকর আধুনিক গ্রন্থ নহে

''রাজরত্নাকর নামে ত্রিপুর রাজবংশের একখানা ধারাবাহিক সংস্কৃত ইতিহাস আছে। এই গ্রন্থ ধর্ম্মমাণিক্যের রাজত্ব সময়ে সঙ্কলিত হইতে আরম্ভ হয়। ধর্ম্মমাণিক্য ''জীবারি বসুমানে'' ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ত্রিপুরা ৮৬৮ সনে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এখন ত্রৈপুর ১২৯৬ সন। উক্ত রাজরত্নাকরে আর একখানা প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'রাজমালার' উল্লেখ আছে ; কিন্তু সেই প্রাচীন রাজমালা এখন কোথাও অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না। 'রাজমালা' বলিয়া যাহা প্রচলিত, তাহা রাজরত্নাকর হইতে সংক্ষিপ্ত ও সংগৃহীত এবং বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত। সাধারণে পাঠ করিয়া যেন অনায়াসে বুঝিতে পারে, এই

অভিপ্রায়েই দ্বিতীয় 'রাজমালা' রচিত হইয়াছে। ইহাতে মহারাজ দৈত্যের জীবন বৃত্ত হইতে বর্ণিত আছে ; তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অনেক রাজার ইতিহাস নাই।" ইত্যাদি।

যে রাজমালা অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না বলিয়া মহারাজ লিখিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তীকালে (মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্যের রাজত্বকালে) আগরতলাস্থিত উজীর বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে।

রাজরত্নাকরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে স্বয়ং মহারাজের উক্তি পাওয়া গেল। উক্ত গ্রন্থের রচয়িতাগণ গ্রন্থরচনার সূচনায় কি বলিয়াছেন, তাহাও দেখা সঙ্গত। তাহাতে পাওয়া যায় :---

"শশধর কুলকান্তিঃ প্রাজ্য বিক্রান্তিধাম
প্রথিত বিমলকীর্ত্তি রাজ রাজি প্রজেতা।
নরপতিগণ সেব্যো যো মহাসেন নাম।
নৃপতিরিহ জনানামেক আসীচ্ছরণ্যঃ।।
তস্যাত্মাজন্মা নিতরাং পবিত্রোধর্ম্মৈক কামঃ করুণার্দ্রচেতাঃ।
শ্রীধর্ম্মাদবো নৃপতির্মহীয়ান্ উদারধীঃপুণ্যবতাং বরিষ্ঠঃ।।
যুবাপিযো ভোগসুখানি হিত্বা কন্দাদিভুক্ তাপতুষারসোঢ়া।
সংত্যজ্য গেহং বিনিবৃত্তকামো বভ্রাম তীর্থেষু চ কাননেষু।।
জীবারিবসু সংখ্যাত ত্রিপুরাব্দে গৃহাগতঃ।
পিতয্যুপরতে ঘিন্নো রাজতাময়মগ্রহীৎ।।
স্ব পূর্ব্ব পুরুষাণাংস ভূপতীনাং বিসারিনীম্।
কীর্ত্তিমন্যচ্চ বৃত্তান্তং শ্রোতুমিচ্ছন্ মহীপতিঃ।।
চতুর্দ্দশানাং দেবানাং পূজনাদিসু তৎপরম্।
তন্ত্রাদি সম্বিদং ধীরং পুরাবৃত্তার্থ কোবিদম্।।
বৃর্দ্ধং নীতিবিদাং শ্রেষ্ঠং শান্তং সজ্জন সন্মতম্।।
স কুলাচার তত্ত্বজ্ঞং চন্তায়িং দুর্লভেন্দ্রকম্।।
শুক্রেশ্বরং মদনুজং তথা বাণেশ্বরঞ্চমাম্।
ইদমাহ সমহূয় সাদরং ধরণীশ্বরঃ।।" ইত্যাদি।

এতদ্দারা জানা যায়, চন্তাই দুর্ল্লভেন্দ্র এবং পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর কর্ত্তৃক রাজ-রত্নাকর রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা রাজমালাও মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের অনুজ্ঞায় ইঁহারাই রচনা করিয়াছেন, সুতরাং রাজরত্নাকর ও রাজমালা সমসাময়িক গ্রন্থ বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। তবে, রাজরত্নাকর অগ্রে ও রাজমালা তাহার পরে রচিত হওয়া অসম্ভব নহে।

রাজরত্নাকর রাজমালা গ্রন্থের সমসাময়িক

মহারাজ পূর্ব্বোক্ত পত্রের এক স্থানে লিখিয়াছেন,---"দ্বিতীয় বাঙ্গালা রাজমালার

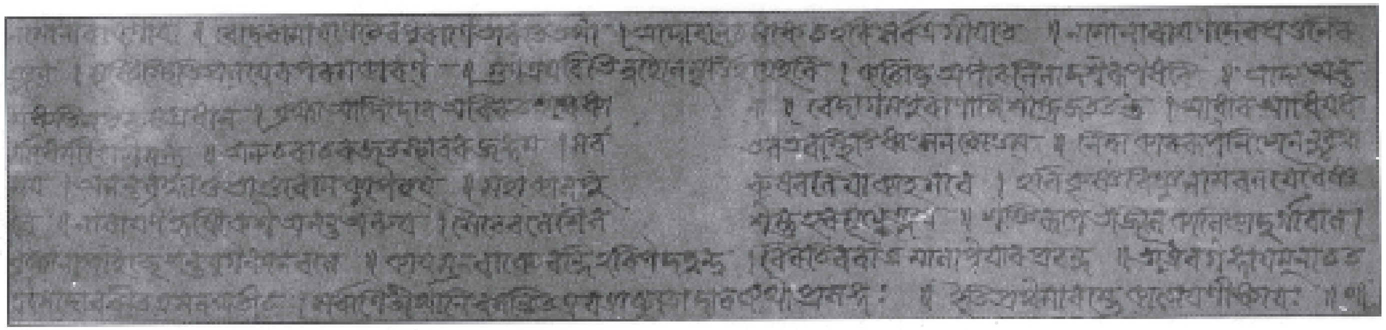

রাগমালা পুঁথি: ৪৮ক পৃষ্ঠা

লেখককে আমি বালক বয়সে দেখিয়াছি।" এই বাক্য রাজমালার প্রথম খণ্ডের রচয়িতাগণের প্রতি আরোপ হইতে পারে না। কারণ, পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের বাল্যকালে তাহার রচয়িতাদিগকে দেখা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। রাজমালার বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপিসমূহের মধ্যে একখানা আলোচনায় জানা যায়, তাহা ১২৫৬ ত্রিপুরাব্দে লিখিত হইয়াছে। এই সময়ের লিখিত অন্যান্য আরও অনেক পাণ্ডুলিপি রাজগ্রন্থ-ভাণ্ডারে পাওয়া যাইতেছে। এতদ্দারা বুঝা যায়, সে কালে অনেকগুলি গ্রন্থ নকল করা হইয়াছিল। মহারাজ বীরচন্দ্রের বয়সের হিসাব ধরিলে দেখা যাইবে, ইহা মহারাজের শৈশবের কথা। তাঁহার শিশুকালের এই দৃশ্য স্মরণ ছিল এবং তাহাই পত্রে লিখিয়াছেন, সমস্ত অবস্থা আলোচনা করিলে ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ 'লেখক' ও 'রচয়িতা' এক কথা নহে। মহারাজের পত্রস্থ 'লেখক' শব্দ পূর্ব্বোক্ত অনুমানকেই পোষণ করিতেছে। বাঙ্গালা রাজমালার প্রথমাংশ যে পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন, এ বিষয়ে কাহারও সংশয় নাই। এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণেলও একথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।*

এ স্থলে আর একটী কথা মনে হয়। রাজমালার ৬ষ্ঠখণ্ড মহারাজ কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের রাজত্বকালে (১২৩৯ হইতে ১২৫৯ ত্রিপুরাব্দের মধ্যে) রচিত হইয়াছে। এই খণ্ডের রচয়িতা স্বর্গীয় উজীর দুর্গামণি ঠাকুর। ইহা মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের বাল্য জীবনের ঘটনা। পূর্ব্বোক্ত পত্রে 'লেখক' শব্দ দ্বারা যদি রচয়িতাকেই লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, তবে এই ৬ষ্ঠ খণ্ডের রচয়িতার কথাই বলা হইয়াছে, ইহা নিঃসংশয়ে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে।

সমগ্র রাজমালা এক সময়ের রচিত নহে

অনেকের বিশ্বাস, সমগ্র রাজমালা এক সময়ে রচিত হইয়াছে; এই ধারণা প্রমাদশূন্য নহে। মহারাজ দৈত্য হইতে মহারাজ কাশীচন্দ্রমাণিক্যের শাসনকাল পর্য্যন্তের বিবরণ ক্রমান্বয়ে ছয়বারে রাজমালায় গ্রথিত হইয়াছে। এই ছয় বারের রচনাকে ছয়টি লহরে বিভক্ত করা হইল। প্রত্যেক লহরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

প্রথম লহর

বিষয়---দৈত্য হইতে মহামাণিক্য পর্য্যন্ত বিবরণ।

বক্তা---বাণেশ্বর, শুক্রেশ্বর ও দুর্ল্লভেন্দ্র নারায়ণ।

শ্রোতা---মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য।

রচনাকাল---খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ।

---

* J.A.S.B-Vol. XIX

দ্বিতীয় লহর

বিষয়---ধর্ম্মমাণিক্য হইতে জয়মাণিক্য পর্য্যন্ত বিবরণ।

বক্তা---রণচতুর নারায়ণ।

শ্রোতা---মহারাজ অমরমাণিক্য।

রচনাকাল---খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ।

তৃতীয় লহর

বিষয়---অমরমাণিক্য হইতে কল্যাণমাণিক্য পর্য্যন্ত বিবরণ।

বক্তা---রাজমন্ত্রী।

শ্রোতা---মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য।

রচনাকাল---খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ।

চতুর্থ লহর

বিষয়---গোবিন্দমাণিক্য হইতে কৃষ্ণমাণিক্য পর্য্যন্ত বিবরণ।

বক্তা---জয়দেব উজীর।

শ্রোতা---মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য।

রচনাকাল---খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ।

পঞ্চম লহর

বিষয়---রাজধরমাণিক্য হইতে রামগঙ্গামাণিক্য পর্য্যন্ত বিবরণ।

বক্তা---দুর্গামণি উজীর।

শ্রোতা---মহারাজ কাশীচন্দ্রমাণিক্য।

রচনাকাল---খৃঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ।

ষষ্ঠ লহর

বিষয়---রামগঙ্গামাণিক্য হইতে কাশীচন্দ্রমাণিক্য পর্য্যন্ত বিবরণ।

বক্তা---দুর্গামণি উজীর।

শ্রোতা---মহারাজ কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য।

রচনাকাল---খৃঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

রাজমালা ইতিহাস পর্য্যায়ের অন্তর্গত

শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে পুরাবৃত্ত বা ইতিহাসের যে সকল লক্ষণ বর্ণিত আছে, রাজমালাকে তাহার সম্যক লক্ষণাক্রান্ত বলা যাইতে না পারিলেও মুখ্য বা গৌণ ভাবে তৎসমস্তের অনেক লক্ষণই ইহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এস্থলে প্রাচীন মতের আভাস প্রদান করা হইয়াছে।

"ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রান্যনু ব্যাখ্যানানি" (১৪।৫।৪।১০) ইতিহাস বাচ্য। মহাভারতে পাওয়া যাইতেছে—

প্রাচীনমতে ইতিহাসের লক্ষণ

"ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণামুপদেশ সমন্বিতম্।।
পুরাবৃত্ত কথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে।।"

"যাহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপদেশ এবং পুরাকাহিনী আছে, তাহাকে ইতিহাস বলা যায়।"

বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার শ্রীধরস্বামীর মতে, পূতচরিত ত্রিকালদর্শী ঋষিগণের মুখ-নিঃসৃত আখ্যানসমূহ, দেব ও ঋষিচরিত, এবং ভবিষ্যৎ ধর্ম্মকর্ম্মাদির বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থ ইতিহাস আখ্যা লাভ করিবার যোগ্য। আর্য্য মতে, যে গ্রন্থে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ নাই, তাহা পূর্ণ বা স্থায়ী ইতিহাস নহে ; তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য। সাহিত্য সম্পর্কেও তাঁহাদের ইহাই মত। প্রাচীনকালের সাহিত্য ও ইতিহাস প্রায়ই একাধারে বিন্যস্ত এবং তাহার সমগ্রাংশ ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দেবধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, যে গ্রন্থে মানব সমাজের অতীত ও বর্ত্তমান ঘটনাবলী সন্নিবিষ্ট আছে, তাহাকেই ইতিহাস বলে।† এতদুভয় মতের পার্থক্য বড় বেশী। যাহা হউক, প্রাচীন এবং আধুনিক উভয় মতেই রাজমালা ইতিহাসশ্রেণীতে স্থান লাভের যোগ্য বলিয়া মনে হয়।

পাশ্চাত্যমতের ইতিহাস

রাজমালা যে বংশের ইতিহাস, সেই বংশের প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষগণ ক্ষত্রিয় জাতি। জগতের সৃষ্টিকাল হইতে এই জাতি মানব সমাজে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন। ঋগ্বেদ (১০।৯০।১২), শুক্ল যজুর্ব্বেদ (৩১।১১), অথর্ব্ববেদ (১৯।৬।৬) মতে ক্ষত্রিয়জাতি ব্রহ্মার বাহু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ‡

ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি কথা

ক্ষত্রিয়জাতি প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত---সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ, অগ্নিবংশ ও ইন্দ্রবংশ। এই চারিজাতীয় ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সূর্য্যবংশীয়গণই আদিম। ভগবান্ লোকলোচন দিবাকরের পুত্র বৈবস্বত মনু

ক্ষত্রিয় জাতির বংশ বিভাগ

---

* "আর্য্যাদি বহুব্যাখ্যানাং দেবর্ষি চরিতাশ্রয়ম্।
ইতিহাসসমিতি প্রোক্তং ভবিষ্যাদ্ভুত ধর্ম্মযুক্।।"

† The general idea of history seems to be that it is the biography of a society"--Arnold's Lecture on History.

‡ ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্ বাহূরাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদভ্যাং শূদ্রোহজায়ত।

হইতে এই বংশল তা সমুদ্ভুত, এবং ভগবান্ চন্দ্রের আত্মজ বুধ হইতে চন্দ্রবংশ ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। অগ্নিবংশের উৎপত্তি বিবরণ কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্যময়। এই বংশ চারিভাগে বিভক্ত, যথা---প্রতিহার (পুরীহার), চৌলুক্য (চালুক্য; বা শোলাঙ্কি), প্রমার ও চৌহান। এই শাখা চতুষ্টয়ের চারিজন আদি পুরুষ ব্রাহ্মণের যজ্ঞকুণ্ড হইতে অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম প্রতিহার, চৌলুক্য, প্রমার ও চৌহান। ইঁহাদের নামানুসারেই তত্তদ্বংশবল্লী পরিচিত হইয়াছে। ইন্দ্রবংশীয়গণের উৎপত্তি বিবরণ প্রচলিত পুরাণাদি গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় না ; কিন্তু খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া প্রদেশের অধিনায়কগণ এতদ্বিংশীয় বলিয়া পরিচিত।

আদিবংশ বিষয়ক বিবরণ

আদিবংশ সম্পর্কীয় একটী কথা এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে বলেন, সূর্য্য এবং চন্দ্র জড়পদার্থ, সুতরাং তাহাদের বংশ বিস্তার সম্ভব হইতে পারে না। যাঁহারা বেদ পুরাণোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব এবং তাহার উদ্দেশ্য ধীরভাবে অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করেন না, কিন্তু পাশ্চাত্য-মতবাদিগণের মধ্যে এতদ্দেশীয় অনেক ব্যক্তিও এ বিষয়ে সন্দেহের ভাব পোষণ করেন। এই সুগভীর প্রাচ্য মতের পোষক প্রমাণ লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার, এবং তাহা সকলের সাধ্যায়ত্তও নহে। শাস্ত্র বাক্যের প্রতি সন্দেহোদ্রেকের ইহাই প্রধান কারণ। বিশেষতঃ এখন পাশ্চাত্য প্রভাবের যুগ, সুতরাং পাশ্চাত্য মতানুকূল বাক্যই গ্রাহ্য হইয়া থাকে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য মত আলোচনা করিতে গেলেও দেখা যাইবে, যে সকল প্রতীচ্য দেশ আপনাদের প্রাচীনত্ব স্থাপনের প্রয়াসী, সেই সকল দেশের আদি বংশের ইতিহাস আর্য্যমতের অনুসরণ করে। মিসর, বাবলেন ও আমেরিকার আদি নৃপতিগণ সূর্য্যতনয় বলিয়া পরিচিত। চীনের আদি নৃপতিও সূর্য্য-পুত্র। এই সকল কথা মানিয়া লইতে আপত্তি না থাকিলে, আর্য্য মতের আলোচনা কালে বিরুদ্ধ প্রশ্ন উত্থাপনের কি কারণ থাকিতে পারে জানি না। কিন্তু এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারাই মত-বিরোধিগণ সন্তুষ্ট হইবেন, এমন আশা হৃদয়ে পোষণ করা যাইতে পারে না। তবে তাঁহাদিগকে আর্য্য ইহিতাস শ্রদ্ধার সহিত আলোচনার নিমিত্ত অনুরোধ করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

এতৎ সম্বন্ধে আর্য্যশাস্ত্র ঘটিত একটী কথা এ স্থলে বলা যাইতে পারে। কথাটি এই যে, সূর্য্য ও চন্দ্রের বংশধারা আলোচনাকালে আমাদের মনে রাখা উচিত, সমস্ত গ্রহ মণ্ডলেরই এক একজন অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন। গ্রহ এবং গ্রহ-অধিষ্ঠাতা এক নহেন, অথচ অধিকাংশ স্থলে উভয়ে এক নামেই পরিচিত। এ স্থলে বিশেষভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, চন্দ্রগ্রহের অধিষ্ঠাতার নামও চন্দ্র।*

* বিশ্বকোষ—৬ষ্ঠ ভাগ, 'চন্দ্র' শব্দ দ্রষ্টব্য। মতান্তরে চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী উমা।

সূর্য্য, মরিচীর পৌত্র এবং প্রজাপতি কশ্যপের পুত্র। সূর্য্যের পুত্র বৈবস্বত মনু হইতে মানবকুল বিস্তৃত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, চন্দ্র অত্রির পুত্র। অত্রি সপ্তর্ষির মধ্যে একজন, মনুর মতে ইনিও প্রজাপতি। চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র পুরূরবা। এই পুরূরবা হইতে চন্দ্রবংশে বিস্তার লাভ করিয়াছে। এখন সহজেই বুঝা যাইবে, এই সূর্য্য ও চন্দ্র জড় গ্রহ মণ্ডল নহেন---গ্রহের প্রতিষ্ঠাতা দেবতা। তাঁহারা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে মাতা ও পিতার রজ-বীর্য্যের জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের বংশ বিস্তারের কথা অসঙ্গত বা অসম্ভব বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না।

সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ সম্বন্ধীয় কথা

সুপ্রাচীন কাল হইতে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ জগতে অধিকতর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এতদুভয় বংশ পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার প্রমাণও পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রের পুত্র বুধ, সূর্য্যের পৌত্রী (মনু-তনয়া) ইলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইবে, এক মনু হইতেই উক্ত প্রভাবশালী বংশদ্বয়ের বিস্তার হইয়াছে। সূর্য্যবংশ মনুর পুত্র হইতে, এবং চন্দ্রবংশ তাঁহার কন্যা হইতে সঞ্জাত। এতদুভয় বংশ সমকালীয় হইলেও সূর্য্যবংশের অভ্যুদয়কাল চন্দ্রবংশ হইতে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। কর্ণেল টড্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এতৎসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। সত্য ও ত্রেতাযুগের একচ্ছত্র নৃপতিবৃন্দের নাম আলোচনা করিলে জানা যায়, তৎকালে সূর্য্যবংশীয়গণই বিশেষ প্রভাবান্বিত ছিলেন। চন্দ্রবংশীয়গণ ক্বচিৎ ভারতে একাধিপত্য লাভ করিয়া থাকিলেও সূর্য্যবংশীয় প্রভাবের সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বাল্মিকী রামায়ণের মতে শ্রীরামচন্দ্র সূর্য্যদেব হইতে অধস্তন ৩৭শ স্থানীয়, এবং মহাভারত অনুসারে যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন প্রভৃতি চন্দ্র হইতে ৪৩শ স্থানীয়। উভয় বংশের মধ্যে পুরুষ সংখ্যার এই অকিঞ্চিৎকর পার্থক্য দর্শনে, পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমাজ বলেন, ‘‘শাস্ত্রানুসারে রামচন্দ্র ত্রেতাযুগের রাজা হইয়াও দ্বাপরের শেষ ভাগের রাজা যুধিষ্ঠিরাদি হইতে মাত্র সাত পুরুষ অগ্রবর্ত্তী বলিয়া লক্ষিত হইতেছেন। রামচন্দ্রকে

পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমাজের মত ও তাহার নিরাসন

ত্রেতার শেষভাগের রাজা বলিয়া মনে করিলেও তিনি যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের মাত্র সাত পুরুষ পূর্ব্বে আবির্ভূত হওয়া সম্ভব বলিয়া, ধরা যাইতে পারে না।’’ এই প্রশ্ন উত্থাপনের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, পাশ্চাত্য সমাজ, সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের অভ্যুত্থান সমকালীয় বলিয়া মনে করেন; এই কারণেই তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সূর্য্য বংশীয় ১৫শ পুরুষের সময় চন্দ্রবংশের অভ্যুদয় হইয়াছে। অথচ, চন্দ্রের পৌত্র পুরূরবা

সত্যযুগে আবির্ভূত হইয়াও ত্রেতার প্রারম্ভকাল পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহা পাওয়া যাইতেছে।

"পুরূরবস এবাসীৎত্রয়ী ত্রেতামুখে নৃপ।
অগ্নিনা প্রজয়া রাজা লোকং গান্ধর্ব্বমেয়িবান্।।"

শ্রীমদ্ভাগবত—৯ম স্কন্ধ, ১৪ অঃ, ৪৯ শ্লোক।

ইক্ষ্বাকু, ত্রিশঙ্কু, ধুন্ধুমার ও মান্ধাতা প্রভৃতি সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ সত্যযুগের রাজা। এতদ্বংশীয় ভরত ও সগররাজার প্রথম বয়সে সত্যযুগ ছিল। আবার উক্ত মহারাজ সগর ও চন্দ্রবংশীয় পুরূরবার শেষ বয়সে ত্রেতা যুগের উদ্ভব হয়, সুতরাং সগর ও পুরূরবা সমসাময়িক নির্ণীত হইতেছেন। পূর্ব্বোক্ত বংশ প্রবৃত্তিকালের সহিত এই বিবরণ মিলাইয়া হিসাব করিলে দেখা যাইবে, রামচন্দ্রের অধস্তন ২৪ পুরুষ পরে ভারত-যুদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে মাত্র সাত পুরুষ ব্যবধান দেখিতেছেন, তাহা প্রমাদপূর্ণ।

কথাটি আরও বিশদভাবে বুঝা আবশ্যক। এতদুদ্দেশ্যে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় বংশলতার কিয়দংশ পাশাপাশি ভাবে উদ্ধৃত হইল।

সূর্য্যবংশ---	**চন্দ্রবংশ**---
(বাল্মিকী রামায়ণ মতে)	(মহাভারত মতে---পৌরব শাখা)
১। সূর্য্য।	
২। মনু।	
৩। ইক্ষ্বাকু।	
৪। কুক্ষি।	
৫। বিকুক্ষি।	
৬। বাণ।	
৭। অনরণ্য।	
৮। পৃথু।	
৯। ত্রিশঙ্কু।	
১০। ধুন্ধুমার।	
১১। যুবনাশ্ব।	
১২। মান্ধাতা।	
১৩। সুসন্ধি।	
১৪। ধ্রুবসন্ধি।	

সূর্য্যবংশ---

(বাল্মিকী রামায়ণ মতে)

১৫। ভরত।
১৬। অসিত।
১৭। সগর।
১৮। অসমঞ্জস।
১৯। অংশুমান।
২০। দিলীপ।
২১। ভগীরথ।
২২। কুকুৎস্থ।
২৩। রঘু।
২৪। প্রবৃদ্ধ।
২৫। শঙ্খন।
২৬। সুদর্শন।
২৭। অগ্নিবর্ণ।
২৮। শীঘ্রগ।
২৯। মরু।
৩০। প্রাশুশ্রুক।
৩১। অম্বরীষ।
৩২। নহুষ।
৩৩। যযাতি।
৩৪। নাভগ।
৩৫। অজ।
৩৬। দশরথ।
৩৭। শ্রীরামচন্দ্র।
৩৮। কুশ।
৩৯। অতিথি।
৪০। নিষধ (নল)।
৪১। নভ।
৪২। পুণ্ডরীক।
৪৩। ক্ষেমধন্বা।

চন্দ্রবংশ---

(মহাভারত মতে---পৌরব শাখা)

১। চন্দ্র।
২। বুধ।
৩। পুরূরবা।
৪। আয়ু।
৫। নহুষ।
৬। যযাতি।
৭। পুরু।
৮। জনমেজয়।
৯। প্রাচীন্বান।
১০। সংযাতি।
১১। অহংযাতি।
১২। সার্ব্বভৌম।
১৩। জয়ৎসেন।
১৪। অবাচীন।
১৫। অরিহ।
১৬। মহাভৌম।
১৭। অযুতনায়ী।
১৮। অক্রোধন।
১৯। দেবতিথি।
২০। অরিহ।
২১। ঋক্ষ।
২২। মতিনার।
২৩। তংসু।
২৪। ঈলিন।
২৫। দুষ্মন্ত।
২৬। ভরত।
২৭। ভূমন্যু।
২৮। সুহোত্র।
২৯। হস্তী।

সূর্য্যবংশ---	**চন্দ্রবংশ---**
(বাল্মিকী রামায়ণ মতে)	(মহাভারত মতে---পৌরব শাখা)
৪৪। দেবানীক।	৩০। বিকুণ্ঠ।
৪৫। হীন (অহীনগু বা রুরু)।	৩১। অজমীঢ়।
৪৬। পারিযাত্র (পারিপাত্র)।	৩২। সংবরণ।
৪৭। বলস্থল (দল)।	৩৩। কুরু।
৪৮। বজ্রনাভ।	৩৪। বিদূরথ (বিদূর)।
৪৯। সুগন।	৩৫। অনশ্বা।
৫০। বিধৃতি (ব্যুথিতাশ্ব)।	৩৬। পরীক্ষিৎ।
৫১। হিরণ্যনাভ।	৩৭। ভীমসেন।
৫২। পুষ্প (পুষ্য)।	৩৮। প্রতিশ্রবা।
৫৩। ধ্রুব সন্ধি।	৩৯। প্রতীপ।
৫৪। সুদর্শন।	৪০। শান্তনু।
৫৫। অগ্নিবর্ণ (শীঘ্র)।	৪১। বিচিত্রবীর্য্য।
৫৬। মরু।	৪২। পাণ্ডু।
৫৭। প্রসুশ্রুত।	৪৩। অর্জ্জুন।
৫৮। সন্ধি (সুগন্ধি)।	৪৪। অভিমন্যু। (ইনি ভারতযুদ্ধে বৃহদ্বলকে নিহত করেন।)
৫৯। অমর্ষণ (অমর্ষ)।	
৬০। মহস্বান্।	
৬১। বিশ্রুতবান্।	
৬২। বৃহদ্বল। (ইনি অভিমন্যু কর্ত্তৃক ভারতযুদ্ধে নিহত হন)।	

ভারতযুদ্ধে অভিমন্যু কর্ত্তৃক বৃহদ্বল নিহত হইবার কথাও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অসম্ভব বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এই উপেক্ষাও পুরুষ সংখ্যার প্রমাদমূলক হিসাবসঞ্জাত। উদ্ধৃত বংশতালিকা আলোচনায় দেখা যাইবে, চন্দ্রবংশের অভ্যুত্থানকালের পূর্ব্ববর্ত্তী সূর্য্যবংশীয় ১৫ জনের নাম বাদ দিলে, (চন্দ্রবংশীয় প্রথম পুরুষ বুধের সমসাময়িক অসিত হইতে সূর্য্যবংশের পুরুষ সংখ্যা গণনা করিলে) বৃহদ্বল সূর্য্যবংশের ৪৭ সংখ্যায় দাঁড়াইবেন। তাঁহাকে চন্দ্রবংশের ৪৪ স্থানীয় অভিমন্যুর সমসাময়িক বলিয়া নির্ণয় করিতে আপত্তি হইতে পারে না। সুদীর্ঘকালে উভয়বংশের ক্রমিক সংখ্যায় তিন পুরুষের তারতম্য ধর্ত্তব্য নহে। বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশের ২২শ অধ্যায়ে, বৃহদ্বল যুধিষ্ঠির সমসাময়িক বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহাতে মানবের আয়ুষ্কাল সুদীর্ঘ লক্ষিত হইবে ; ইহা আর্য্য শাস্ত্র-গ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। বর্ত্তমানকালে অনেকেই শাস্ত্র কথিত আয়ুঃ পরিমাণ স্বীকার করেন না। মানুষ সহস্র সহস্র বৎসর বাঁচিতে পারে, ইহা তাঁহারা প্রলাপ বাক্য বলিয়া মনে করেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় এই আপত্তির যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত করা হইল :—

মানবের আয়ুষ্কাল বিষয়ক আলোচনা

"শাস্ত্রে লিখিত আছে,—কেহ কেহ সহস্র বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন, কেহ তাহারও অধিককাল জীবিত ছিলেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে—সত্যযুগে মানুষের পরমায়ু একরূপ, ত্রেতায় অন্যরূপ, দ্বাপর ও কলিতে আবার আর একরূপ। * কিন্তু আয়ু গণনার বর্ত্তমান পদ্ধতিতে শাস্ত্রবাক্য অনুসরণ করা হয় না। মানুষ একশত বর্ষের অধিককাল বাঁচিতে পারে, এখনকার দিনে একথা কেহ কল্পনায়ও ধারণা করিতে পারেন না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সুদীর্ঘ পরমায়ুর কথা শুনিলে উপহাস করেন। কিন্তু একটু নিগূঢ় অনুসন্ধান করিলে আমরা কি দেখিতে পাই ? পাশ্চাত্য দেশেরই দুইটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইংলণ্ডের অধিপতি দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে হেন্‌রী জেঙ্কিন্স্ নামক একব্যক্তির বয়ঃক্রম ১৬৯ বৎসর হইয়াছিল। অষ্টম হেন্‌রীর রাজত্বকালে একাদশ বর্ষ বয়সে ফ্রোডন-রণক্ষেত্রে জেঙ্কিস্ ইংলণ্ডের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। ইংলণ্ডের সিংহাসনে পর্য্যায়ক্রমে সাতজন নৃপতিকে এবং ক্রমওয়েলকে সে রাজত্ব করিতে দেখিয়াছিল। প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে টমাস পার নামক এইরূপ আর একজন দীর্ঘজীবী ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এ ব্যক্তি ১৫২ বর্ষ ৯ মাস জীবিত ছিল। *** আমাদের শাস্ত্র কথিত পরমায়ু সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থে, বাইবেলে মহাপুরুষগণের পরমায়ু সম্বন্ধে কি উক্তি দেখিতে পাই ? আদম ৯৩০ বৎসরের অধিককাল জীবিত ছিলেন। লুক প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের কেহ কেহ ৯০০ বৎসর, কেহ ৭০০ বৎসর, কেহ ৬০০ বৎসর জীবিত ছিলেন।"

পৃথিবীর ইতিহাস—৪র্থ খণ্ড, ৪র্থ পরিঃ, ৩৫ পৃষ্ঠা।

আর্য্য শাস্ত্রে কলিযুগের মানব-পরমায়ু ১২০ বৎসর নির্দ্ধারিত আছে। লোককে সেই পরিমাণ পরমায়ু লাভ করিতে অনেকেই দেখিয়াছেন—বর্ত্তমানকালেও দেখিতেছেন। উদ্ধৃত বাক্য দ্বারা তদপেক্ষা অধিককাল জীবিত থাকিবার খবরও পাওয়া যাইতেছে ; সুতরাং শাস্ত্র নিরূপিত কলির মানব-পরমায়ুকাল প্রত্যক্ষ সত্য। এরূপ অবস্থায় সত্য-ত্রেতাদি যুগের শাস্ত্রকথিত পরমায়ুকাল

* শাস্ত্রমতে সত্যযুগের মনুষ্য-পরমায়ু লক্ষ বৎসর এবং তৎকালে মৃত্যু মানুষের ইচ্ছাধীন ছিল। মানবগণ ত্রেতা যুগে দশ সহস্র বৎসর, দ্বাপরে সহস্র বৎসর এবং কলিযুগে ১২০ বৎসর পরমায়ু লাভ করিবে, শাস্ত্রে ইহাই মত।

আমাদের প্রত্যক্ষের বহির্ভূত বলিয়া কি তাহা উপেক্ষা করিতে হইবে? যদি তাহাই সঙ্গত হয়, তবে বর্ত্তমানের অদূরদর্শী দৃষ্টির অগোচর কোন বিষয়েরই যথার্থ্য স্বীকার করা চলে না। প্রতিনিয়ত দেখা যাইতেছে, পাশ্চাত্য ধারণা পদে পদে পর্য্যুদস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমরা তৎপ্রতি অন্ধবিশ্বাসী। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত পাইলেই, তাহাকে বেদবাক্য অপেক্ষাও অভ্রান্ত বলিয়া আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি, কিন্তু সেই মতের ভিত্তি কতটুকু দৃঢ়, তাহা ভাবিয়া দেখি না। অবশ্য, পাশ্চাত্য মতকে অশ্রদ্ধা বা উপেক্ষা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, বিচারপূর্ব্বক গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তাহাই বলিতেছি।

পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে আলোচনা।

আর্য্য শাস্ত্রানুসারে সত্যযুগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তের কাল-মান কিঞ্চিদধিক ৩৮ লক্ষ ৯৩ হাজার বৎসর দাঁড়ায়। * পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকেও হাস্যজনক উক্তি বলিয়া মনে করেন ; এই সমাজের অনেকে বলেন, "ইতিহাস পাঁচ ছয় হাজার বৎসরের অধিক প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন প্রদান করিতে অসমর্থ।" ইঁহাদের বাক্য সম্যক সমর্থনযোগ্য না হইলেও সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষণীয় বলা যায় না। আর এক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস খ্রীষ্ট-জন্মের চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। ইঁহাদের মতে পৃথিবীর বয়স এখনও ছয় হাজার বৎসর পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু আর্য্যশাস্ত্র বলেন,---বৈবস্বত মন্বন্তরের সম্পূর্ণ তিনটী যুগ (সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর) অতীতে পর, কলিরও পাঁচ হাজার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। যে স্থলে এমন আকাশ পাতাল পার্থক্য, সে স্থলে উভয় মতের সামঞ্জস্য ঘটাইতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তবে, পাশ্চাত্য মতের সারবত্তা কতটুকু, তাহা দেখা আবশ্যক ; এ স্থলে দুই একটী পাশ্চাত্য মতেরই আলোচনা করা যাইতেছে।

'পাভিলাণ্ড্ কেভ্' গহ্বরে কতকগুলি নর-কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল, † ইহা একশত বৎসরেরও পূর্ব্বকালের কথা। সেই অস্থি-পঞ্জর কত কালের প্রাচীন, তৎসময় তাহা নির্ণীত হইতে পারে নাই। পরবর্ত্তীকালে 'রয়েল য়্যানথ্রো-পলজিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট্' সমিতির এক অধিবেশনে অধ্যাপক সোল্লাস্ নির্ণয় করিয়াছেন, ইহা 'আরিগনাশিয়ান' কালের (Aurignacian age)

---

* সত্যযুগের মান—১৭,২৮,০০০ হাজার বৎসর, ত্রেতার মান—১২,৯৬,০০০ হাজার বৎসর, দ্বাপরের মান—৮,৬৪,০০০ হাজার বৎসর এবং কলির গতাব্দা কিঞ্চিদধিক ৫,০০০ হাজার বৎসর।

† "Priviland Cave represents the most westerly outpost of the Cro-Magnon race, which extended to the east as far as Moravia (in Austria) and to the south as far as Mentone (in Italy)."

কঙ্কাল। * অর্থাৎ যে সময় 'গ্লেসিয়াল' (তুষারচ্ছাদিত অবস্থা) অতীত হইয়া 'পোষ্ট-গ্লেসিয়াল' (তুষার পাতের পরবর্ত্তী অবস্থা) চলিতেছিল, সেই সময় আরিগনাশিয়ান কাল বিদ্যমান ছিল। তাহা বর্ত্তমান হইতে বিংশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কাল। উক্ত গহ্বরে এমন কতকগুলি আসবাব ও অস্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছিল, যদ্দ্বারা সেকালের সভ্যতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং এই নিদর্শনকেও মানব জাতির আদিকালের বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ইংলণ্ডে টেমস নদীর গর্ভস্থ মৃৎস্তরের ভিতর একটী নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। সেই পঞ্জর অন্যূন ১ লক্ষ ৭০ হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী মনুষ্যের বলিয়া অধ্যাপক কিথ্ ঘোষণা করিয়াছেন। অন্যত্র ভূগর্ভে প্রাপ্ত অনেকগুলি মৃৎপাত্র ও কবরস্থান ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া ডক্টর ডাউলার তাহা অন্যূন পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্ব্বের বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অল্পদিন পূর্ব্বে ই. বি. রেলওয়ে লাইন বর্দ্ধিত করা উপলক্ষে আসানসোলের সন্নিহিত স্থানে একখণ্ড গাছ-পাথর পাওয়া গিয়াছিল, তাহা কলিকাতার সরকারী চিত্রশালায় রাখা হইয়াছে। কৃতবিদ্য বিশেষজ্ঞের পরীক্ষায় নির্ণীত হইয়াছে, তাহা দেড় লক্ষ বৎসরের প্রাচীন বস্তু। এবম্বিধ দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে। ইহার পরেও কি পৃথিবীর বয়স ছয় হাজার বৎসরের ন্যূন বলিয়া মানিতে হইবে? উত্তরোত্তর যতই পুরাতত্ত্বের আবিষ্কার হইতেছে, দিন দিন ততই পাশ্চাত্যমত এই ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অনন্ত ভবিষ্যৎ ব্যাপিয়া এরূপ নূতন নূতন মত প্রবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তনের ধারা চলিতে থাকিবে। ইহার শেষ কোথায়, ভগবান জানেন।

পাঁচ ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া যে অধুনা একটী কথা উঠিয়াছে, তাহা একেবারে অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না,

প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার।

কিন্তু নিবিষ্টমনে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে, বর্ত্তমান কালের অবলম্বিত প্রণালী ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। প্রাচীন স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ শিলালিপি, তাম্রশাসন, প্রাচীন মুদ্রা এবং প্রাচীন সাহিত্য ইত্যাদি উপাদান, পুরাতত্ত্ব সংগ্রহের পক্ষে বিশেষ সাহায্যকারী সত্য, কিন্তু তৎসমুদায়ের স্থায়িত্ব অধিক নহে। এই সকল উপাদানের সাহায্যে দুই সহস্র বৎসরের ইতিহাস সংগ্রহ করাও অনেক স্থলে অসম্ভব। অথচ বর্ত্তমান কালে এই সমস্তের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করা হইতেছে। এরূপ অস্থায়ী উপাদানের সাহায্যে সুপ্রাচীন কালের বিবরণ

* Lecture of the Royal Anthropological Institutes delivered by Prof. W.T. Sollas,

সংগ্রহ করিবার চেষ্টাকে নিতান্তই ব্যর্থ প্রয়াস বলিতে হইবে। আর্য্যগণ একমাত্র ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট ইতিহাসেরই স্থায়িত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ধর্ম্মগ্রন্থ ব্যতীত প্রাচীন ইতিহাসের অন্য কোনও স্থায়ী উপাদান নাই। শ্রদ্ধাসহকারে শাস্ত্র-গ্রন্থসমূহ আলোচনা করিলে, তাহা হইতেই ইতিহাসের উপাদান উদ্ধার করা যাইতে পারে। আর্য্যগণের রাজনীতি, সমাজ-নীতি, শিল্প ও বাণিজ্য-নীতি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়েরই মূলভিত্তি একমাত্র ধর্ম্ম। সুতরাং ধর্ম্মগ্রন্থসমূহে তদ্বিষয়ক উপাদানের অভাব নাই। মানব সমাজের ইতিহাস সংগ্রহের পক্ষে এই সকল উপাদান বিশেষ মূল্যবান। কেবল বেদ-পুরাণ নহে, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি সর্ব্বদেশীয় সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থই অল্পাধিক পরিমাণে ইতিহাসের উপাদান বক্ষে ধারণ করিতেছেন, তাঁহা বাছিয়া লইতে পারিলে বহু প্রাচীন কালের বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু সুদূর অতীতের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে গেলে এই সকল উপাদানও পরাভূত হইবে। বৈদিক কালের কথা ছাড়িয়া দিয়া, বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের বিবরণ সংগ্রহ করিতে গেলেও ৩৯ লক্ষ বৎসরের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে হয়। বর্ত্তমান কালে তাহা কোন ক্রমেই সম্ভবপর হইতে পারে না। এই কারণে পুরাতত্ত্ব লইয়া নানাবিধ বিতর্ক উপস্থিত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক এবং প্রতিনিয়ত তাহাই হইতেছে।

যুগের মানও আধুনিক পণ্ডিত সমাজের গ্রহণীয় নহে, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহারা যে যুক্তি-মূলে যুগমান অস্বীকার করেন, তাহাও উল্লেখ করা গিয়াছে। ইতিহাসের অগোচর কালে (খ্রীঃপূঃ চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে) পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকিবার কথাই যাঁহারা মানেন না, সুদীর্ঘ যুগমান তাঁহাদের স্বীকার্য্য হইতে পারে না। কিন্তু বিষয়টী নিবিষ্ট চিত্তে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, আর্য্যকথিত যুগ-প্রবর্ত্তনা ও যুগ-মানের হিসাব তিথি নক্ষত্রাদির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধান্বিত। সুতরাং তারা কাল্পনিক বা ভিত্তিহীন বলিয়া উপেক্ষা করিবার যোগ্য নহে। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের কথা আমাদের ধারণার অতীত, অতএব তদ্বিষয়ক আলোচনার প্রয়াস সর্ব্বথা ব্যর্থ হইবে। কলিযুগের কথা সম্যক্ পরিগ্রহ করাও আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে, এতৎ সম্বন্ধে একটী কথা বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান ১৯২৭ খৃঃ অব্দে কলিগতাব্দা বা কল্যব্দা ৫০২৭। এই হিসাবে ৩১০০ খৃঃপূঃ অব্দে কলিযুগ প্রবৃত্ত হইয়াছে। শাস্ত্রমতে শুক্রবার, মাঘী পূর্ণিমায় এই যুগের উৎপত্তি। তৎকালে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে ছিলেন। বরাহ মিহিরের টীকাকার ভট্টোৎপলের উদ্ধৃত গর্গ-বচনে লিখিত আছে---"কলি ও দ্বাপর যুগের সন্ধিকালে বিশ্ববাসিগণের রক্ষায় উৎফুল্ল ঋষিগণ, পিতৃগণের অধিষ্ঠিত নক্ষত্রে

যুগের মান সম্বন্ধীয় আলোচনা।

অর্থাৎ মঘা নক্ষত্রে অবস্থান করিতেছিলেন। অধিকাংশ শাস্ত্রগ্রন্থের ইহাই মত। এই সূত্র ধরিয়া হিসাব করিলে কল্যব্দের মান অস্বীকার করা যাইতে পারে না। এবং তাহা প্রলাপ বাক্য বলিয়া উপেক্ষা করাও সঙ্গত নহে। আরও দেখা যাইতেছে, বরাহ মিহিরের আবির্ভাব কাল পর্য্যন্ত কলি গতাব্দা বা কল্যব্দা ধরিয়াই জ্যৌতিষিক গণনাদি সর্ব্ববিধকার্য্য সমাহিত হইত। বরাহ মিহিরই সর্ব্বপ্রথমে জ্যোতিষ গণনায় শক্যব্দা গ্রহণ করেন ; তদবধি কলি গতাব্দা বা কল্যব্দা পরিত্যক্ত হইয়াছে ; যে অব্দ জ্যোতির্ব্বিদগণ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না।

আর্য্যমতে কলির ৫০২৭ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে পৃথিবীর বয়স আজ পর্য্যন্তও ছয় হাজার বৎসর পূর্ণ হয় নাই। এই গুরুতর তারতম্যের সামঞ্জস্য কতকালে হইবে, কাহারও বলিবার উপায় নাই।

কথা প্রসঙ্গে উদ্দিষ্ট বিষয় হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়া গিয়াছে। চন্দ্রবংশের কথা আলোচনা করাই এস্থলে প্রধান উদ্দেশ্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সূর্য্যবংশের অভ্যুদয় কলা চন্দ্রবংশের পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং এতদুভয় বংশ পরস্পর সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত ছিল। সুতরাং চন্দ্রবংশ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্ব্বে সূর্য্যবংশের ক্রম-বিস্তৃতি বিষয়ে দুই একটী কথা বলিয়া লওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

চন্দ্র ও সূর্য্যবংশ বিষয়ক আলোচনা।

সূর্য্যবংশীয় রাজন্যবর্গের প্রথম ও প্রাচীন রাজধানী কৌশল রাজ্যস্থিত অযোধ্যানগরী। এইস্থানেই উক্তবংশের প্রথম পুরুষ স্বনামধন্য মহারাজ ইক্ষ্বাকুর রাজপাট স্থাপিত হয়। এই স্থানেই তদীয় অধস্তন ৩৪শ স্থানীয়, ভগবদবতার শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হন। রামচন্দ্রের পুত্র কুশ হইতে ষষ্ঠিতম পুরুষ সুমিত্র পর্য্যন্ত এইস্থানে রাজত্ব করিয়া ছিলেন। সুমিত্রের পরবর্ত্তী নরপতিগণের বৃত্তান্ত পুরাণাদিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং তাঁহারা কোন সময়ে এবং কি কারণে কোশল রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই মাত্র জানা যায়, সুমিত্রের অধস্তন ৪র্থ স্থানীয় কনক সেন নামা ভূপাল আনুমানিক ২০০ সংবতে (১৪৪ খ্রীঃ) সৌরাষ্ট্র প্রদেশ জয় করিয়া তদন্তর্গত বিরাটপুরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। কনক সেনের পরবর্ত্তী চতুর্থপুরুষ বিজয়সেন, সৌরাষ্ট্রপ্রদেশে বিজয়পুর নামক একটী নগর স্থাপন করেন। তথায় পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার পরবর্ত্তী ষষ্ঠ পুরুষ শিলাদিত্য পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। এই সময় সূর্য্যবংশীয়গণ "বালকরায়" আখ্যা লাভ করেন। কালক্রমে শিলাদিত্য যবন কর্ত্তৃক পরাভূত ও নিহত হইলে, সৌরাষ্ট্রে সূর্য্যবংশীয় রাজগণের প্রভাব বিলুপ্ত হয়। তৎপর শিলাদিত্যের পুত্র গ্রহাদিত্য

সূর্য্যবংশীয় সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সৌরাষ্ট্রের সমীপবর্ত্তী ইদর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। গ্রহাদিত্য হইতে তাঁহার অধস্তন কয়েক পুরুষ পর্য্যন্ত এই রাজপাটেই অবস্থিত ছিলেন। অতঃপর এই বংশ আহর নামক স্থানে গমন করেন। পূর্ব্বোক্ত গ্রহাদিত্যের পরবর্ত্তী ষষ্ঠ পুরুষও গ্রহাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজস্থানের বর্ত্তমান শিশোদিয় কুলের প্রতিষ্ঠাতা বাপ্পারাওল শেষোক্ত গ্রহাদিত্যের বংশধর। রাজপুতনার সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ সাধারণতঃ যে গ্রহলোট বা গিহ্লোট নামে পরিচিত, তাহা পূর্ব্বকথিত কনক সেনের বংশধর গ্রহাদিত্য হইতে প্রবর্ত্তিত। কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, গ্রহাদিত্য গুহায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তদানীন্তন অবস্থার পরিচায়ক 'গ্রহলোট' বা 'গ্রহলোট' আখ্যায় অভিহিত ছিলেন। সেই শব্দই পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান 'গিহ্লোট' শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। এই গিহ্লোট কুল চতুর্ব্বিংশতি ভাগে বিভক্ত ; তন্মধ্যে আহর্য্য ও শিশোদিয় কুলই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। গিহ্লোট কুলতিলক বাপ্পারাওল হইতে রাজপুতানায় সূর্য্যবংশীয় নৃপতি কুলের আধিপত্য সংস্থাপিত হয়।

অম্বরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহ কর্ণেল টড্‌কে সূর্য্যবংশের যে তালিকা প্রদান করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহাই অবলম্বন করা হইয়াছে। পুরাণাদির মত অনুসরণ দ্বারা এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত করা সহজসাধ্য নহে ; কারণ, সুমিত্রের পরবর্ত্তী বংশধরগণের নাম কোন পুরাণে পাওয়া যায় না।

এ স্থলে সূর্য্যবংশের এতদরিক্ত বিবরণ আলোচনা করিবার সুবিধা ঘটিল না, তাহার প্রয়োজনও নাই।

মহাভারতে, চন্দ্রবংশীয় পুরূরবার নামই প্রথমে পাওয়া যায়। হরিবংশাদি পৌরাণিক গ্রন্থের মতে ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রির পুত্র চন্দ্র, চন্দ্রের পুত্র বুধ এবং বুধের আত্মজ পুরূরবা। পুরূরবার পরবর্ত্তী বংশধরগণের নাম প্রায় সকল পুরাণেই একরকম পাওয়া যায়।

চন্দ্রবংশের বিবরণ

পুরূরবার গর্ভধারিণী মনু-দুহিতা ইলা। ইঁহার জন্ম কথা এবং জীবনবৃত্তান্ত বিশেষ বৈচিত্র্যময়। এতৎ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে---

ইষ্টিঞ্চ মিত্রাবরুণয়োর্ম্মনুঃ পুত্রকামশ্চকার। তত্রাপহাতেহোতুব পচারাদিলা নাম কন্যা বভূব।।

সৈব চ মিত্রাবরুণ প্রসাদাৎসুদ্যুম্নো নাম মনোঃ পুত্রো মৈত্রেয়াসীৎ। পুনশ্চেশ্বর কোপাৎ স্ত্রীসতী সোমসূনো বুধিস্যাশ্রম সমীপে বভ্রাম। সানুরাগশ্চ তস্যার্বুধঃ পুরূরবস মাত্মজমূৎ-পাদয়ামাস। জাতে চ তস্মিন্নমিততেজোভিঃ পরমর্ষিভিরিষ্টিময় ঋঙ্ময়ো যজুর্ম্ময়ঃ সামময়োহর্থর্ব্বময়ঃ সর্ব্বময়ো মনোময়ো জ্ঞানময়োহকিঞ্চিন্ময়ো ভগবান্ যজ্ঞপুরুষরূপী সুদ্যুম্নস্য পুংস্ত্বমভিলাষ দ্ভির্যথাবদিষ্টঃ।

"তৎপ্রসাদাদিলা পুনরপি সুদ্যুম্নোহভবৎ।" বিষ্ণুপুরাণ—৪র্থ অংশ ১ম অঃ, ৬-১১ শ্লোক।

মর্ম্ম ;---মনু পুত্রকামনায় মিত্রাবরুণ নামক দেবদ্বয়ের প্রীতির জন্য যজ্ঞ করেন। মনুপত্নীর প্রার্থনানুসারে হোতা, কন্যালাভের সঙ্কল্প করাতে, ঐ বৈকল্পিক

যজ্ঞে ইলা নাম্নী কন্যা উৎপন্ন হইল। হে মৈত্রেয়, মিত্রাবরুণ দেবের অনুগ্রহে সেই ইলা নাম্নী মনু-কন্যাই সুদ্যুম্ন নামক পুত্র হইল। পুনর্ব্বার ঈশ্বর কোপে ঐ সুদ্যুম্ন কন্যা হইয়া চন্দ্র-পুত্র বুধের আশ্রম সমীপে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বুধ সেই কন্যাতে অনুরক্ত হইয়া, তাহাতে পুরূরবা নামক পুত্রের উৎপাদন করেন। পুরূরবা জন্মগ্রহণ করিলে পর অমিততেজা পরমর্ষিগণ সুদ্যুম্নের পুংস্ত্ব অভিলাষে ঋঙ্ময়, যজুর্ম্ময়, সামময়, অথর্ব্বময়, সর্ব্বময় ও মনোময়, কিন্তু পরমার্থতঃ অকিঞ্চিণ্ময় ভগবান যজ্ঞপুরুষরূপী শিবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। ভগবানের প্রসাদে ইলা পুনর্ব্বার পুরুষ সুদ্যুম্ন হইলেন।

এতদ্দারা জানা যাইতেছে, মনুর যজ্ঞ-লব্ধ সন্তানটি কখনও পুরুষ এবং কখনও নারী অবস্থা প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার পুরুষাবস্থার নাম সুদ্যুম্ন এবং নারী অবস্থার নাম ইলা। এই ইলার গর্ভে এবং চন্দ্র-পুত্র বুধের ঔরসে পুরূরবা জন্মগ্রহণ করেন। পুরূরবার ঔরসে আয়ু প্রভৃতি ছয়পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আয়ুর নহুষ প্রভৃতি পাঁচপুত্র, নহুষের যতি ও যযাতি প্রভৃতি ছয়পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের বংশমালা অঙ্কন করিলে এইরূপ দাঁড়াইবে :—

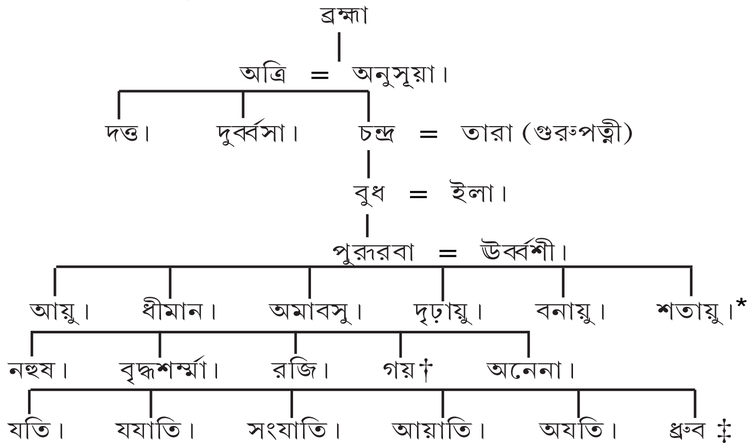

সুদ্যুম্ন বা ইলা কখনও পুরুষ এবং কখনও নারীমূর্ত্তি লাভ করিতেন।

---

* হরিবংশমতে পুরূরবার পুত্রগণের নাম—আয়ু, অমাবসু, বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু ও শতায়ু। এস্থলে সাতপুত্রের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। ভাগবতের মতে পুত্র ছয়টী, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও নাম হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের সহিত্য ঐক্য হয় না।

† কোন কোন পুরাণের মতে আয়ুর পাঁচ পুত্র। সেই সকল পুরাণে 'রজি, গয়' স্থলে 'রাজিঙ্গয়' লিখিত আছে। 'রাজিঙ্গয়' শব্দ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া রাজি-গর করা বিচিত্র নহে। যদি ইহাই সত্য হয় তবে এতদ্দরুণ পুত্র সংখ্যা একটী বৃদ্ধি পাইয়াছে।

‡ সকল পুরাণেই যতি ও যযাতির নাম অপরিবর্ত্তিত পাওয়া যায়, অন্যান্য নামে বৈষম্য আছে। মৎস্য পুরাণের মতে নহুষের সাত পুত্র।

একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি পূর্ব্বে স্ত্রী ছিলেন বলিয়া রাজ্যভাগ হইতে বঞ্চিত হন। পরে বশিষ্ঠের অনুরোধে সুদ্যুম্নের পিতা তাঁহাকে প্রতিষ্ঠান নামক নগরদান করেন। সেই নগর সুদ্যুম্ন হইতে পুরূরবা পাইয়াছিলেন। এতদ্বিষয়ক বিষ্ণু পুরাণের বাক্য নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ;---

"সুদ্যুম্নস্তু স্ত্রী পূর্ব্বকত্বাৎ রাজ্যভাগং
ন লেভে।। তৎ পিত্রাতু বশিষ্ঠ বচনাৎ
প্রতিষ্ঠানং নাম নগরং সুদ্যুম্নায় দত্তম্।
তচ্চাসৌ পুরূরবসে প্রাদাৎ।।"

বিষ্ণুপুরাণ---৪র্থ অংশ, ১ম অঃ, ১২-১৩ শ্লোক।

তদবধি পুরূরবা প্রতিষ্ঠান পুরে অধিষ্ঠিত হন। ইনিই চন্দ্রবংশের প্রথম নরপতি।

পুরূরবার বিবরণ

পুরূরবা বেদ বিহিত বহুবিধ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা ভূমণ্ডলে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অমিতশৌর্য্য বলে উদ্দৃপ্ত হইয়া অবৈধ উপায়ে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অত্যাচার এবং তাঁহাদের ধন-রত্নাদি হরণ করিতেন। ব্রাহ্মণগণ এই উপদ্রবের প্রতিকার লাভে অসামর্থ্য হেতু একান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। পুরূরবার এবম্বিধ প্রবৃত্তি নিবারণোদ্দেশ্যে দেবর্ষি সনৎ কুমার তাঁহাকে অনুদর্শ যজ্ঞে দীক্ষিত করিতে চাহেন, কিন্তু পুরূরবা তাহাতে সম্মত হইলেন না। অতঃপর তিনি ব্রহ্মশাপে বিনষ্টপ্রায় হইয়া, গন্ধর্ব্বলোক হইতে যজ্ঞার্থে ত্রিধাগ্নি * আনয়ন করেন ; তৎকালে অপ্সরা ললাম উর্ব্বশীকেও আনিয়া ছিলেন † এই উর্ব্বশী ৫৯ বর্ষকাল তাঁহার পত্নীভাবে ছিলেন ইঁহারই গর্ব্ভে পুরূরবার পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন।

* গার্হস্পত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ নামধেয় ত্রিবিধ যজ্ঞীয় অগ্নি।

† হরিবংশের মতে স্বর্গ বিদ্যাধারী উর্ব্বশী ব্রহ্মশাপে নরযোনী লাভ করেন। পদ্মপুরাণের মতে তিনি নিজ ও বরুণের অভিসম্পাতে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন উর্ব্বশী এই সর্ত্তে পুরূরবার পত্নীত্ব স্বীকার করেন যে,—যতদিন রাজাকে নগ্নাবস্থায় না দেখিবেন, যতদিন রাজা অকামা পত্নীতে রত না হইবেন, যতদিন তিনি দিবসে একবার মাত্র ঘৃত আহার করিবেন, এবং যতদিন উর্ব্বশীর শয্যার নিকট দুইটী মেষ বদ্ধাবস্থায় থাকিবে, ততদিন তিনি ভার্য্যাভাবে রাজার গৃহে বাস করিবেন। ইহার অন্যথা ঘটিলে, উর্ব্বশী শাপমুক্ত হইয়া রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। রাজা এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, উর্ব্বশীসহ সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

গন্ধর্ব্বগণ উর্ব্বশীকে শাপমুক্ত করিবার উপায়ে উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। একদা বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্ব রাত্রিকালে, উর্ব্বশীর শয্যা পার্শ্বস্থিত মেষদ্বয় হরণ করিল। উর্ব্বশী তৎক্ষণাৎ রাজাকে এই ঘটনা জানাইলেন। রাজা তখন নগ্নাবস্থায় শায়িত ছিলেন ; তিনি

আয়ুর জ্যেষ্ঠপুত্র নহুষ পিতৃ সিংহাসন লাভ করেন। ইনি প্রজারঞ্জক এবং ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। রাজধর্ম্ম প্রভাবে দেব-দৈত্য-যক্ষ-রক্ষাদিকেও তিনি বশ্যতা স্বীকার করাইয়াছিলেন। তাঁহার শাসন কৌশলে দুর্দ্দান্ত দস্যুদল নিয়ন্ত্রিত হইয়া, সর্ব্বদা ঋষিগণকে করপ্রদান ও পৃষ্ঠে বহন করিত।

নহুষের বিবরণ

নহুষের ছয় পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র যতি ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে পিতৃরাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াও বিষয় বিতৃষ্ণা বশতঃ যৌবনেই প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই কারণে দ্বিতীয় পুত্র যযাতি পিতৃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইনি ধার্ম্মিক, প্রজাবৎসল এবং ন্যায়পরায়ণ সম্রাট ছিলেন। মহারাজ যযাতির দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা নাম্নী দুই মহিষী ছিলেন। দেবযানী দৈত্য গুরু শুক্রাচার্য্যের দুহিতা এবং শর্ম্মিষ্ঠা দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা।

যযাতির বিবরণ

একদা, দৈত্যরাজ দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা, দেবযানী ও অন্যান্য সহচরীবর্গ সহ জলবিহার করিতেছিলেন। তাঁহাদের পরিধেয় বসনগুলি সরোবর তীরে ছিল। দেবরাজ ইন্দ্র সেই সরোবর সন্নিহিত পথে গমনকালে সুন্দরী যুবতীবৃন্দকে জলক্রীড়া করিতে দেখিয়া, মোহিত হইলেন। এবং বাপীতীরয়স্থিত বসননিচয় একত্রিত করিয়া, কৌতূহলাবিষ্ট হৃদয়ে অন্তরালে অবস্থিত রহিলেন। অতঃপর যুবতীবৃন্দ জল হইতে উত্থিত হইয়া, শশব্যস্তে স্তূপীকৃত বস্ত্র হইতে যে কোন বস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক পরিধান করিলেন। ব্যস্ততা নিবন্ধন পরস্পরের মধ্যে বস্ত্র পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা, শুক্রাচার্য্য দুহিতা দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করায়, এই সূত্রে উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল। তাঁহাদের বিসম্বাদ ক্রমশঃ এরূপ সীমা উলঙ্ঘন করিল যে, দেবযানী ক্রোধভরে শর্ম্মিষ্ঠার পরিহিত স্বীয় বসন ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন। অভিমানিনী ও কোপাবিষ্টা শর্ম্মিষ্ঠার এই ব্যবহার অসহনীয় হইল, তিনি দেবযানীকে ধাক্কা দিয়া সন্নিহিত কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া পিতৃভবনে গমন করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে মৃগয়াবিহারী তৃষ্ণাতুর মহারাজ যযাতি সেইস্থানে উপনীত হইয়া, কূপাভ্যন্তরস্থিতা দেবযানীর বিলাপধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তিনি ব্যস্তভাবে কূপ সন্নিধানে যাইয়া দেখিলেন, এক পরমাসুন্দরী যুবতী কূপের অভ্যন্তরে পতিতাবস্থায় রোদন করিতেছে। মহারাজ যযাতি, রমণীর পরিচয় এবং তাদৃশ

সেই অবস্থায়ই পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। এদিকে, রাজাকে উলঙ্গ অবস্থায় দর্শন করিয়া উর্ব্বশী তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন, গন্ধর্ব্বও মেষ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

(হরিবংশ—২৬ অধ্যায়)

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের পুরূরবা ও উর্ব্বশীর বিবরণ পাওয়া যায়। কালিদাসের 'বিক্রমোর্ব্বশীর' নাটক ইহাদের ঘটনা লইয়া রচিত হইয়াছে।

দুর্গতির কারণ অবগত হইয়া, তাঁহার দক্ষিণ হস্তধারণ পূর্ব্বক কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন এবং দেবযানী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, স্বীয় গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন।

অবমানিতা ও ক্ষুব্ধা দেবযানী পিতৃসকাশে উপনীতা হইয়া আত্ম-লাঞ্ছনার আনুপূর্ব্বিক ঘটনা নিবেদন করিলেন। প্রাণপ্রতিমা দুহিতার দুর্গতির কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখিত ও মর্ম্মাহত শুক্রাচার্য্য দৈত্যলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

শুভানুধ্যায়ী কুলগুরুর এবম্বিধ মনোভাব অবগত হইয়া, দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বা গুরুসদনে বিনীতভাবে স্বীয় দুহিতার অপরাধ মার্জ্জনার প্রার্থনা করিলেন। দৈত্যরাজের স্তুতিবাক্যের ভার্গবের ক্রোধানল কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইল। তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিলেন যে, দেবযানীর মনোমালিন্য অপনীত করিতে পারিলে, দৈত্যরাজ্যে অবস্থান করিবেন।

অতঃপর পিতার নিকট যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দেবযানী বলিলেন—"যদি রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠা দুই সহস্র দৈত্য-কন্যাসহ আমার দাসী হয়, এবং আমি পরিণীতা হইয়া স্বামীভবনে গমনকালে আমার অনুগমন করিতে সম্মতা হয়, তবে আমার মনোবেদনা সম্যক অপগত হইবে ; এতদ্ব্যতীত আমার অন্য কোন বক্তব্য নাই।" দৈত্যরাজ গুরুতনয়ার অভিপ্রায় জানাইয়া, শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর পরিচারিকা বৃত্তি অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন। অভিমানী শর্ম্মিষ্ঠার পক্ষে এই অনুরোধ রক্ষা করা নিরতিশয় গ্লানিকর হইলেও পিতৃকুলের কল্যাণকামনায় পিতার আদেশ পালন করিতে সম্মতা হইলেন।

কিয়দ্দিবস পরে একদা দেবযানী, শর্ম্মিষ্ঠা ও সহচারীগণ সহ পূর্ব্বোক্ত বাপী তীরবর্ত্তী উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তৎকালে মৃগানুসরণকারী যযাতি সেই উদ্যানে প্রবেশ করিলেন, এবং অপ্সরোপম লাবণ্যময়ী যুবতীবৃন্দের রূপ মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের সমীপবর্ত্তী হইলেন। যৌবনসুলভ চাঞ্চল্যময়ী দেবযানীও মহারাজ যযাতির অলোকসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিতা হইয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণ যযাতি তাঁহার পরিচয় অবগত হইয়া বলিলেন,—"আপনি ব্রাহ্মণ কন্যা, সুতরাং আমি আপনার পাণিগ্রহণ করিতে অসমর্থ ; বিশেষতঃ আপনার পিতা এই পরিণয়ে কোনক্রমেই সম্মতি প্রদান করিবেন না।" তচ্ছ্রবণে দেবযানী বলিলেন, —আপনি ইতঃপূর্ব্বে পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক আমাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সুতরাং আমাদের পরিণয় ব্যাপার প্রকারান্তরে পূর্ব্বেই সঙ্ঘটিত হইয়াছে, এখন আমার প্রার্থনা পূরণে বিমুখ হওয়া আপনার পক্ষে সঙ্গত হইতেছে না।

মহারাজ যযাতি, ব্রহ্ম-শাপের ভয়ে দেবযানীর আত্মোৎসর্গে বাক্যে সম্মতি দান করিতে পারিলেন না। তখন দেবযানী পিতৃসদনে আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বিবৃত করিয়া বিপদুদ্ধারকারী মহাপুরুষের করে তাঁহাকে অর্পণ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। সন্তান বৎসল ভার্গব এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তনয়ার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। তিনি যযাতির হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়া বলিলেন---"আমি বর প্রদান করিতেছি, এই প্রতিলোম পরিণয় জনিত পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে না। কিন্তু আমার কন্যার অনুগামিনী দৈত্যরাজ নন্দিনী শর্ম্মিষ্ঠাকে কদাপি তুমি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিও না ; অপিচ তাঁহাকে পূজনীয়া মনে করিয়া সযত্নে রক্ষা করিও।" মহারাজ এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, দেবযানীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

মহারাজ যযাতি, নবপরিণীতা মহিষীসহ স্বীয় আবাসে আগমন পূর্ব্বক, দেবযানীকে রাজঅন্তঃপুরে এবং শর্ম্মিষ্ঠাকে অন্তঃপুর সন্নিহিত অশোকবনে এক নিভৃত নিবাসে স্থান দান করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল মধ্যে দেবযানীর গর্ব্ভে পর্য্যায়ক্রমে যযাতির যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই কুমার জন্মগ্রহণ করিলেন।

এদিকে ঋতুমতী শর্ম্মিষ্ঠা, ঋতু রক্ষার নিমিত্ত মহারাজ যযাতির শরণাপন্ন হইলেন। সত্যসন্ধ যযাতি, শুক্রাচার্য্যের নিকট সত্যপাশে আবদ্ধ থাকবার কথা স্মরণ করিয়া যুবতীর প্রার্থনা উপেক্ষা করিলেন। কিন্তু শর্ম্মিষ্ঠা নানাবিধ যুক্তি দ্বারা যযাতিকে বশীভূত করিয়া, আপন অভিলাষ পূর্ণ করিয়া লইলেন। অনন্তর তাঁহার গর্ব্ভে ক্রমান্বয়ে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামক তিন পুত্র সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন।

একদা দেবযানী, যযাতি সমভিব্যাহারে অশোকবনে যাইয়া, উদ্যান বিহারী সুকুমার তিনটী বালককে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বালকত্রয় মহারাজ যযাতির প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বিনীত ভাবে বলিলেন---"ইনিই আমাদের পিতা।" তখন দেবযানীর অবস্থা বুঝিতে বিলম্ব ঘটিল না। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে, রোষাবিষ্টচিত্তে রোরুদ্যমানাবস্থায় পিতৃভবনে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। মহারাজ যযাতি ভয়বিহ্বলচিত্তে বিনয়বাক্য দ্বারা মহিষীকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। অগত্যা নিরুপায় যযাতি ভীত ও বিষণ্ণভাবে অভিমানিনী পত্নীর অনুসরণ করিলেন।

নন্দিনীর অবস্থা দর্শন ও যযাতির ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিয়া কোপন স্বভাব দৈত্যগুরু রোষ কষায়িতনেত্রে যযাতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন যে,---"তুমি ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়াও সামান্য ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বাসনায় ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করিয়াছ, সুতরাং দুর্জ্জয় জরা অবিলম্বে তোমাকে আক্রমণ করুক।" যযাতি দুঃখিতান্তঃকরণে বলিলেন,—

যযাতির প্রতি শুক্রাচার্য্যের অভিশাপ

"আমি শাস্ত্রানুমোদিত ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিতে বাধ্য হইয়াছি, ঋতুমতী রমণীর ঋতুরক্ষার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা পাপকর্ম্ম। এই পাপের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে যাইয়া আপনার নিকট অপরাধী। আমি অদ্যাপি যৌবন সুখ উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারি নাই। অতএব ভবদীয় চরণে প্রার্থনা করিতেছি, প্রসন্ন হইয়া এই কঠোর অভিসম্পাত হইতে মুক্তিলাভের উপায় বিধান করুন।" রাজার বিনয় ব্যবহারে শুক্রাচার্য্য ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি ইচ্ছা করিলে স্বীয় জরাভার অন্যের শরীরে অর্পণ করিতে পারিবে।"

মহারাজ যযাতি শুক্রাচার্য্যের বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন---"যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার পঞ্চপুত্রের মধ্যে যে আমার জরাভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইবে, তাহাকে আমার সাম্রাজ্যের আধিপত্য অর্পণ করিতে যেন সমর্থ হই, এই বর প্রদান করুন। শুক্রাচার্য্য কৃপাপরবশ হইয়া, রাজার এই প্রার্থনাও অনুমোদন করিলেন।

জরাতুর যযাতি ক্ষুব্ধচিত্তে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জ্যেষ্ঠানুক্রমে প্রত্যেক পুত্রকে জরাভার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন ; সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুরু ব্যতীত অন্য কেহই পিতার কুৎসিত ও দুঃকর জরা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন, যযাতি কনিষ্ঠ পুত্রের উপর জরাভার অর্পণ করিয়া, তাঁহাকেই সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিলেন, এবং অবাধ্য পুত্রদিগকে অভিসম্পাত প্রদান পূর্ব্বক নানাদিগদেশে নির্ব্বাসিত করিলেন। তিনি সেই সকল পুত্রের মধ্যে যাহার প্রতি যে আদেশ করিয়াছিলেন, মহাভারত আদিপর্ব্বের ৮৩ অধ্যায় হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,---

যযাতির জরাভার অর্পণ ও পুত্রগণের প্রতি অভিশাপ

যদুর প্রতি ;---

"যত্বং মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি।
তস্মাদ্ রাজ্যভাক্ তাত প্রজা তব ভবিষ্যতি।।"৯

মর্ম্ম ;---তুমি যখন আমার পুত্র হইয়াও আমার অনুরোধ রক্ষার নিমিত্ত স্বীয় যৌবন প্রদান করিলে না, তখন এই অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত হইবে এবং তোমার উত্তর পুরুষগণও রাজা হইতে পারিবে না।

তুর্ব্বসুর প্রতি ;---

"যত্ত্বং মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি।
তস্মাৎ প্রজা সমুচ্ছেদং তুর্ব্বসো তব যাস্যতি।।১৩
সঙ্কীর্ণচার ধর্ম্মেষু প্রতিলোম চরেষু চ।
পিশিতাশিষু চান্ত্যেষু মূঢ় রাজা ভবিষ্যসি।।১৪

গুরুদার প্রদক্তেযু তির্য্যগ্ যোনি গতেযু চ।

পশুধর্ম্মেযু পাপেযু ম্লেচ্ছেযু ত্বং ভবিষ্যসি।।"১৫

মর্ম্ম ;---তুমি আমার আত্মজ হইয়াও আমাকে স্বীয় যৌবন প্রদান করিলে না, অতএবং তোমার বংশবল্লী ধরাধাম হইতে বিলুপ্ত হইবে। এবং আচারভ্রষ্ট রাক্ষস ও ম্লেচ্ছ প্রভৃতি অন্ত্যজাতির উপর আধিপত্য করিবে।

দ্রুহ্যুর প্রতি ;---

"যত্ত্বং মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি।

তস্মাদ্ দ্রুহ্যো প্রিয়ঃ কামো ন তে সম্পৎস্যতেক্কচিৎ।।২০

যত্রাশ্বরথমুখ্যানামশ্বানাং স্যাদ্ গতং ন চ।

হস্তিনাং পীঠকানাঞ্চ গর্দ্দভানাস্তথৈব চ।।২১

উড়ুপপ্লব সন্তারো যত্র নিত্যং ভবিষ্যতি।

অরাজ ভোজ শব্দস্তং তত্র প্রাপ্স্যসি সান্বয়ঃ।।২২

মর্ম্ম ;---তুমি আমার আত্মসম্ভূত হইয়াও স্বীয় যৌবন প্রদান করিলে না, তদ্ধেতু তোমার কোন প্রিয় অভিলাষই পূর্ণ হইবে না। এবং অশ্ব, গজ, রথ, পাঠক, গর্দ্দভ, ছাগ, গো ও শিবিকা প্রভৃতি যানবাহনের গতিবিধি রহিত দুর্গম প্রদেশে অবস্থান করিবে। তোমার অধিকৃত স্থানে গমন করিতে হইলে একমাত্র উডুপ (ভেলা) বা সন্তরণ ব্যতীত অন্য অবলম্বন থাকিবেন না। অপিচ, তোমার বংশধরগণ রাজাখ্যা প্রাপ্ত হইবে না।

অনুর প্রতি ;---

"যত্ত্বং মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি।

জরা দোষস্তয়া প্রোক্তস্তস্মাত্ত্বং প্রতিলপ্স্যসে।।২৫

প্রজাশ্চ যৌবনং প্রাপ্তা বিনশিষ্যন্ত্যনোস্তব।

অগ্নি প্রস্কন্দন পর স্ত্বং চাপ্যেবং ভবিষ্যসি"।।২৬

মর্ম্ম ;---পুত্র হইয়া যখন তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা করিলে না, তখন তুমি নিশ্চয়ই অবিলম্বে জরা ভারাক্রান্ত হইবে। এবং তোমার বংশধরগণ যৌবন প্রাপ্তি মাত্রেই কালকবলে পতিত হইবে।

কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি জরাভার অর্পণের পর যযাতি ভোগবিলাসে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়া বুঝিলেন, ভোগের দ্বারা বাসনার নিবৃত্তি হইবার নহে—ত্যাগের দরকার। তখন তিনি লৌকিক সুখ সম্পদে বীতস্পৃহ হইয়া, পুত্রকে তাঁহার যৌবন প্রত্যর্পণ এবং পুত্রের অঙ্গে সঞ্চারিত স্বীয় জরা গ্রহণপূর্ব্বক বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন।

পুত্রগণের প্রতি দণ্ডাদেশ প্রদানকালে রাজচক্রবর্ত্তী যযাতির রাজধানী কোথায় ছিল, তাহা নির্ণয়োপলক্ষে বর্ত্তমান কালে বহু বিতর্ক উপস্থিত হইতেছে। অনেকে বলেন, তৎকালে সাম্রাজ্যের রাজপাট বর্ত্তমান ভারতের বাহিরে ছিল, কেহ কেহ মধ্য এসিয়ার প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যযাতির অধস্তন দ্বিতীয় স্থানীয় দুষ্মন্ত পর্য্যন্ত ভারতের বাহিরেই ছিলেন, তদীয় তনয় ভরত হইতে ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে, ইতিহাসে এবম্বিধ মতেরও অসদ্ভাব নাই। কিন্তু এই সকল মতের পোষক প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়াসী হইয়া থাকিলেও সেই প্রমাণ নিত্যন্তই দুর্ব্বল।

সম্রাট যযাতির রাজপাট কোথায় ছিল

প্রাচীন ভারতের সীমা বর্ত্তমান কালের ন্যায় সংকীর্ণ ছিল না। এককালে সসাগরা পৃথিবী ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল ; অনন্তকালের অনন্ত পরিবর্ত্তনের পরে বর্ত্তমান অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, সাম্রাজ্যের সীমা যতই বিস্তৃত থাকুক না কেন, সম্রাটের রাজপাট চিরদিনই বর্ত্তমান ভারতের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল ; এখান হইতেই সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয়গণ নানা দিগ্দেশে যাইয়া আর্য্যনিবাস স্থাপন ও আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে অনেকে বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়া, বিভিন্ন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, সম্পূর্ণরূপে ভিন্নদেশী ও ভিন্নজাতির মধ্যে দাঁড়াইয়াছেন এবং অনেকের বংশধরগণ আবার ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আর্য্যসমাজে মিশিয়াছেন।

সূর্য্যবংশীয়গণের কোশল রাজ্যের আদি রাজধানী অযোধ্যা বর্ত্তমান ভারতের বাহিরে নহে, ইহা মানবের আদি পিতা বৈবস্বত মনু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৈবস্বত মনুর পূর্ব্বে, অন্যদেশে আর্য্যগণের অস্তিত্ব সম্ভব হইতে পারে না। সম্রাট যযাতির রাজপাটের অবস্থান নির্ণয়জন্য চন্দ্রবংশীয় রাজগণের বসতিস্থানের বিষয় আলোচনা করাই এস্থলে প্রধান উদ্দেশ্য। তাহা আলোচনা করিতে গেলে দেখা যাইবে, চন্দ্রবংশীয়গণের রাজধানীও আদিকাল হইতেই বর্ত্তমান ভারতের অন্তর্ভুক্ত গঙ্গা ও যমুনার সম্মিলন-স্থানের অবস্থিত ছিল, সেই স্থানের নাম ছিল প্রতিষ্ঠানপুর। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বৈবস্বত মনুর পুত্র সুদ্যুম্ন পূর্ব্বে নারী ছিলেন বলিয়া রাজ্যভাগ হইতে বঞ্চিত হন, পরে বশিষ্ঠের অনুরোধে সুদ্যুম্নের পিতা সুদ্যুম্নকে প্রতিষ্ঠান নগর প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা পুরুষানুক্রমে পুরূরবা ও তাঁহার বংশধরগণ প্রাপ্ত হন। এই দানপ্রাপ্তিই চন্দ্রবংশীয়গণের সাম্রাজ্য বিস্তারের মূল সূত্র হইয়াছিল। এতদ্বিষয়ক বিষ্ণুপুরাণের

মত পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। হরিবংশ * এবং দেবী ভাগবত † প্রভৃতি গ্রন্থের এবিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সুদ্যুম্ন হইতেই প্রতিষ্ঠান নগরের প্রতিষ্ঠা হয়। পুরূরবাও যে সেই স্থানেই রাজত্ব করিয়াছিলেন, পুরাণের প্রমাণ দ্বারা তাহা স্পষ্টতররূপে প্রমাণিত হইতেছে। এখন প্রতিষ্ঠানের অবস্থান নির্ণয় করা আবশ্যক। এই প্রয়োজনেও শাস্ত্রকার ঋষিগণের দ্বারস্থ হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। প্রথমতঃ হরিবংশের কথাই ধরা যাইতেছে। তাহাতে লিখিত আছে ;—

প্রতিষ্ঠানপুরের অবস্থান নির্ণয়

"এবং প্রভাবোরাজাসীদৈলস্তু নরসত্তম।
দেশে পুণ্যতমে চৈব মহর্ষিভিরভিষ্টুতে।।
রাজ্যং স করয়ামাস প্রয়াগে পৃথিবীপতিঃ।
উত্তরে জাহ্নবী তীরে প্রতিষ্ঠানে মহাযশাঃ।।"

খিল হরিবংশ—২৬ অঃ, ৪৮-৪৯ শ্লোক।

মর্ম্ম ;—পুরুষোত্তম ইলানন্দ পুরূরবা প্রভাব সম্পন্ন ছিলেন। সেই মহাযশস্বী পৃথিবীপতি পুরূরবা মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত পবিত্রমত প্রয়াগ প্রদেশে জাহ্নবীর উত্তর তীরে প্রতিষ্ঠান নামক নগরে রাজ্য করিয়াছিলেন।

লিঙ্গপুরাণেও এ বিষয আলোচিত হইয়াছে, উক্তগ্রন্থে পাওয়া যায় ;—

"সূত বলিলেন, হে দ্বিজগণ, রুদ্রভক্ত প্রতাপশালী ইলা পুত্র শ্রীমান পুরূরবা প্রতিষ্ঠান পুরীর অধিপতি এবং তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া যমুনায় উত্তর তীরে মুনি-সেবিত পুণ্যময় প্রয়াগ ক্ষেত্রে নিষ্কণ্টকে রাজ্য করেন।"

লিঙ্গপুরাণ—পূর্ব্বভাগ, ৬৬ অধ্যায়।

(বঙ্গবাসীর অনুবাদ)

---

* "কন্যা ভাবাচ্চ সুদ্যুম্নো নৈনং গুণমবাপ্তবান্।
বশিষ্ঠ বচনাচ্চাসীৎ প্রতিষ্ঠানে মহাত্মনঃ।।
প্রতিষ্ঠা ধর্ম্ম রাজস্য সুদ্যুম্নস্য কুরুদ্বহ।
তৎ পুরূরবসে প্রাদাদ্রাজ্যং প্রাপ্য মহাযশাঃ।।"

খিল হরিবংশে—১১শ আঃ, ২২-২৩ শ্লোক।

† সুদ্যুম্নেতু দিবং যাতে রাজ্যঞ্চক্রে পুরূরবাঃ।
সগুণশ্চ সুরূপশ্চ প্রজারঞ্জন তৎপরঃ।।
প্রতিষ্ঠানে পুরে রম্যে রাজ্যং সর্ব্ব নমস্কৃতম্।
চকার সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ প্রজারঞ্জন তৎপরঃ।।"

দেবী ভাগবতম্—১ম স্কন্দ, ১৩শ অঃ, ১-২ শ্লোক।

যযাতি পুরুকে রাজ্য প্রদানকালে যাহা বলিয়াছিলেন, তদ্দ্বারাও প্রতিষ্ঠান নগরের অবস্থান নির্ণয় করা যাইতে পারে, যথা :---

"গঙ্গাযমুনায়োর্মধ্যে কৃৎস্নোহয়ং বিষয়স্তব।" মৎস্য পুরাণ।

কূর্ম্ম পুরাণের ৩৬শ অধ্যায়েও উক্তরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। এতদতিরিক্ত শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত কবিকূল গৌরব মহাকবি কালিদাস বিক্রমোর্ব্বশীয় নাটকে প্রতিষ্ঠানপুরীর স্থিতি বিবরণ প্রদান করিয়াছেন---। তাহা আলোচনায় জানা যায়, সখী চিত্রলেখা উর্ব্বশীকে বলিয়াছিলেন,---

'সখী! প্রেক্ষস্ব প্রেক্ষস্ব এতৎ ভগবত্যাঃ ভাগীরথ্যা যমুনা সঙ্গম পাবনেষু সলিলেষু পুণ্যেষু অবলোকয়তইব আত্মানং প্রতিষ্ঠানস্য শিখাভরণ ভূতমিব তস্য রাজর্ষে (পুরূরবসঃ) র্ভবনমুপগতে স্বঃ।'

বিক্রমোর্ব্বশীয় নাটক---২য় অঙ্ক।

কোষগ্রন্থকারগণ কর্ত্তৃকও বিষয়টী উপেক্ষিত হয় নাই। বিশ্বকোষে পাওয়া যাইতেছে,---

'প্রতিষ্ঠান---চন্দ্রবংশীয় প্রথম রাজা পুরূরবার রাজধানী। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম স্থলে, প্রয়াগের অপর তীরে, গঙ্গার বামকূলে অবস্থিত। বর্ত্তমান নাম ঝুসি।"

বিশ্বকোষ---১২শ ভাগ, ৩০৩ পৃষ্ঠা।

প্রকৃতিবাদ অভিধানে পাওয়া যাইতেছে ;---

"প্রতিষ্ঠানপুর---চন্দ্রবংশীয় প্রথম রাজা পুরূরবার রাজধানী। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রয়াগের অপর তীরে গঙ্গার বামকূলে অবস্থিত। বর্ত্তমান নাম ঝুসি।"

প্রকৃতিবাদ অভিধান---৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১২৪১ পৃঃ।

আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যেও কোন কোন ব্যক্তির এদিকে দৃষ্টি পড়িয়াছিল। বাবু নন্দলাল দে প্রণীত "The Geological Dictionary of Ancient Mediaeval India" নামক গ্রন্থের ৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে,---

"Jhusi, opposite to Allahabad across the Ganges ; it is still called Pratisthanpur. It was the capital of Raja Pururavas."

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় বলিয়াছেন,---

"বারাণসী প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ রাজ্য এক সময়ে প্রতিষ্ঠান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। রামায়ণে দেখিতে পাই,---মধ্য ভারতে ইল রাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠানপুর প্রতিষ্ঠিত হয়, এই নগরী এক সময়ে পুরূরবার রাজধানী রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। *** ইহাতে প্রয়াগ বা প্রতিষ্ঠান প্রদেশকেই যে বুঝাইতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহা হইলে ঐ প্রদেশ পুরূরবা হইতে যযাতি পর্য্যন্ত চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের রাজ্যান্তর্ভুক্ত ছিল প্রতিপন্ন হয়।"

পৃথিবীর ইতিহাস---২য় খণ্ড, ৮ম পরিঃ, ১২৪ পৃষ্ঠা।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গালার ইতিহাস আলোচনায় জানা যাইতেছে, দ্বিতীয় পাল সাম্রাজ্যের সময়েও 'প্রতিষ্ঠান' নামের বিলোপ ঘটে নাই। তিনি লিখিয়াছেন,---

"খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে উত্তরাপথে প্রবল রাজশক্তির একান্ত অভাব হইয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তের এই ঘোর দুর্দ্দিনে মুসলমান সেনাপতি আহমদ্ নিয়ালতিগীন অনায়াসে বিস্তৃত মধ্যদেশ অতিক্রম করিয়া পবিত্র বারাণসী নগরী লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। *** গুর্জ্জরেশ্বর প্রয়াগে প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র দুর্গে আত্মরক্ষার চিন্তায় ব্যাপৃত ছিলেন।"

বাঙ্গালার ইতিহাস---১ম ভাঃ, ২য় সংস্করণ, ২৬৩ পৃষ্ঠা।

প্রতিষ্ঠান নগরের অবস্থান বিষয়ে এতদতিরিক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করা নিষ্প্রয়োজন। পুরূরবার রাজধানী প্রতিষ্ঠানপুর যে এলাহাবাদের পরপারে গঙ্গা ও যমুনার মিলন স্থানে ছিল, তাহা জানিবার নিমিত্ত উদ্ধৃত প্রমাণই যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। এই প্রতিষ্ঠানই বর্ত্তমানকালে ঝুসি নামে অভিহিত হইতেছে।

এখন দেখা যাইতেছে, সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের আদি রাজগণের রাজধানী বর্ত্তমান ভারতেই ছিল। এবং চন্দ্রবংশীয় রাজগণের রাজধানী সম্রাট যযাতির শাসনকালেও প্রতিষ্ঠানপুরেই ছিল ; এ বিষয়ে পৌরাণিক প্রমাণের অভাব নাই।

যযাতির স্বর্গলাভের পরে তিনি দেবরাজ পুরন্দরের প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছিলেন ;---

"প্রকৃত্যনুমতে পুরুং, রাজ্যং কৃত্বেদমব্রুবম্।
গঙ্গাযমুনায়োর্মধ্যে রাজা কৃৎস্নোহয়ং বিষয়স্তর।।
মধ্যে পৃথিব্যাস্ত্বং রাজা ভ্রাতারোহন্তেহধিপাস্তব।"

মৎস্য পুরাণ---৩৬ অঃ, ৬ শ্লোক।

মর্ম্ম ;---প্রকৃতিপুঞ্জের অনুমত্যনুসারে পুরুর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করিয়া বলিলাম,---এই গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ তোমার। তুমি পৃথিবীর মধ্যস্থানের রাজা।

এ বিষয়ের আরও স্পষ্ট এবং পরিষ্কার প্রমাণ আছে। বাল্মিকী রামায়ণ আলোচনা করিলে জানা যাইবে, যযাতি এবং তদীয় পুত্র পুরু প্রতিষ্ঠানপুরে বসিয়াই সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে ;---

"ততঃকালেন মহতা দিষ্টান্তমুপজগ্মিবান্।
ত্রিদিবং স গতো রাজা যযাতি নহুষাত্মজঃ।।
পুনশ্চকার তদ্রাজ্যং ধর্ম্মেণ মহতাবৃতঃ।
প্রতিষ্ঠানে পুরূরবে কাশীরাজ্যে মহাযশাঃ।।"

বাল্মিকী রামায়াণ---উত্তরাকাণ্ড, ৬৯ সর্গ, ১৮-১৯ শ্লোক।

মর্ম্ম ;---বহুকাল বিগত হইলে, নহুষ-তনয় যযাতি রাজা স্বর্গে গেলেন। মহাযশা পুরুঃ মহৎ ধর্ম্মে পরিবৃত হইয়া কাশীরাজ্যের অন্তর্গত * পুরশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান নগরে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

এতদ্বারা যযাতিনন্দন পুরুর সাম্রাজ্যকালেও প্রতিষ্ঠানপুরে রাজধানী থাকিবার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে পুরুর অধস্তন ২১শ স্থানীয় সুহোত্রের কাল পর্য্যন্ত রাজধানী পরিবর্ত্তনের কোনও প্রমাণ নাই। সুহোত্র-নন্দন মহারাজ হস্তীর রাজত্বকালে রাজপাট হস্তিনাপুরে নীত হয়।

যযাতি নন্দনগণ কে কোন্ দিকে গিয়াছিলেন

সম্রাট যযাতি প্রতিষ্ঠানপুরের রাজধানী হইতে যে পুত্রগণকে দিগ্দিগন্তরে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে নিঃসংশয়িত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এখন কোন্ পুত্রকে কোন্ দিকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাই দেখা আবশ্যক। প্রধানতঃ বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ ও শ্রীমদ্ভাগবতে এ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু উক্ত গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে পরস্পর মতবৈষম্য আছে; তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;

খিল হরিবংশে পাওয়া যাইতেছে ;—

"সপ্তদ্বীপাং যযাতিস্তু জিত্বা পৃথ্বীং সসাগরাম্।
ব্যভজৎ পঞ্চধা রাজন্ পুত্রানাং নাহুষস্তদা।।
দিশি দক্ষিণ পূর্ব্বাস্যাং তুর্ব্বসুং মতিমান নৃপঃ।
প্রতীচ্যামুত্তরস্যাং চ দ্রুহ্যং চানু চ নাহুষঃ।।
দিশি পূর্ব্বোত্তরস্যাং বৈ যদুং জ্যেষ্ঠংন্যযোজয়ৎ।
মধ্যে পুরুং চ রাজনমভিষিঞ্চত নাহুষঃ।।
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা স পত্তনা।
যথা প্রদেশমদ্যাপি ধর্ম্মেণ প্রতিপাল্যতে।।"

খিল হরিবংশ—৩০শ অঃ, ১৬-২০ শ্লোক।

মর্ম্ম ;---নহুষ নন্দন যযাতি সসাগরা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে পুত্রদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়াছিলেন। মতিমান নহুষ-নন্দন যযাতি নৃপতি দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ অগ্নিকোণে তুর্ব্বসুকে, পশ্চিম ও উত্তরভাগে দ্রুহ্য এবং অনুকে, পূর্ব্বোত্তর দিকে জ্যেষ্ঠ যদুকে নিয়োজিত করিলেন। মধ্য অর্থাৎ কুরুপাঞ্চালদেশে পুরুকে অভিষিক্ত করিলেন। তাঁহারা অদ্যাপি এই সপ্তদ্বীপা সপত্তনা সমস্ত বসুন্ধরাকে প্রদেশানুসারে ধর্ম্মতঃ পালন করিতেছেন।

উদ্ধৃত শ্লোকের 'কাশীরাজ্যে' শব্দ পাঠ করিয়া সন্দিগ্ধ হইবার কোনও কারণ নাই। সেকালে প্রতিষ্ঠানে ও কাশীরাজ্যে পুরূরবার বংশধরগণ শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। কাশীর রাজবংশাবলীই এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

বিষ্ণুপুরাণের মত কিয়ৎপরিমাণে হরিবংশের সমর্থক হইলেও সর্ব্বতোভাবে নহে ; উক্ত গ্রন্থের মতে,—

"দিশি দক্ষিণ পূর্ব্বাস্যাং তুর্ব্বসু প্রত্যথাদিশৎ
প্রতীচ্যাং চ দ্রুহ্যুং দক্ষিণাপথতো যদুম্।
উদিচ্যাঞ্চ তথৈবানুং কৃত্বা মণ্ডলিনো নৃপান্
সর্ব্ব পৃথ্বিপতিং পুরুং সোহভিষিচ্য বনং যযৌ।।"

বিষ্ণুপুরাণ—৪র্থ অংশ, ১০ম অঃ, ১৭-১৮ শ্লোক।

মর্ম্ম ;—যযাতি, দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে দ্রুহ্যুকে, দক্ষিণ দিকে যদুকে পূর্ব্বদিকে তুর্ব্বসুকে ও উত্তরদিকে অনুকে অধীশ্বর করিলেন। এবং সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পুরুকে সমগ্র ভূমণ্ডলের অধীশ্বর করিয়া, অগ্রজাত তনয়দিগকে পুরুর অধীনে স্থাপন পূর্ব্বক বনে গমন করিলেন।

পুরাণ শ্রেষঠ শ্রীমদ্ভাগবতের মত আবার অন্যরূপ। উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায় ;—

"দিশি দক্ষিণ পূর্ব্বাস্যাং দ্রুহ্যুং দক্ষিণতো যদুং।
প্রতীচ্যাং তুর্ব্বসুঞ্চক্রে উদীচ্যামনুমীশ্বরং।।
ভূমণ্ডলস্য সর্ব্বস্য পুরুমর্হত্তমং বিশাং।
অভিষিচ্যা প্রজাংস্তস্যবশেস্থাপ্য বনং যযৌ।।"

শ্রীমদ্ভাগবত—৯ম স্কন্ধ, ১৯শ অঃ, ৬-১৭ শ্লোক।

মর্ম্ম ;— যযাতি, দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে দ্রুহ্যুকে, দক্ষিণ দিকে যদুকে, পূর্ব্বদিকে তুর্ব্বসুকে ও উত্তরদিকে অনুকে অধীশ্বর করিলেন। এবং সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পুরুকে সমগ্র ভূমণ্ডলের অধীশ্বর করিয়া, অগ্রজাত তনয়দিগকে পুরুর অধীনে স্থাপন পূর্ব্বক বনে গমন করিলেন।

দ্রুহ্যু কোন্ দিকে গিয়াছিলেন, তাহা নির্দ্ধারণ করাই এস্থলে একমাত্র উদ্দেশ্য। উদ্ধৃত বচন আলোচনায় জানা যাইতেছে, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের মতে দ্রুহ্যু পশ্চিমদিকে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মতে অগ্নিকোণে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থত্রয় একই মহাপুরুষের (ব্যাসদেবের) রচিত। তৎসত্ত্বেও এক গ্রন্থের সহিত অন্য গ্রন্থের মতবৈষম্য লক্ষিত হইবার কারণ কি, ঋষিবাক্য এবং পণ্ডিত মণ্ডলীর আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। যে মহাপুরুষের বাক্যের এবম্বিধ অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছে, তাঁহার বাক্য দ্বারাই সামঞ্জস্য ঘটানো যাইতে পারে কিনা, সর্ব্বাগ্রে তাহাই দেখা সঙ্গত। এ বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে, উক্ত পুরাণত্রয়ের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশেষে রচিত হইয়াছে ; সুতরাং অন্যান্য পুরাণের প্রমাদ

ও বিষম্বাদ শ্রীমদ্ভাগবত দ্বারা মীমাংসিত হওয়া স্বাভাবিক। উক্ত গ্রন্থত্রয়ের প্রণেতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন স্বয়ং বলিয়াছেন—

"কিং শ্রুতৈর্বহুভিঃ শাস্ত্রৈ পুরাণৈশ্চ ভ্রমাবহৈঃ।

একং ভাগবতং শাস্ত্রং মুক্তিদানেন গর্জতি।।"

ভাগবত মাহাত্ম্য—৩য় অঃ, ২৮ শ্লোক।

এই বাক্যদ্বারা সর্ব্বোপরি ভাগবতের প্রাধান্য স্থাপন করা হইয়াছে ; অতএব হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ অপেক্ষা ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে শাস্ত্রানুরাগী ব্যক্তিবৃন্দের আপত্তি থাকিতে পারে না। অপিচ পণ্ডিতসমাজ তাহাই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহারও দুই একটী দৃষ্টান্ত প্রদান করা যাইতেছে।

স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুম রচনাকালে সমস্ত পুরাণ আলোচিত হইয়াছিল, একথা অনেকের অপ্রত্যক্ষ হইলেও বিশ্বাসের অযোগ্য নহে। এই কোষগ্রন্থ সে কালের সুবিখ্যাত ও শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত মণ্ডলীর সমবায় চেষ্টার ফল। সাধারণের মধ্যে এই গ্রন্থ প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে পুরাণসমূহের পূর্ব্বোক্ত দ্বৈতমতের যেরূপ সমাধান হইয়াছে, তাহা এই ;---

"যযাতিঃ মরণ সময়ে কনিষ্ঠ পুত্রং পুরুং

রাজচক্রবর্ত্তিনং কৃতবান্।

যদবে দক্ষিণ পূর্ব্বাস্যাং কিঞ্চিদ্রাজ্য খণ্ড দত্তবান্।

তথাদ্রুহ্যবে পূর্ব্বাস্যাং দিশি পশ্চিমায়া

তুর্ব্বসবে উত্তরাস্যা মনযে সর্ব্বান পুরোরাধিনাংশ্চক্রে।"

মর্ম্ম ;---সম্রাট যযাতি মরণ সময়ে কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে রাজচক্রবর্ত্তী পদে স্থাপন পূর্ব্বক, যদুকে দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে কিঞ্চিৎ রাজ্যখণ্ড প্রদান করিয়া, দ্রুহ্যুকে পূর্ব্বদিকে, তুর্ব্বসুকে পশ্চিমদিকে, অনুকে উত্তরদিকে, সম্রাট পুরুর অধীন শাসনকর্ত্তা করিলেন।

এই সিদ্ধান্ত দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের মতই বিশেষ পুষ্ট হইয়াছে। 'বঙ্গবাসী' আফিস হইতে প্রচারিত অধিকাংশ পুরাণ গ্রন্থের অনুবাদক ও সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় আমাদের পত্রের উত্তরে যাহা জানাইয়াছেন, তাহাতে এ বিষয়ের সুমীমাংসা আছে। তিনি ভারতবর্ষের মানচিত্রে, যযাতির পঞ্চপুত্রের মধ্যে বিভক্ত স্থানসমূহ শাস্ত্রানুমোদিত ভাবে চিহ্নিত করিয়া পত্রের সঙ্গে পাঠাইয়াছেন ; উক্ত মানচিত্র এস্থলে সংযোজিত হইল। পত্রে কিয়দংশ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে ;---

"আমাদের প্রাচীন সম্মত উত্তর—'কল্পভেদাদবিরুদ্ধম্।' পুরাণে যে স্থলে মতানৈক্য, সে স্থলে ভিন্নকল্পে বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা, তাহাতে কোন পুরাণে এক কল্পের কথা, অন্য পুরাণে অপর কল্পের কথা আছে ; অতএব বিরোধ কোথাও হয় না। দৃষ্টান্ত এই যে, যদি কোন গ্রন্থে লিখিত থাকে—'ভারতবর্ষে বড়ই দুর্ভিক্ষ', আর কোন গ্রন্থে লিখিত থাকে—'ভারতবর্ষে বড়ই সুর্ভিক্ষ', এই দুই গ্রন্থেই কিন্তু শকাব্দোর উল্লেখ নাই। তখন উভয় গ্রন্থেরই প্রামাণ্য সংস্থাপন করা যায়—এক শকাব্দ বা বর্ষে দুর্ভিক্ষ, অন্য বৎসরে সুর্ভিক্ষ। বৎসরের ন্যায় কল্পও একটী খণ্ডকালের সংজ্ঞা। শ্রীমদ্ভাগবতে যে কল্পের উল্লেখ আছে, তাহা বর্ত্তমান কল্প ধরিলে অনেকটা মীমাংসা হয়। নবীন উত্তরের প্রণালী পৃষ্ঠাঙ্কিত মানচিত্রে দ্রষ্টব্য। পুরাণসমূহের একটী বিষয়ে অনৈক্যই আমার প্রদর্শিত মানচিত্রের মূল প্রমাণ।

"পুরুর রাজধানী প্রতিষ্ঠানপুরে থাকিলেও তাঁহার রাজ্যের বিস্তৃতি যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহা নিশ্চয়। পাঁচ ভাগ করিবার যে প্রমাণ আছে, তাহাতে ঠিক পূর্ব্বদেশ যে পুরুর ভাগে, তাহাও বুঝা যায়। কারণ, পূর্ব্বোত্তর, পূর্ব্বদক্ষিণ, উল্লিখিত উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণেরও উল্লেখ আছে ; কিন্তু ঠিক পূর্ব্বের উল্লেখ অন্য ভাগে নাই। মন্বাদি শাস্ত্রে পূর্ব্ব পশ্চিম সাগরের কথা ভারতবর্ষের দেশ বিভাগ স্থানে দেখা যায়। 'আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ' (মনু ১ম অঃ)। বর্ত্তমান শ্যামরাজ্যও পূর্ব্বে ভারতবর্ষ মধ্যে ছিল। পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে অর্থাৎ বর্ত্তমান চীন সমুদ্র হইতে, পশ্চিম সমুদ্র অর্থাৎ আরবসাগর পর্য্যন্ত স্থান, অথচ মধ্যভাগ লইয়া পুরুরাজ্য। মূল বক্তার বা শ্রোতার বাসস্থান প্রভৃতির ভেদহেতু বিভিন্নপুরাণে একই রাজ্যকে বিভিন্নদিক সংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। সকল পুরাণেই পুরুরাজ্যের ভূ-খণ্ডই কেন্দ্র করা হইয়াছে—পুরুর রাজধানী নহে। মানচিত্র দেখিলেই বুঝিবেন, যদুর রাজ্য পুরুর রাজ্যের পূর্ব্বোত্তরেও আছে, দক্ষিণেও আছে। মথুরা এই যদুবংশীয়গণের রাজধানী, নর্ম্মদার কিয়দংশও যদুবংশীয়দিগের অধিকারস্থ। দ্রুহ্যুরাজ্য ত্রিপুরা, মান্দালয়াদি ব্রহ্ম ভূ-খণ্ড, তাহা পুরুরাজ্যের পশ্চিমও বটে এবং দক্ষিণ পূর্ব্বও বটে। অনুরাজ্য উত্তর ভাগলপুর প্রভৃতি ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশ ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত। পরে অঙ্গ-বঙ্গাদির বিভাগে তাহার সূচনা আছে। তুর্ব্বসুরাজ্য পুরুরাজ্যের পশ্চিমাংশের দক্ষিণ পূর্ব্ব ও পূর্ব্বাংশের পশ্চিম। বিভিন্ন পুরাণের মত সমন্বয় মানচিত্রে আছে।"

পণ্ডিত মহাশয়ের পত্র সুদীর্ঘ, তাহার সমগ্রভাগ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার অঙ্কিত মানচিত্রে দ্রুহ্যুর অধিকৃত রাজ্য যেভাবে চিহ্নিত হইয়াছে, তদ্দারা সুন্দরবন হইতে আরম্ভ করিয়া, পূর্ব্বদিকে (বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশ-সহ) ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত দ্রুহ্যুর অধিকারভুক্ত ছিল।

পুরাণ সমূহের পরস্পর মতানৈক্যের কারণ সম্বন্ধে উক্ত পত্রে নিম্নলিখিত কতিপয় মীমাংসা পাওয়া যাইতেছে ;—

(১) ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে, বিভিন্নকল্পের কথা সন্নিবেশিত হওয়ায় একই বিষয়, নানা পুরাণে নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তদ্দরুণ পরস্পর যে অনৈক্য দৃষ্ট হয়, তাহা

প্রকৃতপক্ষে বিরুদ্ধভাব বলা যাইতে পারে না ; কারণ—'কল্পভেদাদ-বিরুদ্ধম্'।

(২) মূলবক্তা বা শ্রোতার বাসস্থান প্রভৃতির ভেদ হেতু বিভিন্ন পুরাণে একই রাজ্যকে বিভিন্নদিক সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

(৩) সকল পুরাণেই পুরুরাজ্যের ভূ-ভাগকে কেন্দ্র করা হইয়াছে—পুরুর রাজধানীকে নহে। সুতরাং সকল পুরাণে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানকে কেন্দ্র করা হয় নাই। পুরুরাজ্যের বিভিন্ন স্থানকে কেন্দ্র করিয়া দিঙনির্ণয় করায়, পুরাণসমূহের মত পরস্পর অনৈক্য লক্ষিত হয়।

(৪) দ্রুহ্যুরাজ্য ত্রিপুরা মান্দালয়াদি ব্রহ্ম-ভূখণ্ড, তাহা পুরুরাজ্যের পশ্চিমও বটে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বও বটে।

পণ্ডিত সমাজ, পুরাণ সমূহের যেরূপ মত সমন্বয় করেন, তাহা বুঝা গেল। তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতের সমর্থক। ত্রিপুর ইতিহাসে এতৎ সম্বন্ধে কি পাওয়া যায়, এখন তাহা দেখা আবশ্যক। সংস্কৃত রাজমালায় লিখিত আছে,—

"ততো রাজ্যং নিজং রাজ্ঞা স্বপুত্রেন সমর্পিতং।
পূর্ব্বমাগ্নে ভাগঞ্চ দ্রুহ্যবে প্রদদৌ নৃপঃ।"

সংস্কৃত রাজমালা।

ত্রিপুরার অন্যতর পুরাবৃত্ত 'রাজরত্নাকর' গ্রন্থেও এতদ্বিষয়ের উল্লেখ আছে,---

"আগ্নেয্যাং দিশি যে দেশাঃ সমুদ্র তটবর্ত্তিনঃ।
তদ্দেশানামাধিপত্যং যযাতির্দ্রুহ্যবে দদৌ।।"

রাজরত্নাকর—৬ষ্ঠ সর্গ ; ৩ শ্লোক।

ইহাও শ্রীমদ্ভাগবতের অনুযায়ী। দ্রুহ্যু অগ্নিকোণে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, অধিকাংশের মতে ইহাই নির্ণীত হইতেছে। যযাতি যে স্থান হইতে পুত্রদিগকে নানা দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সাধারণতঃ সেই স্থান হইতে দিঙ্নির্ণয় করাই স্বাভাবিক ; সুতরাং দ্রুহ্যুকে প্রতিষ্ঠানপুর হইতে অগ্নিকোণে পাঠাইয়াছিলেন, ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে। কোন কোন পুরাণে যে দ্রুহ্যুকে পশ্চিমদিকে প্রেরণের কথা পাওয়া যায়, কল্পভেদ, মূল বক্তা বা শ্রোতার বাসস্থান ভেদ, কিম্বা দিঙনির্ণয়ের কেন্দ্র ভেদ হেতু তাহা ঘটিয়াছিল, ইহাই বুঝা যায়।

দ্রুহ্যুর প্রথম উপনিবেশের স্থান নির্ণয়

দ্রুহ্যু পিতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কোথায় প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সে আর এক বিষম সমস্যা। বিভিন্ন মতবাদীগণের মত বৈষম্যে এবিষয়ের মীমাংসা নিতান্তই জটিল হইয়াছে। ইহার উপর আবার নূতন মত স্থাপন করিতে যাইয়া কোলাহলের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক নহি---সে বিষয়ে শক্তিরও অভাব আছে। প্রচারিত মতসমূহ

আলোচনা দ্বারা এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে কি না, এস্থলে তাহারই চেষ্টা করা হইবে।

কৈলাসচন্দ্র সিংহের মতালোচনা

পরলোকগত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় দ্রুহ্যুর সহিত রাজমালার কোন রূপ সম্বন্ধ রাখেন নাই ; সুতরাং দ্রুহ্যুর উপনিবেশের প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামাইবারও প্রয়োজন ঘটে নাই। তিনি অতি সহজ পথ অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন ;---

"শ্যানবংশের একশাখা কামরূপের পূর্ব্বাংশে একটী স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্যের আধিপতি 'ফা' উপাধি ধারণ করিতেন। পার্ব্বত্যমানবদিগের দ্বারা 'ফা' বংশীয়গণ কামরূপ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন। রাজ্যভ্রষ্ট নরপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র আধুনিক নাগা পর্ব্বতে একটী স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন, ইহাই প্রাচীন বা কৃত্রিম হেড়ম্ব রাজ্য। দিমাপুর তাহার আদিম রাজধানী। সেই হৃত-রাজ্য কামরূপ পতির কনিষ্ঠ পুত্র, অগ্রজের ন্যায় আধুনিক কাছাড় প্রদেশের উত্তরাংশে দ্বিতীয় রাজ্য স্থাপন করেন। ইহা প্রাচীন 'তৃপুরা' বা 'ত্রীপুরা' রাজ্য। এই তৃপুরা বা ত্রীপুরা শব্দ হইতে আধুনিক ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি।

কৈলাসবাবুর রাজমালা—২য় ভাঃ, ১ম অঃ ৮ পৃষ্ঠা

এই উক্তি হইতে নিম্নোক্ত তিনটী বিষয় পাওয়া যাইতেছে,—

(১) কামরূপের পূর্ব্বাংশে 'ফা' উপাধিধারী শ্যান বংশীয়গণের রাজত্ব ছিল।

(২) 'ফা' বংশীয়গণ কামরূপ হইতে বিতারিত হওয়ায়, রাজ্যভ্রষ্ট নরপতির জ্যেষ্ঠপুত্র আধুনিকগ নাগা পর্ব্বতে নব রাজ্য স্থাপন করেন, তাঁহার আদি রাজধানী দিমাপুর।

(৩) উক্ত রাজার কনিষ্ঠ পুত্র আধুনিক কাছাড় প্রদেশের উত্তরাংশে আর এক রাজ্য স্থাপন করেন, ইহাই বর্ত্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম পত্তন।

এই তিনটী বাক্যের মধ্যে প্রথম কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে, শ্যানবংশীয় 'ফ্রা' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন,---'ফা' উপাধি নহে। অহোম নৃপতিগণ পরবর্ত্তীকালে 'ফা' উপাধি গ্রহণের প্রবাদ সত্য হইলে, তাহাও ত্রিপুরেশ্বরগণের উপাধি গ্রহণের বহু পরবর্ত্তী সময়ের কথা, এবং তাঁহাদের উপাধিরই অনুকরণ বলিয়া মনে হয়। শ্যানগণের 'ফ্রা' উপাধির কথা কৈলাসবাবুরও অগোচর ছিল না, তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ;---

"আমাদের প্রভু শব্দটি শ্যান ব্রহ্ম প্রভৃতি জাতিদ্বারা 'ফ্রা' রূপ অপভ্রংশত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই সেই জাতীয় নরপতিগণ এই 'ফ্রা' উপাধি ধারণ করিতেন।"

কৈলাসবাবুর রাজমালা—১ম ভাঃ ৩য় অঃ, ১৮ পৃঃ।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ আলোচনায় স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে, শ্যানবংশীয় রাজগণের প্রাচীন উপাধি 'ফ্রা' ছিল---'ফা' নহে। সুতরাং 'ফা' উপাধিধারী শ্যানগণ কাছাড়ে ও প্রাচীন ত্রিপুর রাজ্যে আসিবার কথা ঠিক নহে।

দ্বিতীয় কথার আলোচনায় প্রতিপন্ন হইবে, কাছাড়ে শ্যানবংশের প্রাধান্যলাভ এবং দিমাপুরে রাজধানী স্থাপন বেশীদিনের কথা নহে। কামরূপ হইতে বিতাড়িত শ্যানবংশীয় রাজার নাম কি, তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে কাহার কি নাম ছিল, এবং তাঁহাদের কামরূপ ছাড়িয়া কাছাড়ে আগমন কত কালের কথা, কৈলাসবাবু তাহা বলেন নাই। আসাম বুরুঞ্জিতে পাওয়া যায়, অতি প্রাচীনকালে মহীরঙ্গ নামক দানব কামরূপের রাজা ছিলেন। এই দানবের পরিচয়াদি জানিবার উপায় নাই। মহীরঙ্গের পর তদ্বংশীয় চারিজন রাজা এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছেন। তৎপরে নরকাসুর বিষ্ণুর কৃপায় এই প্রদেশের অধিকার লাভ করেন। নরকাসুর রামায়ণের ঘটনার সমকালিক ছিলেন।* নরকাসুরের পুত্র ভগদত্ত স্বনাম প্রসিদ্ধ নরপতি। প্রাগজ্যোতিষপুরে (গৌহাটীতে) ইঁহার রাজধানী ছিল। ইনি ভারতযুদ্ধে দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বী হইয়া একটী প্রধান নায়কের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি মহাভারতের সমসাময়িক রাজা। ভগদত্তের পরে ধর্ম্মপাল, রত্নপাল, কামপাল, পৃথ্বীপাল ও যুবাহু এই পাঁচজন রাজার নাম পাওয়া যায়। কামরূপ বুরুঞ্জীর মতে ইঁহারা ভগদত্তের বংশধর ছিলেন। সুতরাং শ্যানবংশ কামরূপের প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকিলে, তাহা ইঁহাদের শাসনের বহু পরবর্ত্তী কালের কথা, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

এই গেল কামরূপের কথা। কাছাড়ের বিবরণ আলোচনা করিতে গেলে দেখা যাইবে, এই রাজ্যও বহু প্রাচীন। দেশাবলীর মতে কাছাড়ের (হেড়ম্বের) প্রথম ভীমনন্দন ঘটোৎকচ। পুরাণ সমূহ দ্বারাও এইমত সমর্থিত হয়। ঘটোৎকচ কুরুক্ষেত্র মহাসমরে কর্ণ কর্ত্তৃক নিহত হইবার পর, তৎপুত্র বর্ব্বরীক কাছাড়ের রাজা হন। বর্ব্বরীকের পর, তৎপুত্র মেঘবর্ণ পিতার সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। এখন দেখা যাইতেছে, কামরূপের রাজা ভগদত্তের ন্যায় কাছাড়ের

কিষ্কিন্ধ্যাপতি সুগ্রীব, সীতার অন্বেষণে প্রেরিত দূতদিগকে উপদেশ প্রদানকালে বলিয়াছিলেন—

"যোজনানি চতুঃষষ্টির্বরাহো নাম পর্ব্বতঃ।
সুবর্ণশৃঙ্গঃ সুমহানগাধে বরুণালয়ে।।
তস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা নরকো নাম দানবঃ।।"
তত্র প্রাগ্জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং পুরম্।

বাল্মিকী রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪২ সর্গ ৩০-৩১ শ্লোক।

(হেড়ম্বের) রাজা ঘটোৎকচও মহাভারতের সমসাময়িক ভূপতি। তাঁহাদের পরেও তত্তদ্বংশীয় কয়েক পুরুষ কামরূপে ও কাছাড়ে রাজত্ব করা প্রমাণিত হইতেছে, সুতরাং মহাভারতের কালে শ্যানবংশ কামরূপে অধিকার লাভ করা এবং তথা হইতে আসিয়া কাছাড়ে নবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা দুই-ই অসম্ভব কথা। ভগদত্ত ও ঘটোৎকচ উভয়েই অসাধারণ পরাক্রমশালী নরপতি, তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া রাজ্য স্থাপন করা সেকালে শ্যান জাতির অসাধ্য ছিল। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে কৈলাসবাবুর দ্বিতীয় কথাও অনুমোদন করা যাইতে পারে না। শ্যানজাতি কাছাড়ে অভ্যুত্থিত হইবার কথা ইতিহাসে পাওয়া গেলেও সেই আধুনিক ঘটনাকে প্রাচীনকালের ঘটনার সঙ্গে জোড়া দেওয়া চলে না।

কৈলাসবাবুর তৃতীয় কথাও ভিত্তিহীন। তিনি বলিয়াছেন, কামরূপের শ্যানরাজা তথা হইতে বিতাড়িত হইবার পর, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র যে রাজ্য স্থাপন করেন, তাহাই কালক্রমে ত্রিপুর রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। এই বাক্যের একমাত্র প্রমাণস্বরূপ কৈলাসবাবু বলিয়াছেন---

সেই' সেই জাতীয় (শ্যান ও ব্রহ্মা প্রভৃতি) নৃপতিগণ 'ফ্রা' উপাধি ধারণ করিতেন। এই 'ফ্রা' হইতে 'ফা' শব্দের উদ্ভব। মাণিক্য উপাধি প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে ত্রিপুরাপতিগণ সকলেই 'ফা' উপাধি ধারণ করিতেন।"

কৈলাসবাবুর রাজমালা—১ম ভাঃ ৩য় অঃ, ১৮ পৃষ্ঠা।

'ফ্রা' এবং 'ফা' এক ভাষাজাত শব্দ নহে এবং ঠিক একার্থ বোধকও নহে, এতদুভয় শব্দের একত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টাকে নিতান্তই ব্যর্থ প্রয়াস বলিতে হইবে। 'ফ্রা' শব্দ ব্রহ্ম ভাষা উদ্ভূত তাহার অর্থ প্রভু। আর 'ফা' শব্দ ত্রিপুরা ভাষাজাত, তাহার অর্থ পিতা। হালাম ভাষায়ও 'ফা' শব্দ পিতৃবাচক। কাহারও কাহারও মতে সংস্কৃত 'পাল' শব্দ হইতে পা এবং 'পা' শব্দ 'ফা' হইয়াছে। যাহা হউক, 'প্রভু' ও 'পিতা' দুই-ই সম্মানসূচক শব্দ, এতদর্থে উভয়ের একত্ব প্রতিপাদিত হইলেও তাহার অর্থগত ও ব্যবহারগত পার্থক্য অস্বীকার করা যাইতে পারে না। গ্রন্থভাগের আলোচনা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, 'ফা' শব্দ প্রভুবাচক নহে,---পিতাবাচক।*

ত্রিপুরার আদি রাজা কামরূপ হইতে 'ফা' উপাধি লইয়া আগমনের কথাটি নিতান্তই কাল্পনিক। ত্রিপুর পুরাবৃত্তে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, মহারাজ ত্রিপুরের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের এবং তৎপরবর্ত্তী ২৬ জন রাজার এবম্বিধ কোন উপাধি ছিল না। ত্রিপুরের অধস্তন ২৭শ স্থানীয় মহারাজ ঈশ্বর (নামান্তর

* রাজমালা—১ম লহর, ৯০-৯১ পৃষ্ঠা।

নীলধ্বজ) 'ফা' উপাধি গ্রহণ করেন। তদবধি রাজা ফা (হরিরায়) পর্য্যন্ত ৭১ জন ভূপতি সেই উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। রাজা ফা-এর পরবর্ত্তী রত্নমাণিক্যের সময় হইতে 'মাণিক্য' উপাধি প্রচলিত হইয়াছে। মহারাজ ত্রিপুরের পূর্ব্বেই (ফা উপাধি লইবার অনেক পূর্ব্বে) কিরাত দেশে ত্রিপুরেশ্বরগণের রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং ত্রিপুর রাজবংশের আদি পুরুষ 'ফা' উপাধি লইয়া ত্রিপুরায় আগমনের কথা গ্রহণ করিবার কোন সূত্র পাওয়া যাইতেছে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মহারাজ ত্রিপুরের পূর্ব্বে (তাঁহার ঊর্দ্ধতন ১৪শ স্থানীয় মহারাজ প্রতর্দ্দনের সময়ে) কিরাত দেশে ত্রিপুর রাজবংশের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে। এ বিষয়ের প্রমাণাদি পরে প্রদান করা হইবে। ভারত সম্রাট যুধিষ্ঠির ও মহারাজ ত্রিপুর সমসাময়িক রাজা, ইহা গ্রন্থভাগে প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।* সুতরাং পূর্ব্বকথিত ভগদত্ত ও ঘটোৎকচের ন্যায় মহারাজ ত্রিপুরও মহাভারতের ঘটনার সমসাময়িক ব্যক্তি। পূর্ব্বে দেখানো হইয়াছে, ভগদত্ত প্রভৃতির কালে শ্যান বংশীয়গণের কামরূপে এবং হেড়ম্ব দেশে প্রভাব বিস্তার করা অসম্ভব ছিল। সুতরাং কৈলাসবাবুর কথিত কামরূপের পরাজিত রাজার কনিষ্ঠ-পুত্রের তৎকালে ত্রিপুরায় আগমনের কথাও অসম্ভব হইয়া পড়ে।

কৈলাসবাবুর যুক্তি যে সুসঙ্গত নহে, তাহা বুঝাইবার জন্য বোধ হয় এতদতিরিক্ত আলোচনার প্রয়োজন হইবে না। ত্রিপুরায় যে শ্যান বংশীয়গণের আগমন হয় নাই, পূর্ব্ব আলোচনায় তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ত্রিপুরেশ্বরগণের ত্রিপুর ভাষাসম্ভূত 'ফা' উপাধি দ্বারা কৈলাসবাবু রাজবংশের প্রতি যে ভাব পোষণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া অনেক দোষারোপ করিয়া থাকে। মৃত ব্যক্তির উপর এরূপ অভিযোগের আরোপ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তবে, কৈলাসবাবুর একথা বুঝা সঙ্গত ছিল যে, স্থানীয় রীতিনীতি সর্ব্বত্রই সমাজ বা বংশ বিশেষের প্রতি প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। বিশেষতঃ ভূপতিবৃন্দ, অনেক সময় রাজভক্ত প্রকৃতিপুঞ্জ হইতেও স্থানীয় ভাষা সম্ভূত উপাধি লাভ করিয়া থাকেন। এ স্থলে তাহাই ঘটিয়াছে। পিতৃবাচক উপাধি রাজা স্বয়ং গ্রহণ করা অপেক্ষা প্রজাবৃন্দ হইতে লাভ করাই যে অধিকতর সম্ভবপর এবং স্বাভাবিক, ইহা অতি সহজবোধ্য। ত্রিপুরা কিম্বা হলাম ভাষাজাত

* রাজমালা—১ম লহর, ১৬৫ পৃষ্ঠা।

উপাধি গ্রহণ বা নাম ধারণ করিলেই হেয় কিম্বা অনার্য্য হইতে হইবে, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই ; তাহা দেশ ও কাল প্রভাবের নিদর্শন মাত্র। সকলেই জানেন, দিল্লীর দরবারে ভারতের নৃপতিবর্গ সমবেতভাবে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে 'কৈশরে হিন্দ্' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন ; শব্দটি পারস্য ভাষাজাত। ভবিষ্যৎ কালের ঐতিহাসিকগণ 'কৈশরে হিন্দ্' উপাধির প্রতি লক্ষ্য করিয়া মহারাণীকে মোগল সম্রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা করিবেন কি? করিলে, তাঁহারা কৈলাসবাবুর ন্যায়ই ভ্রমে পতিত হইবেন। আমাদের দেশে 'খাঁ' উপাধিধারী ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ইহা মুসলমান কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপাধি। উপাধির প্রতি লক্ষ্য করিয়া জাতি নির্ণয় করিতে গেলে, ঐ সকল ব্রাহ্মণ সন্তানের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের ভাগ্যের কাশী ঘটিবে কি মক্কা ঘটিবে, তাহা ভগবান জানেন।

নামের উপর নির্ভর করিয়া বংশ পরিচয় করা বর্ত্তমান কালেও সহজসাধ্য নহে। বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হিন্দুস্থানীগণের রমণীমোহন, রসিকলাল প্রভৃতি নাম সচরাচরই পাওয়া যাইতেছে। হিন্দুস্থানের উপনিবেশী বাঙ্গালী সন্তানের হিন্দুস্থানী ধরণের নামও দুর্ল্লভ নহে। হিন্দুবালকগণের ক্রঞ্জি, জুবিয়ার, মন্টু, ঝাণ্টু প্রভৃতি নাম শুনিয়া কেহ কি জাতি নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন? প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যের উপাধির ন্যায় নামের মধ্যেও অনেক পরিমাণে দেশ ও কালের প্রভাব সংক্রামিত হইয়া থাকে। সুতরাং কোন প্রাচীন জাতি বা সমাজের প্রচলিত নাম কিম্বা উপাধির প্রতি নির্ভর করিয়া প্রকৃত পরিচয় সংগ্রহ করা সকল স্থলে সম্ভব হইতে পারে না।

বিশ্বকোষের মতালোচনা

বিশ্বকোষ সম্পাদক মহাশয়ের মতও এ স্থলে আলোচনা যোগ্য। তিনি ত্রিপুরা বিষয়ক প্রসঙ্গে এক স্থানে বলিয়াছেন ;—

"পুরাণ মতে দ্রুহ্যুর পুত্র গান্ধার হইতে গান্ধার দেশের নামকরণ হয়। এরূপ স্থলে দ্রুহ্যু ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে না আসিয়া পশ্চিম প্রান্তে গমন করিয়াছিলেন, তাহাই পৌরাণিক মতে স্বীকার্য্য।"

বিশ্বকোষ—৮ম ভাগ ১৯৮-৯৯ পৃষ্ঠা।

এই মত হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের অনুরূপ। পুরাণাদির মত আলোচনা করিয়া দ্রুহ্যুর অগ্নিকোণে গমনের কথা ইতিপূর্ব্বেই নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে, ইহা বলা আবশ্যক যে, প্রাচ্য বিদ্যার্ণব মহাশয় এই বাক্যের সূচনায়ই ভ্রমবর্ত্মে পাদবিক্ষেপ করিয়াছেন, তিনি গান্ধারকে দ্রুহ্যুর পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাণের মতে গান্ধার দ্রুহ্যুর অধস্তন ৪র্থ স্থানীয়।

বিশ্বকোষে পুরাণের কথা আলোচনা করিয়াও গান্ধারকে দ্রুহ্যুর পুত্র বলিবার কারণ বুঝা যাইতেছে না। এ বিষয়ে বিষ্ণু পুরাণে পাওয়া যায় ;---

"দ্রুহ্যুস্তু তনয় বভ্রুঃ।
ততঃ সেতুঃ, সেতুপুত্র আরদ্বান নাম,
তদাত্মজ গান্ধার" ইত্যাদি।

বিষ্ণু পুরাণ--৪র্থ অংশ, ১৭শ অঃ।

শ্রীমদ্ভাবগত ৯ম স্কন্ধ, ২৩শ অধ্যায়ে দ্রুহ্যুর যে অংশ বিবরণ পাওয়া যায়, তদ্দারাও গান্ধার দ্রুহ্যুর চতুর্থ স্থানীয় বলিয়া জানা যাইতেছে। গান্ধার দেশ, এই গান্ধার কর্ত্তৃক বিজিত এবং তদীয় নামানুসারে নামকরণ হইয়াছিল, মৎস্য পুরাণের ৩৮শ অধ্যায়ে এবং অন্যান্য গ্রন্থে এ কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সমগ্র অবস্থা আলোচনা করিলে মনে হয়, গান্ধার উক্ত প্রদেশ জয় করিয়া থাকিলেও তথায় বসবাস করেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী ৫ম স্থানীয় প্রচেতার পুত্রগণ পৈতৃক রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, গান্ধার দেশ তাঁহাদের দ্বারা অধ্যুষিত হওয়ায়ই অধিকতর সম্ভবপর। বিষ্ণু পুরাণের বচন সম্যক আলোচনা করিলে এরূপ আভাসই পাওয়া যাইবে। বিষ্ণু পুরাণের কথা এই ;---

"দ্রুহ্যুস্তু তনয় বভ্রুঃ।
ততঃ সেতুঃ, সেতুপুত্র আরদ্বান নাম,
তদাত্মজো গান্ধারঃ, ততো ধর্ম্মঃ, ধর্ম্মাৎ ধৃতঃ,
ধৃতাৎ দুর্গমঃ, তত প্রচেতা
প্রচেতসঃ পুত্রশতম্ অধর্ম্ম বহুলানাং
ম্লেচ্ছানামুদীচ্যাদী নামাধিপত্যমকরোৎ।।"

বিষ্ণু পুরাণ--৪র্থ অংশ, ১৭শ অ ১-২ শ্লোক।

এই বাক্য দ্বারা স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইবে, দ্রুহ্যু হইতে প্রচেতা পর্য্যন্ত নয় পুরুষ এক স্থানেই অবস্থিত ছিলেন; প্রচেতার শত পুত্র পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া দিক্ দিগন্তরে গমন করেন। এইরূপ মনে করিবার আরও কারণ আছে ; উদ্ধৃত শাস্ত্রবাক্যে পাওয়া যাইতেছে, প্রচেতার পুত্রগণ ম্লেচ্ছদিগের রাজা হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ সেকালে গান্ধার দেশ আর্য্যাবাসের পক্ষে বিশেষ নিন্দনীয় ছিল, শাস্ত্রবাক্যে ইহাও পাওয়া যাইতেছে।* গান্ধার এবম্বিধ দূষিত স্থানে বাস করিলে পুরাণে সে কথার নিশ্চয়ই উল্লেখ থাকিত। ত্রিপুরার ইতিহাস আলোচনা করিলেও গান্ধারের স্থানান্তরে থাকিবার কথাই প্রমাণিত হয়। এতৎ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ

* মহাভারত—কর্ণপর্ব্ব, ৪৫ অধ্যায়।

তর্করত্ন মহাশয়, পূর্ব্বোক্ত পত্রে এক স্থানে লিখিয়াছেন---

"দ্রুহ্যু বংশীয় গান্ধার, পুরু বংশীয় কোন রাজার হস্ত হইতে গান্ধার প্রদেশ আচ্ছন্ন করিলে, তাঁহার নামানুসারে ঐ প্রদেশের 'গান্ধার' নাম হয়। প্রচেতার বহু পুত্রগণের মধ্যে কেহ সে স্থানে নিজ রাজধানী স্থাপন করেন, আপনার এ মত আমি সমর্থন করি ; পুত্রের নাম আমার অনুসন্ধানে মিলে নাই।'

বিশ্বকোষ সম্পাদক মহাশয়ের মত, এই সকল মতের সহিত আলোচনা করা আবশ্যক। তাঁহার বাক্যের মর্ম্ম এই যে, "দ্রুহ্যুর পুত্র গান্ধারের নামানুসারে যখন গান্ধার দেশের নামকরণ হইয়াছে, তখন দ্রুহ্যু ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে না আসিয়া পশ্চিম প্রান্তে গমন করিয়াছিলেন, ইহাই স্বীকার্য্য।" গান্ধার দ্রুহ্যুর পুত্র নহেন—চতুর্থ স্থানীয়, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অধস্তন পুরুষ দ্বারা বিজিত ও নামাঙ্কিত হইয়াছে বলিয়াই দ্রুহ্যু গান্ধার দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এরূপ স্বীকার করিবার কি কারণ থাকিতে পারে জানি না। দ্রুহ্যু ভারতের পূর্ব্বদিকে উপনিবিষ্ট হইলেও, তাঁহার অধস্তন চতুর্থ স্থানীয় গান্ধারের, পশ্চিম ভারতে রাজ্য বিস্তার করিতে কি বাধা ছিল, এবং অধস্তন পুরুষের নামের সহিত কোন স্থানের সম্বন্ধ পাইলেই, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণও সেই স্থানের অধিবাসী ছিলেন এমন মনে করিবার কি হেতু থাকিতে পারে, তাহাও সহজবোধ্য নহে। এবম্বিধ যুক্তি বলে দ্রুহ্যুকে পশ্চিম দিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে বোধ হয় কেহই সম্মত হইবেন না।

দ্রুহ্যুর উপনিবেশ সম্বন্ধে ঢাকার ইতিহাস প্রণেতা স্নেহাস্পদ শ্রীমান যতীন্দ্র মোহন রায় মহাশয়ের মত অন্যরূপ, তিনি 'ত্রিবেণী' প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,---

ঢাকার ইতিহাস প্রণেতার মত আলোচনা

'ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী ও লক্ষ্যা এই নদ-নদী ত্রয়ের সম্মিলন স্থান ত্রিবেণী বলিয়া পরিচিত। এই স্থান নারায়ণগঞ্জের বিপরীত কূলে সোণার গাঁও পরগণায় অবস্থিত।'

"কথিত আছে, যযাতির পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে পরাক্রান্ত তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্যু কিরাত ভূপতিকে রণে পরাঙ্মুখ করিয়া কোপল (ব্রহ্মপুত্র) নদের তীরে ত্রিবেগ বা ত্রিবেণী নগর সংস্থাপন পূর্ব্বক তথায় স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন।"

ঢাকার ইতিহাস—১ম খণ্ড, ২৪শ অঃ ৪৭২ পৃষ্ঠা।

তিনি অন্য স্থানে বলিয়াছেন ;---

'বন্দরে রায়চৌধুরীগণের অধ্যুষিত ভদ্রাসন, রাজা কৃষ্ণদেব প্রদত্ত বলিয়া রাজবাড়ী নামে প্রসিদ্ধ। আমাদের মতে উহা দ্রুহ্যুর অনন্তর বংশীয় কোনও রাজার বাস হইতে রাজবাড়ী আখ্যা প্রাপ্ত হয়।"

ঢাকার ইতিহাস—১ম খণ্ড, ২৪শ অঃ, ৪৮৮ পৃঃ।

প্রথম কথাটি প্রবাদ মূলক। অনুসন্ধান করিলে, এই প্রবাদের ভিত্তি পাওয়া যাইবে না। দ্রুহ্যুর নির্ব্বাসন দণ্ড সত্যযুগের ঘটনা। তৎকালে সুবর্ণগ্রামের ত্রিবেণী

নামক স্থান অগাধ সাগর সলিলে নিমজ্জিত ছিল, একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং তথায় দ্রুহ্যুর উপনিবেশ স্থাপন সম্ভব হইতে পারে না। এই প্রবাদ ত্রিপুর ইতিহাসেরও স্বীকার্য্য নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে সুবর্ণ গ্রামে, হিন্দু এবং মুসলমান বঙ্গেশ্বরগণের রাজধানীই ছিল, তথায় কোন কালেই ত্রিপুরেশ্বরগণের রাজধানী স্থাপিত হয় নাই।

দ্বিতীয় কথা আলোচনায় দেখা যাইবে, সুবর্ণ গ্রামের 'রাজবাড়ীর' সহিত ত্রিপুর রাজ্যের পরোক্ষ সম্বন্ধ আছে। সমসের গাজী, লবঙ্গ ঠাকুর নামক রাজ পরিবারস্থ এক ব্যক্তিকে 'লক্ষ্মণমাণিক্য' নাম দিয়া, ত্রিপুরার রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই লক্ষ্মণমাণিক্য মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া সুবর্ণ গ্রামে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার অধ্যুষিত স্থানই 'রাজবাড়ী' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ত্রিপুরার কোন রাজা সুবর্ণ গ্রামে বাস কিম্বা রাজপাট স্থাপন করেন নাই। এ বিষয় গ্রন্থভাগে আলোচিত হওয়ায় এ স্থলে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। * বিষয়টি রাজমালা দ্বিতীয় লহর সংসৃষ্ট, সেই লহরে বিশেষভাবে আলোচনা করিবার সঙ্কল্প রহিল। সুবর্ণ গ্রামের রাজবাড়ী যে দ্রুহ্যুর স্থাপিত নহে, পূর্ব্বকথিত বিবরণ দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইবে।

এতদ্বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন মত যত দূর সম্ভব আলোচিত হইল, আর এই সকল মত লইয়া কথা বাড়াইব না। দ্রুহ্যুর উপনিবেশ সম্বন্ধে ত্রিপুর ইতিহাসের মত কি, এখন তাহা দেখা আবশ্যক।

রাজমালায় মহারাজ দৈত্যের নামোল্লেখ থাকিলেও তৎপুত্র মহারাজ ত্রিপুরের শাসনকালের ঘটনা হইতেই উক্ত গ্রন্থের রচনা আরম্ভ হইয়াছে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তীগণের বিবরণ তাহাতে নাই। সুতরাং দ্রুহ্যুর উপনিবেশ সম্বন্ধীয় কোন কথা রাজমালায় পাওয়া যায় না। 'রাজরত্নাকর' গ্রন্থে এবিষয় বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে।

তাহাতে পাওয়া যায়---

"দ্রুহ্যু নিজ গণৈঃ সার্দ্ধং প্রতিষ্ঠানাদ্বহির্গতঃ।
স্বর্ধুনী তীরমাসাদ্য সাগরভিমুখো যযৌ।।
হংস সারস দাত্যুহান্ নির্ম্মলানি সরাংসি চ।
সমুন্নত গিরিব্রাতান্ মৃগান্ নানাবিধানপি।।
সিংহ ব্যাঘ্র সমাকীর্ণ বনানি নিবিড়ানি চ।
সাধুনাং শান্ত চিত্তানাং মুনিনামাশ্রমবাংস্তথা।।
নদীর্বেগবতীস্তত্র নদানুর্ম্মি সমাকূলান্।
শমীতাল বটাশ্বাখন্ লতা পুষ্প সুশোভিতাঃ।।

* রাজমালা—প্রথম লহর, ২৬৯, ২৭০ পৃষ্ঠা।

ক্বচিৎ কীচক সন্দোহান্ ধ্বনতো বায়ু যোগতঃ।
দ্রুহ্যু কৌতুহলাবিষ্টঃ পথি গচ্ছন্ দদর্শ বৈ।।
কোকিলানাং কলরবং তথান্য পক্ষিনামপি।
নানাবিধানি গীতানি শুশ্রাব বন বর্ত্মানি।।
ক্বচিৎ শার্দ্দূল সিংহানাং গর্জ্জনং হৃদ্ বিদারকম্।
তথা বন্য বরাহাণা মৃক্ষাণাং ভীষণংরবম্।।
কুত্র শিষ্যসমেতানামৃষীণাং ব্রহ্মবাদিনাম্।
ব্রহ্মঘোষং সুললিতং শুশ্রাব বিপিনান্তরে।
এবং গচ্ছন্ সবৈ রাজন্ পঞ্চদশ দিনান্তরে।
পান্থঃ সানুচরোদ্রুহ্যুঃ প্রাপজহ্নোস্তপোবনম্।।
সমালোক্যাশ্রমং তস্য স্নাত্বা চ জাহ্নবী জলে।
হিত্বা পথশ্রমং তত্রাবাপ শান্তি মনুত্তমাম্।।
প্রাপ্যাশিষং মুনেস্তস্মাৎ প্রীতি প্রোৎফুল্লদর্শনঃ।
কপিলস্যাশ্রমং সোহথপ্রপেদে পুণ্যবর্দ্ধনম্।।
যত্র দক্ষিণগা গঙ্গালেভে সাগর সঙ্গমম্।
গঙ্গা সাগরয়োর্মধ্যে দ্বীপ একো মনোরমঃ।।
যস্মিন্ দ্বীপে স ভগবানুবাস কপিলো মুনিঃ।
যত্র ভাগীরথী পুণ্যা তদাশ্রম তলং গতা।।
কপিলেতি সমাখ্যাতা সর্ব্বপাপ প্রণাশিনী।
গজাশ্ব রথমুখ্যানাং গতির্যত্র ন বিদ্যতে।
বসন্নপি পবিত্রেহত্র ভক্তিতঃ কপিলাশ্রমে।
পিতৃশাপং চিন্তয়িত্বা দ্রুহ্যুরুৎকণ্ঠিতোহভবৎ।।”

রাজ রত্নাকর—৬ষ্ঠ সর্গ, ৪-১৮ শ্লোক।

স্থূল মর্ম্ম ;---দ্রুহ্যুস্বগণ-সহ প্রতিষ্ঠান নগর হইতে বহির্গত হইয়া, সুরধুনীর তীরবর্ত্তী পথে সাগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি বন পথে গমনকালে, দেখিতেছিলেন, কোথাও হংস সারসাদি বিহগবৃন্দ সেবিত নির্ম্মল সলিল-সরোবর শোভা পাইতেছে, কোথাও সমুন্নত গিরিনিচয়ে নানাবিধ মৃগ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে, ক্বচিৎ সিংহ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যানী বিরাজমান, কোথাও বা প্রশান্ত হৃদয় মুনিগণের মনোরম আশ্রমসমূহ শোভা পাইতেছে, কোথাও শমী, তাল, বটাশ্বত্থাদি বৃক্ষ, লতাপুষ্পে সুশোভিত হইয়া প্রকৃতির মহিমা ঘোষণা করিতেছে, ইত্যাদি। ক্ষুণ্নমনা দ্রুহ্যু সেই সকল সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া, কৌতূহলাবিষ্ট চিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইভাবে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন, কলনাদিনী স্রোতস্বিনীকূল সাগরাভিমুখে সবেগে ধাবিতা হইতেছে। আবার

নানা জাতীয় কলকণ্ঠ বিহঙ্গমকুলের সুমধুর কাকলিরবে বনপথ মুখরিত হইতেছে, ক্বচিৎ সিংহ শার্দ্দূলাদির হৃদয়বিদারক গর্জ্জনধ্বনি শুনা যাইতেছে, কোথাও সামগান মুখরিত তপোবনে শিষ্যকুল পরিবৃত ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ বেদাধ্যাপনে নিরত। এই সকল দৃশ্য সমন্বিত পথে অনুচর পরিবৃত দ্রুহ্যু, পনর দিবস অতিবাহিত করিয়া মহর্ষি জহ্নুর পবিত্র আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন, এবং জাহ্নবীর পূত সলিলে স্নানাদি দ্বারা পথশ্রান্তি দূর করিলেন। মহর্ষি জহ্নুর আতিথ্যে সুস্থ ও পরিতুষ্ট হইয়া দ্রুহ্যু পুনর্ব্বার পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত হইলেন। দক্ষিণ-বাহিনী গঙ্গার তীরবর্ত্তী পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর, ভাগীরথীর সাগর সঙ্গম স্থানের সন্নিহিত এক মনোরম দ্বীপ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। এই দ্বীপে ভগবান কপিল মুনির আশ্রম ; সর্ব্ব পাপ প্রনাশিনী গঙ্গা এই পবিত্র আশ্রমের পাদবাহিনী হইয়া 'কপিলা' নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তথায় গজ, অশ্ব ও রথাদি যানবাহনের গতিবিধি নাই। দ্রুহ্যু সেইস্থানে যাইয়া ভক্তি পরিপ্লুত চিত্তে বাস করিতে লাগিলেন। পিতার নিদারুণ অভিসম্পাত স্মরণ করিয়া তিনি সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত চিত্তে কালযাপন করিতেছিলেন।

সগরদ্বীপ ও সুন্দরবনের সহিত দ্রুহ্যুবংশের সম্বন্ধ

উদ্ধৃত বাক্যে পাওয়া যাইতেছে, দ্রুহ্যু পৈতৃক রাজধানী প্রতিষ্ঠানপুর হইতে বহির্গত হইয়া, গঙ্গার তীরবর্ত্তী পথ অবলম্বনে গঙ্গাসাগর সঙ্গমের সন্নিহিত সাগরদ্বীপে যাইয়া মহামুনি কপিলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্ঞানের জীবন্ত মূর্ত্তি এবং সর্ব্বতত্ত্বদর্শী এই মহামুনি কপিলই সাংখ্য দর্শন প্রণেতা এবং সগরবংশের ধ্বংস সাধনকারী। তিনি যযাতি নন্দন দ্রুহ্যুর দুরবস্থা দর্শনে কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় আশ্রম সান্নিধ্যে আশ্রয় দান করিলেন। তখন,

"তথোবাচ প্রসন্নাস্য কপিলস্তং নৃপাত্মজম্।
মদ্‌বরেণ চ ভোগেন ক্ষয়মেনোগমিষ্যতি।।
যযাতেঃ শাপতো মুক্তিলপ্স্যন্তে তব বংশজাঃ।
এতদ্‌বচো নিশম্যাসৌ হৃষ্ট চিত্তস্তৌহভবৎ।।
স্থাপয়ামাস তত্রৈব ত্রিবেগ নগীরং শুভাম্।
প্রভাববানভূত্তত্র রাজশব্দ তিরোহিতঃ।।
স দোর্দ্দণ্ড প্রতাপেন বহুদেশান্ বশে নয়ন্।
পালয়ামাস ধর্ম্মেণ প্রজা আত্ম প্রজা ইব।।
যদ যদধিকৃতং রাজ্যং ত্রিবেগ পতিনা নৃপ।
তত্তৎ সর্ব্বৎ তদারভ্য ত্রিবেগ খ্যাতিমাগতম্।।'

রাজরত্নাকর—৬ষ্ঠ সর্গ, ১৯-২৩ শ্লোক।

স্থূল মর্ম্ম ;—মহর্ষি কপিল নৃপনন্দনকে প্রসন্নবদনে বলিলেন, আমার বরে এবং ভোগের দ্বারা তোমার পাপ ক্ষয় হইবে এবং তোমার বংশধরগণ যযাতির শাপ

হইতে মুক্তি লাভ করিবে। অতঃপর নৃপাত্মজ দ্রুহ্যু, হৃষ্টচিত্তে মহর্ষির সদয় বাক্যে প্রবুদ্ধ হইয়া সেই স্থানেই ত্রিবেগ নামক একটী উৎকৃষ্ট নগরী স্থাপন করিলেন। তথায় তিনি 'রাজা' শব্দ বর্জ্জিত হইয়া * অতীব প্রভাবশালী হইলেন। এবং দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে অনেক দেশ বশীভূত করিয়া, রাজধর্ম্মানুসারে অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিজিত সমস্ত দেশ 'ত্রিবেগ' ‡ আখ্যা লাভ করিয়াছিল। দ্রুহ্যুর সুন্দরবনস্থিত ত্রিবেগে রাজধানী স্থাপনের কথা যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতের আলোচনা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। সগরদ্বীপ ও সুন্দরবনে দ্রুহ্যুবংশীয়গণের রাজপাট থাকিবার কথা ইতিহাস বিস্মৃত হইয়া থাকিলেও তদঞ্চলে এই বংশের প্রভাব বিস্তারের নিদর্শন বর্ত্তমান কালেও নিতান্ত দুর্ল্লভ নহে। গুটী দুই নিদর্শনের বিষয় পর পৃষ্ঠায় আলোচনা করা যাইতেছে।

---

* পিতৃ শাপের সম্মান রক্ষার নিমিত্ত দ্রুহ্যু, নব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াও 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তৎপুত্র বভ্রু কপিল মুনির প্রসাদে 'রাজা' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। রাজরত্নাকরে লিখিত আছে ;—

"দ্রুহ্যু পুত্র স্ততো বভ্রুঃ কপিলস্য প্রসাদতঃ।
পিতুর্য্যুপরতে ধীরো রাজাখ্যানমুপেষিবান্।'

রাজরত্নাকর—৭ম পর্ব, ১ শ্লোক।'

দ্রহ্যুবংশীয়গণ যযাতির অভিসম্পাত কোন কালেই বিস্মৃত হন নাই ; তবে কাল প্রবাহে সেই স্মৃতি ক্রমশঃ শিথিল ভাব ধারণ করিয়াছে, একথা সত্য। যযাতি নৌকাবিহীন দেশে যাইবার নিমিত্ত দ্রুহ্যুকে আদেশ করিয়াছিলেন, সেই আদেশের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত দ্রুহ্যু বংশীয় ত্রিপুরেশ্বরগণ অদ্যাপি রাজ্যমধ্যে নৌকা প্রস্তুত করেন না। নৌকা নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইলে, তাহার প্রথম পত্তনের কার্য্য রাজ্যের বাহিরে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ তিনটী স্রোতের (ত্রিমোহনার) সন্নিহিত স্থান 'ত্রিবেগ' বা 'ত্রিবেণী' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শতমুখী গঙ্গার সন্নিহিত সগরদ্বীপ ও তৎসমীপবর্ত্তী রাজ্যের 'ত্রিবেগ' নাম হইবার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে, দুইটী হেতু নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ১ম—গঙ্গার 'ত্রিপগথা' নাম হইতে 'ত্রিবেগ' নামের উদ্ভব হইতে পারে। 'ত্রিপথগা' নাম সম্বন্ধে পুরাণে পাওয়া যায় ;—

'গঙ্গা ত্রিপথগা নাম দিব্যাভাগীরথীতি চ।
ত্রীন্ পথো ভাবয়ন্তীতি তস্মাৎত্রিপথগা স্মৃতঃ।।!!
বাল্মীকি রামায়ণ—আদিকাণ্ডঃ, ৪৪ সর্গ, ৬ শ্লোক।

মর্ম্ম ;—এই দিব্যাদীগঙ্গা, ত্রিপথগা ও ভাগীরথী নামে লোক বিখ্যাত হইবেন। তিনি ত্রিপথ দিয়া প্রবাহিতা হইলেন, এইজন্য ইহার 'ত্রিপথগা' নান লোকে প্রচারিত হইবে।

২য়—দ্রুহ্যুর পৈতৃক রাজ্য ত্রিবেণীতে (প্রয়াগের সন্নিহিত স্থানে) ছিল। সেই ত্রিবেণীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে রাজ্যের নাম 'ত্রিবেগ' হওয়া বিচিত্র নহে। ইহাই অধিকতর সঙ্গত কারণ বলিয়া মনে হয়।

(১) মহারাজ ত্রিলোচন, চতুর্দ্দশ দেবতার অর্চ্চনার নিমিত্ত দণ্ডীদিগকে সগরদ্বীপ হইতে আনিবার নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। উদ্ধত এবং অধার্ম্মিক ত্রিপুর তখনও জীবিত আছেন মনে করিয়া, দণ্ডীগণ ত্রিলোচনের আহ্বানে আসিতে সাহসী হন নাই। পরে রাজা স্বয়ং সগরদ্বীপে যাইয়া তাঁহাদিগকে আনয়ন করেন। * পারিবারিক বিবাদ মীমাংসার নিমিত্তও সময় সময় দণ্ডীদিগকে আহ্বান করিবার আভাস পাওয়া যাইতেছে। † এই সকল ঘটনার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় সগরদ্বীপের সহিত ত্রিপুরার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং এতদূভয় স্থানের মধ্যে সর্ব্বদাই সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ও পরস্পরের মধ্যে বাধ্যবাধকতা ছিল। এই স্থানের দণ্ডীগণের সংবাদ পূর্ব্বেই মহারাজ ত্রিলোচনের জানাছিল ; এবং মহারাজ ত্রিপুরের অনাচারের কথাও দণ্ডীগণ জানিতেন। রাজ রত্নাকারের মতে, এই দণ্ডীগণ পূর্ব্বেও দ্রুহ্য সন্তানগণের দেবতার সেবাইত ছিলেন, মহারাজ ত্রিপুরের অত্যাচারে তাঁহারা সেই কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই সকল ঘটনা আলোচনায় হৃদয়ঙ্গম হইবে, সুন্দরবনে রাজধানী থাকা কালেই এই সাধুপুরুষগণের সহিত রাজবংশের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল এবং সেই সূত্রেই কিরাত রাজ্য স্থাপনের পরেও তাঁহাদিগকে আনা হইয়াছিল।

(২) দণ্ডী (চন্তাই) ত্রিপুর রাজবংশের বিবরণ প্রাচীনকাল হইতে সংগ্রহ করিতেছিলেন। রাজমালা, রাজরত্নাকর প্রভৃতি ত্রিপুরার ইতিহাস, চন্তাইর মুখনিঃসৃত বাক্য অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারাও ত্রিপুর রাজবংশের সহিত সগরদ্বীপের ঘনিষ্ঠতা সূচিত হইতেছে। সগরদ্বীপে উপনিবিষ্ট সাধুপুরুষগণ ত্রিপুরার পুরাবৃত্ত সঙ্কলনে ব্রতী হইবার অন্য কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

(৩) সুন্দরবনে স্থাপিতা ত্রিপুরাসুন্দরী মূর্ত্তি দ্বারাও ত্রিপুরার সহিত উক্ত প্রদেশের সম্বন্ধ সূচিত হয়। শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয় 'সুন্দরবনের প্রাচীন

---

* রাজমালা—প্রথম লহর, ত্রিলোচন খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা। রাজরত্নাকর—দক্ষিণ বিভাগের চতুর্থ সর্গেও এ বিষয়ের উল্লেখ আছে।

† On the death of the sonless Raja of Hindamba a dispute arose as to which of his grand-sons were to occupy the vacant throne. To solve the difficulty peacefully Trilochana sent messengers to the venerated shrine of Siva on Sagar Island, to request the Priests to come and solve the difficulty."

History of Tripura--P. 11.

ইতিহাস' শীর্ষক প্রবন্ধে ত্রিপুরাসুন্দরীর উল্লেখ করিয়াছেন। * তাঁহার প্রবন্ধে অম্বুলিঙ্গের নামও পাওয়া যায়। প্রবন্ধের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

বর্ত্তমান সময়ে উক্ত প্রদেশের প্রাচীন তত্ত্বের নিদর্শনসমূহের মধ্যে ভাগীরথী নদীর পশ্চিম কূলে বড়াশীতে অম্বুলিঙ্গ, ছত্রভোগে ত্রিপুরাসুন্দরী ও অন্ধমুনি প্রভৃতি নামে কতকগুলি প্রাচীন হিন্দু তীর্থক্ষেত্র বিদ্যমান আছে।"

'ত্রিপুরাসুন্দরী' শব্দের পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে ;---

"ত্রিপুরাসুন্দরী তীর্থক্ষেত্রে এইক্ষণে ত্রিপুরা বালা ভৈরবী নাম্নী এক দারুময়ী দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। এই দেবালয়ের পুরোহিতগণ বলেন যে, উহা একটী পীঠস্থান এবং দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী শক্তি ও বড়াশীর অম্বুলিঙ্গ ভৈরব। সাধারণের বিশ্বাস, তথায় দেবীর বক্ষঃস্থল (বুকের ছাতি) পড়িয়াছিল। *** কথিত আছে যে, উক্ত ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দির বহু প্রাচীনকালে কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী কাটান দীঘি নামক স্থানে ছিল। পরে উহা তথা হইতে ছত্রভোগে স্থানান্তরিত হয়। এইক্ষণে যে দেবীগৃহ ছত্রভোগে বর্ত্তমান আছে, উহাও তথাকার প্রাচীন মন্দির নহে। ১২৭১ সালের ঝড়ে উক্ত প্রাচীন মন্দির পড়িয়া যাইবার পরে ইদানীন্তন মন্দিরগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে"।

ত্রিপুরাসুন্দরীর উপরিউক্ত বিবরণ কথিত প্রবন্ধে পাওয়া যাইতেছে। অম্বুলিঙ্গের বিবরণ বড় বেশী পাওয়া যায় না। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নীলাচল যাত্রীর পথ প্রসঙ্গে শ্রীমৎ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর উক্ত বিগ্রহের কথঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই ;—

"এইমত প্রভু জাহ্নবীর কুলে কুলে।
আইলেন ছত্রভোগ মহাকুতুহলে।।
সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হই শতমুখী।
বহিতে আছেন সর্ব্বলোকে করি সুখী।।
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।
'অম্বুলিঙ্গঘাট' করি বোলে সর্ব্বজনে।

চৈঃ ভাঃ,---অন্ত্য খঃ, ২ অধ্যায়

এই অম্বুলিঙ্গ উদ্ভবের একটী বিবরণও উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায়, সেই সুদীর্ঘ কাহিনী এ স্থলে প্রদান করা অনাবশ্যক।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, ধনপতির সিংহল যাত্রার পথের যে ভৌগোলিক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেও ত্রিপুরাসুন্দরী এবং অম্বুলিঙ্গের বিবরণ পাওয়া যায় ; নিম্নে তাহা দেওয়া যাইতেছে,---

"নাচনগাছা বৈষ্ণবঘাটা বামদিকে থুইয়া।
দক্ষিণেতে বারাশত গ্রাম এড়াইয়া।।

* ভারতবর্ষ (মাসিক পত্র)—আশ্বিন, ১৩৩২।

ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুবালা।
ছত্রভোগে উত্তরিলা অবসান বেলা।
ত্রিপুরা পূজিয়া সাধু চলিলা সত্বর।
অম্বুলিঙ্গে গিয়া উত্তরিলা সদাগর।।"

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে, কবিদ্বয়ের সময়ে ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী ছত্রভোগে ছিলেন। ইহারও পূর্ব্ববর্ত্তী ; কালে এই বিগ্রহ কাটান দীঘি নামক স্থানে থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার রচিত যশোহর খুলনার ইতিহাসে ত্রিপুরাসুন্দরীর কোনও বিবরণ প্রদান করেন নাই। তিনি অম্বুলিঙ্গের কথা বলিয়াছেন---

"শশাঙ্কের রাজত্বকালে সমতটের নানাস্থনে শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। হাতিয়াগড়ে সুপ্রসিদ্ধ অম্বুলিঙ্গ শিব, কালীঘাটে নকুলেশ্বর, দ্বিগঙ্গায় গঙ্গেশ্বর শিব, কুশদেহ যমুনাতটে, লাউপালা নামক স্থানে জলেশ্বর শিব, এই সময়ে বা তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

যশোহর খুলনার ইতিহাস---১ম খণ্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা

এই গেল অম্বুলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার কথা। ত্রিপুরাসুন্দরী কাহার প্রতিষ্ঠিতা, তাহা কেহ বলিয়াছেন, এমন জানি না। ত্রিপুর ইতিহাসে এতদ্বিষয়ক যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা পরে দেওয়া যাইবে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত বিবরণে জানা গিয়াছে যে, 'ত্রিপুরাসুন্দরী' পীঠদেবী, এবং সতীর বক্ষঃস্থল পতিত হওয়ায় এই পীঠের উদ্ভব হইয়াছে, ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু তন্ত্র চূড়ামণি, পীঠমালাতন্ত্র, দেবী ভাগবত, কালিকা পুরাণ ও শিব চরিত প্রভৃতি গ্রন্থে সুন্দরবনে পীঠ প্রতিষ্ঠার কোন কথা পাওয়া যায় না। একমাত্র কুব্জিকাতন্ত্রের সপ্তম পটলে, গঙ্গাসাগর সঙ্গমে সিদ্ধ পীঠের উল্লেখ আছে, কিন্তু দেবীর কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা এই পীঠের উদ্ভব হইবার উল্লেখ উক্ত গ্রন্থে নাই। শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ পীঠ দেবীর অঙ্গ ব্যতীতও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তন্ত্রের বিধানে যে স্থানে দেবীর উদ্দেশ্যে লক্ষ পশুবলি হইয়াছে, অথবা যে স্থানে কোটি হোম বা কোটি সংখ্যক মহাবিদ্যামন্ত্র জপ হইয়াছে, সেই স্থানকে সিদ্ধপীঠ, যথা---

"জাতোলক্ষ বলির্যত্র হোমো বা কোটি সংখ্যকঃ।
মহাবিদ্যা জপঃ কোটিঃ সিদ্ধ পিঠঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।"

তন্ত্রসার।

ইহার কোন এক কারণে সাগর সঙ্গমে সিদ্ধপীঠের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিবে। এই সিদ্ধপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম কুব্জিকাতন্ত্রের মতে 'জ্যোতির্ম্ময়ী'। এই স্থানে প্রাচীনকালে কোন মূর্ত্তি থাকিবার প্রমাণ নাই। ত্রিপুরা সুন্দরী মূর্ত্তি যে পরবর্ত্তী কালের স্থাপিতা, সম্যক বিবরণ আলোচনা করিলে ইহাই বুঝা যায়।

পীঠদেবী ত্রিপুরাসুন্দরী একমাত্র ত্রিপুরায়ই অধিষ্ঠিতা, অন্য পীঠে দেবীর এই নাম নাই। পীঠস্থানের বিবরণ সম্বলিত সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থই এক বাক্যে বলিয়াছেন---'ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদ দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী''। এরূপ অবস্থায় সুন্দর বনে অবস্থিতা দেবীর নাম 'ত্রিপুরাসুন্দরী' কেন হইল, এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা কে এবং কি সূত্রে প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ইহা অনুসন্ধানের বিষয়।

পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে, দেবীমূর্ত্তি দারুময়ী। ত্রিপুর ইতিহাসের সহিত এই প্রতিমার এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ পাওয়া যাইতেছে। 'রাজরত্নাকর' গ্রন্থে মহারাজ প্রতর্দ্দনের পৌত্র কলিন্দ নামা ভূপতির বিবরণে বর্ণিত হইয়াছে ;---

''ত্রিবেগাৎ পূর্ব্বদেশে মন্দিরম্ সুমনোহরং।
নির্ম্মায় স্থাপয়ামাস ত্রিপুরাসুন্দরী পরাং।।
চতুর্ভুজাং দারুময়ীং যথোক্ত বিধিপূর্ব্বকং।
অদ্যাপি বর্ত্ততে রাজন্ সা মূর্ত্তিঃ সুপ্রতিষ্ঠিত।''

রাজরত্নাকর---দক্ষিণ বিভাগ, ১ম সং, ৬-৭ শ্লোক।

সুন্দরবন ও সগরদ্বীপে দ্রুহ্যুর স্থাপিত রাজ্যের নাম যে, 'ত্রিবেগ' ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রাজরত্নাকরে বর্ণিত মূর্ত্তি ও সুন্দরবনের প্রতিষ্ঠিতা মূর্ত্তি অভিন্ন, ইহা অতি সহজবোধ্য। এখন এই দেবীর স্থাপয়িতার পরিচয় পাওয়া আবশ্যক।

সুন্দরবনে ত্রিপুরা সুন্দরী মূর্ত্তির স্থাপয়িতা কে

রাজরত্নাকরে পাওয়া যায়, দ্রুহ্যুর অধস্তন ২৪শ স্থানীয় মহারাজ শক্রজিৎ বা শত্রুজিৎ পর্য্যন্ত ত্রিবেগের রাজপাটে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শক্রজিতের পুত্র মহারাজ প্রতর্দ্দন কিরাত দেশ জয় করিয়া ব্রহ্মপুত্র তীরে অন্য রাজপাট স্থাপন করেন ; এখানেও রাজধানীর 'ত্রিবেগ' নাম অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছিল। কালক্রমে সেই ত্রিবেগ রাজ্যই 'ত্রিপুরা' আখ্যা লাভ করিয়াছে ; এতদ্বিষয়ক বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে। কিরাত ভূমিতে নব রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরেও অনেক কাল সুন্দরবন প্রভৃতি প্রদেশ উক্ত রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। * নববিজিত

* But so late as the 16th century the Raj stretched from Kamrup in Assam to the north up to Arakan in the south, from the Empire of Burma on the east to the then densely populated Sunderbans on the west. History of Tripura,--P.12.

কিরাত দেশে (ত্রিপুরায়) পীঠস্থান থাকিবার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে ; গ্রন্থ ভাগেও ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে। * এই পীঠ দেবীর নাম ‘ত্রিপুরা সুন্দরী।’

কিরাত-বিজয়ী প্রতর্দ্দনের পুত্র প্রমথ এবং তৎপুত্র কলিন্দ। † ইঁহারা কখনও সাগর-সঙ্গমে এবং কখনও ব্রহ্মপুত্রতীরে অবস্থান করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে ; মহারাজ কলিন্দ কর্ত্তৃক সুন্দরবনে ত্রিপুরাসুন্দরীর প্রতিষ্ঠাই তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। ত্রিবেগপতিগণ পুরুষ পরম্পর পীঠদেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন, রাজমালায় এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত বিস্তর আছে। ত্রিপুরায় বর্ত্তমান কালেও সেই ভক্তি রসের অনাবিল স্রোত সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। ব্রহ্মপুত্র তীরে অবস্থানকালে যেমন রাজ্য মধ্যে অবস্থিতা পীঠদেবীর সেবা পূজা দ্বারা আনন্দ উপভোগ করা হইত, সুন্দরবনে অবস্থানকালেও সেই শ্বাশত-আনন্দ উপভোগের অভিপ্রায়ে সেই স্থানেও ত্রিপুরাসুন্দরী মূর্ত্তি স্থাপন করা হইয়াছিল, ইহাই বুঝা যাইতেছে। এতদ্ব্যতীত ত্রিপুরায় অবস্থিতা পীঠদেবীর নামানুকরণে ত্রিপুরেশ্বর কর্ত্তৃক সুন্দরবনে দ্বিতীয় মূর্ত্তি স্থাপনের যুক্তিযুক্ত অন্য কোনও কারণ বিদ্যমান নাই। অম্বুলিঙ্গের সহিত এই দেবীমূর্ত্তির বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস, ত্রিপুরাসুন্দরী ভৈরবী এবং অম্বুলিঙ্গ ভৈরব। এই লিঙ্গ-বিগ্রহ শশাঙ্কের রাজত্বকালের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সতীশবাবু অনুমান করিয়া থাকিলেও আমরা এই বিগ্রহ এবং দেবায়তন মহারাজ কলিন্দের কীর্ত্তি বলিয়াই মনে করি। এই অনুমান ভিত্তিহীন নহে। ত্রিপুরেশ্বর কর্ত্তৃক সুন্দরবনে শিবমন্দির নির্ম্মাণের যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা অম্বুলিঙ্গের মন্দির হইবার সম্ভাবনাই অধিক। ‡

---

* রাজমালা—প্রথম লহর, ১২২ পৃষ্ঠা।

† “পরলোকং গতে তস্মিন্ মহারাজে প্রতর্দ্দনে।
তৎপুত্রঃ প্রমথো নাম নৃপাসন মথারুহৎ।।
ততো বীর্য্যেন কৃত্বাসৌ প্রবলারি পরাজয়ং।
নির্ব্বৈরং ত্রিপুরাংমত্বা সংবতৌ প্রমথো নৃপঃ।।
কলিন্দ নাম্নি তৎপুত্রে সম্ভুত্বেতচিরেণ সঃ।

রাজরত্নাকর—দক্ষিণ বিভাগ, ১ম সং, ১-৩ শ্লোক।

‡ “In ancient times there were on Sagar Island a famous Tol or Sanskrit College for Pandits and a shirne of Siva, erected by the Rajas of Tripura when their dominions spread far more Westward than they do now.”

Bengal & Assam Behar & Orrisas--Page, 463.

Compiled by Somerset Playne,

F.R.G.S.

প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র ব্যতীত স্বীয় আধিপত্যবিহীন স্থানে দেবালয় বা বিগ্রহ স্থাপন করা কোন রাজার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। অতএব এই ব্যাপারে সুন্দরবনের সহিত দ্রুহ্যু বংশের যে সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে, তাহা আধিপত্যসূচক ব্যতীত অন্য কিছু মনে করা সঙ্গত হইবে না।

দ্রুহ্যু প্রথমে যে সগর দ্বীপেই উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত বিবরণসমূহ দ্বারা তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। বিশেষত ত্রিপুর ইতিহাস এ কথা স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করিতেছে। ইহার বিরুদ্ধ মতবাদীগণের মধ্যে কেহই এরূপ সুদৃঢ় প্রমাণ প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং এই মত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের মতে সায় দেওয়া নিতান্তই অসম্ভব।

সগরদ্বীপই দ্রুহ্যুর প্রথম উপনিবেশের স্থান

ত্রিবেগ-রাজপাটের বিশুদ্ধ অবস্থান নির্ণয় করা বর্ত্তমান সময়ে সম্ভব হইবে না। কারণ, সগর দ্বীপ ও সুন্দরবনের বক্ষের উপর কত বার খণ্ড প্রলয়ের অভিনয় হইয়াছে---কতবার তদঞ্চল সাগর সলিলে নিমজ্জিত হইয়াছে, কতবার সেই সমৃদ্ধ প্রদেশ জনপ্রাণীহীন নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, তাহা সম্যক রূপে নির্ণয় করা মানব শক্তির অতীত। এই প্রদেশের এক একবার পতনের পর, শত শত বর্ষেও পুনরুত্থান সাধিত হয় নাই। এই ভাবের উত্থান পত্তন অনেকবার ঘটিয়াছে। ঝড়, ভূমিকম্প, প্লাবন এবং মঘ ও পর্ত্তুগীজদিগের অত্যাচারে এতৎ প্রদেশের বারম্বার যে রূপ অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, অন্য কোন দেশের উপর এরূপ মুহুর্ম্মুহুঃ আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক উপদ্রব সংঘটিত হইয়াছে কিনা জানা নাই। আবার এতদঞ্চলের ভূভাগ প্রাচীনকালের তুলনায় দক্ষিণ দিকে শত শত মাইল প্রসারিত হইয়াছে। অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির সমাধি ক্ষেত্রে নব নব কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এক এক স্থানের এবম্বিধ বিবর্ত্তন বহুবার ঘটিয়াছে। এই ক্ষেত্রে প্রাচীন তত্ত্বের সন্ধান লওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না।

সগরদ্বীপ ও সুন্দরবনের অবস্থা বিপর্য্যয়ের বিবরণ

সুন্দরবনের কথা ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র সগর দ্বীপের উত্থান পতনের বিবরণ আলোচনা করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। এই দ্বীপ সুন্দরবনের নিম্ন দেশে বঙ্গোপসাগরগর্ভে অবস্থিত। মহামনি কপিলের পবিত্র আশ্রম বক্ষে ধারণ করিয়া এই স্থান ধন্য হইবার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পুরাকাল হইতে এই দ্বীপ তীর্থক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত ও আদৃত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান কালেও মাঘ মাসে এই স্থানে সহস্র সহস্র যাত্রী-সমাগম হইয়া থাকে। রামায়ণে পাওয়া যায়, সূর্য্যবংশীয় সগর রাজার যষ্ঠি সহস্র তনয় মহর্ষি কপিলের কোপানলে এই স্থানে বিনষ্ট হইয়াছিলেন। ভগীরথের উগ্র তপস্যার ফলে পুণ্যসলিলা

সগরদ্বীপের উত্থান পতনের বিবরণ

ভাগীরথী ভূতলে অবতীর্ণা হইয়া তাঁহাদের উদ্ধার সাধন করেন। রঘু দিগ্বিজয় করিয়া গঙ্গাস্রোতের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপনের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, * তাহা এই সগর দ্বীপ। তদনন্তর যযাতি নন্দন দ্রুহ্যু, এই স্থানে আসিয়া মহামুনি কপিলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই কালে যে এই স্থান সমৃদ্ধ জনপদ মধ্যে পরিগণিত ছিল, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। পরবর্ত্তী কালেও ইহার অবস্থা বিশেষ উন্নত ছিল। এই স্থানের সংস্কৃত বিদ্যালয় এবং ত্রিপুরেশ্বরের স্থাপিত শিবালয় এককালে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। † কবি কঙ্কণ চণ্ডীতে শ্রীমন্ত সদাগরের সিংহল যাত্রার পথের বিবরণে এই স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়, ‡ তাহা মুসলমান রাজত্বকালের কথা। প্রতাপাদিত্যের শাসনকালে এখানে সাময়িক নৌ-বহরের আড্ডা এবং সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। কেহ কেহ প্রতাপাদিত্যকেই সদর দ্বীপের শেষ রাজা বলিয়াছেন। বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ প্রতাপাদিত্যকে চ্যাণ্ডিকানের (Chandecan) অধিপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় মহাশয়ের মতে চ্যাণ্ডিকান ও সদরদ্বীপ অভিন্ন। §

প্রতাপাদিত্যের পরবর্ত্তী কালেও সগরদ্বীপের সমৃদ্ধি কম ছিল না। এই স্থানে ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দেও দুই লক্ষ লোকের বাস থাকিবার কথা জানা যায়। সেই বৎসরই

---

* 'বঙ্গান্ উৎখায় তরসা নেতা নৌ সাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয় স্তম্ভান্ গঙ্গা স্রোতোহন্তরেষু সমঃ।।'

রঘুবংশ—৪র্থ সর্গ, ৩৬ শ্লোক।

† In ancient times there were on Sagar Island a famousr Tol or Sanskrit College for Pandits and a shrine of Siva, erected by the Rajas of Tripura.

History of Tripura--Page 11
(By E. F. Sandys)

‡ যেখানে সগর বংশ, ব্রহ্মশাপে হইল ধ্বংস
অঙ্গার আছিল অবশেষ ;
পরশি গঙ্গার জলে, বিমানে বৈকুণ্ঠে চলে
হৈয়া সব চতুর্ভুজ বেশ।
মুক্তিপদ এই স্থান, এই খানে করি স্নান
চল ভাই সিংহল নগর ;
তর্পণ করিয়া জলে, ডিঙ্গালয়ে সাধু চলে,
গাইল মুকুন্দ কবিবর।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী—শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রা।

§ প্রতাপাদিত্য—উপক্রমণিকা, ১৩৬-১৪৫ পৃঃ।

মানচিত্র - নং২

THE ORIENT INDUSTRIES

ভীষণ জলপ্লাবনে এই বিপুল জনপথ বিধ্বস্ত হইয়াছে। এই বাক্যের প্রমাণ স্থলে নিম্নোধৃত উক্তি ব্যবহৃত হইতে পারে।

Two years before the foundation of Calcutta, it (Sagor Island) contained a population of 2,00,000 souls, which in one night in 1688 was swept away by a inundation."

Calcutta Review - No. XXXVI.

মর্ম্ম ; ---কলিকাতা নগরী প্রতিষ্ঠিত হইবার দুই বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানের (সগর দ্বীপের) লোক সংখ্যা দুই লক্ষ ছিল। ১৬৮৮ খৃঃ অব্দের এক জল প্লাবনে সেই জনপদ ভাসাইয়া দিয়াছে।

রেভারেণ্ড্ জেম্‌স লঙ সাহেবও এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, প্যারিস নগরে Bibliotheque Royale এ পর্ত্তুগীজদের অঙ্কিত বঙ্গদেশের একখণ্ড মানচিত্র তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহা তিনশত বৎসরের প্রাচীন। সেই মানচিত্রে সগর দ্বীপের সমুদ্রোপকূলস্থিত পাঁচটী নগরের নাম ছিল। * এতদ্বারাও উক্ত দ্বীপের প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের প্লাবনের পরে সগরদ্বীপে আর মনুষ্য বসতি হয় নাই। † এখন এই স্থান হিংস্র জন্তু পূর্ণ নিবিড় অরণ্যে পরিণত অবস্থায় আছে। প্রতাপাদিত্যের লুপ্তপ্রায় কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ ব্যতীত বর্ত্তমানকালে সগরদ্বীপে বা সুন্দরবনে অন্য কোন উল্লেখযোগ্য প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন বড় একটা পাওয়া যায় না। এরূপ অবস্থায় দ্রুহ্যু বা তাঁহার বংশধরগণের এতদঞ্চলে বাসের বা আধিপত্য স্থাপনের প্রমাণ প্রদর্শন করা যে অসম্ভব, এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। বঙ্গীয় মানচিত্রে এই দ্বীপের বর্ত্তমান অবস্থান জানা যাইবে, কিন্তু তদ্দ্বারা প্রাচীনকালের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে ; তাহা বুঝিবার উপায়ও নাই।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণসমূহ আলোচনায় দ্রুহ্যুর সগর দ্বীপে অবস্থানের যে আভাস পাওয়া যাইতেছে, তাহার তুলনায় অন্য স্থানে উপনিবেশ স্থাপনের যুক্তি নিতান্তই দুর্ব্বল। অতএব দ্রুহ্যু সগর দ্বীপে প্রথম আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন এ কথা স্বীকার করিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইবে না।

ত্রিপুর রাজবংশ দ্রুহ্যুর সন্তান

রাজামালার বিষয়ীভূত ত্রিপুর রাজবংশ দ্রুহ্যুর সন্তান কিনা, এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিতেও কেহ কেহ কুণ্ঠিত হন নাই। ইংরাজগণের মতই এই প্রশ্নের মূল সূত্র। ইয়োরোপীয় কোন কোন মহাপুরুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অনেক লুপ্ত পুরাতত্ত্বের উদ্ধার দ্বারা আমাদের অশেষ কল্যাণ

---

* J. A. S. B.--Vol XIX

† Hunters' Statistical Accounts,--Vol I, Page 106.

সাধন করিয়াছেন। এই সহৃদয়তার জন্য ভারতবাসীগণ তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের জাতীয় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আবার ভারতের ইতিহাসকে এমনই বিকৃত করিয়াছেন যে, তাহা দেখিলে হাসিও পায়—দুঃখও হয়। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা এই শ্রেণীর ঐতিহাসিকের কার্য্য। ইঁহাদের লিখিত রামায়ণের সমালোচনার কথা উত্থাপন না করাই ভাল। অনেকে আবার অনুসন্ধানের কষ্ট লাঘবের ইচ্ছায়ও অন্যের স্কন্ধে ভর করিয়া ভ্রমবর্ত্মে পাদ বিক্ষেপ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের মত

এই শ্রেণীর আরামপ্রিয় ঐতিহাসিকগণই যুক্তি প্রমাণ না দিয়া, খামখেয়ালীভাবে ত্রিপুর রাজবংশকে তিব্বতীয় ব্রহ্মা (Tiboeto Barman) বলিয়া ঘোষণা করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। * আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, তাঁহারা এ বিষয়ে অনুমানের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছেন। এই সকল ভিত্তিহীন মতকে 'গভীর গবেষণা' বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের দেশীয় কোন কোন ঐতিহাসিক দ্বিধা বোধ করেন নাই। যদি ইংরেজ ঐতিহাসিকের কথার উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হইতেন, তবে মনে করা যাইতে পারিত যে নিজেরা এ বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহের নিমিত্ত কোন রকম চেষ্টা করেন নাই, পরের কথা লইয়াই কাজ সারিয়াছেন। কিন্তু তাহা মনে করিবারও উপায় নাই। কেহ কেহ বেদ পুরাণ ঘাটিয়া এতদ্বিষয়ক বিচারে প্রবৃত্ত হইতেও ক্রটী করেন নাই। রাজমালার সংগ্রাহক কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় তাঁহাদের একজন। তিনি বলিয়াছেন।—

ঋগ্বেদ সংহিতার চতুর্থ, সপ্তম ও অষ্টম মণ্ডলে বারংবার যযাতির পঞ্চ পুত্রের নাম উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা তদপেক্ষা প্রাচীন হইতেছেন। জগতের আদি গ্রন্থ ঋগ্বেদ অপেক্ষা প্রাচীন দ্রুহ্যু ও তাঁহার পুত্র কিরূপে ত্রিপুরায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা অবধারণ করা মানব বুদ্ধির অগম্য।"

কৈলাসবাবুর রাজমালা—১ম ভাঃ, ৪র্থ অঃ, ৩২-৩৩ পৃষ্ঠা।

ঋগ্বেদে যাঁহার নাম পাওয়া যায়, তিনি বেদ অপেক্ষা প্রাচীন হইবেন, ইহা সঙ্গত ধারণা নহে। এতদ্বারা বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব বাধিত হয়। এরূপ প্রশ্ন প্রাচীনকালেও উঠিয়াছে এবং তাহার মীমাংসাও সেইকালেই হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্র

---

* Statistical Account of Bengal--Vol VI. P. 482.

Lewins Hill Tracts of Chittagong--P. 79.

Dulton's Ethnology of Bengal--P. 109.

শায়ন ভাষ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিলেই তাহা জানা যাইতে পারে। সেই পুরাতন কথা লইয়া বাক্-বিতণ্ডা করা নিরর্থক। বিশেষতঃ এরূপ জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতে যাইয়া উপহাসাস্পদ হইবার ইচ্ছাও নাই।

দ্রুহ্যু ত্রিপুরায় উপনিবিষ্টি হইবার কথা কৈলাসবাবুর স্বকল্পিত বাক্য। স্থূল কথা, ঋগ্বেদোক্ত প্রাচীন দ্রুহ্যু ত্রিপুর রাজবংশের পূর্ব্ব পুরুষ হইতে পারেন না ইহা বলাই কৈলাসবাবুর মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনি বোধ হয় ভাবিয়া দেখেন নাই যে, ঋগ্বেদোক্ত দ্রুহ্যু ও মহাভারতের কালের দ্রুহ্যু এক ব্যক্তি বলিয়া মনে করা সঙ্গত হয় না। কল্পভেদে মহাপুরুষগণের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। * বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটির অধ্যাপক পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ তর্ক চূড়ামণি মহাশয় আমাদের পত্রের উত্তরে এতৎ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এ স্থলে তাহাই উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

১। "বেদ যদি অনাদি অপৌরুষেয় হয়, তবে বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের কাল দ্বারা পরিচ্ছেদ হইতে পারে না। দ্রুহ্যু বা তৎপুত্রগণ এই কালচক্রের একটী ক্ষুদ্র বিন্দু, তাঁহারাও বহুবার উৎপন্ন ও প্রধ্বস্ত হইয়াছেন। এই ধারাবাহিক সংসার চক্রের বিবৃতি বেদ ব্যতীত কিসে যাইতে পারে?"

২। "বেদ যদি ঈশ্বর বাক্য বলিয়া অপৌরুষেয় হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, কালত্রয়ের মধ্যে তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই। বেদে যদি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু থাকে, তাহা দোষের বা অসঙ্গতির কারণ নহে।"

এই উক্তিতেও দ্রুহ্যু প্রভৃতির বারম্বার আবির্ভারে কথা পাওয়া যাইতেছে। তদ্দারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঋগ্বেদে যে সকল মহাপুরুষের নাম পাওয়া যায়, তাঁহাদের সকলেরই বংশ লোপ হয় নাই। এরূপ স্থলে দ্রুহ্যু বংশের বিদ্যমানতা অস্বীকার করিবার কি যুক্তি থাকিতে পারে জানি না। অন্ততঃ কৈলাসবাবু কোন যুক্তি আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। "তাহা অবধারণ করা মানব বুদ্ধির অগম্য" বলিয়াই তিনি বাক্য শেষ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণের কৃপায় ত্রিপুরার ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হইয়াছে। † বুদ্ধদেব কতকালের—ত্রিপুরার ক্ষত্রিয়ত্বই বা কত কালের, তাহা তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই, ইহাই দুঃখের কথা। কৈলাসবাবু, এই বংশকে শ্যান বংশের শাখা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যে

---

* শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি ভব চার্জ্জুন।
তান্যহং দেব সর্ব্বাণি ন ত্বং বেগ পরন্তপ।।"

শ্রীমদ্ভাগবদগীতা,—৪র্থ অঃ, ৫ম শ্লোক।

† কৈলাসবাবুর রাজমালা—২য় ভাঃ, ২য় অঃ, ২৬ পৃঃ।

প্রয়াসী ছিলেন, তাহা পূর্বে বলা গিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, তাঁহার এই ব্যর্থ প্রয়াস উদ্দেশ্যমূলক। আমরা মৃত ব্যক্তির উপর এবম্বিধ দোষারোপ করিতে প্রস্তুত নহি, একথা বারম্বার বলিতেছি। তবে, তিনি যে ভুল বুঝিয়াছেন, তাহা যথাসাধ্য দেখাইতে বাধ্য হইলাম।

বিশ্বকোষ সম্পাদক মহাশয়ও বৈদেশিক মতের পক্ষপাতী। উক্ত গ্রন্থে 'ত্রিপুরা' শব্দের বিবরণে লিখিত হইয়াছে,---

বিশ্বকোষ বর্ণিত বংশ বিবরণ

"ত্রিলোচন যে বাস্তবিক চন্দ্রবংশোদ্ভব নহেন, রাজমালাও তাঁহাকে শিবৌরসজাত বলিয়া বর্ণনা করায়, তাহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। এদিকে পাশ্চাত্য গবেষণায় স্থির হইয়াছে যে, মণিপুর রাজবংশের ন্যায় ত্রিপুরার রাজবংশও শান বা লৌহিত্য বংশোদ্ভূত। অথবা যদিও চন্দ্রবংশীয় বলিতে হয়, তাহা হইলেও তাহা প্রমাণের কোন সুবিধা নাই।"

বিশ্বকোষ---৮ম ভাগ, ২০০ পৃষ্ঠা।

অন্যত্র লিখিত হইয়াছে---

"বহুকাল গবেষণার পর স্থির হইয়াছে যে, এই বংশ শান জাতি হইতে উৎপন্ন, শান জাতি লৌহিত্য বংশ নামে অভিহিত হয়। ইংরাজেরা এই জাতির ব্যাখ্যান কালে ইহাকে Tiboeto Burman বলেন।"

বিশ্বকোষ---৮ম ভাগ ১৯৮ পৃষ্ঠা।

বিশ্বকোষের এই উক্ত হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পাওয়া যাইতেছে ;---

(১) রাজমালায়, ত্রিলোচন শিবৌরস জাত বলিয়া বর্ণিত হওয়ায়, তাঁহাকে চন্দ্রবংশীয় বলিবার বাধা ঘটিয়াছে।

(২) পাশ্চাত্য গবেষণায় স্থির হইয়াছে, ত্রিপুর রাজবংশ শান বা লৌহিত্য বংশীয়।

(৩) এই বংশকে চন্দ্রবংশীয় বলিতে হইলেও প্রমাণের কোন সুবিধা নাই।

প্রথম কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে বোঝা যায়, ত্রিলোচনকে 'শিবৌরস জাত' বলিয়া যে ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহা শিবভক্ত প্রকৃতিপুঞ্জের কার্য্য। এ বিষয়ে রাজমালায় লিখিত আছে ;---

"চন্দ্রের বংশেতে জন্ম চন্দ্রের নিশান।
শিব বরে ত্রিলোচন ত্রিশূল ধ্বজ তান।"*

শিবভক্তগণের দ্বারা উদ্ধৃত পাঠের 'শিব বরে' বাক্য স্থলে "শিবৌরসে" করা হইয়াছে। সংস্কৃত রাজমালায়ও এবম্বিধ পাঠান্তর ঘটিয়াছে। সেকালে রাজ্যে শৈব ধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল, এবং শিব আরাধনার ফলস্বরূপ অরাজক ত্রিপুরার ভাবী রাজা "ত্রিলোচন" জন্মগ্রহণ করেন। এই কারণেই

---

* রাজমালা---১ম লহর, ১৮ পৃষ্ঠা।

শিবভক্ত প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহাকে শিবের পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। রাজমহিষী হীরাবতী পুত্র কামনায় যে কঠোর ব্রত উদযাপন করিয়াছিলেন, রাজমালায় তাহা বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সেই বর্ণনা পাঠ করিয়া অনেকে মনে করেন, বিধবা রাজ্ঞী শিবের কৃপায় গর্ব্ভবতী হইয়াছিলেন, মহারাজ ত্রিলোচন সেই গর্ব্ভজাত সন্তান। এই ভ্রান্ত ধারণার মূলেই বিশ্বকোষ সম্পাদক মহাশয় ত্রিলোচনকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত। এতদ্বিষয়ক রাজরত্নাকরের উক্ত আলোচনা করিলে এই ভ্রম অপনোদিত হইবে বলিয়া আশা করি। উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে, ত্রিপুর মহাদেবের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, নিহত হইয়াছিলেন, অতঃপর---

"তং হত্বাপি মহাদেবো ন শান্তস্তস্যভাবিনীং।
হিরাবতীং মহাক্রোধাদ্ধন্তুং দ্রুতমুপাগতঃ।।
রাজভার্য্যাতু পশ্যন্তী ভীমমূর্ত্তিং পিনাকিনং।
অতীব ভীতিসম্পন্না তুষ্টাব ভৃশামাকূলা।।
অন্তর্ব্বত্নীং রাজপত্নী মবলোক্য মহেশ্বরঃ।
স্ত্রীবধে ভ্রূণহত্যাপি ভবিতেতিন্যবর্ত্তত।।"

রাজরত্নাকর—দক্ষিণ বিভাগ, ৩য় সর্গ।

ইহার পর মহারাণী স্বয়ং এবং প্রকৃতিপুঞ্জ মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হওয়ায়, আশুতোষ তাহাদের তপস্যায় পরিতুষ্ট হইলেন। তখন,---

"শ্রুত্বাতু বচনং তেষাং ত্রিকালজ্ঞস্ত্রিলোচনঃ।
প্রাহ প্রতুষ্টো ভগবান্ দুঃখিতান্ ত্রিপুরৌকসঃ।।
হে বৎসা ময়ি যুষ্মাভিঃ ন বক্তব্যমিতেধিকং।
বদামি দুঃখ নাশস্য কারণং যদ্ভবিষ্যতি।।
হিরাবতী মহিষীয়ং ত্রিপুরস্য সুলক্ষণা।
পুষ্ট গর্ভাভবত্তস্যাঃ পুত্র একো ভবিষ্যতি।।
সপুত্রো মদ্বরেণৈব সর্ব্ববিদ্যা বিশারদঃ।
সদ্‌বুদ্ধিঃ সর্ব্বমান্যশ্চ মাদৃশঃ স ত্রিলোচনঃ।। ইত্যাদি

রাজরত্নাকর—দক্ষিণ বিভাগ, ৩য় সর্গ

অন্যত্র পাওয়া যাইতেছে ;---

"ত্রিপুরে চ মহীপালে মৃতে মাসত্রয়াৎ পরং।
একদা তস্য ভূপস্য পত্নী হিরাবতী কিল।।
সংস্থিতা রাজভবনে নির্ম্মিতে গিরিমূর্দ্ধনি।
যথাকালেচ মধ্যাহ্নে শুভ তিথ্যাদি সংযুতে।।
সুসুবে পুত্রমেকন্তু লোচনং ত্রিতয়ান্বিতং।
রাজ্ঞী তং বালকং দৃষ্ট্বা রাজলক্ষণ লক্ষিতং।। ইত্যাদি

রাজরত্নাকর—দক্ষিণ বিভাগ, ৪র্থ সর্গ।

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে, মহারাজ ত্রিপুরের নিধনকালে রাজমহিষী গর্ব্ভবতী ছিলেন এবং রাজার পরলোক গমনের তিন মাস পরে ত্রিলোচন জন্মগ্রহণ করেন। এই অবস্থায় তাঁহাকে শিবের পুত্র বলিবার দরুন চন্দ্রবংশের বাহিরে ফেলিবার কি হেতু থাকিতে পারে, তাহা নিতান্তই দুর্ব্বোধ্য কথা। এতৎ সম্বন্ধে ইংরেজ ঐতিহাসিকের মতও দুষ্প্রাপ্য নহে। তাহার একটী মাত্র এ স্থলে প্রদান করা যাইতেছে ;—

"Tripura had left no son to succeed him, but his widow was pregnant. Great was the grief of the innocent and disconsolate rani, and her entreaties, joined to the prayers of the Tripuras, allayed the wrath of Siva, who promised that the rani's unborn child should be a son, who would be the recipient of his godship's favour. And, as a sign, he should have on his forehead the mark of the third or central eye, a distinguishing feature of Siva. In due course Tripur's widowed rani gave birth to a posthumous son, who bore Siva's promised taken and was accordingly named Trilochana (three-eyed) in compliment to the god, one of whose names is Trayambaka, having the same meaning."

Bengal & Assam, Behar & Orissa, Page 460
Compiled by Somerset Playne, F. R. G. S.

স্থূল মর্ম্ম ;—ত্রিপুর কোন পুত্র সন্তান রাখিয়া যান নাই ; কিন্তু তখন তাঁহার বিধবা মহিষী গর্ব্ভবতী ছিলেন। রাজ্যের উত্তরাধিকারীর অভাব প্রযুক্ত নির্দ্দোষী ও শোকসন্তপ্তা মহারাণী এবং তাঁহার আত্মীয়বর্গ নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। তখন সকলে মিলিয়া আবার শিবারাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। মহাদেব, অর্চ্চনায় সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিলেন যে—তোমার গর্ব্ভস্থিত পুত্র আমার পরম ভক্ত হইবে। তাহার ললাটে মহাদেবের ন্যায় তৃতীয় চক্ষু হইবে। যথা সময়ে ত্রিপুরের বিধবা পত্নীর গর্ব্ভে শিবের বর প্রভাবে একটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। মহাদেবের ত্র্যম্বক নামানুসারে তাঁহার নাম ত্রিলোচন রাখা হইল।

মহারাজ ত্রিপুর চন্দ্রবংশীয় রাজা

ইহা রাজরত্নাকরের বাক্যেরই অনুসৃতি নহে কি? বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ যাহা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করেন, দেশীয়গণ তাহাও মানিতে চাহেন না, ইহাই বিস্ময়ের কথা! তর্কের নিমিত্ত যদি মহারাজ ত্রিলোচনকে রাজমহিষীর বৈধব্য অবস্থার সন্তান বলিয়াও স্বীকার করা যায়, তথাপি ইঁহাকে চন্দ্রবংশীয় বলিতে কি আপত্তি থাকিতে পারে, বুঝিতেছি না। বর্ত্তমানকালের সামাজিক প্রথা লইয়া ত্রিলোচন সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া কোনওক্রমেই

যুক্তিযুক্ত হইবে না। তিনি দ্বাপরের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এ স্থলে পুত্রোৎপাদন ও পুত্র গ্রহণ সম্বন্ধীয় তাৎকালিক সামাজিক নিয়ম গ্রহণ করিতে হইবে। শাস্ত্রালোচনায় দ্বাদশবিধ পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায় ;---

'ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ।
গূঢ়োৎপন্নহপবিদ্ধশ্চ দায়াদাবান্ধবাশ্চষট্।
কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ং দত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ।।"

মনুসংহিতা—১৯শ অঃ, ৫৯-৬০ শ্লোক।

ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, অববিদ্ধ, কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত ও শৌদ্র---এই দ্বাদশ প্রকার পুত্রের কথা ভগবান মনু উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সকল পুত্রের উৎপত্তি বিবরণও তাঁহার বিধানে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ক্ষেত্রজ পুত্র সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

যস্তল্পজঃ প্রমীতস্য ক্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা।
স্বধর্ম্মেণ নিযুক্তায়াং সপুত্রঃ ক্ষেত্রজঃস্মৃত।।"

এতদ্ব্যতীত পদ্মপুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে চতুর্ব্বিধ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে সপ্তবিধ পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। গরুড় পুরাণ, মার্কণ্ডেয়র পুরাণ, এবং মৎস্য পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থেও পুত্র সম্বন্ধীয় অনেক কথা আছে, এ স্থলে তাহার আলোচনা করিবার প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। একমাত্র ক্ষেত্রজ পুত্রের কথাই আমাদের আলোচ্য। মনুর বচনে পাওয়ত্রা যাইতেছে ;---পুত্রহীন অবস্থায় মৃত, নপুংসক, অথবা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির ভার্য্যা স্বধর্ম্মানুসারে গুরুজন কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া যে পুত্র উৎপাদন করে, সেই পুত্র ক্ষেত্রজ নামে অভিহিত হয়। ইহারা ঔরস-পুত্রের সমকক্ষ না হইলেও শাস্ত্রানুসারে পৈতৃক সম্পত্তির ও পিতৃশ্রাদ্ধের অধিকারী এবং পিতার কুলবর্দ্ধক হইয়া থাকে।

ইহা হইল শাস্ত্রের ব্যবস্থা, সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে সে কালে উচ্চ সমাজেও এই ব্যবস্থা সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। পাণ্ডবগণের জন্ম-কথা সকলেরই জানা আছে। বিচিত্র বীর্য্যের বিধবা পত্নীতে, বেদব্যাস কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের উৎপত্তি বিবরণও অজানিত নহে। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও প্রদান করা যাইতে পারে। ইঁহারা যদি চন্দ্রবংশীয় বলিয়া অবিসংবাদিত ভাবে গৃহীত হইতে পারেন, তবে মহারাজ ত্রিলোচনের বেলা কেন আপত্তি হইবে বুঝা যায় না। ইনি দ্বাপরের শেষভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং যুধিষ্ঠিরাদির সমসাময়িক ব্যক্তি। যাহা হউক, ত্রিলোচন যে ইঁহাদের শ্রেণীভুক্ত নহেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ; সুতরাং বিশ্বকোষের বাক্য গ্রহণীয় নহে।

দ্বিতীয় কথার আলোচনায় দেখা যায়, ত্রিপুর রাজবংশকে লৌহিত্য বংশীয় বলিবার পক্ষে ইংরেজগণের উক্তিই একমাত্র অবলম্বন ; তদ্ভিন্ন অন্য কোনও প্রমাণ নাই। দেশীয় ঐতিহাসিকের মধ্যে কৈলাসবাবুই এই উক্তি প্রথম গ্রহণ করিয়াছেন। 'Reynold's Tribes of the Eastern Frontier' অবলম্বন করিয়া তিনি ইহাও বলিয়াছেন,---

"রেইনল্ড্ সাহেব লিখিয়াছেন—আকৃতি দ্বারা তিপ্রাগণ খাসিয়াদের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি বলিয়া বোধ হয়।"*

এই সকল কথার ভিত্তি বা মূল্য না থাকিলেও অনেকে প্রকৃত তথ্য অজ্ঞাত হেতু ইহার উপর আস্থা স্থাপন করেন। প্রকৃত পক্ষে লোহিত্যগণ বিশ্বামিত্র বংশীয় ; বিশ্বামিত্র, চন্দ্রবংশীয় হইয়াও যোগবলে ব্রাহ্মণ্য গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দ লৌহিত্য বংশীয় হইলে তাহা স্বীকার করিতে অগৌরবের কথা কিছুই ছিল না। তবে কেন যে নিজের বংশ পরিত্যাগ করিয়া অন্য বংশের নামে পরিচয় দিতে প্রয়াসী হইবেন, তাহা সকলের বোধগম্য হইতে পারে না। কৈলাসবাবু রেইনল্ড্ সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া ত্রিপুরা ও কুকি প্রভৃতির সহিত রাজবংশের আকৃতিগণ সাদৃশ্য বুঝাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন ; তিনি চিন্তা করিয়া দেখেন নাই যে, নব আবিষ্কৃত নৃ-বিজ্ঞান এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যাহাদিগকে আমরা বিশুদ্ধ আর্য্য বলিয়া অবিসংবাদিত রূপে স্বীকার করিতেছি, নৃ-বিজ্ঞানের হিসাবে বাছিতে গেলে, তাহাদের বংশধরগণের মধ্যে অনেককেই আর্য্য সমাজ হইতে বাদ দিয়া অনার্য্য সমাজে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে। এই শ্রেণীর অপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া জাতি বিশেষের উপর মত প্রকাশ করিতে যাওয়া সকল স্থলে সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ ত্রিপুর রাজবংশীয় ব্যক্তিবর্গের আকৃতি সম্বন্ধে পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে রাজমালা যাহা বলিয়াছেন, কৈলাসবাবু তাহা দেখিয়াও দেখেন নাই। নিম্নে সেই বিবরণ দেওয়া যাইতেছে---

"অবশ্য শরীরে চিহ্ন রহে ত তাহার।
গৌরবর্ণ শ্বেত গৌর লক্ষণ হয় তার।।
অতিদীর্ঘ নাহি হয় নহে অতি খর্ব্ব।
অভিরূপ মত উচ্চ দর্প মহাগর্ব্ব।।
দীর্ঘ খর্ব্ব নহে নাসা কর্ণ পরিমিত।
বদন বর্ত্তুল প্রায় দীর্ঘ কদাচিত।।

---

* কৈলাসবাবুর রাজমালা—১ম ভাগ, ৩য় অঃ, ১৭ পৃঃ।

গজস্কন্ধ, বৃষস্কন্ধ, সিংহস্কন্ধ হয়।
বৃহৎ হৃদয়, বড় উদর না হয়।।
মহাবল পরাক্রম বেগবন্ত বড়।
কদলির তুল্য জানু জঙ্ঘা মনোহর।।
মল্লবিদ্যা অভ্যাসেতে বাহু স্থূল হয়।
যেন শাল বৃক্ষ দৃঢ় জানিয় নিশ্চয়।।
তেজবন্ত, শুদ্ধ শান্ত দেখিতে আকার।
নিশ্চয় জানিয় তাকে ত্রিপুর কুমার।।
হরিহর দুর্গা প্রতি দৃঢ় ভক্তি যার।
ত্রিপুর বংশতে জন্ম নিশ্চয় তাহার।।”

এই বর্ণনা নৃ-বিজ্ঞানের হিসাবে কোন্ ভাগে পড়িতেছে? ইহা আর্য্যের বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের অবিকল চিত্র নহে কি? এ বিষয়ে এতদতিরিক্ত কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। এতদ্দারা বিশ্বকোষের এবং কৈলাসবাবুর উক্তি ব্যর্থ হইতেছে।

বিশ্বকোষের তৃতীয় কথা কিছু অদ্ভূত রকমের। ত্রিপুর রাজবংশকে চন্দ্রবংশীয় বলিতে হইলেও প্রমাণের কোনও সুবিধা নাই, সুতরাং লৌহিত্য বলাই সুবিধাজনক! বিশেষতঃ ইহা সাহেবী মত, সুতরাং প্রমাণ থাকুক আর নাই থাকুক, গ্রহণ করিতেই হইবে। বাল্যকালে অনেকের বিশ্বাস থাকে, ছাপার হরপে মুদ্রিত শব্দ বা বর্ণ ভুল হইতে পারে না; বর্ত্তমানকালে, সাহেবী লেখাও অনেকের মতে তদ্রূপ নির্ভুল যাহা হউক, ত্রিপুর রাজবংশ যে দ্রুহ্যুর বংশধর, তদ্বিষয়ে পূর্ব্বে অনেক কথা বলা হইয়াছে; অতঃপরও ধারাবাহিক রূপে তাহা দেখানো যাইবে।

সচরাচর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, লোকের বা সমাজের প্রাচীন বদ্ধমূল সংস্কার সমূহ আলোচনা দ্বারা তাহাদের পিতৃপুরুষগণের রীতি নীতি ও ব্যবহারের খাঁটি নিদর্শন উদ্ধার করা যাইতে পারে। পুরাতন তথ্য উদ্ঘাটনের নিমিত্ত এই পন্থাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ক্লার্ক সাহেব ও টড্ সাহেব প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই উপায় অবলম্বন দ্বারা অনেক স্থলেই সাফল্য লাভ করিয়াছেন। রাজমালা এবং রাজরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনায় দান, যজ্ঞ, দেববিগ্রহ ও দেবায়তন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি যে সকল প্রাচীন সংস্কারের নিদর্শন ত্রিপুর রাজবংশে পাওয়া যায়, তদ্দ্বারাও এই প্রাচীন বংশের আর্য্যত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। সেই সকল সংস্কার যে পুরুষ পরম্পরাগত, পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থসমূহ আলোচনা করিলে তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে।

আর একটি কথা বলিবার রহিয়াছে। চন্দ্রবংশ উত্তরোত্তর বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে যযাতির জ্যেষ্ঠ তনয় যদুর বংশ বিবরণ উল্লেখযোগ্য। এই বংশ ভট্টি, জারিজা প্রভৃতি আটটি শাখায় বিভক্ত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও যদুকুলে আবির্ভূত হইয়া এই

চন্দ্রবংশের শাখা বিভাগ

কুল পবিত্র করিয়াছেন। 'তোমর' বা 'তুয়ার'কে যদু বংশের অন্যতম শাখা বলিয়া অনেক ঐতিহাসিক স্বীকার করিয়াছেন। চাঁদ কবির মতে তোমর কুল পাণ্ডুবংশের শাখা বিশেষ। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মতই বিশেষ প্রবল এবং প্রসিদ্ধ। আবুল ফজল, কনিংহাম প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ এই বংশের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তোমরগণ এককালে রাজস্থানের ষট্‌ত্রিংশৎ রাজকুলের মধ্যে সর্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিলেন। উজ্জয়িনীর অধীশ্বর রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য এবং দিল্লীশ্বর অনঙ্গপাল তোমর কুলের সমুজ্জ্বল রত্ন। অনঙ্গপালের পর তদ্বংশীয় বিশজন নরপতি ক্রমান্বয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিয়াছেন। দ্বিতীয় অনঙ্গপালের সময় দিল্লীর দুর্গ (লালকোট) নির্ম্মিত হইয়াছে। তোমর বংশের শেষ রাজা তৃতীয় অনঙ্গপাল অপুত্রক থাকায়, তাঁহার দৌহিত্র চৌহান বংশীয় পৃথ্বীরাজকে সিংহাসন দান করেন। এই অনঙ্গপালের পরলোক গমনের সঙ্গেই তোমর বংশের গৌরব-রবি চিরঅস্তমিত হইয়াছে। এখন আগ্রা, ঝান্সি ও ফরাক্কাবাদ প্রভৃতি স্থানে মুষ্টিমেয় তোমর বংশীয়গণ নিষ্প্রভ ভাবে বাস করিতেছেন।

যযাতি নন্দন দ্রুহ্যু, পৈতৃক রাজধানী প্রতিষ্ঠানপুর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অনেক পরে চন্দ্রবংশের পূর্ব্বোক্ত শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই কারণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, দ্রুহ্যু-সন্তানগণ সেই সকল শাখার সহিত পুরুষানুক্রমিক সম্বন্ধান্বিত নহেন, কিন্তু ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ রহিয়াছে। তন্মধ্যে যাদবগণই দ্রুহ্যু বংশীয়দিগের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি। সুতরাং, যদুবংশীয় তোমর শাখার সহিত দ্রুহ্যু সন্তানদিগের সম্বন্ধ যে সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ, ইহা অতি সহজবোধ্য। বর্ত্তমান কালে ত্রিপুরা ব্যতীত অন্য কোথাও দ্রুহ্যু বংশীয়গণের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

বংশ তালিকা

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রাজমালা মহারাজ দৈত্যের শাসনকালের বিবরণ লইয়া আরম্ভ হইয়াছে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গের বিবরণ এই গ্রন্থে নাই। সম্ভবতঃ ত্রিপুরায় এই রাজবংশের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সময় লইয়া রাজমালা রচিত হইয়াছিল। একমাত্র রাজরত্নাকরে এই বংশের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল হইতে যে বংশ তালিকা রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, এই বংশের বিবরণ সংগ্রহ পক্ষে তাহাও বিশেষ সাহায্যকারী। ধারাবাহিক বিবরণ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বংশের শাখা-প্রশাখা বাদ দিয়া, কেবল রাজগণের ক্রমিক তালিকা এ স্থলে প্রদান করা যাইতেছে। পূর্ণ বংশাবলী দ্বিতীয় লহরে দেওয়া হইবে।

ত্রিপুর রাজন্যবর্গের ধারাবাহিক তালিকা

(নামের বাম পার্শ্বের অঙ্ক, রাজগণের ক্রমিক সংখ্যা জ্ঞাপক)

ত্রিপুর রাজবংশ যযাতি নন্দন দ্রুহ্যু হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকিলেও সম্যক বিবরণ জ্ঞাপনের অভিপ্রায়ে চন্দ্রমা দেব হইতে পুরুষানুক্রমিক তালিকা প্রদান করা হইল।

১। চন্দ্র।
২। বুধ।
৩। পুরূরবা। *
৪। আয়ু।
৫। নহুষ।
৬। যযাতি। †
৭। দ্রুহ্যু।
৮। বভ্রু।
৯। সেতু।
১০। আনর্ত্ত (আরব্ধ বা আরদ্বান)।
১১। গান্ধার।
১২। ধর্ম্ম (ঘর্ম্ম)।
১৩। ধৃত (ঘৃত)।
১৪। দুর্ম্মদ।
১৫। প্রচেতা।
১৬। পরাচি (শতধর্ম্ম)।

১৬।
১৭। পরাবসু।
১৮। পারিষদ।
১৯। অরিজিৎ।
২০। সুজিৎ (অসুজিৎ)।
২১। পুরূরবা (২য়া)।
২২। বিবর্ণ।
২৩। পুরুসেন।
২৪। মেঘবর্ণ।
২৫। বিকর্ণ।
২৬। বসুমান।
২৭। কীর্ত্তি।
২৮। কনীয়ান্।
২৯। প্রতিশ্রবা।
৩০। প্রতিষ্ঠ।
৩১। শত্রুজিৎ (শত্রুজিৎ)।

* ইনি পিতা কর্ত্তৃক প্রয়াগের পরপারস্থিত প্রতিষ্ঠান নগরে প্রতিষ্ঠিত হন। এইস্থানে বর্ত্তমানকালে 'কুসী' নামে পরিচিত। পুরূরবা চন্দ্রবংশীয় প্রথম রাজা।

† ইনি পিতা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত ও নির্ব্বসিত হইয়া, পৈতৃক রাজধানী প্রতিষ্ঠান নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গাসাগর সঙ্গমস্থলে কপিল মুনির আশ্রম সগর দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ ও তৎপ্রদেশে রাজ্য বিস্তার করেন।

৩১।
৩২। প্রতর্দ্দন। *
৩৩। প্রমথ।
৩৪। কালন্দ।
৩৫। ক্রম (ক্রথ)।
৩৬। মিত্রারি।
৩৭। বারিবর্হ।
৩৮। কার্ম্মুক।
৩৯। কলিঙ্গ (কালাঙ্গ)।
৪০। ভীষণ।
৪১। ভানুমিত্র।
৪২। চিত্রসেন (অঘ চিত্রসেন)।
৪৩। চিত্ররথ।
৪৪। চিত্রায়ুধ।
৪৫। দৈত্য।
৪৬। ত্রিপুর। †
৪৭। ত্রিলোচন। ‡
৪৮। দাক্ষিণ।

৪৮।
৪৯। তয়দাক্ষিণ (তৈদাক্ষিণ)।
৫০। সুদাক্ষিণ।
৫১। তরদাক্ষিণ।
৫২। ধর্ম্মতরঃ (ধর্ম্মতর)।
৫৩। ধর্ম্মপাল।
৫৪। সধর্ম্মা (সুধর্ম্ম)।
৫৫। তরবঙ্গ।
৫৬। দেবাঙ্গ।
৫৭। নবাঙ্গিত।
৫৮। ধর্ম্মাঙ্গদ।
৫৯। রুক্মাঙ্গদ।
৬০। সোমাঙ্গদ (সোনাঙ্গদ)
৬১। নৌযুগরায় (নৌগযোগ)।
৬২। তরজুঙ্গ।
৬৩। রাজধর্ম্মা (তররাজ)।
৬৪। হামরাজ।
৬৫। বীররাজ।

---

* ইনি সগরদ্বীপ রাজপাট হইতে, কাছাড়ে যাইয়া নবরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হন। ইঁহার প্রযত্নেই কিরাতদিগকে জয় করিয়া বর্ত্তমান ত্রিপুর রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে।

† ইঁহার সময় হইতে ত্রিপুর রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছে। এবং ইনিই রাজ্যের ত্রিপুরা নামের প্রবর্ত্তক।

‡ ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দৃকপতি কাছাড়ে মাতামহের রাজ্য লাভ করায়, দ্বিতীয় পুত্র দাক্ষিণ ত্রিপুরার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

৬৫।
৬৬। শ্রীরাজ।
৬৭। শ্রীমান (শ্রীমন্ত)।
৬৮। লক্ষ্মীতরু।
৬৯। রূপবান্ (তরলক্ষ্মী)।
৭০। লক্ষ্মীবান্ (মাইলক্ষ্মী)।
৭১। নাগেশ্বর।
৭২। যোগেশ্বর।
৭৩। নীলধ্বজ (ঈশ্বর ফা)। *
৭৪। বসুরাজ (রঙ্গখাই)।
৭৫। ধনরাজ ফা।
৭৬। হরিহর (মুচং ফা)। †
৭৭। চন্দ্রশেখর (মাইচোঙ্গ ফা)।
৭৮। চন্দ্ররাজ (তাভুরাজ বা তরুরাজ)।
৭৯। ত্রিপলি (তরকনাই)।
৮০। সুমন্ত।

৮০।
৮১। রূপবন্ত (শ্রেষ্ঠ)।
৮২। তরহোম (তরহাম)।
৮৩। হরিরাজ (খাহাম)।
৮৪। কাশীরাজ (কতর ফা)।
৮৫। মাধব (কালাতর ফা)।
৮৬। চন্দ্ররাজ (চন্দ্র ফা)।
৮৭। গজেশ্বর।
৮৮। বীররাজ (২য়)।
৮৯। নাগেশ্বর (নাগপতি)।
৯০। শিখিরাজ (শিক্ষরাজ)।
৯১। দেবরাজ।
৯২। ধূসরাঙ্গ (দুরাশা বা ধরাঈশ্বর)।
৯৩। বারকীর্ত্তি (বীররাজ বা বিরাজ)।
৯৪। সাগর ফা।
৯৫। মলয়চন্দ্র।

৯৬। সূর্য্যনারায়ণ (সূর্য্যরায়)

৯৭। ইন্দ্রকীর্ত্তি (অচঙ্গফণাই বা উত্তঙ্গফণী)।

৯৮। বীরসিংহ (চরাচর)।

৯৯। সুরেন্দ্র (হাচুংফা বা আচংফা)।

---

* ইঁহার সময় হইতে রাজগণ 'ফা' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

† এই সময় হইতে রাজগণের মধ্যে অনেকে হালাম ভাষার এক একটী নাম গ্রহণ করিতেন। বর্ত্তমান রাজবংশের আধিপত্য বিস্তারের পূর্ব্বে ত্রিপুরায় হালাম জাতির প্রভুত্ব ছিল ; রাজগণের হালাম ভাষায় নাম গ্রহণ করিবার এবং বিষয় বিশেষে হালাম ভাষা প্রচলিত থাকিবার ইহাই কারণ।

৯৯

১০০। বিমার।

১০১। কুমার।

১০২। সুকুমার।

১০৩। বীরচন্দ্র (তৈছরাও বা তক্ষরাও)।

১০৪। রাজ্যেশ্বর (রাজেশ্বর)।

১০৫। নাগেশ্বর (ক্রোধেশ্বর বা মিছলিরাজ)।

১০৬। তৈছং ফা (তেজং ফা)।

১০৭। নরেন্দ্র।

১০৮। ইন্দ্রকীর্ত্তি।

১০৯। বিমান (পাইমারাজ)।

১১০। যশোরাজ।

১১১। বঙ্গ (নবাঙ্গ)।

১১২। গঙ্গারায় (রাজগঙ্গা)।

১১৩। চিত্রসেন (শুক্ররায় বা ছাক্রু রায়)।

১১৪। প্রতীত।

১১৫। মরীচি (মিছলি, মালছি বা মরুসোম)।

১১৬। গগন (কাকুথ)

১১৭। কীর্ত্তি (নওরাজ বা নবরায়)

১১৮। হিমতি (যুঝারু ফা বা হামতার ফা)

১১৯। রাজেন্দ্র (জঙ্গি ফা বা জনক ফা)।

১২০। পার্থ (দেবরাজ বা দেবরায়)।

১২১। সেবরায় (শিবরায়)।

১২১।

১২২। কিরীট (আদিধৰ্ম্ম ফা, ডুঙ্গুরু ফা দানকুরু ফা বা হরিরায়)। *

১২৩। রামচন্দ্র (খারুং ফা বা কুরুঙ্গু ফা)।

১২৪। নৃসিংহ (ছেংফণাই বা সিংহফণী)।

১২৫। ললিত রায়।

১২৬। মুকুন্দ ফা (কুন্দা ফা)।

১২৭। কমল রায়।

১২৮। কৃষ্ণ দাস।

১২৯। যশোরাজ (যশ ফা)।

১৩০। উদ্ধব (মোচং ফা)।

১৩১। সাধুরায়।

১৩২। প্রতাপ রায়।

১৩৩। বিষ্ণুপ্রসাদ।

১৩৪। বাণেশ্বর (বাণীশ্বর)।

১৩৫। বীরবাহু।

১৩৬। সম্রাট।

১৩৭। চম্পকেশ্বর (চাম্পা)।

১৩৮। মেঘরাজ (মেঘ)।

১৩৯। ধৰ্ম্মধর (ছেংকাছাগ্)।

১৪০। কীর্ত্তিধর (ছেংথুম ফা বা সিংহতুঙ্গ ফা)।

১৪১। রাজসূর্য্য (আচঙ্গ ফা বা কুঞ্জহোম ফা)।

১৪২। মোহন (খিচুং ফা)।

১৪৩। হরিরায় (ডাঙ্গর ফা)।

---

* ইঁহার সম্পাদিত দান পত্রে "ধৰ্ম্ম পা" লিখিত হইয়াছে।

১৪৩।

১৪৪। রাজা ফা।   ১৪৫। রত্নফা (রত্নমাণিক্য)। *

১৪৬। প্রতাপ মাণিক্য।   ১৪৭। মুকুট মাণিক্য (মুকুন্দ)।

১৪৮। মহামাণিক্য।

১৪৯। ধর্ম্মমাণিক্য (২য়)।   কচুফা (গগন ফা বা পুরন্দর)

১৫০। প্রতাপমাণিক্য।   ১৫১। ধন্যমাণিক্য। (ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির)

১৫২। ধ্বজমাণিক্য।   ১৫৩। দেবমাণিক্য।

১৫৪। ইন্দ্রমাণিক্য।   ১৫৫। বিজয়মাণিক্য।

১৫৭। উদয়মাণিক্য। †   ১৫৬। অনন্তমাণিক্য।

১৫৮। জয়মাণিক্য। †

১৫৯। অমরমাণিক্য (রামদাস)।

১৬০। রাজধর মাণিক্য।

১৬১। যশোধর মাণিক্য।

১৬২। কল্যাণ মাণিক্য।

১৬৩। গোবিন্দ মাণিক্য। ‡   ১৬৪। ছত্র মাণিক্য (নক্ষত্র রায়)   জগন্নাথ ঠাকুর।

---

* এই সময় হইতে ত্রিপুরেশ্বরগণ 'মাণিক্য' উপাধি ধারণ করিয়াছেন।

† ১৫৭ ও ১৫৮ সংখ্যক রাজাদ্বয় ভিন্ন বংশীয়।

‡ ইনি ভ্রাতা ছত্রমাণিক্য (নক্ষত্র রায়) কে রাজত্ব প্রদান পূর্ব্বক আরাকান গমন করিয়াছিলেন। ছত্রমাণিক্যের পরলোক গমনের পর পুনর্ব্বার রাজ্য লাভ করেন। ইঁহার কীর্ত্তি কণিকা লইয়া 'রাজর্ষি' ও 'বিসর্জ্জন' রচিত হইয়াছে।

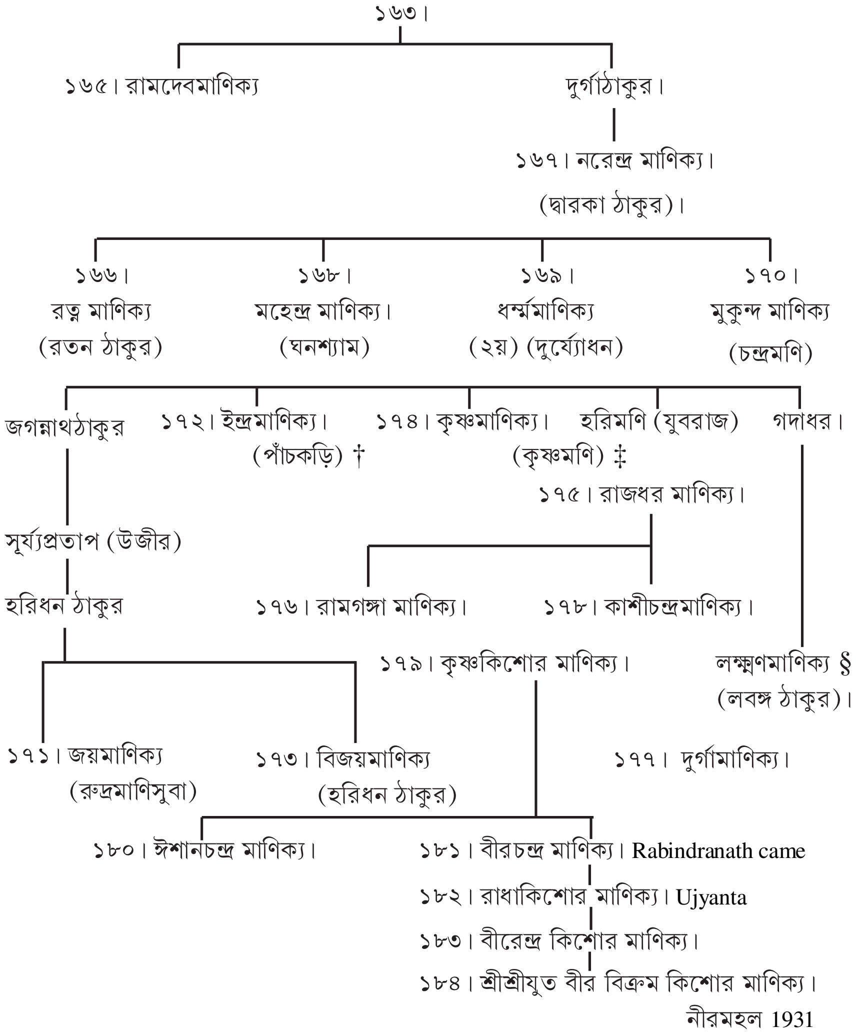

* ১৬৯ সংখ্যক ধর্ম্মমাণিক্যের পর, ছত্রমাণিক্যের বংশধর 'জগতরায়' মুসলমান শাসন কর্ত্তা হইতে সনন্দ গ্রহণ করিয়া জগৎমাণিক্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সিংহাসন লাভ করিতে পারেন নাই, অল্প কালের জন্য জমিদারী দখল করিয়াছিলেন।

† ১৭১/১৭২ সংখ্যক সমসাময়িক রাজা। এতদুভয়ের মধ্যে কলহকালে সুযোগ পাইয়া ধর্ম্মমাণিক্যের পুত্র গঙ্গাধর 'উদয়মাণিক্য' নাম গ্রহণ পূর্ব্বক কুমিল্লায় আসিলেন। তিনি অল্পকালের মধ্যেই ঢাকায় ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন।

‡ ইহার পরলোক গমনের পর তাঁহার মহিষী মহারাণী জাহ্নবী মহাদেবী দুই বৎসর কাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

§ ইনি সমসের গাজি কর্ত্তৃক ত্রিপুরায় নামমাত্র রাজা হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে যে তালিকা দেওয়া হইল, তন্মধ্যে চন্দ্র হইতে চিত্রায়ুধ পর্য্যন্ত ৪৪ জনের নাম বা বিবরণ রাজমালায় নাই। ৪৫ সংখ্যক রাজা দৈত্য হইতে রাজমালা আরম্ভ হইয়া থাকিলেও ইঁহার নাম মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে, বিশেষ কোনও বিবরণ প্রদান করা হয় নাই। চন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র বিবরণ জানিতে হইলে রাজরত্নাকরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ত্রিপুর রাজবংশ দ্রুহ্যু হইতে প্রবর্ত্তিত। অতএব দ্রুহ্যু হইতে মহারাজ দৈত্য পর্য্যন্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাজরত্নাকর অবলম্বনে প্রদান করা যাইতেছে।

দ্রুহ্যু---ইতি ভারত সম্রাট যযাতির তৃতীয় পুত্র। পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া যে পথ অবলম্বন করিয়া, যে অবস্থায় গঙ্গার সাগরসঙ্গম সন্নিহিত সগর দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইনি ভগবান কপিলের নির্দ্দেশানুসারে তথায় 'ত্রিবেগ' নামক এক নব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু পিতৃশাপের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করিলেন না। * দ্রুহ্যু পার্শ্ববর্ত্তী অনেক জনপদ জয় করিয়া স্বীয় রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কিয়ৎকালে রাজ্য ভোগের পর বার্দ্ধক্যে ভগবচ্চিন্তায় নিযুক্ত থাকিয়া, স্বকীয় পুণ্যোচিত লোক গমন করিলেন।

দ্রুহ্যুর বিবরণ

বভ্রু---পুণ্য শ্লোক দ্রুহ্যুর পরলোক গমনের পর, তদীয় পুত্র বভ্রু পিতৃ রাজ্যের আধিপত্য লাভ করিলেন। বভ্রুর ঔদার্য্য ও শৌর্য্যাদি গুণে মুগ্ধ হইয়া মহর্ষি কপিল তাঁহাকে রাজোপাধি প্রদান করিলেন। † তদবধি তাঁহার বংশধরগণ রাজা আখ্যায় পরিচিত হইয়াছেন। কথিত আছে, অমিততেজা বভ্রু সংগ্রামে নির্ভীক এবং নিরতিশয় প্রভাবশালী ছিলেন; এমনকি, পুরাতত্ত্বে তিনি দেবাসুর বিজেতা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। ইনি স্বীয় ভুজবলে ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া, উৎকল প্রদেশান্তর্গত বৈতরণীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগের রাজন্যবর্গকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া স্বীয় করদ-রাজ

বভ্রুর বিবরণ

---

* "স্থাপয়ামাস তত্রৈব ত্রিবেগ নগরীং শুভাম্।
প্রভাবমান ভূত্তত্র রাজ শব্দ তিরোহিতঃ।।
স দোর্দ্দণ্ড প্রতাপেন বহুদেশান্ বশে নয়ন্।
পালয়ামাস ধর্ম্মেণ প্রজা আত্ম প্রজা ইব।।"
রাজরত্নাকর—পূর্ব্ব বিভাগ, ৬ষ্ঠ সর্গ, ২১-২২ শ্লোক।

† "দ্রুহ্যু পুত্রস্ততো বভ্রুঃ কপিলস্য প্রসাদতঃ।
পিতর্য্যুপরতে ধীরো রাজাখ্যানমুপেষিবান।।"
রাজরত্নাকর—৭ম সর্গ ; ১ম শ্লোক।

শ্রেণীতে পরিণত করেন। এতদ্ভিন্ন সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী ভূপালগণ বভ্রুর বিপুল বিক্রম সন্দর্শনে ভীত হইয়া বিনা যুদ্ধেই বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। * সুশাসন গুণে বভ্রু প্রকৃতিপুঞ্জের অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাজন হইয়াছিলেন। কথিত আছে, দেবোপম নৃপতিকে, অনুরক্ত প্রকৃতিপুঞ্জের অদেয় কিছুই ছিল না। এমনকি, মৎস্যজীবীগণও রত্নাকরের গর্ভে প্রাপ্ত দুষ্প্রাপ্য রত্নরাজি স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া, তাহা রাজার প্রাপ্য জ্ঞানে অম্লান চিত্তে তাঁহার চরণে উৎসর্গ করিত, অধিকন্তু, দুর্দ্দমনীয় রাক্ষসদিগকে পরাভূত করিয়া বভ্রু অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। † এই কারণে, রাজকোষ প্রচুর ধনরত্নে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত।

রাজচক্রবর্ত্তী বভ্রু, বিবিধ ঐশ্বর্য্য গৌরবে বিভূষিত হইয়া কতিপয় বৎসর রাজ্যে সুখ উপভোগ করিবার পর তাঁহার সর্ব্ব সুলক্ষণ যুক্ত এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন, তাঁহার নাম রাখা হইল---সেতু। স্বীয় প্রতিভাবলে রাজকুমার সেতু অল্পকাল মধ্যেই সমস্ত বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে মহারাজ বভ্রু, সুশিক্ষিত ও রাজনীতি বিশারদ পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন।

সেতুর বিবরণ

সেতু;---সেতু পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, সমদৃষ্টি সহকারে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। তিনি কদাপি রাজধর্ম্ম বিগর্হিত নীতির বশবর্ত্তী হন নাই। কুলগুরুর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল, গুরুর আদেশ গ্রহণ ব্যতীত তিনি কোন কার্য্যই করিতেন না। ধর্ম্মপরায়ণ সেতু সর্ব্বদা সদ্‌গুরু হইতে রাজনীতি, ধর্ম্ম নীতি ও সমাজ নীতি প্রভৃতি বিষয়ে সদুপদেশ লাভ করিয়া ধার্ম্মিক নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। রাজার অনুকরণ করা প্রকৃতি পুঞ্জের পক্ষে স্বাভাবিক ; তাঁহার শাসনকালে, রাজ্য মধ্যে ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত সকলেই যত্নবান ছিল।

---

* ভাগীরথীং সমারভ্য যাবদ্ বৈতরণী নদীম্।
সর্ব্বান্নৃপগণাংশ্চক্রে করদান্ বিগ্রহাদিভিঃ।
ভয়াদ্ ভূপতয়ঃ সর্ব্বে জ্ঞাত্বা তস্য পরাক্রমম্।
রত্নাকরোপকূলস্থাঃ স্বীচক্রুস্তস্য শাসনম্।।"
রাজরত্নাকর—৭ম সর্গ, ৩-৪ শ্লোক।

† "ধীবরা বহবো দক্ষা মুক্তারত্নাদিকং বহু।
প্রণতাঃ সমুপাজহ্রুমূর্দ্দে তস্য মহাত্মনঃ।।
জিত্বা রক্ষোগণান্ সর্ব্বান্ বহ্বৈশ্বর্য্যসংযতুঃ।
সম্পূ জিতো জনৈঃ সর্ব্বৈর্বুভুজে বিষয়ান্ বহূন্।।"
রাজরত্নাকর—৭ম সর্গ, ৫-৬, শ্লোক।

কিয়ৎকাল পরে মহারাজ সেতু, আরদ্বান * নামক পুত্রকে উত্তরাধিকারী বিদ্যমান রাখিয়া অনন্তধামে গমন করিলেন।

আরদ্বান ;---সেতু-পুত্র আরদ্বান পিতার ন্যায় বিবিধ গুণালঙ্কৃত ছিলেন। তিনি সিংহাসন লাভ করিয়া, অল্পকাল মধ্যেই সুশাসন গুণে প্রকৃতিপুঞ্জের শ্রদ্ধার ভাজন হইলেন। তাঁহার শাসন কালে জনসাধারণ প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী ও সৎক্রিয়ান্বিত হইয়া, নিরুদ্বেগে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

আরদ্বানের বিবরণ

আরদ্বান অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবলোক ও পিতৃলোকের সন্তোষ বিধান করিয়াছিলেন। অনন্তর, তাঁহার গান্ধার নামক এক সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ক্রমে রাজকুমার পরিণত বয়স্ক হইলে, মহারাজ আরদ্বান রাজ্য ও পরিবার বর্গের ভার পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন। তিনি অবশিষ্ট জীবন অরণ্যস্থিত পর্ণকুটীরে, যোগ সাধনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

গান্ধার ;—গান্ধার পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়া, পূর্ব্বপুরুষগণের প্রবর্ত্তিত প্রণালী অবলম্বনে শাসন কার্য্য পরিচালনে প্রবৃত্ত হইলেন। মহর্ষি কপিলের উপদেশানুসারে, মহারাজ গান্ধার, রাজধানী ত্রিবেগ নগরে অগ্নিদেবের উপাসনা (অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ) আরম্ভ করেন। † রাজার দৃঢ় ব্রতে পরিতুষ্ট হইয়া বৈশ্বানর স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন। অগ্নিদেব রাজাকে অভিলাষিত বর প্রার্থনা করিতে বলায়, তিনি ধনুর্ব্বিদ্যা লাভের প্রার্থনা জানাইলেন। ভগবান্ অগ্নিদেব হৃষ্টচিত্তে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। ‡

গান্ধারের বিবরণ

গান্ধার ধনুর্ব্বিদ্যা লাভের পর পররাষ্ট্র জিগীষু হইয়া প্রতিনিয়ত যুদ্ধ কার্য্যে রত থাকিতেন। তাঁহার ভুজবলে ভাগীরথী ও পদ্মার বিচ্ছেদ স্থান পর্য্যন্ত

---

* বিষ্ণুপুরাণে সেতুর পুত্রের 'আরদ্বান' নাম পাওয়া যায়। রাজরত্নাকরেও এই নামই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে সেতুর পুত্র 'আরব্ধ' নামে অভিহিত হইয়াছেন। লিপিকার প্রমাদই ইহার কারণ বলিয়া মনে হয়।

† "পিতুঃ সিংহাসনং লব্ধা মহর্ষীণাং নিদেশতঃ।
অগ্নেরুপাসনাঞ্চক্রে ত্রিবেগনগরে নৃপঃ।।"
রাজরত্নাকর—৮ম সর্গ, ১ শ্লোক।

‡ "বৈশ্বানরস্ততঃ প্রাহ শ্রূয়তাং ভক্তিপূর্ব্বকম্।
কথয়ামি ধনুর্ব্বেদং ভবজজ্ঞান বিবর্দ্ধনম্।।"
রাজরত্নাকর—৮ম সর্গ, ৫ শ্লোক।

রাজ্যের সীমা প্রসারিত হইয়াছিল। † গৌড় রাজধানীর সন্নিহিত রাজমহলের পূর্ব্বদিকে দশ ক্রোশ অন্তরে গঙ্গা ও পদ্মা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। গান্ধার গঙ্গার সাগরসঙ্গম স্থানে বসিয়া এতদূর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তৎকালে ভাগীরথীর সাগর সঙ্গতা হইবার স্থান যে বর্ত্তমান স্থান হইতে অনেক উত্তরে ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার অধিকৃত সমগ্র ভূভাগ 'ত্রিবেগ' আখ্যা লাভ করিয়াছিল। গান্ধার কেবল ঐ স্থান পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াই নিরস্ত হন নাই। তিনি উত্তর ভারতে, সিন্ধু নদের তীরবর্ত্তী স্থানেও আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। গান্ধার দেশ যে এই মহাপুরুষের নামেরই স্মৃতি বহন করিতেছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সুদূর পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত 'গান্ধার বট্ট' নামের কথাও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য।

গান্ধার প্রবল পরাক্রমের সহিত দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করিয়া ধর্ম্ম নামধেয় সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্রের হস্তে রাজ্য সমর্পণ পূর্ব্বক যোগসাধনোদ্দেশ্যে বনবাসী হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মের বিবরণ

ধর্ম্ম---গান্ধার তনয় ধর্ম্ম পিতৃ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, রাজধর্ম্মানুমোদিত প্রণালী অবলম্বনে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি ধনুর্ব্বেদে পিতার ন্যায় প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক, সদাচারী, প্রজাবৎসল এবং দয়া ও ন্যায়বান রাজার শাসন গুণে ত্রিবেগ রাজ্য সুখ শান্তিময় হইয়াছিল। তিনি কদাচ ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যে লিপ্ত হন নাই। রাজরত্নাকরের মতে তিনি পান, অক্ষক্রীড়া, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, লোভ, দর্প, নৃশংসতা, বৃথা আলাপ, ভৃত্যগণের সহিত হাস্য-পরিহাস, পরদ্রোহিতা, পরনিন্দা, বিলাস, দীর্ঘসূত্রিতা, মোহ, গর্ব্ব, আলস্য, নিষ্ফল-তর্ক, স্ত্রৈণ, অস্থৈর্য্য, কার্পণ্য, চাঞ্চল্য, অনৃত ভাষণ প্রভৃতি দোষ হইতে সর্ব্বদা অন্তরে থাকিতেন। এবং ধর্ম্ম, অর্থ, দণ্ড-নীতি, দেবদ্বিজে ভক্তি, শক্তির সম্মান এবং কুলপ্রথার মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত নিয়ত যত্নবান ছিলেন। এই ভাবে কিয়ৎকাল রাজ্য শাসন করিবার পর বার্দ্ধক্যে ধৃত নামক পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া মহারাজ ধর্ম্ম বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন।

ধৃত ;---পিতৃ আসনে অভিষিক্ত হইয়া মহারাজ ধৃত প্রকৃতিপুঞ্জকে পুত্রের

---

† "যাবদ্ ভাগীরথী পদ্মা বিচ্ছেদং স নরাধিপঃ।
তাবদ্ বিস্তারয়ামাস রাষ্ট্রং ত্রিবেগ সংজ্ঞিতম্।।"
রাজরত্নাকর—৮ম সর্গ, ১১০ শ্লোক।

ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন। তিনি বাল্যকালে, চ্যবনমুনির প্রসাদে সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ হইয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যালাভ সম্বন্ধে রাজরত্নাকর বলেন ;---

ধৃতের বিবরণ

"সামর্গযজুরথর্ব্বাখ্যা বেদাশ্চোপনিষদ্গণাঃ।
শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষাংগতিঃ।।
চ্ছন্দোহভিধানং মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণকম্।
ন্যায় বৈদ্যক গান্ধর্ব্বং ধনুর্ব্বেদার্থ শাস্ত্রকম্।।
অষ্টাঙ্গযোগ শাস্ত্রঞ্চ রসশাস্ত্রমতঃপরম্।
এতানি চ্যবনাদিভ্যোহধিজগে বাল্যকালতঃ।।"

রাজরত্নাকর---৯ম সর্গ, ১৪-১৬ শ্লোক।

মহারাজ ধৃত সুখ্যাতির সহিত দীর্ঘকাল রাজ্য পালন করিয়া অন্তিম কালে বহুবিধ ধর্ম্মকার্য্য সাধন পূর্ব্বক অনন্তধামে গমন করিলেন।

দুর্ম্মদ ;---মহারাজ ধৃত স্বর্গলাভ করিবার পর তৎপুত্র দুর্ম্মদ রাজ্যাধিকারী হইলেন। ইনি পিতার ন্যায় ধার্ম্মিক এবং প্রজানুরক্ত ছিলেন। একদা রাজা গঙ্গাস্নানে যাইয়া, দৈবানুগ্রহে তথায় চ্যবন মুনির দর্শন লাভ করিলেন এবং মুনির মুখ নিঃসৃত গঙ্গা মাহাত্ম্য শ্রবণে নিজকে ধন্য মনে করিলেন। তিনি মুনি পুঙ্গবের উপদেশানুসারে রাজ্য পালন ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে জীবনাতিবাহিত করিয়াছিলেন।

দুর্ম্মদের বিবরণ

প্রচেতা ;---দুর্ম্মদেব পরলোক প্রাপ্তির পর, তদাত্মজ প্রচেতা রাজ্য লাভ করিলেন। তিনি বাল্যকালে কুলগুরু ভগবান কপিলের নিকট বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া বিশিষ্ট জ্ঞানে বিভূষিত হইয়াছিলেন। * তিনি রাজত্ব করিতেন, কিন্তু রাজ্য সুখে আসক্ত ছিলেন না। তাঁহার সংগৃহীত রাজকরের অর্দ্ধাংশ প্রকৃতিপুঞ্জের হিতকল্পে এবং অবশিষ্টের এক-তৃতীয়াংশ স্বজন বর্গের ভরনপোষণে ব্যয়িত হইত। ব্যয়াবশিষ্ট টাকা কোষে রক্ষিত হইবার ব্যবস্থা ছিল। প্রচেতার পরাচি প্রমুখ শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বার্দ্ধক্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া মহারাজ প্রচেতা দিব্যলোকে গমন করিলেন।

প্রচেতার বিবরণ

---

* "স রাজা বাল্যতো বেদানধীত্য কপিলাশ্রমে।
বিষয়েষু বিরক্তোহভুৎ পরমার্থবিদ্যাং বরঃ।।"

রাজরত্নাকর---৯ম সর্গ, ৪১ শ্লোক।

পরাচি ;---প্রচেতার পর, জ্যেষ্ঠপুত্র পরাচি ত্রিবেগের অধীস্বর হইলেন। তিনি ক্ষত্রিয়োচিত ধনুর্বের্বদাদিতে পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে রাজ্য সুখ শান্তিময় হইয়াছিল। বাহুবল, ভ্রাতৃবল ও সৈন্যবলে বলীয়ান হইয়া পরাচি সর্ব্বদা দিগ্বিজয় বাসনা অন্তরে পোষণ করিতেন।

পরাচির বিবরণ

একদা মহারাজ পরাচি চিরপোষিত বাসনা পূর্ণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি ভাবিলেন দিগ্বিজয় যাত্রা অতীব বিপদ সঙ্কুল। যদি প্রত্যাগমন ভাগ্যে না ঘটে তবে রাজ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা ঘটিবার আশঙ্কা থাকিবে। এই আশঙ্কা নিবারণ কল্পে, স্বীয় পুত্র পরাবসুকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া, ঊনশত ভ্রাতা সহ দিগ্বিজয় কামনায় উত্তরাভিমুখে অভিযান করিলেন। * পরাচি ম্লেচ্ছদেশে উপনীত হইয়া বিপুল বিক্রমে ম্লেচ্ছ ভূপাল বৃন্দকে পরাভূত ও তদ্দেশে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিলেন। এই ম্লেচ্ছ বিজয়ের কথা বিষ্ণু পুরাণে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা ;---

"প্রচেতসঃ পুত্রশতমধর্ম্ম বহুলানাং মুদীচ্যাদীনাং ম্লেচ্ছাদীনামাধিপত্য মকরোৎ।"

বিষ্ণুপুরাণ—৪র্থ অংশ, ১৭শ অধ্যায়।

টীকাকার শ্রীধর স্বামী এই বাক্যের বিবৃতি উপলক্ষে বলিয়াছেন ;—

"এতেন যযাতি শাপ পরিনামো ম্লেচ্ছভাবঃ সূচিতঃ। (শ্রীধর স্বামী)।

বিষ্ণুপুরাণ—৪র্থ অংশ, ১৭শ অধ্যায়।

এই বাক্যে পাওয়া যাইতেছে, পরাচি ভ্রাতৃবর্গসহ ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়া, উদীচ্যাদি দেশ অধিকার ও তথায় রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজরত্নাকরে পাওয়া যায়, পরাচি কিম্বা তাঁহার ভ্রাতাগণের মধ্যে কেহই ত্রিবেগ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তথায় পরাচি নন্দন পরাবসুর আধিপত্যই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছিল।

পরাবসু ;---পরাচির দ্বিগ্বিজয় যাত্রার পর পরাবসু পিতৃ আসনে উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন পিতার অমিত দানের ফলে রাজকোষ শূন্য হইয়াছে। তাঁহার অসাধারণ যত্ন ও চেষ্টায় অল্পকাল মধ্যে ভাণ্ডারে প্রভূত অর্থ সঞ্চিত হইল। তিনি সর্ব্বদা প্রাজ্ঞ ও প্রবীণ মন্ত্রীবর্গে পরিবেষ্টিত থাকিতেন। তাঁহার শাসন গুণে রাজ্য সুখ শান্তিপূর্ণ ও সর্ব্ববিষয়ে

পরাবসুর বিবরণ

---

* "এবং সঞ্চিন্তয়ন্ রাজা পরাচিনিজমানসম্।
পরাবসু সমাখ্যায় তনয়ায় প্রদত্তবান্।।
ততঃ পরাচিরনুজৈঃ সহোনশত সংখ্যকৈঃ।
বিজয়ায় দিশাং বীর ঔদীচ্যাভিমুখো যযৌ।।"
রাজরত্নাকর—৯ম সর্গ ৪৯-৫০ শ্লোক।

সুসমৃদ্ধ হইয়াছিল। তিনি নির্ব্বিবাদে দীর্ঘকাল প্রজা পালন করিয়া, বার্দ্ধক্যে পুত্র পারিষদের হস্তে রাজ্যভার অর্পণান্তে যোগ সাধনের নিমিত্ত বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

পারিষদের বিবরণ

পারিষদ ;---পারিষদ রাজ্য লাভ করিয়া স্বীয় বাহুবলে বিপক্ষ দলন এবং রোগ ও দারিদ্র্য নিবারণ দ্বারা রাজ্য সুখ শান্তিময় করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল রাজ্য শাসনের পর, পুত্র অরিজিৎকে উত্তরাধিকারী বিদ্যমান রাখিয়া স্বর্গলাভ করিলেন।

অরিজিতের বিবরণ

অরিজিৎ ;---মহারাজ অরিজিতের দয়া-দাক্ষিণ্য ও শৌর্য্যাদি গুণে প্রজাবর্গ এবং সামন্ত রাজগণ পরিতুষ্ট ও অতিশয় বাধ্য ছিলেন। যথাসময় রাজার পুত্র না হওয়ায়, তিনি ক্ষুব্ধ মনে মহামুনি কপিলের শরণাপন্ন হইলেন। মহর্ষির বরে তিনি বৃদ্ধ বয়সে এক পুত্ররত্ন লাভ করেন, তাঁহার নাম রাখা হইল—সুজিৎ। ইহার কিয়ৎকাল পরে নৃপতি অরিজিৎ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

সুজিতের বিবরণ

সুজিৎ ;---মহারাজ সুজিৎ রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে রাজ্য শান্তিময় ছিল। তিনি দীর্ঘকাল রাজৈশ্বর্য্য উপভোগের পর, বার্দ্ধক্যে পুত্র পুরূরবাকে রাজ্যভিষিক্ত করিয়া অনন্তধামে গমন করিলেন।

পুরূরবার বিবরণ

পুরূরবা ;---পুরূরবার রাজত্বকালে রাজ্যে সুখ শান্তির অভাব ছিল না। এই সময় রাজা-প্রজার মধ্যে এক সুদুর্ল্লভ পবিত্র প্রীতিভাব সংস্থাপিত হইয়াছিল। রাজা সর্ব্বদা ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের উপদেশানুসারে রাজকার্য সম্পাদনা করিতেন। বিবিধ যজ্ঞ, দান-দক্ষিণাদি দ্বারা তিনি অক্ষয়কীর্ত্তি ও অসাধারণ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। বার্দ্ধক্যে পুত্র বিবর্ণকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া মহারাজ পুরূরবা নৈমিষারণ্যে গমনপূর্ব্বক বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বনে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

বিবর্ণের বিবরণ

বিবর্ণ ;---বিবর্ণ ধার্ম্মিক এবং নীতিজ্ঞ ভূপতি ছিলেন। তিনি প্রজাবর্গকে পুত্রের ন্যায় পালন করিতেন। তাঁহার বিদ্যা, বাহুবল, বৈভব, সমস্তই রাজ্যের মঙ্গলার্থে নিয়োজিত হইত। বিবর্ণ পরিণত বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার পুত্র পুরুসেন রাজ্যাধিকারী হইলেন।

পুরুসেনের বিবরণ

পুরুসেন ;---পুরুসেন বিনীত এবং সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ছিলেন। তিনি পূজনীয় বৃদ্ধ, পণ্ডিত, মিত্র, সামন্ত, সচিব ও পিতৃবন্ধু প্রভৃতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। দেব-দ্বিজের প্রতি তাঁহার অসাধারণ ভক্তি ছিল।

মহারাজ পুরুসেন অযোধ্যাপতি রাজচক্রবর্তী দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে আহূত হইয়া বহুবেদজ্ঞ ঋষি ও প্রভূত সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিয়াছিলেন। *

মহারাজ বিস্তর ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান ও সুখ শান্তি উপভোগ করিয়া বার্দ্ধক্যে মর্ত্তলোক পরিত্যাগ করিলেন।

মেঘবর্ণ ;---পুরুসেনের লীলা সম্বরণের পর তদাত্মজ মেঘবর্ণ ত্রিবেগের অধিপতি হইলেন। তিনি সত্যব্রতপরায়ণ, দেব-দ্বিজে ভক্তিমান, এবং অসাধারণ ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। তাঁহার শাসন গুণে দ্বিজগুণ স্বধর্ম্মপরায়ণ, প্রকৃতিপুঞ্জ ধর্ম্মানুরক্ত এবং রমণীকুল পতিভক্তি পরায়ণা ছিল। দেবতা ও ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা, অতিথি সেবা, জলাশয় খনন প্রভৃতি পুণ্যকার্য্য সাধারণের নিত্য করণীয় ছিল। রাজ্য ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ ছিল। সেকালে ত্রিবেগের রাজধানী শৌর্য্য, বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যে ইন্দ্রের অমরাবতী তুল্য ছিল। সৈনিক দল বীর্য্যবান এবং সমরকুশল ছিল। বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ও গ্রন্থাগার স্থাপনাদি জনহিতকর কার্য্যে রাজার বিশেষ আগ্রহ ছিল।

মেঘবর্ণের বিবরণ

মহারাজ মেঘবর্ণ অকৃতদার ছিলেন। তৎকালে চেদি রাজ্যের অধীশ্বর মহাবল বীরবাহু, সুদক্ষিণা নাম্নী সর্ব্ব সুলক্ষণসম্পন্না কন্যার নিমিত্ত সুযোগ্য পাত্রের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। এই সময় ঘটনাক্রমে বিন্ধ্যাচলাশ্রমী মহর্ষি জাবালি রাজসকাশে উপনীত হইলেন। তিনি রাজার মনোগতভাব অবগত হইয়া বলিলেন, "তোমার লক্ষ্মীস্বরূপা কন্যার একমাত্র যোগ্যবর দ্রুহ্যকুল সমুদ্ভূত, ত্রিবেগপতি মহারাজ মেঘবর্ণ। তিনি শান্ত, দান্ত, বদান্য, ক্ষমাশীল, উদার, জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, প্রজারঞ্জনকারী, দেব-দ্বিজে ভক্তিমান, অনাথ ও দরিদ্রের আশ্রয়দাতা, সৌম্যমূর্ত্তি, বীর্য্যবান এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্। তিনিই সর্ব্বতোভাবে তোমার কন্যার উপযুক্ত বর, তাঁহার হস্তে কন্যা সমর্পণ করাই শ্রেয়কর বলিয়া মনে করি।" রাজার অনুরোধে মহির্ষ জাবালি মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিবাহের প্রস্তাব সুস্থির করিলেন এবং মহারাজ মেঘবর্ণ স্বয়ংবর সভায় উপনীত হইয়া রমণীকুল ললাম সুদক্ষিণাকে লাভ করিলেন।

---

* "অযোধ্যাগমনদ্বীমান্ স্বসৈন্যৈঃ পরিবেষ্টিতঃ।
ঋষিভির্য্যোগিভি সার্দ্ধং যজ্ঞে দশরথস্য সঃ।।
রাজ্ঞা দশরথে নায়ং পুরুসেনঃ প্রপুজিতঃ।
দৃষ্টা বহূনি তীর্থানি প্রত্যায়াতঃ স্বকং পুরম্।।
রাজরত্নাকর—৯ম সর্গ, ৮৬।৮৭ শ্লোক।

কথিত আছে, এই স্বয়ংবর সভায় দেবরাজ ইন্দ্র প্রমুখ অনেক দেবতা কন্যা লাভের অভিলাষে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ত্রিদিব পতি ভগ্নমনোরথ ও অপমানিত হইয়া, মেঘবর্ণকে ব্রজাঘাতে নিহত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

একদা মহারাজ মেঘবর্ণ মৃগয়া ব্যপদেশে বনে গমন করেন। তৎকালে প্রবল ঝড়বৃষ্টি দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া অনুচরবর্গ চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল, এদিকে নিঃসহায় ও বিপন্ন মেঘবর্ণ বিজনবনে বজ্রাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। ঝঞ্ঝাবাত প্রশমিত হইবার পর অনুচরবর্গ প্রভুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার মৃহদেহ দেখিতে পাইল, এবং শোকার্ত্ত হৃদয়ে সেই প্রাণহীন কলেবর লইয়া রাজধানীতে উপনীত হইল। রাজমহিষী সহমরণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাঁহার ক্রোড়ে রাজ্যের উত্তরাধিকারী শিশু কুমার বিদ্যমান থাকায়, কুলগুরু মহারাণীকে সেই সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিলেন। রাজোচিত সমারোহে রাজার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাহিত হইল।

বিকর্ণ ;—রাজার আকস্মিক মৃত্যুতে রাজ্য অরাজক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। সচিবগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া, শিশু রাজতনয় বিকর্ণকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। রাজার ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম না হওয়া পর্যন্ত মন্ত্রীবর্গ রাজ কার্য্য পরিচালনা করিলেন ; বিকর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে রাজ্যে কোন রূপ অশান্তি বা উপদ্রব ঘটে নাই। তিনি পুত্র বসুমানকে বিদ্যমান রাখিয়া যথা সময়ে পরলোক গমন করিলেন।

বিকর্ণের বিবরণ

বসুমান ;—বসুমান রাজ্য লাভ করিয়া সুশাসন গুণে অল্পকাল মধ্যেই প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যে দারিদ্র্য, অসত্য ব্যবহার, দস্যুভয় প্রভৃতি উপদ্রবের লেশমাত্রও ছিল না। কিন্তু অধিককাল রাজ্য সুখ উপভোগ করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। তিনি যৌবনেই কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন।

বসুমানের বিবরণ

কীর্ত্তি ;—বসুমানের পর তৎপুত্র কীর্ত্তি পিতৃরাজ্য লাভ করিলেন। ইঁহার দ্বারা পূর্ব্ব পুরুষগণের অর্জ্জিত নির্ম্মল যশঃরাশি মলিন হইয়াছিল। ইনি অপর্য্যাপ্ত ব্যসনামোদি, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, পরস্ত্রী-লোলুপ এবং ব্যভিচারী ছিলেন। প্রজাগণের দুঃখ মোচনের যত্নপর হওয়া দূরের কথা, তিনিই প্রকৃতিপুঞ্জের বিবিধ দুঃখের ও আশঙ্কার হেতু হইয়া দাঁড়াইলেন। মহারাজ কীর্ত্তি অসংখ্য রমণী পরিবৃত হইয়া নিরন্তর নির্জ্জনে বাস করিতেই ভালবাসিতেন। এইরূপে রাজ্য

মহারাজ কীর্ত্তির বিবরণ

নানাবিধ অশান্তি ও উপদ্রবে পূর্ণ করিয়া, মহারাজ কীর্ত্তি অকালে পরলোক গমন করিলেন।

কণিয়ান ;---মহারাজ কীর্ত্তি লোকান্তরিত হইবার পর, তৎপুত্র কণিয়ান, ত্রিবেগের রাজতক্তে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইনি ধীর, ধার্ম্মিক, প্রজারঞ্জক এবং অতিশয় দয়ালু ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে রাজ্যে রোগ, অন্নকষ্ট বা দারিদ্র্য ছিল না। তিনি সুশাসনের দ্বারা প্রকৃতিপুঞ্জের সর্ব্ববিষয়ে শ্রীবৃদ্ধি করিয়া, যথাকালে অনন্তধামে গমন করিলেন।

কণিয়ানের বিবরণ

প্রতিশ্রবা ;—মহারাজ কণিয়ানের পর তৎপুত্র প্রতিশ্রবা রাজ্যাধিকারী হইলেন। ইতি পিতার সর্ব্ববিধ গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার রাজ্য শাসন স্পৃহা অপেক্ষা ধর্ম্মানুরাগই অধিক ছিল। শেষ জীবনে তিনি পুত্র প্রতিষ্ঠের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

প্রতিশ্রবার বিবরণ

প্রতিষ্ঠ ;---মহারাজ প্রতিষ্ঠ ধার্ম্মিক এবং সদ্‌গুণালঙ্কৃত রাজা ছিলেন। তিনি বিবিধ যজ্ঞ সম্পাদন দ্বারা দেব ও পিতৃলোকের তুষ্টি বিধান করিয়া পরিণত বয়সে স্বর্গে গমন করেন। তৎপুত্র শত্রুজিত সিংহাসনে সমাসীন হইয়াছিলেন।

মহারাজ প্রতিষ্ঠের বিবরণ

শত্রুজিত ;---ইনি প্রজা পালনে তৎপর ছিলেন। নিয়ত ধর্ম্মকর্ম্মে ও নীতি অনুশীলনে সময়াতিবাহিত করিতেন। ইতি শৌর্য্য বীর্য্যে এবং দয়া দাক্ষিণ্যে সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার প্রতর্দ্দন নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রকে রাজোচিত সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা করাইয়া, তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমে প্রেরণ করা হয়। রাজনন্দন প্রতর্দ্দন, নানাতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপনীত হইলেন। মহর্ষি তাঁহাকে সস্নেহে অভিপ্সীত যাবতীয় বিদ্যা প্রকৃষ্ট রূপে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। পুত্র সুশিক্ষিত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর, মহারাজ তাঁহাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক অবশিষ্ট জীবন বদরিকাশ্রমে অতিবাহিত করিলেন।

মহারাজ শত্রুজিতের বিবরণ

প্রতর্দ্দন ;---মহারাজ প্রতর্দ্দনের রাজত্বকালে বহুবিধ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছিল। তাঁহার কার্য্যাবলীর মধ্যে 'কিরাতদেশ বিজয়' বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

প্রতর্দ্দনের বিবরণ

প্রতর্দ্দন বিদ্যাভাস উদ্দেশ্যে কৌশিকাশ্রমে গমনকালে পুণ্যসলিল ব্রহ্মপুত্র তটস্থ

জনৈক ব্রাহ্মণের মুখে ব্রহ্মপুত্র মাহাত্ম্য, সুবিশাল কিরাত রাজ্যের বিবরণ এবং তদন্তর্গত পীঠস্থানের মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার হৃদয়ে কিরাত জয়ের আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরিত হয়। প্রতর্দ্দন পাঠ সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার পোষিত বাসনার কথা পিতৃ সমক্ষে নিবেদন করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণ শত্রুজিত নানাবিধ উপদেশ বাক্য দ্বারা পুত্রকে এই দুরূহ কার্য্যে প্রতিনির্বৃত্ত করেন। পিতৃভক্ত প্রতর্দ্দন পিতার অলঙ্ঘনীয় আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সে বিষয়ে নিরস্ত ছিলেন। কিন্তু বিশাল ত্রিবেগ রাজ্যের অধিকার লাভ করিবার পর, তাঁহার যাপ্য লালসা পুনরুদ্দীপ্ত হইল। তিনি বিপুল বাহিনী-সহ কিরাতের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন।

মহারাজ প্রতর্দ্দন লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) নদের পশ্চিম তীরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়া তিন দিবস অতিবাহিতি করিলেন। চতুর্থ দিবসে তিনি ব্রহ্মপুত্রের পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া শিবির সন্নিবেশ এবং ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে কিরাত রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই ঘটনায় কিরাতগণ নিরতিশয় ক্ষুদ্ধ ও ক্রুদ্ধ হইল। তৎপ্রদেশের নায়কগণ প্রচুর সৈন্যবল সংগ্রহ করিয়া প্রতর্দ্দনের বিরুদ্ধে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া প্রতিপক্ষের সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। বিপক্ষের বিক্রম ও অসম-সাহসিকতা মহারাজ প্রতর্দ্দনের বিস্ময়কর হইয়াছিল। এই যুদ্ধে তাঁহাকে বিস্তর আয়াস ও ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। চতুর্দ্দশ দিবসব্যাপী অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর বিজয়লক্ষ্মী মহারাজ প্রতর্দ্দনের অঙ্কশায়িনী হইলেন। কিরাতগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রতর্দ্দনের বশ্যতা স্বীকার করিল।

ব্রহ্মপুত্র নদের নামান্তর কপিলা হইলেও কপিল নামক অন্য এক নদীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এই নদী গৌহাটীর কিঞ্চিৎ উপরে ব্রহ্মপুত্রে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। পার্জিটার (Pargiter) সাহেবের মতে ইহার প্রাচীন নাম 'কৃপা' নদী। এতদুভয় নদীর সম্মিলন স্থানে প্রতর্দ্দন নব বিজিত রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। এই রাজধানীও ত্রিবেগ নামে আখ্যাত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মপুত্র ও কপিলের সন্নিহিত আর একটী নদী ছিল, তাহা এখন মজিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের মতে তিনটী নদীর সান্নিধ্যস্থল বলিয়া রাজধানীর নাম 'ত্রিবেগ' হইয়াছিল। সুন্দরবনস্থ রাজধানীর 'ত্রিবেগ' নামের কথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। প্রাচীন রাজধানীর নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ হওয়াই অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্য কিরাত দেশে স্থাপিত হইয়া থাকিলেও সমস্ত কিরাত ভূমি এই রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হয় নাই। কিরাত দেশের বিস্তৃতি অনেক বেশী। তাহার কিয়দংশ প্রতর্দ্দনের রাজ্য ভুক্ত হইয়াছিল।

এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের সীমা সম্বন্ধে রাজমালার প্রাচীন পুথিসমূহের পাঠ পরস্পর অনৈক্য দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত রাজমালায় লিখিত আছে ;---

"যস্য রাজ্যস্য পূর্ব্বাস্যাং মেখলিঃ সীমতাং গতঃ।
পশ্চিমস্যাং কাচবঙ্গোদেশঃ সীমতি সুন্দরঃ।।
উত্তরে তৈয়ঙ্গ নদী সীমতাং যস্য সঙ্গতা।
আচরঙ্গ নাম রাজ্যে যস্য দক্ষিণ সীমতঃ।।
এতন্মধ্যে ত্রিবেগাখ্যাং দ্রুহ্যুরাজ্যং * সুশাসিতং।"

প্রাচীন রাজমালায় রাজ্যের সীমা সম্বন্ধে লিখিত আছে ;---

"ত্রিবেগ স্থলেতে রাজা নগর করিল।
কপিল নদীর তীরে রাজ্যপাট কৈল।।
উত্তরে তৈউঙ্গ নদী দক্ষিণে আচরঙ্গ।
পূর্ব্বে মেখলি সীমা পশ্চিমে কাচরঙ্গ।।

গ্রন্থান্তরে পাওয়া যায় ;---

'ত্রিবেগ স্থলেতে রাজা নগর করিল।
কপিলা নদীর তীরে রাজ্যপাট ছিল।।
উত্তরে তৈরঙ্গ নদী দক্ষিণে আচরঙ্গ।
পূর্ব্বেতে মেখলি সীমা পশ্চিমে কোচ রঙ্গ।"

অন্যগ্রন্থের পাঠ এইরূপ ;---

"উত্তরে তৈরঙ্গ নদী দক্ষিণে আচরঙ্গ।
পূর্ব্বেতে মেখলি সীমা পশ্চিমে কোচ রঙ্গ।।"

আর এক গ্রন্থে নিম্নোধৃত পাঠ পাওয়া যাইতেছে ;---

"রাজধানী হইল কপিল নদী তীরে।
* * * * *
উত্তরে তৈরঙ্গ হতে দক্ষিণে আচরঙ্গ।
পূর্ব্বেতে মেখলি সীমা পশ্চিমে ভাচরঙ্গ।।"

উত্তর সীমায় কোন গ্রন্থে তৈরঙ্গ নদী, কোন গ্রন্থে তৈয়ঙ্গ বা তৈউঙ্গ নদী লিখিত আছে। এই পার্থক্য যে লিপিকার প্রমাদবশতঃ ঘটিয়াছে, তাহা অতি সহজবোধ্য। ত্রিপুরা ভাষায় জলকে 'তুই' বলে। 'উঙ্গ' প্রকর্ষার্থদ্যোতক। 'তুই-উঙ্গ' শব্দ দ্বারা প্রশস্ত জলরাশি, অর্থাৎ পবিত্র বা বৃহৎ নদীকে বুঝায়। এই 'তুই-উঙ্গ' বিকৃত হইয়া, তৈয়ঙ্গ ও তৈরঙ্গ প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে, ইহাই বুঝা যায়। প্রকৃত শব্দ যাহাই হউক, ইহা যে ব্রহ্মপুত্র নদের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই নদ দ্বারাই রাজ্যের উত্তর সীমা নির্দ্ধারিত

---

* 'দ্রুহ্যুরাজ্য' শব্দ দ্বারা দ্রুহ্যু বংশীয়ের রাজ্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

ছিল। সকল গ্রন্থেই দক্ষিণ সীমায় 'আচরঙ্গ' নাম পাওয়া যায়। এই আচরঙ্গ ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী রাঙ্গামাটির (উদয়পুরের) সন্নিহিত। * বর্ত্তমান সময়ে এই স্থান 'আচলং' নামে পরিচিত। একটী নদীর নাম হইতে তৎপরবর্ত্তী স্থানের এই নাম হইয়াছে। পূর্ব্বে 'মেখলি' শব্দও সকল গ্রন্থে পাওয়া যায়। আসামীগণ মণিপুর রাজ্যকে মেখলি দেশ বলে। পূর্ব্বদিকে এই রাজ্য ত্রিপুরার প্রত্যন্ত দেশ ছিল। পশ্চিম সীমায়ই গোলমাল কিছু বেশী। কাচরঙ্গ, কোচরঙ্গ, কাচবঙ্গ, কোচবঙ্গ, ভাচরঙ্গ প্রভৃতি শব্দের মধ্যে কোন্‌টী বিশুদ্ধ, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ 'কোচরঙ্গ' পাঠ গ্রহণ করিয়া থাকেন, কোচরাজ্য ও রঙ্গপুর তাঁহাদের লক্ষ্যস্থল। এই পাঠ দ্বারা রাজ্যের পশ্চিমসীমা নির্দ্দেশ করা যাইতে না পারে এমন নহে। কোচরাজ্য কাছাড়ের সন্নিহিত ছিল, রাজমালায়ই তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় এবং রঙ্গপুর বঙ্গদেশের অন্তর্গত। তবে সংস্কৃত রাজমালায় 'কাচবঙ্গ' এবং বাঙ্গালা কোন কোন গ্রন্থের 'কোচবঙ্গ' পাঠ অনুসারে কোচরাজ্য ও বঙ্গদেশকে পশ্চিম সীমা বলিয়া নির্দ্ধারণ করাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এই হিসাবে কিরাত দেশের যে অংশ ত্রিবেগ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এ স্থলে সন্নিবেশিত মানচিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইল।

সকল গ্রন্থেই পাওয়া যাইতেছে, 'কপিলা নদীর তীরে' রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কোন কোন পুরাণের মতে ব্রহ্মবিল হইতে সমুদ্ভূত ব্রহ্মপুত্র ও কপিলা নদী অভিন্ন। † ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। জয়ন্তিয়া পর্ব্বতের উত্তর প্রান্ত বাহিনী কপিলি বা কপিলা নামে আর একটী নদীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তাহা ব্রহ্মপুত্রের উপনদী। এই নদী গৌহাটির কিঞ্চিৎ উজানে, ২৫৫° উত্তর লঘিমা এবং ৯২৩১° পূর্ব্ব দ্রাঘিমায়, জয়ন্তিয়া পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া

---

* রাজমালায় কল্যাণমাণিক্য খণ্ডে পাওয়া যায় ;—

ত্রিপুর ভূম আচরঙ্গ দক্ষিণ সীমা।
তারপরে রাঙ্গামাটী করিল আপনা।।
উদয়পুর পূর্ব্ব উত্তর কোণে আচরঙ্গ।
ত্রিপুর রাজার থানা জানে সর্ব্ব বঙ্গ।।

† কজ্জলাচল শৈলাত্তু পূর্ব্বস্মিঞ্ছ্র পর্ব্বতঃ।
তৎপূর্ব্বস্যাৎ মহাদেবী নদী কপিল গঙ্গিকা।।
কামাখ্যা নিলয়াৎ পূর্ব্বং দক্ষিণস্যাং তথাদিশি।
বিদ্যতে মহদাবর্ত্তুং ভুবি ব্রহ্মবিলং মহৎ।।
তস্মাদায়াতি সা নদী সিতাম্ভোহপম তোয়ভাক্।।

কালিকাপুরাণ,—৮১ অধ্যায়।।

নওগাঙ্গ জেলার মধ্য দিয়া, কলং নদীর সহিত মিলিতভাবে ব্রহ্মপুত্রের সহিত সঙ্গ তা হইয়াছে। এই নদী দ্বারা বর্ত্তমান নওগাঙ্গ ও কাছাড় জেলা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এই কপিলি এবং রাজমালার কপিলা অভিন্ন নদী। পার্জিটার (Pargiter) সাহেবের মতে ইহার নাম 'কৃপা', ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও 'কৃপা' নদীর নামোল্লেখ আছে।

'কপিলা' নামোৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করা বর্ত্তমানকালে সহজসাধ্য নহে। রাজরত্নাকর আলোচনায়, সগরদ্বীপে ভগবান্ কপিলের আশ্রম থাকা হেতু তৎপাদ বাহিনী গঙ্গা—'কপিলা গঙ্গা' নাম লাভ করিয়াছিলেন। * কামরূপ প্রদেশেও কপিলাশ্রম থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। † এই স্থলেও কপিল মুনির নামানুসারে নদীর নাম 'কপিলি' হইবার সম্ভাবনাই অধিক। এতদ্ব্যতীত অন্য যুক্তিযুক্ত কারণ অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না। পুণ্যপ্রদ ব্রহ্মপুত্র এই নদীর সংস্পর্শেই কপিলি বা কপিলা নাম লাভ করিয়াছেন, সম্যক অবস্থা আলোচনা করিলে ইহাই বুঝা যায়। এতদুভয় নদীর সন্নিহিত স্থানে ত্রিবেগ রাজপাট প্রতিষ্ঠিত ছিল।

---

* যত্র দক্ষিণগা গঙ্গা লভে সাগর সঙ্গমম্।
গঙ্গাসাগরয়োর্মধ্যে দ্বীপ একো মনোরমঃ।।
যস্মিন্ দ্বীপে স ভগবানুবাস কপিলোমুনিঃ।।
যত্র ভাগীরথী পুর্ণ্যা তদাশ্রম তলংগতা।।
কপিলেতি সমাখ্যাতা সর্ব্বপাপ প্রণাশিনী।" ইত্যাদি।
রাজরত্নাকর—৬ষ্ঠ সর্গ, ১৫-১৭ শ্লোক।

† 'ঊনকোটী তীর্থ মাহাত্ম্য' নামক হস্তলিখিত পুথিতে পাওয়া যায়—
"বিন্ধ্যাদ্রেঃ পাদসম্ভূতো বরবক্রসুপুণ্যদঃ।
অনয়োরন্তরা রাজন্ ঊনকোটি গিরির্মহান্।।
যত্র তেপে তপঃ পূর্ব্বং সুমহৎ কপিলো মুনিঃ।
তত্রৈব কপিলং তীর্থং কপিলেন প্রকাশিতম্।।

বায়ুপুরাণেও কপিল তীর্থের উল্লেখ আছে ; যথা ;—
"যত্রতেপে তপঃ পূর্ব্বং সুমহৎ কপিলমুনিঃ।
যত্রৈব কপিলং তীর্থং তত্র সিদ্ধেশ্বর হরিঃ।।"

সিদ্ধেশ্বর শিব কপিল মুনির আশ্রমে তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এইস্থান কাছাড় ও শ্রীহট্টের মধ্যসীমায় অবস্থিত। বারুণী উপলক্ষে এখানে এক পক্ষকালব্যাপী মেলা বসিয়া থাকে।

কামরূপে ছত্রকোর পর্ব্বতের উত্তরদিকে ২০ ধনু অন্তরে আর একটী কপিলাশ্রমের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তাহা অদ্যাপি তীর্থক্ষেত্র রূপে সেবিত হইতেছে।

অতঃপর নানা সময়ে নানা কারণে রাজপাট স্থানান্তরিত হইয়াছে, রাজমালার পরবর্ত্তী লহরসমূহে তারা ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইবে। কিয়ৎকাল নিরাপদে রাজ্য ভোগের পর মহারাজ প্রতর্দ্দন পুত্র হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অনন্তধামে গমন করিলেন।

মহারাজ প্রমথের বিবরণ

প্রমথ ;---প্রতর্দ্দনের পরলোক গমনের পর, তৎপুত্র মহারাজ প্রমথ বিপুল বিক্রমের সহিত রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার শাসন প্রভাবে রাজ্য বৈরী শূন্য ও শান্তিপূর্ণ হইয়াছিল।

একদা মহারাজ মৃগয়ার্থ গমন করিয়া, সমস্ত দিন বন ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু মৃগের সন্ধান পাইলেন না। তপন দেবের অস্তাচল গমনোন্মুখকালে কোনও এক ক্ষীণ-তপা মুনি, পুত্রসহ সান্ধ্য অবগাহনার্থ নদী তীরে উপনীত হইয়াছিলেন। মহারাজ প্রমথ মৃগ ভ্রান্তিবশতঃ তাঁহাদের উপর শর নিক্ষেপ করিলেন এবং সেই তীক্ষ্ণ শরাঘাতে তাপস তনয় নিহত হইলেন। এই দুর্ঘটনায় মহারাজ ভীত ও অনুতপ্ত হইয়া, স্বীয় আচরিত কর্ম্মের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পুত্র শোকাতুর ঋষি ক্রোধে অধীর হইয়া রাজার বিনাশ কামনায় অভিসম্পাত প্রদান করায়, তৎকালে মহারাজ প্রমথ লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন।

মহারাজ কলিন্দের বিবরণ

কলিন্দ ;---মহারাজ প্রমথ পরলোক গমন করিবার পর তদাত্মজ কলিন্দ পিতৃ আসন লাভ করিলেন। ইতি ধীর, প্রাজ্ঞ এবং রাজনীতি কুশল ভূপতি ছিলেন। ইঁহার শাসনকালে প্রাচীন ত্রিবেগ রাজ্যে (সুন্দরবনে) ত্রিপুরাসুন্দরী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা হইবার বিবরণ পূর্ব্বে প্রদান করা হইয়াছে, এ স্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মহারাজ কলিন্দ দানশীল, ধর্ম্মপরায়ণ এবং দয়ার আধার ছিলেন। প্রজারঞ্জন করাই তাঁহার জীবনের সারব্রত ছিল। দীর্ঘকাল রাজ্য সুখ উপভোগ করিয়া তিনি বার্দ্ধক্যে পুত্র হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন।

মহারাজ ক্রমের বিবরণ

ক্রম ;---ইনি পিতৃরাজ্য লাভের পর সুশাসন গুণে প্রজাবর্গকে বশ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া মহারাজ ক্রম পরলোক প্রাপ্ত হইলেন।

মিত্রারির বিবরণ

মিত্রারি ;---মহারাজ ক্রমের পুত্র মিত্রারি, কার্য্য দ্বারা স্বীয় নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যলাভ করিয়াই মিত্রবর্গের বিপক্ষাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা রাজ কার্য্যে উদাসীন এবং সর্ব্বদা নীচ কার্য্য সম্পাদনের চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার আচরণে অমাত্যগণ উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। এই সুযোগে সুজিৎ নামক প্রধান অমাত্য, রাজাকে অগ্রাহ্য করিয়া, প্রাচীন ত্রিবেগ রাজ্যের শাসন ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন।

বারিবার্হ ;---মিত্রারির পুত্র বারিবার্হ পিতৃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, ত্রিবেগ রাজ্য পুনরুদ্ধারকল্পে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই ; একমাত্র কিরাত রাজ্য লইয়াই তাঁহাকে রাজত্ব করিতে হইয়াছিল।

বারিবার্হের বিবরণ

পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় আলোচনায় জানা যাইতেছে, মহারাজ ক্রুমের পুত্র মিত্রারির সময় প্রাচীন ত্রিবেগ রাজ্য (সুন্দরবন প্রদেশ) দ্রুহ্যু বংশীয়গণের হস্তচ্যুত হইয়াছে। তৎপর কোন সময়ে কি সূত্রে উক্ত প্রদেশ কোন্ বংশীয় রাজার হস্তগত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। মহারাজ মিত্রারি দ্বাপর যুগের রাজা, তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতায় যে গুরুতর ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা কোন কালেই পূর্ণ হয় নাই। তদবধি ত্রিবেগ পতিকে নববিজিত কিরাত রাজ্য লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে।

কার্ম্মুক ;---বারিবার্হের পুত্র মহারাজ কার্ম্মুক শৌর্য্য, বীর্য্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ধনুর্ব্বিদ্যা বিশারদ এবং সমর ক্ষেত্রে নির্ভয় চিত্ত থাকিবার পরিচয় রাজরত্নাকরে পাওয়া যায়। সমর ক্ষেত্রেই তিনি জীবনদান করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধ কাহার সহিত হইয়াছিল, জানিবার উপায় নাই।

কার্ম্মুকের বিবরণ

কালাঙ্গ ;—কার্ম্মুক নন্দন কালাঙ্গ বিশেষ বলবান এবং গদাযুদ্ধ বিশারদ ছিলেন। তাঁহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া অনেকে রাজ্যান্তরে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

কালাঙ্গের বিবরণ

ভীষণ ;---কালাঙ্গের পর তদীয় পুত্র ভীষণ রাজ্যাধিকারী হইলেন। তিনি বীরত্বে পিতার সমকক্ষ হইলেও রাজ্য পালনে পিতৃ স্বভাবের বিপরীত ভাবাপন্ন ছিলেন। দয়া দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণরাশী তাঁহার অঙ্গের ভূষণ ছিল। পিতা কর্ত্তৃক অত্যাচারিত ও দেশান্তরিত প্রজাবর্গকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল যশের সহিত রাজ্য শাসন করিয়া মহারাজ ভীষণ বার্দ্ধক্যে ভবলীলা পরিত্যাগ করিলেন।

মহারাজ ভীষণের বিবরণ

ভানুমিত্র ;---ভীষণ নন্দন ভানুমিত্র সদ্‌গুণান্বিত, সচ্চরিত্র, বিদ্বান এবং দয়ালু ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে রাজ্য ধনধান্য সমন্বিত এবং শান্তিপূর্ণ ছিল।

ভানুমিত্রের বিবরণ

চিত্রসেন ;—ভানুমিত্রের পুত্র মহারাজ চিত্রসেন বীর, ধীর, দয়ালু এবং প্রজারঞ্জক ভূপতি ছিলেন। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদিগকে স্বীয় বাহুবলে পরাস্ত করিয়া দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগ করেন। মহারাজ চিত্রসেন বার্দ্ধক্যে পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বনে গমন পূর্ব্বক যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কথিত আছে, তিনি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীভগবানের দর্শন লাভ এবং অন্তিমে বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিয়াছিলেন।

চিত্রসেনের বিবরণ

চিত্ররথ ;---ইনি মহারাজ চিত্রসেনের পুত্র। ইঁহার শাসনকালে প্রজাগণ কখনও করভারে পীড়িত হয় নাই। ইনি শৌর্য্যশালী, দয়াবান, ধীর, বিদ্বান এবং বিবিধ সদ্‌গুণ সমন্বিত ছিলেন। সর্ব্বদা দেব-ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান এবং যজ্ঞানুষ্ঠানে নিরত থাকিতেন।

চিত্ররথের বিবরণ

ইনি সম্রাট যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন, রাজরত্নাকরের ইহাই মত। এই মত যে ভ্রম-সঙ্কুল, গ্রন্থভাগে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

মহারাজ চিত্ররথের সুশীলা নাম্নী মহিষীর গর্ভে যথাক্রমে চিত্রায়ুধ, চিত্রযোধি ও দৈত্য নামক তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কিয়ৎকাল পরে মহারাজ চিত্ররথ জ্যেষ্ঠপুত্র চিত্রায়ুধকে রাজ্যাধিকারী রাখিয়া পঞ্চত্ব লাভ করিলেন।

চিত্রায়ুধ ;---মহারাজ চিত্রায়ুধ বীর, ধীর এবং প্রজারঞ্জক ভূপতি ছিলেন। প্রতিনিয়ত সমরাঙ্গনে কালক্ষেপ এবং পররাষ্ট্র বিজয় তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। অমিত ক্ষাত্র বীর্য্যই তাঁহাকে অকালে কাল কবলিত করিল। অনুজ চিত্রযোধি সহ তিনি সমরক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

চিত্রায়ুধের বিবরণ

জ্যেষ্ঠপুত্রদ্বয়ের পরলোক গমনের পর রাজমাতা সুশীলা, শিশুপুত্র দৈত্যকে লইয়া বিপদ সাগরে নিমজ্জিতা হইলেন। তিনি ভাবিলেন, শত্রুসমাকুল রাজাহীন রাজ্যে আত্মজীবন এবং শিশুপুত্রকে রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। তাই তিনি রাজমহিষী এবং রাজমাতা হইয়াও নিরাশ্রয়ার ন্যায় শিশু পুত্রকে বক্ষে লইয়া গোপনে রাজ্য ত্যাগ করিলেন এবং গৌতমাশ্রমে যাইয়া ফলমুলাশী অবস্থায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

একদা দৈত্য একাকী ভ্রমণকালে গভীর অরণ্যস্থিত এক মন্দিরে কালিকা দেবীর দর্শন লাভ এবং ভক্তি ভরে তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই তিনি অশ্বত্থামার সঙ্গপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। এই মহাপুরুষের উপদেশানুসারে দৈত্য পৃথুরাজের অর্চ্চনা করিয়া বিজয় পতাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।* ইহার পর পিতৃরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

---

* পুনশ্চ ত্রিপুর রাজ্যং লব্ধুং ভুপাত্মজায় সঃ।
সমাদিদেশ দৈত্যায় পৃথুরাজস্য পূজনম্।।
দ্রৌণ্যাদিষ্ট বিধানেন গিরিমধ্যেহ প্যাথার্চ্চয়ৎ।
অভীষ্ট পূর্ব্বকং দৈত্যঃ পৃথুরাজং প্রযত্নতঃ।।
পূজায়িত্বা পতাকান্ত বিজয়াং লব্ধাংস্তদা।
ততো গেহে সমাগম্য সর্ব্বং মাত্রেন্যবেদয়েৎ।।

রাজরত্নাকর—দক্ষিণবিভাগ, ২য় সর্গ, ১৪৬-১৪৮ শ্লোক।

রাজরত্নাকর ধৃত ভগবদ্রহস্যীয় গৌতম গালবসংবাদে এই অর্চ্চনার উল্লেখ পাওয়া যায়। দৈত্যের পরেও কোন কোন ত্রিপুরেশ্বর ভাবী অমঙ্গল বিনাশ কামনায় পৃথুরাজের অর্চ্চনা ও বিজয়পতাকা ধারণ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরও পৃথুরাজের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন।

দৈত্য ;—অমাত্যবর্গ রাজকুমারের সন্ধানের নিমিত্ত যত্নবান এবং তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় রাজ্য রক্ষা করিতে ছিলেন। অকস্মাৎ রাজপুত্রের আগমনে তাঁহারা অতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং প্রজাবর্গ সহ তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

মহারাজ দৈত্যের বিবরণ

দীর্ঘকাল রাজ্য অরাজক অবস্থায় থাকায়, পার্শ্ববর্ত্তী কিরাতগণ রাজ্যের অনেকাংশ অধিকার করিবার সুযোগপ্রাপ্ত হইয়াছিল। মহারাজ দৈত্য পিতৃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সেই ক্ষতি উদ্ধার করিলেন, এবং আসাম ও মল্লদেশ প্রভৃতি জয় করিয়া রাজ্যের পরিসর বৃদ্ধি এবং ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। মহারাজ দৈত্য, চেদীশ্বর দুহিতা মাণ্ডবীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে ত্রিপুর নামক পুত্র লাভ করিলেন। তিনি দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগ করিবার পর, অনাবিষ্ট পুত্র ত্রিপুরের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করেন।

মহারাজ দৈত্যের শাসনকালে কিরাত প্রদেশে তাঁহার শাসন সুদৃঢ় হইয়াছিল। অদবধি বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া পুরুষ পরম্পরায় এই বংশের শাসন অক্ষুণ্ণ ভাবে চলিয়া আসিতেছে। দৈত্যের বিবরণ লইয়া রাজমালার রচনা আরম্ভ হইয়া থাকিলেও গ্রন্থভাগে তাঁহার নামমাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে, বিবরণ বড় বেশী পাওয়া যায় না।

ত্রিপুর ;—দৈত্যের পর মহারাজ ত্রিপুর রাজ্যলাভ করিলেন। ইতি অতিশয় উদ্ধত, অনাচারী, ধর্ম্মদ্বেষী এবং প্রজাপীড়ক ছিলেন। তিনি নিজকে নিজে দেবতা বলিয়া মনে করিতেন, রাজার অর্চ্চনা ব্যতীত অন্য দেবতার অর্চ্চনা বন্ধ করিয়া দিলেন। কিরাত সংশ্রবে তাঁহার এই দুর্গতি ঘটিয়াছিল। ধর্ম্মদ্বেষিতা হেতুই তাঁহাকে অকালে নিহত হইতে হয়, গ্রন্থভাগে ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

মহারাজ ত্রিপুরের বিবরণ

মহারাজ ত্রিপুরের পরবর্ত্তী রাজগণের বিবরণ রাজমালায় যাহা আছে, তদতিরিক্ত কিছু বলিবার উপায় নাই। সুতরাং সে বিষয়ে নিরস্ত থাকিতে হইল।

অনেকের বিশ্বাস, মহারাজ ত্রিপুরের সময় হইতে তাঁহার অধিকৃত কিরাত রাজ্যের নাম 'ত্রিপুরা' হইয়াছে। আবার, ত্রিবেগে জন্মহেতু রাজার নাম ত্রিপুর হইয়াছিল, ইহাও অনেকে বলিয়াছেন ; শেষোক্ত মত রাজামালারও অনুমোদিত। * এই সকল মত

'ত্রিপুরা' নামোৎপত্তির মুলানুসন্ধান

---

* "ত্রিবেগেতে জন্ম নাম ত্রিপুর রাখিল।।"
রাজমালা—১ম লহর, ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা।

পরিত্যজ্য নহে, অথচ সম্যকভাবে গ্রহণীয়ও নহে। এতৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

ইহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে, দ্রুহ্য সন্তানগণের অধিকৃত রাজ্যের নাম 'ত্রিপুরা' হইবার পূর্ব্বে উক্ত প্রদেশ 'কিরাত ভূমি' নামে প্রখ্যাত ছিল। * কেহ কেহ অনুমান করেন, টলেমির কথিত কিরাদিয়া এবং কিরাত দেশ বা ত্রিপুরা রাজ্য অভিন্ন। † এই কিরাত রাজ্যের কোন সময়ে এবং কি কারণে 'ত্রিপুরা' নাম হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন অনেক মত প্রচলিত আছে। কৈলাসবাবুর মতে ত্রিপুরা ভাষায় জলকে 'তুই' বলে, এই 'তুই' শব্দের সহিত 'প্রা' শব্দের যোগে 'তুইপ্রা' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহা হইতে ক্রমশঃ, তিপ্রা, তৃপুরা, ত্রীপুরা ও পরিশেষে ত্রিপুরা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ‡ তাঁহার মতে 'প্রা' শব্দের অর্থ সমুদ্র ; এবং সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী বলিয়া স্থানের নাম 'তুইপ্রা' হইয়াছিল। ইহা কৈলাসবাবুর স্বকীয় গবেষণা, অন্য প্রমাণ সাপেক্ষ নহে। বিশ্বকোষ সম্পাদক মহাশয়ের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, মৎস্য পুরাণ ও বামন পুরাণে 'প্রবঙ্গ' নামের উল্লেখ আছে। § বিশ্বকোষের মতে এই স্থান ত্রিপুরার অংশ বিশেষ। ¶ এই বাক্যের ভিত্তি কোথায়, জানিবার উপায় নাই। সুতরাং এই সকল মত গ্রহণীয় কিনা তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

মহারাজ ত্রিপুরের নামে স্থানের 'ত্রিপুরা' নামকরণের মূল সূত্র নহে। রাজরত্নাকরের বাক্য দ্বারা জানা যায়, ত্রিপুর জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্ব হইতেই কিরাত দেশের অংশ বিশেষের নাম "ত্রিপুরা" ছিল, এবং তদ্দেশে জন্মহেতু মহারাজ দৈত্য

---

* "তপ্তকুণ্ড সমারভ্য রামক্ষেত্রান্তক শিবে।
কিরাত দেশো দেবেশি বিন্ধ্যশৈলহবতিষ্ঠতি।।

† ঢাকার ইতিহাস—২য় খণ্ড, ১ম অধ্যায়, ৫ম পৃষ্ঠা।

‡ কৈলাসবাবুর রাজমালা—উপক্রমণিকা, ২-৩ পৃষ্ঠা।

§ মার্কণ্ডেয় পুরাণ—৫৭।৪৩, মৎস্যপুরাণ—১১৩।৪৪ ;
কূর্ম্মপুরাণ—১৩।৪৪।

¶ বিশ্বকোষ—আর্য্যাবর্ত্ত শব্দ দ্রষ্টব্য।

স্বীয় পুত্রের "ত্রিপুর" নাম রাখিয়াছিলেন। * তবে, সমগ্র রাজ্যের নামকরণের সহিত মহারাজ ত্রিপুরের নামের সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা পরে বলা হইবে।

ত্রিপুরা নামের প্রাচীনত্ব

নিবিষ্ট চিত্তে শাস্ত্র গ্রন্থ ও ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, বর্ত্তমান ত্রিপুর রাজ্য 'ত্রিপুর' এবং 'ত্রিপুরা' দুই নামেই পরিচিত ছিল। এবং ইহাও প্রতীয়মান হইবে যে, ত্রিপুর বা ত্রিপুরা শব্দটি আধুনিক নহে ; কিন্তু এই শব্দ সর্ব্বত্রই দেশবাচক ভাবে ব্যবহৃত হয় নাই। বেদে, ঐতরেয়, কোষিতকি, গোপথ, শতপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগ্রন্থে, এবং মৈত্রেয়ানী, কাঠক, ও তৈত্তিরীয় প্রভৃতি সংহিতা গ্রন্থে 'ত্রিপুর' নামের উল্লেখ পাওয়া যায় ; কিন্তু তাহা দেশের নাম নহে, তদ্দারা অসুরগণের পুরত্রয়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে। পৌরাণিক যুগে রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে এবং মহাভারতের কোন কোন অংশে 'ত্রিপুর' শব্দ পূর্ব্বোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু আবার মহাভারতেই দেশবাচক 'ত্রিপুর' শব্দও পাওয়া যায়। তাহার কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ;---

(১) ত্রিপুরং স্ববশে কৃত্বা রাজানমমিচৌ জসং।
নিজগ্রহ মহাবাহুস্তরসা পৌরবেশ্বরঃ।।
সভাপর্ব্ব---৩১শ অঃ, ৬০ শ্লোক।

(২) দ্রোণাদনন্তরং যত্তো ভগদত্তঃ প্রতাপবান্।
মাগধৈশ্চ কলিঙ্গৈশ্চ পিশাচৈশ্চ বিশাম্পতে।।
প্রাগ্‌জ্যোতিষাদনুনৃপঃ কোশল্যোহয় বৃহদ্বলঃ।
মেকলৈঃ কুরুবিন্দৈশ্চ ত্রৈপুরৈশ্চ সমন্বিতঃ।।
ভীষ্মপর্ব্ব---৮৭ অঃ, ৮-৯ শ্লোক।

(৩) পূর্ব্বাং দিশাং বিনির্জ্জিত্য বৎসভূমি তথাগমৎ।
বৎসভূমিঃ বিনির্জ্জিত্য কেরলীং মৃত্তিকাবতীং।।
মোহনং পত্তনঞ্চৈব ত্রিপুরাং কোশলাং তথা।
এতান্ সর্ব্বান্ বিনির্জ্জিত্য করমাদায় সর্ব্বশঃ।
দাক্ষিণাং দিশমাস্থায় কর্ণোজিত্বা মহারমান।।
বনপর্ব্ব---২৫৩ অঃ, ৯-১১ শ্লোক।

---

* মহারাজ দৈত্যের পুত্রলাভ সম্বন্ধে রাজরত্নাকরে লিখিত আছে ;—
"মাণ্ডব্যা গর্ত্ত সম্ভুতঃ পুত্র একো ধরাপতে।
বভূব ত্রিপুরায়াস্ত জননা ত্রিপুরেশ্বরং।
নামচক্রে মহারাজো রাজ্যা নামনুসারতঃ।।"
রাজরত্নাকর—দক্ষিণ বিভাগ, ২য় অধ্যায়।

উদ্ধৃত শ্লোকসমূহে সন্নিবিষ্ট 'ত্রিপুর' বা 'ত্রিপুরা' শব্দ দেশবাচক। এবম্বিধ শ্লোক আরও আছে, অধিক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। এই ত্রিপুরার অবস্থান সম্বন্ধে নানা ব্যক্তি নানা কথা বলিয়া থাকেন। কেহ বলেন, ইহা দক্ষিণাপথে অবস্থিত, কাহারও মতে ইহার অবস্থান মধ্যভারতে। এই 'ত্রিপুরা' শব্দ বর্ত্তমান ত্রিপুর রাজ্যের প্রতি প্রয়োগ করিতে তাঁহারা অসম্মত। কিন্তু প্রাগ্‌জ্যোতিষ, মেকল প্রভৃতির সহিত যে ত্রিপুরার নামোল্লেখ হইয়াছে, তাহাকে ত্রিপুরা রাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করাই যুক্তিসঙ্গত। এবিষয় গ্রন্থভাগে আলোচিত হইয়াছে।* এস্থলে একটিমাত্র প্রমাণের উল্লেখ করা আবশ্যক মনে হয়। ভবিষ্য পুরাণীয় ব্রহ্মখণ্ডে পাওয়া যায়---

ত্রিপুরার অবস্থান নির্ণয়

"বারেন্দ্র তাম্রলিপ্তঞ্চ হেড়ম্বম ণিপুরকম্।
লৌহিত্য স্ত্রৈপুরং চৈব জয়ন্তাখ্যং সুসঙ্গকম্।।

লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) হেড়ম্ব, মণিপুর, জয়ন্তা ও সুসঙ্গের সহিত ত্রিপুরার নাম পাওয়া যাইতেছে। এই সকল স্থান ত্রিপুরা রাজ্যের অতি সন্নিহিত। এরূপ অবস্থায়ও কি শ্লোকোক্ত ত্রিপুরাকে দাক্ষিণাত্যে বা মধ্যভারতে সংস্থিত বলা হইবে? প্রকৃতপক্ষে এই শ্লোকের ত্রিপুরা এবং মহাভারতোক্ত ত্রিপুরা যে অভিন্ন, নিবিষ্টচিত্তে আলোচনা করিলে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না। এতদ্বারাও ত্রিপুরা নামটির প্রাচীনত্ব সূচিত হইতেছে।

বরাহমিহির কৃত 'বৃহৎ সংহিতায়' যে ভৌগোলিক বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতেও 'ত্রিপুরা' নামের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ বলেন, এই বিবরণ পরাশরের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। পরাশর অতি প্রাচীন কালের ঋষি অদ্যাপি তাঁহার আবির্ভাব কাল নির্ণীত হয় নাই। তিনি যে খৃষ্টের পূর্ব্বশতকে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা অনেকে স্বীকার করিয়া থাকেন। Weber প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণও একথা মানিয়া লইয়াছেন। † এবং ঐতিহাসিক Kerm ইহার প্রাচীনত্বের বিস্তর প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ‡ এই প্রাচীন ঋষির বাক্য অবলম্বন করিয়া

---

* রাজমালা—১ম লহর, ১৬৯ পৃষ্ঠা।

† Indioche Liter-P. 225.

‡ Kerm-Oeschichte-Vol. IV

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রারম্ভকালে বরাহমিহির বলিয়াছেন ;—

> "আগ্নেয়্যাং দিশি কোশল কলিঙ্গ বঙ্গোপবঙ্গ জঠরাঙ্গাঃ
> কৈলিঙ্গ বিদর্ভ বৎসান্ধ্র চেদিকাশ্চোর্ধ্বকাঠাশ্চ।।
> বৃষনালিকেয় চর্ম দ্বীপা বিন্ধ্যান্তবাসিন স্ত্রিপুরী।
> শ্মশ্রুধর হেমকূট্য ব্যালগ্রীবা মহাগ্রীবাঃ।"
> বৃহৎসংহিতা—৪র্থ অঃ, ৮-৯ শ্লোক।

শ্লোকোক্ত বিন্ধ্যগিরি, কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলার বক্ষ জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। এ বিষয় গ্রন্থভাগে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। * এই পর্ব্বত বাহিনী বরবক্র (বরাক) নদী কাছাড় এবং শ্রীহট্ট জেলার প্রধান নদী বলিয়া পরিগণিত। † গ্রীবা পীঠ শ্রীহট্টের তীর্থভূমি। বিন্ধ্যশৈল, ব্যালগ্রীবা ও মহাগ্রীবার সঙ্গে ত্রিপুরার নামোল্লেখ হওয়ায় তাহা যে ঐ সকল স্থানের পার্শ্ববর্ত্তী বর্ত্তমান ত্রিপুররাজ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। এতদ্দ্বারাও 'ত্রিপুরা' নামের প্রাচীনত্ব লক্ষিত হইবে।

তন্ত্রগ্রন্থেও ত্রিপুরার নাম পাওয়া যায়, তাহা এই,—

> "ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী।
> ভৈরব স্ত্রিপুরেশশ্চ সর্ব্বাভিষ্ট প্রদায়কঃ।।"
>
> পীঠমলা তন্ত্র।

অন্যত্র পাওয়া যাইতেছে,—

> ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবতা ত্রিপুরা মাতা।
> ভৈরব স্ত্রিপুরেশশ্চ সর্ব্বাভিষ্ট ফলপ্রদঃ।।
>
> —তন্ত্র চূড়ামণি।

এবম্বিধ বচন আরও সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এই ত্রিপুরা যে বর্ত্তমান ত্রিপুরারাজ্য, পীঠদেবী ত্রিপুরা সুন্দরীই ইহার সমুজ্জ্বল প্রমাণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। উদ্ধৃত শ্লোক দ্বারা প্রতীয়মান হইবে, পীঠ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব হইতেই স্থানের নাম 'ত্রিপুরা' ছিল। কোন সময়ে কি কারণে এইনাম প্রচলিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই, ইতিহাস এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব।

জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত কূর্ম্মচক্র বচনে, এবং চৈতন্য ভাগবত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী ও ক্ষিতীশবংশাবলী প্রভৃতি আধুনিক অনেক গ্রন্থে ত্রিপুরা নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, তদ্দ্বারাও বর্ত্তমান ত্রিপুরাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

---

* রাজমালা—১ম লহর, ৮৬ পৃষ্ঠা।

† বিন্ধ্যপাদ সমূদ্ভুতো বরবক্র সুপুণ্যদঃ।
বায়ু পুরাণ।

সমগ্র বিবরণ আলোচনা করিলে বুঝা যায়, কিরাত দেশের অন্তর্নিবিষ্ট গোমতী নদীর তীরবর্ত্তী ভূভাগ যে অজ্ঞাত কারণেই হউক, ইতিহাসের অগোচর কাল হইতে 'ত্রিপুরা' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই স্থানে পীঠ প্রতিষ্ঠা হওয়ায়, 'ত্রিপুরা' নামটি বিশেষ খ্যাতিলাভ করে, এবং এই সূত্র অবলম্বনেই পীঠদেবীর নাম 'ত্রিপুরাদেবী' বা 'ত্রিপুরা সুন্দরী' হইয়াছে। অতঃপর মহারাজ ত্রিপুরের শাসনকালে পীঠস্থানের নামের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত, কিম্বা স্বীয় নাম স্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার অধিকৃত সমগ্র রাজ্যের নাম 'ত্রিপুরা' করিয়াছিলেন, অবস্থানুসারে এরূপ নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। ত্রিপুরের ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থার কথা ভাবিতে গেলে, এই ক্ষেত্রে পীঠদেবীর নাম অপেক্ষা স্বীয় নামের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার সম্ভাবনাই অধিক বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে এতদতিরিক্ত কিছু বলিবার সূত্র পাওয়া যায় না।

রাজ্যের নাম ত্রিপুরা হইবার কারণ

কিরাতদেশের (ত্রিপুরার) সহিত আর্য্য সংশ্রব সঙ্ঘটন কতকালের কথা, তাহাও ইতিহাসের অগোচর। প্রাচীন নিদের্শনাদি আলোচনা করিলে জানা যায়, দ্রুহ্যুবংশীয়গণের আগমন কাল হইতে আর্য্য অধ্যুষিত হইয়া থাকিলেও তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই তদ্দেশে আর্য্য সংশ্রব ঘটিয়াছিল। রঘুনন্দন, বেতলিঙ্গ শিব, খোইশিব, এবং চন্দ্রশেখর প্রভৃতি পর্ব্বত ও শৃঙ্গের নাম, গোমতী, মনু, কর্ণফুলী, দেওগাঙ্গ, লক্ষ্মী ও পাবনী প্রভৃতি নদী এবং ছড়ার নাম, কৈলাসহর, ঋষ্যমুখ প্রভৃতি স্থানের নাম দ্বারা প্রাচীন আর্য্য সংশ্রব সূচিত হইতেছে। দেবতামুড়া, ব্রহ্মকুণ্ড, চট্টল-পীঠ, ত্রিপুরা-পীঠ, কামাখ্যা-পীঠ, উনকোটী-তীর্থ, সীতাকুণ্ড ও আদিনাথ তীর্থ প্রভৃতি আর্য্য সংস্পর্শের জাজ্বল্যামান নিদর্শন। মনুর আশ্রম, কপিলাশ্রম প্রভৃতির নামও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। এই সকল নিদর্শন দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে, উত্তরে কাছাড় হইতে আরম্ভ করিয়া, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের অঙ্কশায়ী দ্বীপমালা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ আর্য্য সংস্পৃষ্ট এবং শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল। কিরাত ভূমির কিয়দংশ এই যুগেই 'ত্রিপুরা' নামে আখ্যাত হওয়া বিচিত্র নহে।

কিরাতদেশে আর্য্য সংশ্রবের নিদর্শন

দ্রুহ্যুবংশের আবাস ভূমিতে পরিণত হইবার পরেও উক্তপ্রদেশে শৈবধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল ; মহারাজ ত্রিপুরের নিধন ও ত্রিলোচনের জন্ম বিবরণই এবিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ত্রিপুরার কুল-দেবতা (চতুর্দ্দশ দেবতা) প্রতিষ্ঠার মূল হেতু মহাদেব। রাজমালার মতে, শিবের আজ্ঞায় ঐ সকল দেবতা স্থাপিত হইয়াছে। এবং চতুর্দ্দশ দেবতার মধ্যে মহাদেবই প্রথম দেবতা। এতদ্ব্যতীত চতুর্দ্দশ দেবতার মধ্যস্থলে বুড়া দেবতা (শিব) মহাকাল

শৈবধর্ম্মের প্রভাব

মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান থাকিয়া সর্ব্বোপরি প্রভাব বিস্তার করিতেছেন। ইহা শৈব-ধর্ম্মের প্রাধান্যব্যঞ্জক। কিন্তু তৎকালে অনার্য্য সমাজে সর্ব্বতোভাবে আর্য্য প্রভাব প্রবিষ্ট হইবার প্রমাণ নাই, এই প্রভাব বিস্তারকার্য্যে সুদীর্ঘ সময় লাগিয়াছিল। বর্ত্তমান কালে কোন কোন পার্ব্বত্য জাতি আদিম ধর্ম্মবিশ্বাস এবং প্রাচীন আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করে নাই। কোন কো জাতি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, কেহ বা বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে। অধুনা মিসনারিগণের প্রসাদে কোন কোন জাতির মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের ঝোঁক পড়িয়াছে। এতদ্বিবরণ রাজমালার পরবর্ত্তী লহর সমূহে যথাক্রমে বিবৃত হইবে। ইহার প্রতিকার জন্য ত্রিপুরেশ্বর এবং মণিপুরাধিপতির সদয় দৃষ্টি থাকা অনেকে প্রয়োজন মনে করেন।

ধর্ম্ম সমন্বয় সম্বন্ধীয় বিবরণ

মহারাজ ত্রিলোচনের সময় হইতে শৈবধর্ম্মের সহিত শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের সমন্বয় ঘটিয়াছিল। এ বিষয়েও চতুর্দ্দশ দেবতাই সুস্পষ্ট প্রামাণ। ত্রিপুরেশ্বরগণ পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া থাকিলেও কোনকালেই তাঁহারা ধর্ম্মসম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক ভাব পোষণ করেন নাই। হিন্দুর সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মই তাঁহারা শ্রদ্ধাসহকারে পালন করিয়া আসিতেছেন। তদ্ব্যতীত মহম্মদীয়, খ্রীষ্ট ও বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মকেই তাঁহারা পোষণ করিয়া থাকেন, এবং তাহা রাজার একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহার বিস্তর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণের অভাবজনিত কষ্ট

সগরদ্বীপ বা সুন্দরবন হইতে কিরাতদেশে আগমন করিবার পর ত্রিপুর রাজবংশকে কিয়ৎকাল ব্রাহ্মণের অভাবজনিত কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যবিস্তর ব্যপদেশে নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিতেন, কিন্তু তাঁহারা নববিজিত প্রদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে, ব্রাহ্মণ সমাজ সেইস্থানে যাইতে সম্মত হইতেন না। এই কারণে ধর্ম্মকার্য্যের বিলোপ হেতু অনেক ক্ষত্রিয় পতিত এবং বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন।* ত্রিপুরেশ্বরগণের ঠিক সেই অবস্থা না ঘটিয়া থাকিলেও দন্ডিগণ ভিন্ন অন্য ব্রাহ্মণের অভাব এবং তদ্ধেতু ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে

---

* এতৎ সম্বন্ধে মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—

"শনৈকস্তু ক্রিয়া লোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।

বৃষলত্ব গতা লোকে ব্রাহ্মণদর্শনেন চ।"

মনুসংহিতা—১০।৫৩

অবনতি ঘটিয়াছিল, ইহা বুঝা যায়। মহারাজ দৈত্যের পুত্র ত্রিপুরের চরিত্রই ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। রাজমালায় পাওয়া যায়---

"জন্মাবধি না দেখিল দ্বিজ সাধুধর্ম্ম।
সেই হেতু ত্রিপুর হইল ক্রূর কর্ম্ম।।
দান ধর্ম্ম না দেখিল আগমন পুরাণ।
বেদশাস্ত্র না পঠিল নাহি কোন জ্ঞান।।"

ইত্যাদি।

এই উক্তি দ্বারা ব্রাহ্মণের অভাব স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে। সেকালে দণ্ডিগণই ইঁহাদের পৌরোহিত্য কার্য্য সম্পাদন দ্বারা জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ত্রিপুরেশ্বরদিগকে এই অভাব দীর্ঘকাল ভোগ করিতে হয় নাই। ত্রিপুরের পুত্র ত্রিলোচনের সময় হইতে রাজ্যমধ্যে ব্রাহ্মণোপনিবেশের সূত্রপাত হইয়াছিল। রাজমালায় ত্রিলোচন খণ্ডে লিখিত আছে,---

ব্রাহ্মণোপনিবেশের সূত্রপাত

"সুখ্যাতি শুনিয়া আসে নানাদেশী দ্বিজ।
তাহাতে শিখিল বিদ্যা যত পাই বীজ।"

অতঃপর ক্রমশঃ ব্রাহ্মণোপনিবেশ বৃদ্ধি পাইবার বিস্তর প্রমাণ রাজমালায় পাওয়া যাইবে। এই সময় হইতে রাজন্যবর্গ দান ও যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; সেই স্মরণাতীত কালের অনাবিল ধর্ম্ম-স্রোত অদ্যাপি অক্ষুণ্ণভাবে ত্রিপুরারাজ্যে প্রবাহিত হইতেছে।

প্রাচীন রাজন্যবর্গের কাল নির্ণয় করা নিতান্তই দুঃসাধ্য ব্যাপার ; অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার কোনরূপ সূত্র পাওয়া যায় নাই। পরবর্ত্তী কতিপয় রাজার সময় নির্ণায়ক একখানা প্রাচীন তালিকা আগরতলাস্থিত উজীর ভবনে পাওয়া গিয়াছে। তাহা আলোচনায় জানা যায়, সেকালে অঙ্কপাতের এক বিশিষ্ট প্রণালী প্রচলিত ছিল। দুইটী অঙ্কের মধ্যবর্ত্তী শূন্য (০) লিপিকরা হইত না, শূন্যের স্থানে কিঞ্চিৎ ফাঁক রাখা হইত মাত্র। এস্থলে সংযোজিত তালিকার প্রতিকৃতিতে দৃষ্ট হইবে, মহারাজ রাজধর মাণিক্যের সিংহাসন লাভের কাল ১৫০২ শক স্থলে '১৫ ২', রত্ন মাণিক্যের রাজ্যাভিষেক কাল ১৬০৭ শক স্থলে '১৬ ৭', মহারাণী জাহ্নবী মহাদেবীর শাসনকাল ১৭০৫ শক স্থলে '১৭ ৫' এবং মহারাজ রাজধর মাণিক্যের (২য়) রাজ্যলাভের কাল ১৭০৭ শক স্থলে '১৭ ০৭' অঙ্কপাত করা হইয়াছে। প্রাচীন শিলালিপি এবং ইষ্টক গাত্রেও এই প্রণালীর অঙ্ক উৎকীর্ণ হইবার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা হইল দুই

রাজগণের কাল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য

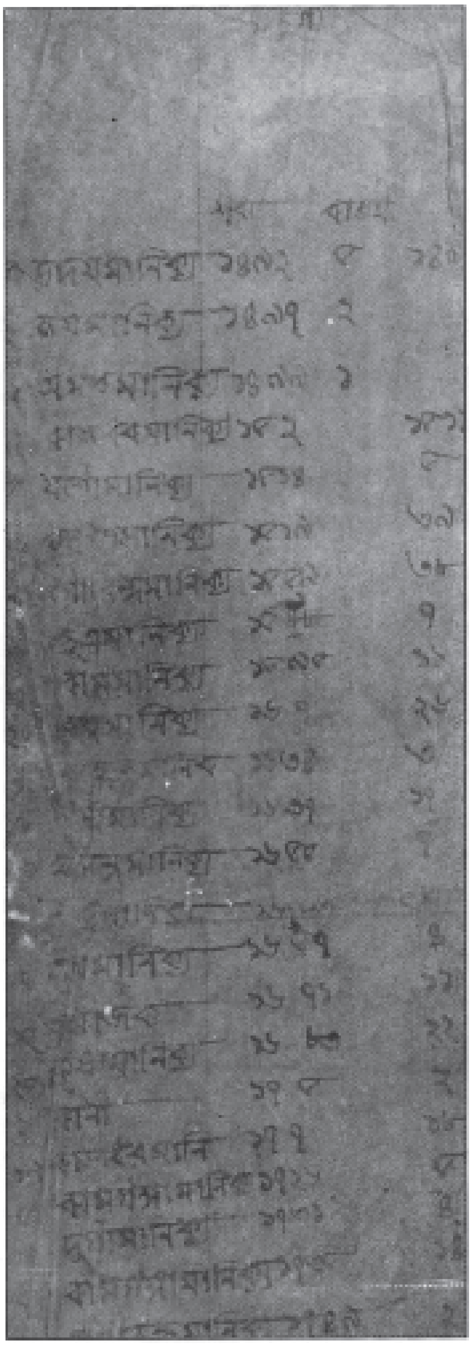

ত্রিপুরেশ্বরগণের কাল নির্ণায়ক প্রাচীন লিপি।

অঙ্কের মধ্যবর্ত্তী শূন্য সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা। শেষ অঙ্কের দক্ষিণ পার্শ্বে শূন্য (0) থাকিলে ফাঁক দেওয়ার সুবিধা নাই, এরূপ স্থলে শূন্য (0) না লিখিয়া ক্রশ চিহ্ন (X) দেওয়া হইত। ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব সার্ভে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্ স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত বসু মহাশয়ের সংগৃহীত প্রাচীন ইষ্টক-ফলকে '১৪৯০' শক স্থলে '১৪৯x' উৎকীর্ণ হইয়াছে। ত্রিপুরায় অঙ্কপাত সম্বন্ধে কিয়ৎকাল এবম্বিধ নিয়ম চলিয়াছিল। যাঁহারা এই নিয়ম অবগত নহেন, তাঁহাদের পক্ষে অনেকস্থলে ঐ সকল অঙ্ক দৃষ্টে প্রকৃত কাল নির্ণয় করা নিশ্চয়ই কষ্ট সাধ্য হইবে, তজ্জন্য কথাটি বলিয়া রাখা সঙ্গত মনে হইল।

ত্রিপুরায় হালামজাতির প্রাধান্য

জনপ্রবাদে জানা যায়, কিরাতদেশ দ্রুহ্যু বংশীয়গণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে হালামজাতি তৎপ্রদেশের অধিনায়ক ছিল। এই প্রবাদের সত্যতা জ্ঞাপক নিদর্শন বিরল নহে ; সুতরাং তাহা অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না। ত্রিপুর দরবারে হালাম ভাষার অনেক শব্দ গৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন রাজগণের নামে ও উপাধিতে হালামভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; এই সমস্ত বিষয় উক্ত প্রবাদের পোষক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অধুনা রাজদরবারে হালামগণের সম্মান এবং প্রতিপত্তির যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা এই জাতির অতীত গৌরবের শেষচিহ্ন বলিয়াই মনে হয়।

প্রকৃতিপুঞ্জের প্রাধান্য

পুরাকালে সর্ব্বত্রই রাজার উপর প্রকৃতিপুঞ্জের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এমনকি, নবীন ভূপতির রাজ্যাভিষেককালে প্রজাবৃন্দের সম্মতি গ্রহণ করিবার প্রথা ছিল। বাল্মিকী রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত ও অদ্ভুত রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থনিচয়ে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। রাজস্থানের ইতিহাসে প্রকৃতিপুঞ্জের প্রাধান্যের অনেক নিদর্শন আছে। ত্রিপুর রাজ্যেও প্রাচীনকালে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। রাজমালার প্রথম লহরে পাওয়া যায়, মহারাজ ত্রিলোচন অমাত্য ও রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিবর্গের সম্মতিমতে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। মুচুং ফা-এর ভ্রাতা সাধুরায় প্রকৃতিপুঞ্জের অভিপ্রায়ানুসারে রাজ্যলাভ করেন। অমাত্যবর্গ কর্ত্তৃক প্রতাপমাণিক্য নিহত এবং মুকুটমাণিক্য সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজমালার পরবর্ত্তী লহরসমূহে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে, তাহা ক্রমান্বয়ে জানা যাইবে।

পারিবারিক কথা

ত্রিপুর রাজপরিবারে প্রচলিত যে-সকল প্রথার বিবরণ গ্রন্থভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত আরও দুই একটী প্রাচীন প্রথার উল্লেখ করা

আবশ্যক। মহারাজ ত্রিলোচনের জন্মবিবরণে পাওয়া যায়,---

"দশমাস অতীতে জন্মিল ত্রিলোচন।
পরম উৎসব হৈল কিরাত ভবন।
* * *
যথাবিধি কুলমতে সপ্তদিন গেল।
পাত্র মন্ত্রী সৈন্য সবে দেখিতে আসিল।"

রাজমালা---১ম লহর, ১৭ পৃষ্ঠা।

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, প্রাচীনকালে, শিশু জন্মিবার সপ্তম দিবসে কুলপ্রথানুসারে একটী উৎসব করা হইত। এই উৎসবের নিদর্শন ত্রিপুরা রাজপরিবার ব্যতীত অন্যত্রও পাওয়া যায়। ময়নামতীর গানে, পুত্র জন্মগ্রহণ করিবার সপ্তম দিবসে 'সাদিনা' উৎসবের উল্লেখ আছে।

ত্রিপুর রাজপরিবারে আর একটী প্রথা বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইঁহারা নানাকার্য্যে, নানাভাবে অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন ব্যবহার করিয়া থাকেন। চতুর্দ্দশ দেবতার প্রত্যেকটির মস্তক অর্দ্ধচন্দ্র লাঞ্ছিত। ত্রিপুরার প্রাচীন ইষ্টকে, মন্দিরগাত্রে, রাজ-লাঞ্ছনে, অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত। ইহা চন্দ্রবংশের পরিচয় জ্ঞাপক চিহ্ন।

পূর্ব্বভাষ অতিরিক্ত মাত্রায় দীর্ঘ করিয়াও সকল কথা বলিবার সুযোগ ঘটিল না। পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ভয়ে এবার এই পর্য্যন্তই বলা হইল, পরবর্ত্তী লহর সমূহে ক্রমশঃ অবশিষ্ট বিবরণ প্রদান করিবার আশা রহিল।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন।

সূচীপত্র

মঙ্গলাচরণ ১-৩

প্রস্তাবনা ৩-৪

গ্রন্থারম্ভ

যযাতির বিবরণ ৫-৬

দৈত্যখণ্ড

দৈত্যের বিবরণ (৬), ত্রিপুরের বিবরণ (৬), আর্য্যাবর্ত্ত ও তীর্থসমূহের বিবরণ (৭), ত্রিপুর বংশের আখ্যান (৮) ৬-১০

ত্রিপুর খণ্ড

ত্রিপুরের চরিত্র (১০), শিবের আবির্ভাব ও ত্রিপুরের সংহার বিবরণ (১১), রাজ্যের দুরবস্থা (১১), প্রকৃতিপুঞ্জের শিবারাধনা (১২), শিবের বরপ্রদান (১২), চতুর্দ্দশ দেবতার পূজাবিধি (১৫), ত্রিলোচনের জন্ম (১৭), ত্রিলোচনের রাজ্যাভিষেক (১৮) ... ১০-১৯

ত্রিলোচন খণ্ড

বিবাহ প্রসঙ্গ (১৯), ত্রিলোচনের পুত্র হেড়ম্বে (২৪), বারঘর ত্রিপুর (২৫), চতুর্দ্দশ-দেব-পূজা (২৬), দেওড়াই আনয়ন (২৮), চতুর্দ্দশ দেবতার নাম (৩০), ত্রিলোচনের দিগ্বিজয় (৩২), ত্রিলোচনের হস্তিনা গমন (৩৩), ত্রিলোচনের স্বর্গলাভ (৩৪) ... ১৯-৩৪

দাক্ষিণ খণ্ড

ভ্রাতৃবিরোধ (৩৪), খলংমায় রাজ্যপাট (৩৬), সুরার প্রভাব (৩৭) ... ৩৪-৩৮

তৈদাক্ষিণ খণ্ড

রাজবংশ মালা (৩৮), শিক্ষরাজের রাজ্যত্যাগ (৪০), ছাম্বুলনগরে শিবাধিষ্ঠান (৪২), মৈছিলি রাজোপাখ্যান (৪৪)... ... ... ৩৮-৪৬

প্রতীত খণ্ড

প্রতিজ্ঞা নিবন্ধ (৪৬), হেড়ম্ব ও ত্রিপুরেশ্বরের বিরোধ (৪৭) ... ৪৬-৪৯

যুঝার ফা খণ্ড

লিকা অভিযান (৪৯), রাঙ্গামাটি জয় ও রাজ্যপাট (৫১), বঙ্গবিজয় (৫২), রাজবংশমালা (৫৩) ৪৯-৫৪

<u>ছেংথুম্ ফা খণ্ড</u>

মহারাণীর বীরত্ব (৫৫), গৌড়ের সঙ্গে যুদ্ধ (৫৭), জামাতা সেনাপতি (৫৯), মেহেরকুল বিজয় (৫৯) **৫৫-৫৯**

<u>ডাঙ্গর ফা খণ্ড</u>

কুমারগণের বুদ্ধির পরীক্ষা (৬০), রাজ্যবিভাগ (৬২), রত্ন ফা গৌড়ে (৬৩) ... **৬০-৬৬**

<u>রত্নমাণিক্য খণ্ড</u>

মাণিক্যখ্যাতি (৬৬), বঙ্গ উপনিবেশ (৬৭), রত্নমাণিক্যের স্বর্গলাভ (৬৯), প্রতাপমাণিক্য (৬৯), মুকুটমাণিক্য, মহামাণিক্য ও শ্রীধর্ম্মমাণিক্য (৭০), পুরাণ প্রসঙ্গ (৭০)... **৬৬-৭১**

মধ্যমণি (টীকা)

<u>রাজমালা প্রথম লহর ও তাহার রচয়িতাগণ</u>

বঙ্গভাষার গ্রন্থরচনার প্রারম্ভকাল (৭৫), রাজাবলী (৭৫), রাজমালা (৭৬), রাজমালার রচয়িতাগণ (৭৭), বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বরের পরিচয় (৭৭), রাজমালার প্রাচীনত্ব (৮১), রাজমালাই ভাষার প্রথম ইতিহাস (৮২), রাজমালা রাজগণের ইতিহাস (৮২) **৭৫-৮৩**

<u>কিরাতদেশ ও তাহার অবস্থান</u>

রাজমালার মত ও পুরাণ প্রসঙ্গ (৮৩), কিরাতদেশের অবস্থান নির্ণয় (৮৪), কিরাতদেশের বিস্তৃতি (৮৫), কিরাতদেশ আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত কিনা? (৮৭) ... **৮৩-৮৮**

<u>পারিবারিক কথা</u>

রাজা সমাজের অধীন নহেন (৮৮), ত্রিপুর খ্যাতি (৮৯), 'ফা' উপাধি (৯০), বৈবাহিক বিবরণ (৯১), বহুবিবাহের প্রশ্রয় (৯২), প্রাচীন পদ্ধতি অক্ষুণ্ন রাখিবার আগ্রহ (৯২), রাজা ও রাণীর এক নাম (৯৩), রাজা ও রাজপরিবারের শিক্ষানুরাগ (৯৩), মল্লবিদ্যার চর্চ্চা (৯৪)... ... ... **৮৮-৯৫**

<u>ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মাচরণ</u>

ধর্ম্মমত সম্বন্ধীয় আভাস (৯৫), ধর্ম্মমত সম্বন্ধে উদারতা (৯৫), ছাম্বুলনগরের অবস্থান নির্ণয় (৯৮), যজ্ঞ বিবরণ (৯৮), আদি ধর্ম্মপার যজ্ঞ ও সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন (৯৯), আদি ধর্ম্মপার তাম্রশাসন (১০০), মৈথিল ব্রাহ্মণের উপনিবেশ স্থাপন (১০১), তাম্রফলক সম্বন্ধীয় আলোচনা (১০২), মহারাজ ধর্ম্মধর (১০৫), নিধিপতির প্রভাব (১০৫), ধর্ম্মধরের

যজ্ঞ (১০৬), ধর্ম্মধরের তাম্রশাসন (১০৬), সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রতিপত্তি (১০৮), ভ্রমাত্মক মত খণ্ডন (১০৯), আদিশূরের যজ্ঞ সম্বন্ধে মতভেদ (১১১), গৌড়ে ব্রাহ্মণ আগমনের কাল (১১২), রাজগণের বানপ্রস্থ অবলম্বন (১১২) **৯৫-১১৩**

শিল্প চর্চ্চা

শিল্পচর্চ্চার সূত্রপাত (১১৩), সুবড়াই রাজা কর্ত্তৃক শিল্পোন্নতি (১১৩), রাজ অন্তঃপুরে শিল্পচর্চ্চা (১১৫), অরণ্যবাসিগণের মধ্যে শিল্পচর্চ্চা (১১৬), কাঁচলির শিল্প নৈপুণ্য (১১৬), ত্রিপুর রাজ্যে কাঁচলির আদর (১১৬)... ... ...**১১৩-১১৮**

উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন পদ্ধতি

দায়ভাগের কথা (১১৯), ত্রিপুর রাজ্য ও দায়ভাগ (১১৯), পৈতৃকধনের বিভাগ প্রণালী (১২০) **১১৯-১২০**

রাজ্যাভিষেক পদ্ধতি

পূর্ব্বকৃত্যকার্য্য (১২), অভিষেক প্রণালী (১২১), রাজচিহ্নধারণ ও মুদ্রা প্রস্তুত (১২১) **১২০-১২১**

পীঠ দেবী

পীঠ প্রতিষ্ঠার মূল সূত্র (১২২), ত্রিপুরায় পীঠস্থান (১২৪), ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দির (১২৪), ত্রিপুরা সুন্দরী মূর্ত্তির বিবরণ (১২৫), সুখ সাগর (১২৬), কল্যাণ সাগর (১২৭), সেবা পুজার বন্দোবস্ত (১২৮), ভৈরব লিঙ্গ (১২৯), শিব চতুর্দ্দশীর মেলা (১২৯), বিজয় সাগর (১২৯)... ... ... **১২২-১২৯**

কুল দেবতা

মহারাজ ত্রিপুরের অত্যাচার ও নিধন (১৩০), মহারাজ ত্রিপুরের নিধন সম্বন্ধে রাজ রত্নাকরের মত (১৩০), চতুর্দ্দশ দেবতার বিবরণ (১৩১), চতুর্দ্দশ দেবতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত (১৩২), চতুর্দ্দশ দেবতার প্রাচীনত্ব (১৩৪), চতুর্দ্দশ দেবতা পাহাড়ীদিগের দেবতা নহে (১৩৫), চন্তাইর বিবরণ (১৩৬), দেওড়াইগণের বিবরণ (১৩৬), চন্তাই ও দেওড়াই পার্ব্বত্য জাতি নহে (১৩৭), শ্রীক্ষেত্রের পূজকগণ (১৩৭), চতুর্দ্দশ দেবতার পূজাবিধি (১৩৯), খার্চ্চি পূজা (১৪৩), কের পূজা (১৪৩), কের পূজার মূল তত্ত্বানুসন্ধান (১৪৪), চতুর্দ্দশ দেবতার প্রভাব (১৪৫), চন্তাইর প্রাধান্য (১৪৬), চতুর্দ্দশ দেবতার সিংহাসন (১৪৭), আরাকান রাজের প্রদত্ত সিংহাসন (১৪৮), নরবলি (১৪৮) **১২৯-১৪৮**

রাজচিহ্ন

রাজলাঞ্ছন (১৪৯), রাজলাঞ্ছনের প্রাচীনত্ব (১৪৯), রাজচিহ্ন সমূহের নাম ও বিবরণ (১৫০), রাজলাঞ্ছনে ব্যবহৃত চিহ্নসমূহের বিবরণ (১৫৫), পঞ্চ-শ্রী ব্যবহারের তাৎপর্য্য (১৫৬), প্রবচন (Motto) (১৫৭), সিংহাসনের আকার ও প্রাচীনত্ব (১৫৭), সিংহাসনের মৌলিকতা নষ্ট হয় নাই (১৫৮), সিংহাসনের অর্চ্চনাবিধি (১৫৮), মাণিক্য উপাধি লাভ (১৫৯), মুসলমান হইতে প্রাপ্ত রাজচিহ্ন (১৬১) **১৪৯-১৬১**

রাজসূয়যজ্ঞে ত্রিপুরেশ্বর

ত্রিপুরেশ্বরের যজ্ঞ-গমনের কথা (১৬১), মহারাজ ত্রিলোচনের হস্তিনাগমন (১৬২), পুরু ও ত্রিপুর বংশের তালিকা (১৬২), বিরুদ্ধবাদিগণের মত খণ্ডন (১৬৫) ...**১৬১-১৭০**

সামরিকবল ও সমর বিবরণ

সৈন্য সংখ্যার আভাস (১৭০), রাজার ভ্রাতা সেনাপতি (১৭১), জামাতা সেনাপতি (১৭২), রণভেরী (১৭২), যুদ্ধাস্ত্র (১৭৩), আগ্নেয় অস্ত্রের প্রচলন (১৭৩), রাজার যুদ্ধ যাত্রা (১৭৩), মহারাজ ত্রিপুরের অভিযান (১৭৩), মহারাজ ত্রিলোচনের অভিযান (১৭৪), অন্যান্য রাজাগণের অভিযান (১৭৪), বঙ্গদেশের প্রতি হস্তক্ষেপ (১৭৫), গৌড়াধীপের সহিত যুদ্ধের সূত্রপাত (১৭৫), মহারাণীর যুদ্ধযাত্রা ও জয়লাভ (১৭৬), যুদ্ধের প্রতিপক্ষ নির্দ্ধারণ (১৭৬), তুগ্রলখাঁ ও জাজনগর (১৭৭), বিজিত গৌড়েশ্বরের অনুসন্ধান (১৭৭), বিজয়শ্রী ভুষিতা মহারাণীর নাম (১৮১), অভিযান ও সৈন্যচালনা (১৮২), সৈনিকগণের উচ্ছৃঙ্খলতা (১৮৩) **১৭০-১৮৪**

রাজ্যের অবস্থা

রাজধানী (১৮৪), কিরাতদেশের প্রথম রাজপাট (১৮৪), খলংমা নামক স্থানে রাজপাট (১৮৪), কৈলাসহরে রাজপাট (১৮৫), ত্রিপুর ও হেড়ম্ব রাজ্যের ব্যবহার (১৮৫), নানাস্থানে রাজধানীর প্রতিষ্ঠা (১৮৫), উদয়পুরে রাজপাট (১৮৬), ডাঙ্গর ফা কর্ত্তৃক রাজ্যবিভাগ (১৮৬), রাজ্য বিস্তার (১৮৭), মহারাজ ত্রিলোচনের শাসনকালে রাজ্য বিস্তার (১৮৭), ত্রিলোচনের পরবর্ত্তীকালের বিবরণ (১৮৭), ত্রিপুরেশ্বরের সহিত গৌড়েশ্বরের যুদ্ধ (১৮৮), ত্রিপুর পর্ব্বতের হস্তীর বিবরণ (১৮৮), আত্মবিরোধ (১৮৮), গৌড়ের সাহায্য গ্রহণ (১৮৮), রত্ন ফা-এর প্রতি ভ্রাতৃবধের অপবাদ (১৮৯), রত্ন ফা-এর সাহায্যকারী গৌড়েশ্বর (১৯১), শাসন তন্ত্র (১৯৩), রাজকর (১৯৩) বাঙ্গালী উপনিবেশ (১৯৩) ...**১৮৪-১৯৪**

রাজগণের কাল নির্ণয়

মহারাজ ত্রিপুর, ত্রিলোচন, ঈশ্বর ফা, চন্দ্রশেখর, যুঝার ফা, ডুঙ্গুর ফা, কীর্ত্তিধর, রত্নমাণিক্য ও প্রতাপ মাণিক্য প্রভৃতি রাজগণের কাল জ্ঞাপক বিবরণ ...**১৯৪-১৯৬**

ত্রিপুরাব্দ

ত্রিপুরাব্দ ও বঙ্গাব্দে পার্থক্য (১৯৭), ত্রিপুরাব্দ সম্বন্ধে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মত (১৯৭), বীররাজ সম্বন্ধীয় প্রচলিত মত (১৯৮), কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মত (২০০), পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত (২০০), বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতার মত (২০৩), মহারাজ প্রতীত সম্বন্ধীয় মত (২০৩), শ্রীহট্টের ইতিহাস প্রণেতার মত (২০৭), অব্দ প্রবর্ত্তক সম্বন্ধীয় শেষ সিদ্ধান্ত (২০৮) **১৯৭-২০৮**

কাতাল ও কাকচাঁদ

কাতাল ও কাকচাঁদের বাসস্থান (২০৯), কৈলাসহরে দুর্ভিক্ষ (২০৯), কাতালের পরিবারবর্গের মৃত্যু (২১০), কাতালের দীঘি (২১০), কাতালের আত্মহত্যা (২১০), কাকচাঁদের দীঘি (২১০), সপরিবারে কাকচাঁদের মৃত্যু, কাতাল ও কাকচাঁদের পরিচয় (২১১) **২০৯-২১১**

অগুরুকাষ্ঠ

কিরাতদেশে অগুরু (২১১), অগুরু বৃক্ষের বিবরণ (২১২), অগুরুর কার্য্যকারিতা (২১২), আগরতলার সহিত অগুরুর সম্বন্ধ (২১৩) **২১১-২১৩**

কিরাত জাতি

কিরাত জাতি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মত (২১৩), শাস্ত্রগ্রন্থে কিরাতের বিবরণ (২১৫), কিরাতভূমির অবস্থান নির্ণয় (২১৫), কিরাত জাতির অবস্থা (২১৫) ... **২১৩-২১৫**

হদার লোক

হদার বিবরণ (২১৬), বাছাল (২১৬), সিউক (২১৭), কুইয়া তুইয়া (২১৭), দৈত্য সিং (২১৭), হুজুরিয়া ও ছিলটিয়া (২১৭), আপাইয়া (২১৮), ছত্রতুইয়া (২১৮), গালিম (২১৮), সেনা (২১৮) **২১৬-২১৮**

রাজমালার উক্তির সহিত শাস্ত্র বাক্যের সাদৃশ্য

সপ্তদ্বীপের বিবরণ (২১৯), নিজের প্রতি দেবত্বের আরোপ (২২০), বিষু সংক্রমণে শ্রাদ্ধ (২২৪), গজকচ্ছপী যুদ্ধ (২২৫), যদুবংশ ধ্বংসের বিবরণ (২২৮), রণক্ষেত্রে কবন্ধ দর্শন (২৩১), মণ্ডল (২৩২), দেবতার দর্শন লাভ (২৩৪) ... ... **২১৯—২৩৬**

রাজমালায় উল্লিখিত স্থানসমূহের নাম ও বিবরণ ... ... **২৩৭—২৭৪**

রাজমালায় উল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম ও বিবরণ ... ... **২৭৪—২৯৬**

চিত্র-সুচী

১। শ্রীশ্রীচন্দ্রমাদেব — মুখপত্র
২। স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য — ”
৩। রাজমালার প্রথম পৃষ্ঠা — ৯০
৬। বাণেশ্বর ছেগার ভূমি সম্বন্ধীয় আদেশ লিপি — ৮০
৭। ধর্ম্মসাগরের চিত্র — ৮১
৮। বিবাহ বেদী — ৯২
৯। স্বর্গীয় মহারাজ রামেশ্বর সিংহ ও স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য — ৯৬
১০। বয়নতা কুকি বালিকাদ্বয় — ১১৬
১১। পীঠদেবী শ্রীশ্রীত্রিপুরা সুন্দরী — ১২৬
১২। শ্রীশ্রীচতুর্দ্দশ দেবতা — ১৩১
১৩। চঁতুর্দ্দশ দেবতার প্রাচীন মন্দির — ১৩৪
১৪। উক্ত দেবতার আধুনিক মন্দির — ১৩৫
১৫। শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চন্তাই — ১৩৬
৪। রাজগণের কাল নির্ণায়ক প্রাচীন লিপি — ৫।/৹
৫। কিরাত যুবকগণ — ১৮
১৬।, ১৭।, ১৮। চতুর্দ্দশ দেবতা বিগ্রহ — ১৩৯-১৪৩
১৯। চঁতুর্দ্দশ দেবতার সিংহাসনস্থিত তাম্র ফলক — ১৪৭
২০। চঁতুর্দ্দশ দেবতার সিংহাসন — ১৪৮
২১। চন্দ্রধ্বজ ও ত্রিশূলধ্বজ ধারীদ্বয় — ১৫০
২২। মাই মূরত ধারী — ১৫২
২৩। শ্বেত ছত্রধারী — ১৫৩
২৪। আরঙ্গী, তাম্বুলপত্র ও পাঞ্জাধারী — ১৫৫
২৫। রাজ-লাঞ্ছন — ১৫৬
২৬। ত্রিপুর সিংহাসন — ১৫৮
২৭। শ্বেত পতাকা ধারীদ্বয় — ১৫৮
২৮। আসা ও সোটা ধারী — ১৬১

মানচিত্র

১। সম্রাট যযাতি কর্ত্তৃক পুত্রগণ মধ্যে বিভক্ত ভারতবর্ষ — ১।/৯্
২। প্রাচীন ত্রিবেগ রাজ্য ও সগর দ্বীপ — ৩৯্
৩। দ্বিতীয় ত্রিবেগ বা ত্রিপুরা রাজ্য — ৫্
৪। প্রাচীন কিরাত দেশ — ২১৫

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ত্রিপুরা রাজ্যের সার্ভে সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার কর মহাশয় ৩ নম্বর মানচিত্রখানা অঙ্কন করিয়া দিয়াছেন। এবং পঞ্চ শ্রীযুক্ত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের নিয়োজিত চিত্র-শিল্পী সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পট অঙ্কন করিয়াছেন। এই সৌজন্যের নিমিত্ত তাঁহাদের নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিব।

শ্রীকালী প্রসন্ন সেন।

শ্রীরাজমালা

(প্রথম লহর)

বিষয়—যযাতি হইতে মহামাণিক্য পর্য্যন্তের বিবরণ।
বক্তা—বাণেশ্বর, শুক্রেশ্বর ও দুর্ল্লভেন্দ্র চন্তাই।
শ্রোতা—মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য।
রচনাকাল—খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

ওঁ নমঃ সরস্বত্যৈ

শ্রীরাজমালা

(প্রথম লহর)

মঙ্গলাচরণ

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।।

নমো নারায়ণ দেব প্রভু নিরঞ্জন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের পরম কারণ।।
গুণত্রয়[১] বিভিন্ন হৈলে মূর্ত্তি হৈয়ে হরি।
করিছে অপার লীলা দশরূপ[২] ধরি।।
আদ্য[৩] অন্ত[৪] মধ্য[৫] তিন পুরুষ প্রধান[৬]।।
ব্রহ্মা আদি দেবে অবিরত করে ধ্যান।।
বেদাগম পুরাণাদি শাস্ত্র যত তন্ত্র।
আধার আধেয় ধর্ম্মাধর্ম্ম যোগ মন্ত্র।।

১। গুণত্রয়—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ। সত্ত্বগুণে জগৎ প্রতিপালিত, রজোগুণ প্রভাবে সৃষ্টি এবং তমোগুণ দ্বারা ধ্বংস হইতেছে।

২। দশরূপ—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি ভগবানের দশ অবতার।

৩। আদ্যপুরুষ—সৃষ্টিকর্ত্তা অর্থাৎ ব্রহ্মা।

৪। অন্তপুরুষ—সংহারকর্ত্তা অর্থাৎ শঙ্কর।

৫। মধ্যপুরুষ—পালনকর্ত্তা অর্থাৎ বিষ্ণু।

৬। এস্থলে নারায়ণকে আদ্য, অন্ত ও মধ্য এই তিন পুরুষের প্রধান অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ত্রিগুণান্বিত বলা হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্‌ও তাহাই বলিয়াছেন, যথা ঃ—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ।।"

গীতা—১০ম অঃ, ২০শ শ্লোক।

"হে গুড়াকেশ, সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত আত্মা আমি, এবং আমিই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশস্বরূপ; অর্থাৎ আমিই জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যুর কারণ।"

অন্য চরাচর যত স্থাবর জঙ্গম।
সব তব ভব[১] স্থিতি[২] ধ্বংস[৩] নরোত্তম।।
নিরাকার রূপা[৪] নিত্যানন্দ ব্রহ্মময়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড[৫] রোমকূপে হয়[৬]।।
মহাকাল পুরুষ বলিয়া কহে সবে।
হরিকৃষ্ণ বিষ্ণুনাম বলয়ে বৈষ্ণবে।।
নারায়ণ হৃষীকেশ অনন্ত অব্যয়[৭]।
শৈবে বলে শিব শম্ভু হর মৃত্যুঞ্জয়।।

১। ভব,---সৃজন। ২। স্থিতি---পালন। ৩। ধ্বংস---প্রলয়।

৪। নিরাকার রূপ---অনিয়ত রূপবিশিষ্ট, অর্থাৎ ভগবানের কোন নির্দিষ্ট রূপ নাই, যখন যে রূপ ইচ্ছা পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এতদ্বিষয়ে ঋগ্বেদ বলেন,---

"চতুর্ভিঃ সাকং নবতিং চ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্তং ব্যতীরবীবিপৎ।
বৃহচ্ছরীরো বিমিমান ঋক্বভির্যুবা কুমারঃ প্রত্যেত্যাহবং।।"
ঋগ্বেদ---১ম মণ্ডল, ১৫৫ সূক্ত, ৬ ঋক্।

"বিষ্ণু গতিবিশেষ দ্বারা বিবিধ স্বভাববিশিষ্ট, চতুর্নবতি কালাবয়বকে চক্রের ন্যায় বৃত্তাকারে চালিত করিয়াছেন। বিষ্ণু বৃহৎ শরীরবিশিষ্ট হইয়াও স্তুতিদ্বারা পরিমেয়। তিনি যুবা, অকুমার এবং আহ্বানে আগমন করেন।"

অন্যত্র পাওয়া যাইতেছে,---

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈব আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্।।"
কঠোপনিষদ্---১ম অঃ, ২য় বল্লী।

"যিনি পরমাত্মাকে পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন, পরমাত্মা তাঁহার নিকট নিজপারমার্থিকী তনু প্রকাশ করিয়া থাকেন।"

উপাসকগণের দ্বারাও ভগবানের রূপ কল্পিত হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে মহানির্ব্বাণতন্ত্রে লিখিত আছে,---

"উপাসকানাং কার্য্যায় পুরৈব কথিতং প্রিয়ে।
গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্।।"
মহানির্ব্বাণতন্ত্র---১৩শ উল্লাস।

৫। ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড---ব্রহ্মাণ্ডের আধার। ৬। ভগবানের প্রতিরোমকূপে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড অবস্থান করিতে পারে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান স্বয়ং এবিষয়ে বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং একান্ত অনুরক্ত ভক্ত অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া স্বীয় অসীমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ৭। অব্যয়---নিত্য।

শক্তিরূপে ভজিলে কালিকা দুর্গা বলে।
ব্রহ্মা না পাইছে অন্ত যোগধ্যান-বলে।।
কায়-মন-বাক্যে বন্দি হরিপদ-দ্বন্দ্ব।
বিরচিব রাজমালা পয়ার প্রবন্ধ।।
তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসতি তত্র যত্রাচ্যুতোদার কথাপ্রসঙ্গঃ।।
ইতি প্রথমারম্ভে কাত্যায়নীধ্যায়ঃ।।[১]

প্রস্তাবনা

ত্রিলোচনবংশে মহামাণিক্য নৃপতি[২]।
তান[৩] পুত্র শ্রীধর্ম্মমাণিক্য নামখ্যাতি।।
বহুধর্ম্মশীল রাজা ধর্ম্মপরায়ণ।
ধর্ম্মশাস্ত্র ক্রমে প্রজা করিছে পালন।।
এককালে মহারাজা বসি ধর্ম্মাসনে।
রাজবংশাবলী কীর্ত্তি শ্রবণেচ্ছা মনে।।
দুর্ল্লভেন্দ্র নাম ছিল চন্তাই[৪] প্রধান।
চতুর্দ্দশ দেবতা[৫] পূজাতে দিব্য জ্ঞান।।
ত্রিপুরের বংশাবলী আছএ অশেষ।
রাজকুল-কীর্ত্তি সব জানেন বিশেষ।।
বাণেশ্বর শুক্রেশ্বর দুই দ্বিজবর।
আগমাদি তন্ত্রতত্ত্ব জানেন বিস্তর।

১। নারায়ণের স্তুতিবাদ লিপি করিয়া, পরিশেষে ‘‘কাত্যায়নীধ্যায়ঃ’’ লিখিবার সার্থকতা উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য।

২। মহামাণিক্য, ত্রিলোচনের অধস্তন একাধিকশততম স্থানীয়, বংশলতা আলোচনায় ইহা প্রতিপন্ন হইবে।

৩। তান---তাঁহার। ‘তাহার’ শব্দ সাধারণতঃ ‘তার’ বলা হয়। সম্ভ্রমার্থে ‘তান’ করা হইয়াছে।

৪। চতুর্দ্দশ দেবতার প্রধান পূজককে ‘চন্তাই’ বলা হয়। ইনি ত্রিপুরারাজ্যে লর্ডবিশপের স্থানীয়।

৫। ইহা ত্রিপুররাজবংশের কুলদেবতা, এই লহরের পরবর্ত্তী টীকায় এতদ্বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

রাজমালিকা[১] আর যোগিনী-মালিকা[২]।
বারণ্যকায় নির্ণয়াদি[৩] লক্ষণ-মালিকা[৪]।।
হরগৌরী সম্বাদ হইল ভস্মাচলে[৫]।
নবখণ্ড বর্ষাদিতে বলিছে কুতূহলে[৬]।।
এই চারি তন্ত্রে আছে রাজার নির্ণয়।
তিনেতে জিজ্ঞাসা রাজা করে এ বিষয়।।
তারা তিনে কহে রাজা কর অবধান।
তোমার বংশের কথা নিশ্চয় প্রমাণ।।
ভাষাতে[৭] না কহি তন্ত্র তাতে পাপ হয়।
ত্রিপুর ভাষাতে চন্তাই রাজাতে কহয়।।
চন্তাই কহিল তত্ত্ব শুনে নরপতি।
ত্রিপুরবংশ যে মতে হইছে উৎপত্তি।।

১। রাজমালিকা—ইহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস। পণ্ডিত মুকুন্দ কর্ত্তৃক ১৬৭৪ শকে উক্ত গ্রন্থের এক সংক্ষিপ্তসার সংগ্রহ হইয়াছিল, তাহা সংস্কৃত রাজমালা' নামে অভিহিত হইয়াছে। মূল রাজমালিকা গ্রন্থ বর্ত্তমান কালে দুষ্প্রাপ্য।

২। যোগিনী-মালিকা—বহু অনুসন্ধানেও এই গ্রন্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ এই নামে রাজলক্ষণ সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ ছিল। যোগিনীতন্ত্র হওয়াও বিচিত্র নহে।

৩। বারণ্যকায়নির্ণয়—বর্ত্তমান কালে এই গ্রন্থের অস্তিত্ব নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহা হস্ত্যায়ুর্ব্বেদেরে ন্যায় কোন প্রাচীন গ্রন্থ হইতে পারে। "বারণ্যকায়নির্ণয়" ও "হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ" এতদুভয়ে অর্থগত সাদৃশ্য থাকিলেও ইহাতে 'রাজার নির্ণয়' সম্ভাবনা কি থাকিতে পারে, বুঝা যায় না।

৪। লক্ষণ-মালিকা—ইহা রাজলক্ষণসমন্বিত গ্রন্থ বলিয়া মনে হয়। ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালে কিছু জানিবার উপায় নাই।

৫। ভস্মাচল—ইহা কামাখ্যার একটী পর্ব্বত। এই স্থানে মহাদেবের নয়নাগ্নিতে কামদেব ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, এই জন্য ইহার 'ভস্মাচল' নাম হইয়াছে। যোগিনীতন্ত্রের মতে হয়াচলের পূর্ব্ব ও ঈশান দিগ্‌ভাগে এই পর্ব্বত অবস্থিত।

৫-৬। এই পংক্তিদ্বয়ের অর্থ এইরূপ বুঝা যাইতেছে,—বৎসরের প্রথম ভাগে ভস্মাচলে হর-পার্ব্বতীর মধ্যে যে কথোপকথন হয়, তৎকালে এই নবখণ্ড (নূতনখণ্ড রাজবিবরণ) বলা হইয়াছিল। অর্থাৎ হরগৌরীসংবাদ ছলে রাজমালা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। এই পদ্ধতির দৃষ্টান্ত অন্যত্রও বিরল নহে। নূতন পঞ্জিকা প্রণয়নে ইহা অনুসৃত হইয়া থাকে, যথা :— "হর প্রতি প্রিয় ভাষে কহে হৈমবতী" ইত্যাদি। আমাদের এই ধারণা রাজমালার নিম্নোক্ত বচন দ্বারা সমর্থিত হইতেছে ;—

"যাহা জিজ্ঞাসিলা নৃপ বলি তত্ত্বসার।
জন্মিব বিশিষ্ট রাজা বংশে ত্রিপুরার।
হরগৌরীসংবাদেতে কহিছে শঙ্কর।" ইত্যাদি।
রত্নমাণিক্য খণ্ড।

৭। ভাষাতে—বঙ্গ ভাষাতে। পূর্ব্বে 'ভাষা' ও 'প্রাকৃত' শব্দ দ্বারা বাংলা ভাষাকে লক্ষ্য করা হইত।

গ্রন্থারম্ভ

চন্দ্রবংশে মহারাজা যযাতি নৃপতি।
সপ্তদ্বীপ[১] জিনিলেক একরথে গতি[২]।।
তান পঞ্চ সুত বহুগুণযুত গুরু[৩]।
যদুজ্যেষ্ঠ তুর্ব্বসু যে দ্রুহ্যু অনু পুরু।।
শুক্রকন্যা দেবযানী গর্ব্ভে পুত্রদ্বয়।
রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ব্ভে তিন হয়।।
দৈবগতি ভূপতিকে শুক্রে পাপ দিল।
পিতৃজরা দিতে পুত্র সভেতে যাচিল।।
জ্যেষ্ঠ চারিপুত্রে তান না রাখিল কথা।
মহারাজ যযাতি পাইল মনে ব্যথা।।
পিতৃবাক্য গুরু মানি পুরুএ রাখিল।
হস্তিনাতে পুরু রাজা সে হেতু হইল।।
মথুরা রাজ্যেতে দিয়া যদুকে রাখিল।
তুর্ব্বসু যবনরাজ্যে নৃপতি হইল।।
বৃষর্ব্বার কন্যা যে শর্ম্মিষ্ঠা তনয়।
দ্রুহ্যু নাম রাজা হৈল কিরাত আলয়।।

১। সপ্তদ্বীপ––জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুস, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর এই সপ্তদ্বীপ। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে, সূর্য্যদেব সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন, এই জন্য অর্দ্ধেক পৃথিবী আলোকপ্রাপ্ত হয়, আর অর্দ্ধেক অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। রাজা প্রিয়ব্রত তপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত হইয়া 'সূর্য্যরথতুল্য বেগশালী ও জ্যোতির্ম্ময় রথদ্বারা রজনীকেও দিন করিব ; এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সপ্তবার দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় সূর্য্যের পশ্চাতে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইঁহার রথনেমি হইতে সপ্ত সমুদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল, এই সপ্ত সমুদ্র হইতে পূর্ব্বোক্ত সাতটী দ্বীপ সৃষ্ট হইয়াছে। (শ্রীমদ্ভাগবত––৫ম স্কন্ধ।)

২। একরথে গতি––অপ্রতিহত গতি। গতিরোধ করিবার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।

৩। গুরু––শ্রেষ্ঠ, সম্মানার্হ।

৪। যযাতির রাজধানী হস্তিনাপুরে ছিল না। যযাতির বহু পরবর্ত্তী মহারাজ হস্তী কর্ত্তৃক 'হস্তিনাপুর' স্থাপিত হইয়াছে। পুরূরবা হইতে আরম্ভ করিয়া বহুপুরষ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠানগরে চন্দ্রবংশীয় রাজগণের রাজপাট স্থাপিত ছিল, পূর্ব্বভাষে এতৎসম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গিয়াছে।

অনুকে যে রাজা করিলেন পূর্ব্ব দেশে।
এই ক্রমে সব দূর কৈল মনরোষে[১]।।
ত্রিবেগ স্থলেতে দ্রুহ্যু নগর করিল।
কপিল নদীর তীরে রাজ্যপাট ছিল।।
উত্তরে তৈরঙ্গ নদী দক্ষিণে আচরঙ্গ।
পূর্ব্বেতে মেখলী সীমা পশ্চিমে কোছ বঙ্গ[২]।।

দৈত্য খণ্ড

দ্রুহ্যু বংশে দৈত্য রাজা[৩] কিরাত নগর।
অনেক সহস্রবর্ষ হইল অমর।।
বহুকাল পরে তান পুত্র উপজিল।
ত্রিবেগেতে জন্ম নাম ত্রিপুর রাখিল[৪]।।
জন্মাবধি না দেখিল দ্বিজ সাধু ধর্ম্ম।
সেই হেতু ত্রিপুর হইল ক্রূরকর্ম্ম।।
দান ধর্ম্ম না দেখিল আগম পুরাণ।
বেদ শাস্ত্র না পাঠিল নাহি কোন জ্ঞান।।
দীক্ষিত না হৈল দেবগুরু না চিনিল।
সল্লোকের ব্যবহার কিছু না দেখিল।।
কিরাতপ্রকৃতি হৈল কিরাত-আচার।
সাধু সঙ্গ না ঘটিল কখনে তাহার।।
পুত্রের চরিত্র দেখি দৈত্য মহারাজা।
নিজ কর্ম্ম স্মরি বনে দিছে পিতা প্রজা।।

১। এতদ্বিষয়ক পুরাণোক্ত বিবরণ পূর্ব্বভাবে দ্রষ্টব্য।

২। রাজ্যের সীমা সম্বন্ধে পূর্ব্ব-ভাষের বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

৩। “দ্রুহ্যুবংশে দৈত্যরাজা’ এই উক্তিদ্বারা অনেকে দৈত্যকে দ্রুহ্যুর অপত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ; এই ধারণা নিতান্ত ভ্রমমূলক। দৈত্য, দ্রুহ্যুর অধস্তন ৩৮শ স্থানীয়। (বংশলতা দ্রষ্টব্য)।

৪। সংস্কৃত ভাষায় “পুর” শব্দের অর্থ প্রবাহ বা বেগ। ত্রিবেগ নগরী তিনটী নদীর সন্নিহিত ছিল, এবং সেই স্থানে জন্ম হওয়ায় নাম ত্রিপুর হইয়াছিল, ক্রমে বর্ণবিন্যাসের পরিবর্ত্তনে ‘ত্রিপুর’ হইয়াছে, কেহ কেহ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ত্রিবেগের বিবরণ পূর্ব্বভাষে দ্রষ্টব্য।

কিরাত আলয় সব অগ্নিকোণ দেশ।
এই রাজ্য পিতা আমা দিয়াছে বিশেষ[১]।।
আর্য্যাবর্ত্ত[২] হৈতে ভূমি নাহি পৃথিবীতে।
ত্রৈলোক্যদুর্ল্লভ স্থল জগত বিদিতে।।
যে স্থানে জন্মিতে ইচ্ছা করে দেবগণ।
সাধুসঙ্গ লভে ধর্ম্ম ত্যাজিয়া গগন[৩]।।
অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী অবন্তিকা।
উৎকল নৈমিষারণ্য মায়াদি দ্বারিকা।।
তীর্থরাজ গঙ্গা হরিদ্বার মুখ্য ধাম।
কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র অবন্তিকা নাম[৪]।।
সিন্ধু সঙ্গ প্রয়াগাদি নানা তীর্থস্থান।
ধন্য মাণিকর্ণিকাদি তীর্থের প্রধান।।
এ সব তীর্থের নাম লএ যেই জন।
প্রভাতে জাগিয়া যেবা করএ শ্রবণ।।
সে জনে পরম পদ পাএ[৫] অন্তপরে[৬]।।
যমভয় নাহি তার পুণ্য কলেবরে[৭]।।
হরিপদ প্রাপ্তির যে এ সব কারণ।
দৃঢ়ভক্তি করি সবে করহ শ্রবণ।।

১। পাঠান্তর—"পুত্রের চরিত্র দেখি দৈত্য মহারাজা।
চিন্তায়ে দুঃখিত, বোলে বাপে দিছে প্রজা।।
কিরাত-আলয় যত অগ্নি কোণ দেশে।
ভালো রাজ্য বাপে মোরে দিয়াছে বিশেষে।।
কতেক জন্মের আছে পাপের সঞ্চয়।
তে কারণে বাপে দিছে কিরাত আলয়।।"

কিরাত দেশের অবস্থান সম্বন্ধে এই লহরের টীকায় লিখিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

২। আর্য্যাবর্ত্ত—উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত প্রদেশ।

৩। ধর্ম্ম, স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে আসিয়া সাধুসঙ্গ লাভ করেন।

৪। পাঠান্তর—'সাগরসঙ্গম গঙ্গা পুণ্য আদি করি।
কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র অবন্তিকা পুরী।।'

৫। পাএ—পায়, প্রাপ্ত হয়।

৬। অন্তপরে—অন্তের পর অর্থাৎ মৃত্যুর পর।

৭। তাঁহার পুণ্য শরীরে যমের ভয় থাকে না, অর্থাৎ সেই পুণ্যাত্মার প্রতি যমের অধিকার থাকে না। তিনি বিষ্ণুলোকে যাইয়া পরমপদ (সদগতি) লাভ করেন।

এইমাত্র দেখিতেছি কিরাত-আলয়।
ভয়ঙ্কর পশু যত সিংহের উদয়।।
নারায়ণ বিষ্ণু তথা পুরাণ শ্রবণ।
যতেক (যথায়?) সকলতীর্থ তথা সর্ব্বক্ষণ[১]।
বেদবেদাঙ্গের তত্ত্ব বঙ্গা নাহি সঙ্গে।
পুত্র আমা[২] মূর্খ হৈল কে পঠাবে রঙ্গে[৩]।।
এই সব দুঃখে রাজা চিন্তিত হইল।
পঠাইতে যত্ন কৈল পুত্রে না পঠিল।।
অনেক সহস্র বর্ষ রাজ্য করি ভোগ।
পুত্রে সমর্পিল রাজ্য মনে বাঞ্ছা যোগ[৪]।।
বনে গিয়া যোগ সাধি রাজা মৃত্যু হৈল।
তান পুত্র ত্রিপুর কিরাতপতি ছিল।।
ইতি দৈত্যখণ্ডে দৈত্যস্বর্গারোহণ।
কথনং

ত্রিপুর বংশের আখ্যান

শ্রীধর্ম্মমাণিক্য রাজা পরে জিজ্ঞাসিল।
ক্ষত্রিয়বংশেতে কেন ত্রিপুর নাম হৈল।।
চন্তাই কহে মহারাজা তাহা বলি আমি।
যেইমতে ক্ষত্রিয় বংশে ত্রিপুর হৈলা তুমি।।
দক্ষকন্যা সতী অঙ্গ পতন যে স্থানে।
মহাপীঠ নির্ণয় মুনি বলিছে পুরাণে।।
শিববাক্য পীঠমালা তন্ত্রের প্রমাণ।
যেইরাজ্যে যেই অঙ্গ সেই পীঠস্থান।।

১। নারায়ণের প্রসঙ্গ এবং পুরাণ শ্রবণ প্রভৃতি এবং সমস্ত তীর্থ তথায় (আর্য্যাবর্ত্তে) সর্ব্বক্ষণ আছে।
২। আমা—আমার।
৩। রঙ্গে—আহ্লাদের সহিত।
পাঠ্যন্তর—(১) পুত্র হইল মূর্খ কে পাঠাইব বঙ্গে।
(২) পুত্র হইল মূর্খ মোর কে পঠাইব রঙ্গে।।
৪। যোগসাধনের বাঞ্ছা হওয়ায় পুত্রের প্রতি রাজ্য ভার অর্পণ করিলেন।

সেই রাজ্যে একদেবী ভৈরব আর জন।
দুই নামে পীঠস্থান করে নিরূপণ[১]।।

অথ পীঠমালাতন্ত্রপ্রমাণশ্লোকঃ
ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী।
ভৈরবস্ত্রিপুরেশশ্চ[২] সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কঃ।।

পদবন্ধ

সতীর দক্ষিণ পদ পড়ে ত্রিপুরাতে।
ত্রিপুরাসুন্দরী খ্যাতি ত্রিপুর ভূমিতে।।
ত্রিপুরেশ নাম শিব ত্রিপুরা রাজ্যেতে।
তান বরে ত্রিলোচন ত্রিপুর পত্নীতে[৩]।।
সেই সে কারণে ক্ষত্রী ত্রিপুর জাতি বলে।
অবধান কর রাজা মন কুতূহলে।।
ত্রিপুর বংশের প্রমাণ আর যথোচিত।
পঞ্চবেদ মহাভারত প্রমাণ লিখিত।।
মহাভারতের সভাপর্ব্বেতে লিখিছে।
সহদেব দিগ্বিজয় দক্ষিণে গিয়াছে।।

অথ শ্লোকঃ সভাপর্ব্বণি।
ত্রিপুরং স্ববশে কৃত্বা রাজানমোমিতৌজসম্।
নিজগ্রাহমহাবাহুস্তরসা পৌরবেশ্বরঃ।।

তথার পয়ার

ত্রিপুরাকে বশ করি রাজা মহৌজস।
আনিলেক মহাবাহু পৌরবেশ্বর বশ।।
ভীষ্মপর্ব্বে অষ্টম দিবস ভীষ্মরণে।
ব্যূহরচনের মধ্যে সব রাজাগণে।।

অথ প্রমাণং ভীষ্মপর্ব্বণি।
প্রাগ্‌জোতিষাদনু নৃপঃ কোশলোহথ বৃহদ্বলঃ।।
মেখলৈস্ত্রৈপুরৈশ্চৈব বর্ব্বরৈশ্চ সমন্বিতঃ।।

১। পীঠস্থান সম্বন্ধীয় বিবরণ এই লহরের টীকায় লিখিত হইল।

২। কোন কোন তন্ত্রে ভৈরবের নাম নল লিখিত হইয়াছে। এরূপ মতদ্বৈধের কারণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। "ভৈরবস্ত্রিপুরেশশ্চ" এই বাক্যদ্বারা কেহ কেহ মনে করেন, ত্রিপুরায় অন্য ভৈরব নাই, ত্রিপুরাধিপতিই ভৈরবস্থানীয়। ইহা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা, উদয়পুর বিভাগীয় অফিসের সন্নিকটে ভৈরবের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। দেবালয়কে শিবের বাড়ী বলে।

৩। পাঠান্তর :—সে ঔরসে ত্রিলোচন ত্রিপুরপত্নীতে।

অথ শ্লোকের পয়ার।

প্রাগ্‌জ্যোতিষদনু আর কোশল নৃপগণ।
মেখল ত্রিপুর বর্ব্বর রাজাতে বেষ্টন।
এইত কহিল ত্রিপুরবংশের আখ্যান।
বেদে তন্ত্রে ধরিয়াছে যেমন প্রমাণ।

ত্রিপুর খণ্ড

দৈত্য মৃত্যুপরে রাজা নামেতে ত্রিপুর।
কিরাত প্রকৃতি ছিল ধর্ম্ম হৈল দূর।।
অনেক বৎসরাবধি কৈল রাজ্যপীড়া।
যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা অবিরত মারে হস্তী ঘোড়া।।
অন্যত্র[১]। নৃপতি নাহি পারে যুদ্ধ বলে।
সকলেরে জয় করে নিজ বাহুবলে।।
পর্ব্বতবাসীয় আছে যত নৃপগণ।
আপনার বশ কৈল[২] সে সব রাজন্।।
ধর্ম্মের নাহিক লেশ অধর্ম্মে মজিল।
অল্প অপরাধে প্রাণী অনেক বধিল।।
কাট মার বিনে শব্দ নাহিক তাহার।
ক্রোধযুক্ত অভিমান বহু অহঙ্কার[৩]।।
আপনাকে আপনে দেবতা করে জ্ঞান।
মানা করে অনেক যদি করে যজ্ঞ দান।।
অকর্ম্মেতে অবিরত স্থির নাহি মতি।
অবিচার যত তার নাহি এত স্ফিতি[৪]।।
পরনারী পরধন হরে বলাৎকারে[৫]।
যদি বাদী হয় কেহ তখনে সংহারে।।

১। অন্যত্র—অন্য স্থানের।
২। কৈল—করিল।
৩। রাজা ক্রোধযুক্ত, অভিমান্য এবং নিতান্ত অহঙ্কারী ছিলেন।
৪। তাঁহার যত অবিচার ছিল, তদ্রূপ অবিচার পৃথিবীতে নাই।
৫। বলাৎকারে—বলপ্রয়োগদ্বারা।

অনেক বৎসর সে যে ছিল এইমতে।
দ্বাপর শেষেতে শিব আসিল দেখিতে।।
আপনা হইতে সে যে না জানিল বড়।
কালবশ হৈল রাজা না চিনে ঈশ্বর।।
তাহা দেখি কুপিত হইল পশুপতি।
সকল মঙ্গল শিব নাহি অব্যাহতি।।
ব্রজসম হৃদয় জগত করে ক্ষয়।
যত সৃষ্টি করিয়াছে করিছে প্রলয়।।
বজ্রতুল্য হৃদয়েতে বজ্র অস্ত্র দিয়া।
দুষ্ট মারি সাধু সব রাখে বাঁচাইয়া।।
মারিলেক শূল অস্ত্র হৃদয় উপর।
শিবমুখ হেরি রাজা ত্যাজে কলেবর।।
স্বর্গে গেল ত্রিপুর শিবের হস্তে মরি।
তার[১]যত প্রজাগণ খায় ভিক্ষা করি।
হেড়ম্ব রাজ্যেতে[২] যাইয়া সকল রহিল।
বহু কষ্ট করি সবে কাল কাটাইল।।
বস্ত্রাভাবে তারা সবে বৃক্ষছাল পৈরে[৩]।
আর এক দিনে গেল ভিক্ষা করিবারে।।
হেড়ম্ব সকলে ভিক্ষা কেহ নাহি দিল।
বহু গালি দিয়া তারা দুঃখিত করিল।।

১। তার—তাঁহার।   ২। হেড়ম্বরাজ্য,—কাছাড়প্রদেশ। বর্ত্তমান কাছাড় জেলার উত্তরে কপিলি ও দিয়ং নদী, পূর্ব্বে মণিপুর ও নাগা পাহাড়, দক্ষিণে লুসাই পর্ব্বতমালা, পশ্চিমে শ্রীহট্ট ও জয়ন্তী পাহাড়। এই প্রদেশের প্রধান নদী বরবক্র (বরাক), রণচণ্ডী এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। শাস্ত্রগ্রন্থে নিম্নোক্ত বিবরণ পাওয়া যায় ;—

"হেড়ম্বদেশমধ্যে চ রণচণ্ডী বিরাজতে।
বরবক্রা-সরিৎপার্শ্বে হিড়িম্বা লোকদুর্জ্জয়া।"

ভবিষ্যপুরাণ—ব্রহ্মখণ্ড, ২২।৪১।

ভীমপুত্র ঘটোৎকচ কর্ত্তৃক হেড়ম্বরাজ্য স্থাপিত হয়। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কর্ণ কর্ত্তৃক নিহত হইবার পর, তাঁহার বংশধরগণ দীর্ঘকাল এখানে রাজত্ব করিয়াছেন। কাছাড়ের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি কমিশনার এডগার সাহেবের মতে নির্ভরনারায়ণ কাছাড়রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই মতদ্বৈধের আলোচনা এস্থলে অনাবশ্যক।

৩। পৈরে—পরিধান করে।

এই মতে গালি সবে শুনি বহুতর।
লজ্জা পাই আসিলেক পাত্র মন্ত্রীবর।।
দুঃখমনে লোকে কহে জীবন কি কাজ।
চল যেই পথে গেছে ত্রিপুরার রাজ।।
জীবনেতে ধিক্ ধিক্ ধিক্ ভিক্ষা করি।
মন্ত্রণা করিল সবে ভিক্ষা পরিহরি।
ফলবন্ত বৃক্ষ যেন পড়িলে বাতাসে।
ফল ছায়া গেলে পক্ষী যায়ে অন্য দেশে।।
সৈন্যগণ চলিল সকলে ধীরে ধীরে।
ত্রিপুরার রাজ্যে রাজা করিব স্বত্বরে।।
অপরাধ দুঃখভোগ করিল বিস্তর।
কার্য্যসিদ্ধি হবে সবে ভজিলে শঙ্কর।।
মন্ত্রণা করিয়া দৃঢ় নিশ্চয় করিল।
একত্র হইয়া সবে পর্ব্বতে চলিল।।
কিরাতের মতে সবে পূজা আরম্ভিয়া[৩]।
বলিদান কৈল বহু ছাগ আদি দিয়া।।
সপ্তদিন সপ্তরাত্রি উৎসব করিল।
কিরাতের মতে যন্ত্রে গীত বাদ্য কৈল।।

শিবের বরপ্রদান

শিবের বরপ্রদান
ত্রিনয়ন পঞ্চানন আশুতোষ শিব।
বহু কষ্ট পাইতেছে দেখি সব জীব।।
সকল মঙ্গলালয় ভগ-ভগবান্।
প্রসঙ্গ হইয়া আসে পূজা যেই স্থান।।
বৃষভ বাহন ভস্ম বিভূষিত অঙ্গ।
শিরেতে পিঙ্গল জটা গঙ্গার তরঙ্গ।।

পরে হর ব্যাঘ্রাম্বর গলে ফণি-হার।
অর্দ্ধ-চন্দ্র ললাটে ত বিরাজ যাহার।।
হস্তে শিঙ্গা ডম্বরু যে ধীরে ধীরে বাজে।
নন্দী ভৃঙ্গী রঙ্গে সঙ্গে বিরাজিত সাজে।
পূজাস্থানে আসিলেন অখিলের নাথ।
দেখি দণ্ডবৎ হৈল ত্রিপুরা অনাথ[১]।।
পুলকিত হৈয়া সবে করুণা[২] করিয়া।
নিজ নিবেদন কৈল করযোড় হৈয়া।।
আমাদিগে[৩] অপরাধ হইছে বিস্তর।
দয়া করি রক্ষা কর অধম কিঙ্কর।।
নাহি সহে আর দুঃখ পাপ কলেবর।
ভিক্ষা করি প্রাণ রাখিয়াছি ঘরে ঘর।।
ত্রিপুরে করিছে পাপ ফল ভোগি ভার।
দয়াময় দয়া হয়[৪] করহ উদ্ধার।।
রাজাহীন রাজ্য প্রজা কে তাকে পালিব[৫]।
লক্ষ্যহীন জন সব রক্ষা কর শিব।।
মহাবৃক্ষ পড়িলে যে ফল ছায়া যায়ে।
বৃক্ষমূল নিবাসীয়ে বহু দুঃখ পায়ে।।
সরোবর শুকাইলে যেন মরে মীন।
অনাথিনী নারী যেন স্বামীর বিহীন।।
বলহীন মৃগ যেন কুক্কুরে যে ধরে।
যুদ্ধে ভয় করে যেন অল্পবল নরে।।
পিতা মাতা মৈলে স্থল ঘটে যে বিস্তর।
রাজাহীন রাজ্যে বাস বড়হি দুষ্কর।।
ত্রিপুর মরিল সবে বড় দুঃখ পাই।
দেশে দেশে যাইয়া সবে ভিক্ষা করি খাই।।

১। ত্রিপুরা অনাথ—সহায়হীন ত্রিপুরা।
২। করুণা—ইহা করুণ অর্থবোধক। করুণা করিয়া—শোকার্ত্ত হইয়া।
৩। আমাদিগে—আমাদের।
৪। দয়া হয়—দয়া করিয়া।
৫। পালিব—পালন করিবে।

বৃক্ষ ছাল পৈরি[১] গেলা ভিক্ষা করিবারে।
না দিয়া হেড়ম্বে ভিক্ষা ফিরি গালি পারে।।
যত অপরাধ কৈল পাইল তার ফল।
অপরাধ ক্ষম প্রভু হইছি বিকল।।
প্রসন্ন হৃদয় হয়[২] ত্রিলোকের পতি।
রাজা এক দেহ সবে পাই অব্যাহতি।।
আশুতোষ ভোলানাথ পতিতপাবন।
সদয়হৃদয় পাত্রে[৩] কহিল তখন।।
চলিলা অধর্ম্মপথে পাইলা বহু ক্লেশ।
ভিক্ষা করি খাইছ সবে যত ইতি দেশ।।
অসাধুর পথে কষ্ট সাধুপথে ভাল।
ধর্ম্মে রক্ষা করে সাধু না ঘটে জঞ্জাল।।
তোমা সবে[৪] দিব আমি এক মহারাজা।
আমার তনয় হৈয়া পালিবেক প্রজা।
আমার সমান হবে আকৃতি প্রকৃতি।
চন্দ্রবংশ খ্যাতি হবে শাসিবেক ক্ষিতি।।
ত্রিপুর রমণী আছে হীরাবতী নাম।
করুক মদন পূজা করি পুত্রকাম।
চৈত্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে।
আরম্ভ করুক পূজা ব্রহ্মচর্য্য মতে।।
প্রতি শুক্লা দ্বাদশীতে পূজা নিরন্তর[৫]।
নিরামিষ একাহার শুচি কলেবর।।
দ্বিতীয়ে করিয়া ব্রত বায়ুপুত্র[৬] আশে।
আমার আজ্ঞায় পুত্র হইবে বিশেষে।।
তিন চক্ষু হইবেক পুরুষ প্রধান।
আমার তনয় আমা হেন[৭] কর জ্ঞান।

১। পৈরি—পরিধান করিয়া। ২। হয়—হইয়া। ৩। পাত্র—মন্ত্রী;

৪। তোমা সবে—তোমাদের সকলকে, তোমাদিগকে।

৫। পাঠান্তর—প্রতি শুক্লা দ্বাদশীতে পূজিবে বৎসর।

৬। বহুপুত্র?

৭। আমা হেন—আমার ন্যায়।

সুবড়াই[১] রাজা বলি স্বদেশে বলিব।
বেদমার্গী সাধুজন ত্রিলোচন কহিব।।
ত্রিপুরের পত্নী গর্ব্ভে জন্মের কারণে।
ত্রিপুরের রাজা তাকে কবে সর্ব্বজনে।।
দুই ধ্বজ করিবা যে তার আগে চিহ্ন।
চন্দ্রবংশ চন্দ্রধ্বজ ত্রিশূলধ্বজ[৩] ভিন্ন।।
কলিযুগ আরম্ভে হইবে শ্রেষ্ঠ রাজা।
তার সেবা করিবেক যত সব প্রজা।।
ধর্ম্মপথ-গামী হৈব সাধুর পালন।
নীতিয়ে পালিব রাজ্য পাত্র মিত্রগণ।।
ধর্ম্ম হৈতে বৃদ্ধি হয় অধর্ম্মে প্রলয়।
যদি বা অধর্ম্মে বাড়ে একি কালে ক্ষয়।।
ধর্ম্মপথে যেবা থাকে দুঃখে বাড়ে ধীরে।
কলিয়ে ধর্ম্মের বংশ নাশিতে না পারে।।
নিত্য স্নান গুরুসেবা দেবতা অর্চ্চন।
ক্রমে দান যথাশক্তি প্রাণী অহিংসন।।
কুলক্রম ধর্ম্মপথ না ছাড়িব নয়।
সেই সে পরম সাধু মৈলেহ অমর।।

চতুর্দ্দশ-দেব পূজাবিধি

চতুর্দ্দশ-দেব পূজাবিধি
চতুর্দ্দশ দেব পূজা করির[৪] সকলে।
আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী হইলে।।
পুনঃ জিজ্ঞাসিল মন্ত্রী যোড় করি কর।
কিমত বিধানে পূজা করিব ঈশ্বর।।
মহাদেবে বিধি কহে শুনে মন্ত্রিগণে।
করপুটাঞ্জলি হৈয়া শুনে সর্ব্বজনে।।

১। ত্রিলোচন 'সুবড়াই' নামে খ্যাত হইয়া ছিলেন। ত্রিপুরারাজ্যে সুবড়াই রাজার অনেক প্রাচীন গল্প প্রচলিত আছে।

২। বেদমার্গী—বেদজ্ঞ, বেদের মতাবলম্বী।

৩। চন্দ্রধ্বজ, ত্রিশূলধ্বজ প্রভৃতি রাজচিহ্ন। পরবর্ত্তী টীকায় ইহার বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

৪। করিব—করিবা, করিবে।

হর উমা হরি মা বাণী কুমার গণেশ।
ব্রহ্মা পৃথ্বী গঙ্গা অব্ধি অগ্নি যে কামেশ।।
হিমালয় অন্ত করি চতুর্দ্দশ দেবা।
অগ্রেতে পূজিব সূর্য্য পাছে চন্দ্রসেবা।।
ত্রিলোচন রাজাকে লইয়া তোমা সবে।
পূজিবা নানান দ্রব্য বলি উপলাভে[১]।।
পূজায় যে পূর্ব্বদিন প্রাতঃকাল লাভে।
সংযম করিবে চন্তাই দেওড়াই সবে।।
পূজাবিধি দেওড়াই[২] সবে তাকে জানে।
সমুদ্রের দ্বীপে তারা রহিছে নির্জ্জনে।।
তাহাকে আনিবা যাইয়া রাজার সহিতে।
যেখানে পূজিবা আমি আসিব সাক্ষাতে।।
যেইবর চাহে রাজা পাইবা সত্ত্বর।
অনেক রাজ্যের রাজা হবে নৃপবর[৩]।।
চতুর্দ্দশ দেবতার চতুর্দ্দশ মুখ[৪]।
নির্ম্মাইয়া দিল শিবে আপনা সম্মুখ।।
যে কালে হইব রাজার ধন বহুতর।
স্বর্ণ রৌপ্য তাম্রে দেব নির্ম্মিব সত্বর।।
এ বলিয়া মহাদেব নিজস্থানে গেল।
পাত্র মন্ত্রী আমাত্যে ত ব্রহ্ম[৫] মানি লৈল।।
শিবের আদেশে ব্রত করে হীরাবতী।
একাগ্র দেখিয়া তুষ্ট হৈলা পশুপতি।।
ত্রিলোচন[৬] বরে পুত্র গর্ব্ভেতে ধরিল।
ত্রিলোচন[৭] জন্মিবেক শিব আজ্ঞা হৈল[৮]।

১। উপলাভ—ইহা উপচার শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়?

২। দেওড়াই—চতুর্দ্দশ দেবতার পূজক। দেওড়াইগণ পূজার বিধি অবগত আছেন।

৩। নৃপতি অনেক রাজ্য জয় করিয়া তাহার রাজা হইবেন।

৪। চতুর্দ্দশ দেবতার চতুর্দ্দশটি মুণ্ডমাত্র পূজিত হয়, মুণ্ডব্যতীত অন্য অবয়ব নাই।

৫। ব্রহ্ম—বেদ। মহাদেবের বাক্যকে বেদ মনে করিল।

৬। ত্রিলোচন—মহাদেব। ৭। ত্রিলোচন—রাজা।

৮। পাঠান্তর—ক্রমে সম্বৎসর ব্রত করে হীরাবতী। ঋতুকাল জানিয়া আসিল পশুপতি।।
শিবের ঔরসে পুত্র গর্ব্ভেতে ধরিল। ত্রিলোচন জন্মিবেক শিব আজ্ঞা হৈল।।

ত্রিলোচনের জন্ম

দশমাস অতীতে জন্মিল ত্রিলোচন।
পরম উৎসব হৈল কিরাত ভবন।।
দ্বিতীয় প্রহর বেলা মুহূর্ত্ত অভিজিৎ[১]।
গর্ত্ত হৈতে ত্রিলোচন জন্মে পৃথিবীত।।
যথাবিধি কুল মতে সপ্তদিন গেল।
পাত্র মন্ত্রী সৈন্য সবে দেখিতে আসিল।।
যার যেই শক্তি মতে দিল যথোচিত।
রমণী পুরুষ আইসে রাজার বিদিত।।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল ত্রিলোচন[২]।
আনন্দ হৃদয় হৈল সৈন্য সেনাগণ।।
মনুষ্য শরীরে দেখে শোভা ত্রি-নয়ন[৩]।
পাত্র মন্ত্রী সৈন্য সেনা সবে তুষ্ট মন।।
শ্রীমন্ত শরীর দেখে দেবতা আকার।
নিশ্চয় বুঝিল সবে হইব উদ্ধার।।
এহান[৪] প্রসাদে সবে সুখেতে বঞ্চিব।
সেবা করি নর নারী দুঃখ ঘুচাইব।।
এমত বলিয়া সবে কহিছে বচন।
আপনা সমাজে যত নরনারীগণ।।
মাসান্তে অশৌচ গেল জানি মন্ত্রিবরে।
ধরাইল নবদণ্ড ছত্র শিরোপরে।।
বসাইল সিংহাসনে মোহর মারিল[৫]।
শিব আজ্ঞা অনুসারে দ্বি-ধবজ করিল।।

১। অভিজিৎ---নক্ষত্রবিশেষ। "অভিজয়তি ঊর্দ্ধাধঃ স্থিত্বা অপরণি নক্ষত্রণি কর্ত্তরি ক্বিপ্।" অভিজিৎনক্ষত্র দুইটী তারাবিশিষ্ট, দেখিতি শিঙ্গার মত। ব্রহ্মা ইহার অধিপতি। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের শেষ ১৫ দণ্ড এবং শ্রবণানক্ষত্রের প্রথম ৪ দণ্ড, এই ১৯ দণ্ডে অভিজিৎ নক্ষত্র হয়। অভিজিৎ নক্ষত্রে জন্ম হইলে মানুষ সুশ্রী ও সজ্জন হইয়া থাকে।

২। ত্রিলোচন--ত্রিলোচন কে। ৩। মহারাজা ত্রিলোচন ভূমিষ্ঠ হইবার পরে তাঁহার ললাটদেশে একটী চক্ষু দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। এই ঘটনার সময়াবধি ত্রিপুররাজবংশের পুরুষগণের বিবাহ-সংস্কারকালে ললাটে একটী চক্ষু অঙ্কিত করা হয় ; ইহা কৌলিক প্রথায় পরিণত হইয়াছে। ৪। এহান--ইঁহার। ৫। মোহর মারিল—মুদ্রা প্রস্তুত করিল। ত্রিপুরভূপতিবৃন্দের রাজ্যাভিষেককালে নিজনামে সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুত করা হয়। এতদ্ব্যতীত নতুন রাজ্য জয় করিয়া তাহার স্মৃতিরক্ষাকল্পেও মুদ্রা প্রস্তুত করা হইত।

চন্দ্রের বংশেতে জন্ম চন্দ্রের নিশান।
শিববরে ত্রিলোচন ত্রিশূলধ্বজ তান[১]।।
সে হেতু ত্রিপুর রাজার হয়ে দুই ধ্বজ।
দিনে দিনে ভেট আসে যত অশ্ব গজ।।
বার্ষিক লইয়া আসে সকল কিরাত।
কনক রজত তাম্র, বস্ত্র যে তাহাত।।
গবয়[২] কুকিয়া ছাগ[৩] শৃঙ্গ বিপরীত[৪]।
শুভ্র রোম দাড়ি সব অতি সুশোভিত।।
অগুরু৫ পিত্তল লৌহ কাংস্য বাদ্য ঘোঙ্গ৬।
কিরাতের ঘোর রব দিগম্বর অঙ্গ।।
হস্তী ঘোড়া খায়ে তারা মূষিক মার্জ্জার।
ব্যাঘ্র কুক্কুরাদি সর্প ভক্ষণ তাহার।।
নৃপতিকে ত্রি-লোচন তাহারা দেখিল
বহু ভক্তি করি সবে সাপক্ষ হইল।।
চন্দ্রকলা দিনে দিনে যেন বৃদ্ধি পায়।
ক্রমে ক্রমে কার্য্য যোগ্য হৈল নৃপরায়।।
সুপ্রকৃতি সুচরিত্র সদা তুষ্ট মন।
পরাক্রম দেখি তুষ্ট সব প্রজাগণ।।
নিত্য শিব হরিদুর্গা প্রতি ভক্তি অতি।
সদয় হৃদয় চিত্ত পুণ্য কর্ম্মে মতি।।

১। পাঠান্তর—'শিবৌরসে ত্রিলোচন ত্রিশূলধ্বজতান।'

২। গবয়—গয়াল, ইহা গো ও মহিষ এতদুভয় লক্ষণাক্রান্ত পশু। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় এই জাতীয় জন্তু আছে। ত্রিপুর রাজ্যের জঙ্গলে ইহারা দল বাঁধিয়া বিচরণ করে।

৩। কুকিয়া ছাগ—ইহা তিব্বতদেশীয় ছাগজাতীয় ; শরীরের রোমাবলী সুদীর্ঘ ও চিক্কণ, শৃঙ্গদ্বয় সুগঠন ও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। এই জাতীয় ছাগ কুকিগণ পালন করে, এজন্য 'কুকিয়া ছাগ' নাম হইয়াছে। ইহা দেখিতে অতি সুন্দর।

৪। বিপরীত—স্বভাবের বিপর্য্যয়, বৃহৎ।

৫। অগুরু---ইহা চন্দনজাতীয় বৃক্ষ, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট অঞ্চলে ইহাকে 'আগর' বলে ; ত্রিপুর রাজ্যে এখনও ইহা যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে।

৬। ঘোঙ্গ—ইহা কুকিগণের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। কাংস্য ধাতু দ্বারা বৃহদাকারের কাঁসরের ধরণে ইহা নির্ম্মিত হয়, মধ্যস্থলে বাটির ন্যায় একটী গোলাকার উচ্চ স্থান থাকে, তাহাতে আঘাত করিয়া বাজাইতে হয়। ইহার শব্দ খুব গম্ভীর এবং দূরগামী। দূরবর্ত্তী লোকদিগকে সমবেত করিবার নিমিত্ত এবং যুদ্ধ ও উৎসবকালে কুকিগণ ইহা বাজায়।

ত্রিপুর। কুকি। হালাম।

ত্রিপুর রাজার বংশ পাপে হৈল ক্ষয়।
শিব আরাধিয়া প্রজা বংশ রক্ষা হয়[১]।।
সেইত প্রজার হানি রাজা চাহে যবে।
তখনে রাজার হানি করিবেক শিবে।।

ইতি ত্রিলোচনজন্মকথনং সমাপ্তং।

ত্রিলোচন খণ্ড

(বিবাহ-প্রসঙ্গ)

বর্দ্ধমান[২] হইলেক ত্রিলোচন বীর।
পূর্ব্ব অনুসারে রাজ্য হইল সুস্থির[৩]।।
বয়ঃক্রম হৈল রাজার দ্বাদশ বৎসর।
আশে পাশে ক্ষুদ্র রাজা মিলিল বিস্তর[৪]।।
মহারাজা সুচরিত্র প্রকৃতি সুন্দর।
সাধুভাব দেবরূপ বিনয় বিস্তর।।
উন্মত্ত[৫] মাৎ সর্য্য[৬] হিংসা নাহিক তাহার।
যেই জন যেই মত সেই ব্যবহার[৭]।।
অহঙ্কার ক্রোধ বশ করিল উত্তম।
নরদেহে ত্রি-লোচন কে বা তান সম।।
যুদ্ধেতে অগ্নির তুল্য ক্ষমায়ে পৃথিবী।
নবীন কন্দর্প রূপে তেজে মহা রবি।।
বাক্যে বৃহস্পতি সম শুক্র তুল্য জ্ঞান।
নানাবিধ যন্ত্র শিক্ষা তালে ছিল জ্ঞান।।
সুখ্যাতি শুনিয়া আইসে নানা দেশী দ্বিজ।
তাহাতে শিখিল বিদ্যা যত পাই বীজ[৮]।।

১। প্রজাগণের শিব অরাধনাদ্বারা বংশ রক্ষা হইয়াছে।
২। বর্দ্ধমান—বর্দ্ধিত, বয়ঃপ্রাপ্ত। ৩। সুস্থির—দৃঢ়, সুশৃঙ্খল।
৪। আশেপাশের অনেক ক্ষুদ্র রাজা বশ্যতা স্বীকার করিল।
৫। উন্মত্ত—হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া কোন বিষয়ে মত্ত হওয়া।
৬। মাৎসর্য্য—পরশ্রীকাতরতা। ৭। পাত্র বিবেচনায় উপযুক্ত ব্যবহার করা।
৮। বীজ—মূল, তত্ত্ব।

বৈষ্ণবচরিত্র সব সাধুর আচার।
নিপুণ হইলা রাজা কালব্যবহার[১]।।
এইমতে গুণশিক্ষা করে নরপতি।
লোকমুখে শুনিলেক হেড়ম্বের পতি।।
হীনপরাক্রম বৃদ্ধ হেড়ম্বের পতি।
মনেতে ভাবিল কন্যা দিব কি সঙ্গতি।।
ম্লেচ্ছ[২] কোচ[৩] আদি সবে রাজ্য আসি লৈল।
বৃদ্ধ সময়ে আমার বিঘ্ন উপজিল।।

১। কালব্যবহার—সময় বুঝিয়া তদুপযোগী ব্যবহার করা।

২। ম্লেচ্ছ—শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনায় জানা যায়, হেড়ম্বরাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী কামরূপ প্রদেশ 'ম্লেচ্ছ' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে ;—"পূর্ব্বকালে অনেক লোকেই মহাপীঠ কামরূপে, তত্রত্য নদীতে স্নান, তদীয় জল পান এবং তথাকার দেবতা পূজা করিয়া স্বর্গে যাইতে লাগিল. কাহার কাহারও বা নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ কিম্বা শিবত্ব প্রাপ্তিও হইতে লাগিল। যম, পার্ব্বতীর ভয়ে তাহাদিগকে বারণ করিতে বা নিজভবনে লইয়া যাইতে সক্ষম হইলেন না। যমদূত তথায় যাইতে গেলে শঙ্কর-গণেরা বাধা দেয়—যাইতে দেয় না; এই জন্য যমদূতেরা প্রেরিত হইলেও তাহাদিগের ভয়ে তথায় যায় না। যম গতিক দেখিয়া কাজকর্ম্ম বন্ধ করিলেন। একদা তিনি বিধাতার নিকটে গিয়া বলিলেন,—বিধাতঃ, মানুষগুলি কামরূপে স্নান পান ও দেবপূজাদি করিয়া মরণান্তে কামাখ্যা দেবীর বা শিবের পার্শ্বচর হইতেছে. আমার সেখানে অধিকার নাই ; তাহাদিগকে বারণ করিতে আমি অসমর্থ; যদি অসম্ভব না হয়, তাহা হইলে এ বিষয়ে উপযুক্ত বিধান করুন।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা যমের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়াই বিষ্ণুভবনে গমন করিলেন। সর্ব্বলোকেশ ব্রহ্মা, যমের কথিত সকল কথাই বিষ্ণুর নিকটে যাইয়া অবিকল বলিলেন, বিষ্ণুও তাহা মনোযোগের সহিত শুনিলেন। তখন বিষ্ণু, যম-বিরিঞ্চি সমভিব্যহারে শিবের নিকট যাইলেন। শিব, আদর অভ্যর্থনা করিয়া আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ বিষ্ণু এই মিত বাক্যে বলিলেন, —এই কামরূপ সকল দেবতা, সকল তীর্থ এবং সকল ক্ষেত্রদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ণ স্থান আর নাই। মানুষ, এই পীঠে আসিয়া তাহার পর মরিলে অনেকেই স্বর্গ পাইতেছে ; মুক্তি, এবং তোমাদিগের পার্শ্বচরত্বও কেহ কেহ পাইতেছে, তাহাদিগের উপর যমের ক্ষমতা থাকিতেছে না। অতএব হে মহাদেব, এমন কোন উপায় কর, যাহাতে মনুষ্যাদির উপর যমের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে। যমের ভয় না থাকিলে এই পীঠেও ঠিক নিয়ম প্রতিপালিত হইবে না।

ঔর্ব্ব বলিলেন,---শিব বিরিঞ্চি সহিত বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া তাঁহাদিগের বাক্য পালন করিতে মনে মনে স্থির করিলেন। *** শঙ্কর দেবী উগ্রতারাকে এবং সমুদয় নিজগণ দিগকে বলিলেন---সত্বর এই কামরূপ পীঠ হইতে লোকসকল দূর কর। ** তখন গণ-সমস্ত এবং অপরাজিতা দেবী উগ্রতারা, সেই কামরূপ পীঠকে গোপনীয় করিবার জন্য তথা

কন্যাকে বিবাহ দিতে চাহি যে সত্বর।
শীঘ্র গতি বৈলা[১] আইস ত্রিলোচন বর।।
হেড়ম্ব রাজার আজ্ঞা শিরেতে বন্দিয়া।
চলিল সুজাতি[২] দূত আনন্দ হইয়া।।
ত্রিলোচনে দিলে কন্যা হইব বিশেষ।
দোহে মিলি বহু রাজ্য জিনিব অশেষ।।
রূপে গুণে বৃহস্পতি শুনি কুতূহল।
হেড়ম্বে কহিল দূত এইক্ষণে চল।।
কতদিনে উত্তরিল[৩] রাজার নগর।
ত্রিলোচন ছিল যেই স্থানে নৃপবর।।

হইতে লোকসকল দূর করিয়া দিতে লাগিলেন। ** সন্ধ্যাচল স্থিত মুনিবর বশিষ্ঠকে তাড়াইবার নিমিত্ত ধরিলে, তিনি নিদারুণ অভিসম্পাত প্রদান করতঃ বলিলেন,—হে বামে! আমি মুনি, তথাপি তুমি যে আমাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য ধরিলে, এই কারণে তুমি মাতৃগণ সহ বামাভাবে (শ্রুতিবিরুদ্ধ পথানুসারে) পূজনীয়া হইবে। তোমার প্রমথগণ মদ-মত্ত চিত্তে ম্লেচ্ছের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে বলিয়া ইহারা এই কামরূপক্ষেত্রে ম্লেচ্ছ হইয়া থাকিবে। ** এই কামরূপক্ষেত্র ম্লেচ্ছ সঙ্কুল হউক। স্বয়ং বিষ্ণু যতদিন এইখানে না আইসেন, ততদিন ইহা এইরূপ ভাবে থাকুক।"

কালিকাপুরাণ—৮১ অঃ, ১-২৬ শ্লোক।

(বঙ্গবাসী আফিসের অনুবাদ)

যোগিনীতন্ত্রের মতেও কামরূপ ম্লেচ্ছসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা :—

যোড়শাব্দে গতে শাকে ভূমহীরিপুচুম্বকে।।বিগতো ভবিতা ন্যূনং সৌমারকামপৃষ্ঠয়োঃ। যন্মাসং তত্র সংপূজ্য উত্তরাকালকোষয়োঃ।।

গমিষ্যান্তি চ রাজানঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ। কুবাচৈর্যবনৈশচান্দ্রৈর্বহুসৈন্যসমাকুলৈঃ।।

ত্রিভির্ম্লেচ্ছৈঃ সমাকীর্ণং মহাযুদ্ধং ভবিষ্যতি। অশ্বমুণ্ডৈর্নরমুণ্ডৈর্গজমূণ্ডৈর্বিশেষতঃ।।

যোগিনীতন্ত্র—১।১২ পটল।

"যোল বৎসর অতীতে সৌমার ও কামপীঠে এক যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। ছয়মাস যুদ্ধের পর ঐ সমস্ত যোদ্ধাগণ উত্তর কাল কোষে উপস্থিত হইয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিবেন। এই যুদ্ধে কুবাচ (কোচ), যবন ও চান্দ্র এই ত্রিবিধ ম্লেচ্ছ সৈন্য মধ্যে বহুসংখ্যক সৈন্য ও অশ্বগজাদি বিনষ্ট হইবে।"

৩। কোচ—কামরূপের প্রাচীন মানচিত্র আলোচনায় দৃষ্ট হয়, কোচগণের আবাসভূমি কামরূপের পার্শ্ববর্ত্তী ছিল। যোগিনীতন্ত্রের যে বচন উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও কোচের নাম পাওয়া যায়।

১। বৈলা—বলিয়া। ২। সুজাতি—ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণ রাজাদিগের বিবাহে ঘটকের কার্য্য করিতেন। ৩। উত্তরিল—উপস্থিত হইল।

ভক্তি করি কহে দূত রাজার আদেশে।
শুভক্ষণে চল নৃপ হেড়ম্বের দেশে।।
হেড়ম্বের পতি মোকে দিছে পাঠাইয়া।
হেড়ম্ব রাজার কন্যা বিভা কর গিয়া।।
শুনিয়া মঙ্গলকথা যত মন্ত্রিগণ।
সর্ব্বলোক পুলকিত কহে জনে জন।।
ত্রিপুরকুলের বৃদ্ধি হবে হেন দেখি।
দেখিব হেড়ম্ব রাজা যদি সঙ্গে থাকি।।
শুভদিনে ত্রিলোচন চলিল হেড়ম্ব[১]।
সঙ্গেতে চলিল কত রাজা কর্ণ-লম্ব[২]।।
হস্তী ঘোড়া চলিল অমাত্য মন্ত্রী সেনা।
কিরাত চলিল বহু না যায়ে গণনা।।
কতদিনে পাইলেক হেড়ম্ব-আলয়।
শুভ প্রাতঃকালে দুই নৃপে দেখা হয়।।
তৃষিত চাতক যেন মেঘ জল পাইল।
ত্রিলোচন দেখিয়া হেড়ম্ব তুষ্ট হৈল।।
চন্দ্র-ধ্বজ ত্রিশূল-ধ্বজ অগ্রেতে নিশানা।
সঙ্গে যত লোক চলে নাহিক গণনা।।
নবদণ্ড শ্বেত ছত্র আরঙ্গী গাওল।
পাত্র মন্ত্রী সঙ্গে গেল আনন্দ বহুল।।
তারাগণ মধ্যে যেন শোভে শশধর।
হেড়ম্ব উজ্জ্বল কৈল[৩] ত্রিলোচন বর।।
দূর হৈতে হেড়ম্বের পতিয়ে দেখিয়া।
পাত্র মন্ত্রী সমভ্যারে[৪] নিল আগু হৈয়া।।
বয়োধিক বৃদ্ধ মান্য হেড়ম্বের পতি।
সেই হেতু ত্রিলোচনে তাকে কৈল নতি।।
বিনয় ভব্যতা৫ দেখি বৃদ্ধ নরেশ্বর।
পুত্র তুল্য স্নেহে কোল দিলেক সত্বর।।

১। হেড়ম্ব—হেড়ম্ব দেশে। ২। কর্ণলম্ব—কিরাত। ইহারা কর্ণলতিকায় ছিদ্র করিয়া, তন্মধ্যে ক্রমশঃ বৃহত্তর বলয়বৎ গোলাকার পদার্থ প্রবিষ্ট করাইয়া সেই ছিদ্রকে এত বড় করে যে, তদ্দরুণ কর্ণ-লতিকা ঝুলিয়া লম্বা হইয়া পড়ে। এজন্য "কর্ণলম্ব" বলা হইয়াছে। ৩। কৈল—করিল। ৪। সমভ্যারে—সমভিব্যাহারে, সঙ্গে। ৫। ভব্যতা—শিষ্টাচার।

আজি আমা ধন্য হৈল হেড়ম্ব নগরী।
শিবপুত্র ত্রিলোচন আসে আমা পুরী।।
যতেক সন্মান কৈল তার নাহি পার।
পুস্তক বিস্তার হয়ে না কহিল আর।।
অশেষ প্রকারে রাজা বিনয় বিস্তর।
সসৈন্যে রহিতে স্থান দিল মনোহর।।
প্রাতঃকালে শুভক্ষণে কন্যা বিভা দিল।[১]
সপ্তদিন নবরাত্র উৎসব করিল।।
মদ্য মাংস ভক্ষ ভোজ্য ছিল ঘাটে পথে।
বাদ্য-ভাণ্ড নৃত্য গীত কৈল বহু মতে।।
দিবা রাত্র ভেদ নাহি মদ্য মাংস খাইয়া।
সুভাষাতে[২] নৃত্য গীত কৈল প্রকাশিয়া।।
ঘোঙ্গ[৩] দুগরি[৪] বাদ্য সারঙ্গী[৫] বাঁশীতে।
দুই দেশের[৬] যন্ত্র শব্দ হৈল বিধিমতে।।
রেসেম[৭] কিরাতী যন্ত্র আর যন্ত্র কত।
এই সব যন্ত্র বাজে ছাগলের অন্ত[৮]।।

১। শাস্ত্রে দিবাভাগে বিবাহ নিষিদ্ধ, যথা :—

বিবাহে তু দিবাভাগে কন্যা স্যাৎ পুত্রবর্জ্জিতা।
বিবাহানলদগ্ধা সা নিয়তং স্বামিঘাতিনী।। (উদ্বাহতত্ত্ব)

এরূপ শাস্ত্রে বিধান থাকা সত্ত্বেও কোন কোন প্রদেশে ক্ষত্রিয়গণের দিবাভাগে বিবাহ হইতে দেখা যায়। সম্ভবতঃ গন্ধর্ব্ববিবাহ হইতে এই প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই নিয়মানুসারেই প্রাতঃকালে ত্রিলোচনের বিবাহ হইয়াছিল। অতঃপর ত্রিপুররাজ্যে এই প্রথার প্রচলন বিরল হইলেও অপ্রাপ্য নহে।

২। সুভাষা—উত্তম ভাষা, এস্থলে বঙ্গভাষাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

৩। ঘোঙ্গ—কুকিগণের ব্যবহার্য্য কাঁসরবাদ্য।

৪। দুগরি—ডগর, ডঙ্কা।

৫। সারঙ্গী—সারঙ্গ, এই যন্ত্র অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে।

৬। দুই দেশের,—হেড়ম্বের ও ত্রিপুরার।　৭। রেসেম—কিরাতগণের ব্যবহার্য্য তন্ত্রবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।　৮। অন্ত—অন্ত্র, আঁতড়ি। ছাগের আঁতড়ির সূত্রদ্বারা রেসেম যন্ত্রে তন্ত্রী প্রস্তুত করা হয়।

মহিষ ছাগল গব খায় পুঞ্জে পুঞ্জে।
হেড়ম্ব নৃপতি রঙ্গ দেখে বসি মঞ্চে।।
বসন ভূষণ জনে দিলেক বিস্তর।
তুষ্ট করি দিল সৈন্য হেড়ম্ব ঈশ্বর।।
নবদিন নবরাত্র রহিল উৎসবে।
দশ দিনান্তরে নৃপ বিদায় হৈল যবে।।
যৌতুক দিলেক বহু বস্ত্র অলঙ্কার।
অশ্ব গজ বহু দিল দাস দাসী আর।।
আগুবাড়ি হেড়ম্ব রাজা দিল কত দূর।
ত্রিলোচন চলি আসে আপনার পুর।।
কত দিনে ত্রিলোচন রাজ্যে উত্তরিল।
সস্ত্রীক আনন্দ মনে পুরে প্রবেশিল।।
অনেক বৎসর রাজা সস্ত্রীক আছিল।
হেড়ম্ব দুহিতা সঙ্গে রাজভোগ ছিল।।
প্রাতঃকৃত্য করি রাজা প্রত্যুষে আপন।
পঞ্চ-কষা[১] জলে স্নান করয়ে রাজন।।
ভিজা গামছা হস্তে লইয়া নৃপবরে।
মস্তক মুছিয়া পরে ফেলায় যে দূরে।।
দুই বাহু হৃদয়েতে অন্য বস্ত্রে পোষে।
নাভি আদি দুই পদ অন্য বস্ত্রে পোছে।।
শুক্ল জোড় পৈরি পূজা ভোজন করয়।
বিষ্ণু শিব দুর্গা বিনে অন্য না জানয়।।
এই ক্রমে রহিল রাজা ত্রিলোচন ধীর।
করিল অনেক সুখ সুধীর সুস্থির।।
কয়েক বৎসর পরে হেড়ম্বনন্দিনী।
প্রথম ধরিল গর্ত্ত পতি সোহাগিনী।।
যেই দিন দশমাস সম্পূর্ণ হইল।
অতি মনোহর পুত্র প্রসব করিল।।
হেড়ম্ব নৃপতি শুনি দৌহিত্র জন্মিল।
পুত্র নাহি তুষ্ট হইয়া দৌহিত্র পালিল।।

১। পঞ্চকষা—জাম, শাল্মলী, বাট্যাল (বেড়েলা), বকুল ও বদর, এই পঞ্চ কষায়।

সেই পুত্র রহিলেক হেড়ম্বের দেশে।
ক্রমে ক্রমে একাদশ পুত্র হৈল শেষে।।
দ্বাদশ তনয় হৈল ত্রিলোচন ঘরে।
কেহ কার ন্যূন নহে তুল্য পরস্পরে।।

বারঘর ত্রিপুরা

ত্রিলোচন ঘরে[১] বার পুত্র উপজিল।
বারঘর ত্রিপুর[২] নাম তার খ্যাতি হৈল।।
রাজবংশ ত্রিপুরা সে রাজা হৈতে পারে।
ত্রিপুরা রাজ্যেতে ছত্র অন্যে নাহি ধরে।।
দৈবগতি রাজার না হয়ে যদি পুত্র।
তবে রাজা হৈতে পারে ত্রিপুরের সূত্র[৩]।।
দ্বাদশ ঘরেতে যেন পুত্র জন্ম হয়।
রাজবংশ ত্রিপুরা তাহাকে লোকে কয়।।
অবশ্য শরীরে চিহ্ন রহেত তাহার।
গৌরবর্ণ শ্বেত গৌর লক্ষণ হয়ে তার।।
অতিদীর্ঘ নাহি হয় নহে অতি খর্ব্ব।
অভিরূপ[৪] মত উচ্চ দর্প মহাগর্ব্ব।।
দীর্ঘ খর্ব্ব নহে নাসা কর্ণ পরিমিত।
বদন বর্ত্তুল প্রায় দীর্ঘ কদাচিত।।
গজস্কন্ধ[৫] বৃষস্কন্ধ[৬] সিংহস্কন্ধ[৭] হয়।
বৃহৎ হৃদয়, বড় উদর না হয়।।

১। ঘর—সংসার, বংশ। ২। বারঘর ত্রিপুর, রাজবংশমধ্যে পরিগণিত হয়। তাঁহারা রাজা হইতে পারেন, ত্রিপুররাজ্যে রাজবংশ ব্যতীত অন্য কেহ ছত্র ধরে না, অর্থাৎ রাজা হয় না।

৩। সূত্র—ভ্রাতা প্রভৃতি জ্ঞাতিবর্গ। ৪। অভিরূপ—লক্ষণানুযায়ী, অনুরূপ। বর্ত্তুল—গোলাকার।

৫। গজস্কন্ধ—গজের স্কন্ধের ন্যায় স্কন্ধ যাহার। ৬। বৃষস্কন্ধ—বৃষের স্কন্ধের ন্যায় স্কন্ধবিশিষ্ট।

৭। সিংহস্কন্ধ—সিহের স্কন্ধের ন্যায় স্কন্ধবিশিষ্ট, বিশাল স্কন্ধ। কালিকাপুরাণের সপ্তবিংশ অধ্যায়ে, বিস্তীর্ণ নয়ন, সিংহস্কন্ধ, উন্নতবাহু, প্রশস্তবক্ষ বালকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

গজস্কন্ধ, বৃষস্কন্ধ ও সিংহস্কন্ধ ইত্যাদি সুলক্ষণের মধ্যে পরিগণিত এবং বীর্য্যবানের পরিচায়ক। রঘুবংশে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

মহাবল পরাক্রম বেগবন্ত বড়।
কদলীর তুল্য জানু জঙ্ঘা মনোহর।।
মল্লবিদ্যা অভ্যাসেত বাহু স্থূল হয়।
যেন শাল বৃক্ষ দৃঢ় জানিয় নিশ্চয়।।
তেজবন্ত শুদ্ধ শান্ত দেখিতে আকার।
নিশ্চয় জানিয় তাকে ত্রিপুর কুমার।।
হরি হর দুর্গা প্রতি দৃঢ় ভক্তি যার।।
ত্রিপুর বংশেতে জন্ম নিশ্চয় তাহার।।
শ্রীধর্ম্মমাণিক্য রাজা পুনঃ জিজ্ঞাসিল।
রাজ পুত্র একাদশে কিমতে বঞ্চিল।।
জ্যেষ্ঠ পুত্র রহিলেক হেড়ম্ব ভবন।
বিস্তারিয়া কহ শুনি সে সব কারণ।।
দুর্ল্লভেন্দ্র বলে শুন বলি মহারাজে।
ভ্রাতৃ সবে কলহ হইল রাজ্য-কাজে[১]।।
হেড়ম্ব রাজার দেশে বড়পুত্র ছিল।
কতকালে বৃদ্ধ রাজা কালবশ হৈল।।
দৌহিত্র পালিয়া ছিল হেড়ম্বে রাখিয়া।
স্বর্গপ্রাপ্তিকালে রাজ্য গেল সমর্পিয়া।।
পিণ্ড শ্রাদ্ধ করিল দৌহিত্র অনুসারি[২]।
ত্রিলোচন প্রধানপুত্র হেড়ম্বাধিকারী।।
এই মতে সেই বংশে সেই নরপতি।
একাদশ পুত্র ছিল পিতার সংহতি[৩]।।

চতুর্দ্দশ-দেব-পূজা

এথা ত্রিলোচন রাজা শিবের আজ্ঞায়।
দেওড়াই আনিবারে দূতকে পাঠায়।।
সমুদ্রের দ্বীপেতে দেওড়াই রহিছে।
চতুর্দ্দশ দেব পূজার শিবে আজ্ঞা দিছে।।

১। রাজ্য-কাজে---রাজকার্য্য। ২। অনুসারী---অনুযায়ী, দৌহিত্রের শ্রাদ্ধ করিবার যে নিয়ম আছে, সেই নিয়মানুযায়ী। ৩। সংহতি---মিলিতভাবে, একত্রে।

তোমরা আসিলে হবে দেবতার পূজা।
সেই সে কারণে আমা পাঠাইছে রাজা।।
শুনিয়া দেওড়াই সবে ভয় উপজিল।
এবেহ ত্রিপুর দুষ্ট বাঁচিয়া রহিল।।
অগ্নি অবতার সে যে ধর্ম্ম নাহি জানে।
দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু কিছু নাহি মানে।।
ম্লেচ্ছবৃত্তি করে রাজা কহিতেহি কাটে।
কি মতে যাইতে পারি তাহার নিকটে।।
পরে দূতে প্রণমিয়া বলিল বচন।
অধার্ম্মিক ত্রিপুর শিবে করিছে নিধন।।
তার নারী গর্ব্ভে জন্ম ত্রিলোচন রাজা।
শিবের বরেতে জন্ম ধর্ম্মে পালে প্রজা[১]।।
ত্রিলোচন জন্মকথা কহে বিরচিয়া।
বিস্মিত হইল দেওড়াই একথা শুনিয়া।।
দূতের সাক্ষাতে তারা দৃঢ় করি কয়।
আপনে আসিলে রাজা যাইব নিশ্চয়।।
এই বাক্য শুনি দূতে আসিল তৎপর।
শুনিয়া চলিল রাজা সঙ্গে মন্ত্রীবর।।
বহু দিনান্তরে রাজা সে দ্বীপ পাইল।
চন্তাই দেওড়াই সবে আগু বাড়ি নিল।।
দেওড়াই গালিম[২] পূজক তারা যতি[৩]।
সবে আসি দেখিলেক ত্রিলোচন পতি।।
ধর্ম্মরূপ দেখি তুষ্ট হৈল সর্ব্বজন।
যাইব রাজার সঙ্গে স্থির কৈল মন।।
তারা সবে নৃপতিকে সত্য করাইল।
যতেক মনের বাঞ্ছা দিব্য দিয়াছিল।।

১। পাঠান্তর—'শিবের ঔরসে জন্ম ধর্ম্মে পালে প্রজা'।
২। গালিম—চতুর্দ্দশ দেবতার অন্যতম পূজক, বলিচ্ছেদও ইহাদের কর্ত্তব্যমধ্যে পরিগণিত।
৩। যতি—তপস্বী, ত্যাগী।

তোমার কুলেতে যেই দেওড়াই হিংসয়।
কাটামারা যেই করে তার বংশ ক্ষয়।। ১
ইত্যাদি করিয়া তারা যত সত্য বিধি।
করিল নৃপতি সত্য যথারুচি সাধি।।
করাঘাত করিলে দেওড়াই জাতি যায়ে।
অপরাধ পাইলে তাকে বাঁশে বাড়িয়ায়ে।। ২
শূকরাদি করি তারা যতেক অভক্ষ্য।
নারীর রন্ধন তারা নাহি করে ভক্ষ্য[৩]।।
নিত্য-স্নান ধৌত বস্ত্র আকাশে শুকায়ে।
আকাশে শুকাইয়া বস্ত্র পবিত্রে পৈরয়ে।।
স্বহস্তে রন্ধন করি ভোজন করয়।
দেবতা পূজিতে ভক্তি তারা অতিশয়।।
শুভদিনে দেওড়াই রাজার সহিতে।
রাজধানী আসিলেন মন-হরষিতে।।
চতুর্দ্দশ দেবতাকে সমর্পিল রাজা।
তদবধি দেওড়াই নিত্য করে পূজা।।
চতুর্দ্দশ পূজাক্রম তারা সবে জানে।
পাঁচালীতে না লিখিল অন্যে পাছে শুনে।।
আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে[৪]।
আনিল নানান দ্রব্য পূজাবিধিমতে।।
মহিষ গবয় ছাগ দিল লক্ষ বলি।
কিরাতে আনিয়া দিছে এসব সকলি।।
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ আনিল ভারে ভার।
মেষ হংস আদি বলি পিষ্টক অপার।। ৫

১। পাঠান্তর—‘তোমার কুলেতে যেই দেওড়াই হিংসয়।
কাট মার যেই করে কুল হৈব ক্ষয়।।
ইত্যাদি করিয়া আর যত সত্য, বিধি।
করিলা নৃপতি সত্য যত রুচে বুদ্ধি।।’

২। দেওড়াইগণকে করাঘাত করিলে তাহারা জাতিভ্রষ্ট হয়। তাহাদের অপরাধের দণ্ডের জন্য করাঘাত না করিয়া বাঁশ দ্বারা আঘাত করিবার নিয়ম ছিল।

৩। তাহারা স্ত্রীলোকের রন্ধিত বস্তু ভক্ষণ করে না।

৪। আষাঢ় মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে চতুর্দ্দশ দেবতার বার্ষিক বিশেষ অর্চ্চনা হয়, ইহাকে “খার্চ্চি পূজা” বলে।

৫। কামরূপ প্রদেশে হংস ও পারাবত ইত্যাদি ভক্ষণ করা শাস্ত্রানুমোদিত, তাহা

অন্য জাতীয় লোক নাগা কুকি আর।
বলিদান বিধিমতে করিছে পূজার।।
রাজা দেওড়াই সব পবিত্র হইব।
এইত প্রকার বিধি পূজা বলি দিব।।
শিব দুর্গা প্রভৃতি আসিল একাদশ।
সেবা নাহি হয়ে না আইসে হৃষীকেশ[১]।।
শিব আজ্ঞা অনুসারে চন্তাই নৃপতি।
ক্ষীরোদের[২] তীরে গেল অতি শীঘ্রগতি।।
যথাতে আছয়ে বিষ্ণু গোলকাধিকারী।
অনন্তের শয্যা'পরে[৩] বসিছেন হরি।।

দেবার্চ্চনেও ব্যবহৃত হয়। যোগিনীতন্ত্রেকামরূপাধিকার নামক দ্বিতীয় ভাগের অষ্টম পটলে উক্ত হইয়াছে,---

"হংসপারাবতং ভক্ষ্যং বরাহং কৌর্ম্মমেবচ।
কামরূপে পরিত্যাগাৎ দুর্গতিস্তস্য সংভবেৎ।।"

ত্রিপুরারাজ্য কামরূপের অন্তর্গত, সুতরাং তথায় হংস ও পারাবত বলি প্রদান দ্বারা দেবতার অর্চ্চনা করা শাস্ত্রসম্মত। কামাক্ষা তন্ত্রে, কামরূপ প্রদেশের সীমা ও পরিমাণফল নিম্নোক্তরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে;---

"করতোয়াং সমারভ্য যাবদ্দিক্করবাসিনীং
উত্তরে বটকীনাম্নী দক্ষিণে চন্দ্রশেখরঃ।
তন্মধ্যে যোনিপীঠঞ্চ নীলপর্ব্বত-বেষ্টিতং
শত-যোজন-বিস্তীর্ণং কামরূপং মহেশ্বরি।।"

শ্রীহট্ট এবং ত্রিপুরা প্রভৃতি প্রদেশ এই সীমার অন্তর্ভুক্ত। উক্ত তন্ত্রে কামরূপের অন্তর্গত সপ্ত পর্ব্বতের নামোল্লেখ-স্থলে প্রথমেই ত্রিপুরার নাম পাওয়া যায়, যথা ;---

"ত্রিপুরা কৈকিয়া চৈব জয়ন্ত্রী মণি-চন্দ্রিকা,
কাছাড়ী মাগধী দেবী অস্যামী সপ্ত পর্ব্বতাঃ।।"

যোগিনী তন্ত্রের মতেও ত্রিপুরা, কামরূপের অন্তনিবিষ্ট বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বরাহ এবং কুর্ম্ম বলি শাস্ত্রবিগর্হিত না হইলেও চতুর্দ্দশ দেবতার পূজায় তাহা দেওয়া হয় না ; কিরাতগণের পূজায় বরাহ কুক্কুটাদি বলি প্রদান করা হয়।

১। হৃষীকেশ---বিষ্ণু, নারায়ণ।

২। ক্ষীরোদ---দুগ্ধসমুদ্র, দেবতা ও দৈত্যগণ সমবেত ভাবে এই সমুদ্র মন্থন দ্বারা বিবিধ রত্ন ও অমৃত লাভ করিয়াছিলেন।

৩। অনন্ত শয্যা---শেষ নাগের উপরে শয্যা। প্রলয়কালে নারায়ণ এই শয্যায় শয়ন করেন। এতদ্বিষয়ে কালিকাপুরাণ বলেন,---

মণিমাণিক্যের স্তম্ভ করিছে উজ্জ্বল।
জড়িত কনক রত্নে করে ঝল মল।।
সহস্র স্তম্ভের মধ্যে সহস্র লক্ষ্মী স্থিতি।
নানা যন্ত্র বাদ্য গীত করে সরস্বতী।।
মহাভক্ত সকলে হুঙ্কারধ্বনি করে।
সামবেদ ছন্দে গায় প্রভু অর্থ করে।।
সেইক্ষণে বাদ্যধ্বনি করিল নৃপতি।
শুনিয়া প্রসন্ন হৈল অখিলের পতি।।
চন্তাই রাজাকে দ্বারে রাখি গেল আগে।
শিব আজ্ঞা অনুসারে কহিবার লাগে[১]।।
চন্তাই আসিছি প্রভু রাজা রহে দ্বারে।
বার্ষিক পূজন নাথ পূজিবার তরে।।
শুনিয়া হাসিল প্রভু ত্রিভুবনপতি।
কোন্ কোন্ দেব পূজা করিবা ভূপতি।।
চন্তাই কহিল তবে দণ্ডবৎ হৈয়া।
শিবাদি দেবতা রহে তোমা উদ্দেশিয়া।।
শিব দুর্গা কুমার আসিছে গজানন।
ব্রহ্মা পৃথ্বী গঙ্গা অব্ধি আর হুতাশন।।
কামদেব আসিলেক আর হিমালয়।
ঈশ্বর যাইবা হেরি পথ নিরীক্ষয়।।
তথাতে চলেন যদি প্রভু দয়াময়।
সমভ্যারে যাইবেন দেবী পদ্মালয়[২]।।

যথায় ক্ষীরোদসমুদ্রে, নারায়ণ লক্ষ্মী সমভিব্যাহারে নিদ্রাভিলাষী, শেষ নামক পরমেশ্বর মহাবলবন্ত অনন্ত, তথায় যাইয়া ত্রৈলোক্যগ্রাসতৃপ্ত সেই পরমেশ্বরকে মধ্যম ফণাদ্বারা ধারণ করেন ; পূর্ব্ব-ফণা পদ্মাকারে উর্দ্ধে বিস্তৃত করিয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করেন, দক্ষিণ-ফণা তাঁহার উপাধান করিয়া দেন ; উত্তর-ফণা তাঁহার পাদোপধান করেন। মহাবল অনন্তরূপী বিষ্ণু পশ্চিম-ফণাকে তালবৃন্ত করিয়া নিদ্রাভিলাষী দেবদেবিকে স্বয়ং ব্যজন করেন। তিনি নারায়ণের শঙ্খ, চক্র, নন্দক, খড়্গ, তুণীরদ্বয় এবং গরুড়কে ঈশান-ফণাদ্বারা ধারণ করেন। আর, গদা, পদ্ম, শার্ঙ্গধনু এবং অন্য সমুদয় অস্ত্র আগ্নেয়-ফণার দ্বারা ধারণ করেন। অনন্ত এইরূপে নিজ দেহকে নারায়ণের শয্যা করিয়া এবং জলমগ্না পৃথিবীর উপর অধোদেহ স্থাপন করিয়া আপনারই শরীরান্তর জগৎকারণ-কারণ জগদ্বীজ নিত্যানন্দ বেদময় ব্রহ্মণ্য জগৎকারণ কর্ত্তা ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমানাধিপতি পরাবরগতি সপরিচ্ছদ লক্ষ্মীসহচর নারায়ণকে মস্তকে ধারণ করেন।

কালিকাপুরাণ—২৭ অধ্যায়। (বঙ্গবাসী আফিসের অনুবাদ)।

১। কহিবার লাগে—বলিতে আরম্ভ করিল। ২। পদ্মালয়—পদ্মালয়া, কমলা।

তবে তুষ্ট হৈয়া বিষ্ণু অভ্যুত্থান[১] হৈল।
ত্রিলোচন ভাগ্যবলে পূজা লৈতে আইল।।
পূজাগৃহে আসিলেক হরিলক্ষ্মীপতি।
শিবাদি দেবতা সবে করিয়াছে স্তুতি।।
হরো মা[২] হরি মা[৩] বাণী কুমার গণ[৪] বিধি[৫]।
এইক্রমে বসাইল দেব অদ্যাবধি।।
পর বেদী মাঝে আর ছয় দেব বৈসে।
খাব্ধি[৬] গঙ্গা অগ্নি কাম হিমাদ্রি যে শেষে।।
পাত্র মন্ত্রী সৈন্য সেনা লইয়া রাজায়।
নমস্কার করিলেন সর্ব্বদেব পায়।।
হস্তী অশ্ব যোগান রহিল বহুতর।
নবদণ্ড ছত্র গাওল আরঙ্গী সুন্দর।।
পতাকা অনেক শোভে প্রতি ফৌজে ফৌজে।
সহস্রাবধি স্বর্ণ ঢালী ছিল তীরন্দাজে[৭]।।
কৃষ্ণবর্ণ লইছে অস্ত্র অগ্নিসম বাণ।
গজপৃষ্ঠে বীর সব লোহার সমান।।
নানাবিধ বাদ্য করে ঢোল যে দগড়ি।
ভেওর[৮] কর্ণাল[৯] শিঙ্গা[১০] দুন্দুভি[১১] মোহরি।।
পঞ্চশব্দী বাদ্য বাজে মৃদঙ্গ করতাল।
কাংস্যের কিরাতী ঘোঙ্গ বাজিছে বিশাল।।
করিল অনেক পূজা নানাবিধ মতে।
শিব দুর্গা বিষ্ণু আজ্ঞা হইল রাজাতে।।
ত্রিপুরের রাজা যেই এই বংশে হয়।
পূজার মণ্ডপমধ্যে আসিব নিশ্চয়।।
চন্তাইতে শিব দুর্গা বিষ্ণু কহে আপনে।
ত্রিপুর রাজাতে কহে চন্তাই সাবধানে।।
তিন বলি নৃপতিয়ে স্বহস্তে ছেদিব।
তিন দেবতা ভিন্ন রুধিরে তার্পব।।

১। অভ্যুত্থান—উত্থান। ২। হরোমা—হর ও উমা। ৩। মা—লক্ষ্মী। ৪। গণ—গণেশ। ৫। বিধি—ব্রহ্মা। ৬। খাব্ধি—পৃথিবী ও সমুদ্র। ৭। তীরন্দাজ—যাহারা তীরদ্বারা যুদ্ধ করে। ৮। ভেওর—ইহা পিত্তলনির্ম্মিত বক্রাকার ফুৎকারযন্ত্র। ৯। কর্ণাল—পিত্তলনির্ম্মিত ফুৎকারযন্ত্র। ১০। শিঙ্গা—মহিষের শৃঙ্গদ্বারা নির্ম্মিত ফুৎকার যন্ত্র। ১১। দুন্দুভি—ঢাক, নাগরা।

অন্য যত বলি সব মণ্ডপ বাহিরে।
চন্তাই দিব ধারা[১] দেওড়াই ছেদ করে।।
এই মতে সপ্তদিন পূজা প্রচারিল।
তুষ্ট হৈয়া দেব সবে নৃপে বর দিল।।
এই যে মণ্ডলে[২] তুমি মহারাজা হৈলা।
জিনিবা সকল রাজা আমা বর পাইলা।।
চন্দ্রাদিত্যাবধি[৩] তব সন্ততি রহিব।
যখনে করহ পূজা সত্বরে আসিব।।
এ বলিয়া দেব গেল যার যেই স্থান।
তদবধি বার্ষিক পূজা হইল প্রমাণ।।

ত্রিলোচন-দিগ্বিজয়

এইমতে নরপতি বঞ্চে[৪] কত কাল।
নানান জাতীয় বহু ছিল মহীপাল।।
কাইফেঙ্গ চাকমা আর খুলঙ্গ লঙ্গাই।
তনাউ তৈয়ঙ্গ আর রয়াং আদি ঠাঁই।।
থানাংছি প্রতাপসিংহ আছে যত দেশ।
লিকা নামে আর রাজা রাঙ্গামাটি শেষ।।
এইসব জিনিবারে ইচ্ছা মনে হৈল।
পাত্র মন্ত্রী সঙ্গে রাজা মন্ত্রণা করিল।।
পাত্রাদির অনুমতি লৈয়া ত্রিলোচনে।
যুদ্ধসজ্জা করিয়া চলিল সেনাসনে।।
রাজার আদেশ পাইয়া সকল সাজিয়া।
ক্রমে ক্রমে সর্ব্বরাজা বিক্রমে জিনিয়া।।
তার রাজা দূর করি যুদ্ধ ক্ষমা দিল।
ত্রিলোচন সেনা মধ্যে সকল আসিল।।

১। বলির পূর্ব্বক্ষণে, চন্তাই স্বয়ং দেবালয়ের দ্বার হইতে বলির স্থান পর্য্যন্ত একটী জলের ধারা প্রদান করেন। বলি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই ধারা উল্লঙ্ঘন করা নিষিদ্ধ। এই ধারা প্রদানের পরে বলি আরম্ভ হয়। ২। মণ্ডল—প্রদেশ, রাজ্য। ৩। চন্দ্রাদিত্যাবধি—যতদিন চন্দ্রসূর্য্য আছেন। ৪। বঞ্চে—বাস্তব্য করে।

এইমতে ত্রিলোচন গেল অগ্নিকোণে।
রাজা যুধিষ্ঠির দেখা করায়ে ভীমসেনে।। } ১
ত্রিলোচন দেখিয়া বিস্তর কৈল মান।
রাখিলেক রাজা যত্নে দিয়া দিব্য স্থান।।
তৃণময় ঘরে থাকে ত্রিলোচন রাজা।
অগ্নিকোণ হৈতে আইসে লৈয়া নিজ প্রজা।।
মেখলীর[২] রাজা আইসে তাহান সহিত।
যুধিষ্ঠির দ্বারে রাজা দেখিছে বিহিত।।
তাহা দেখি দুঃখিত যে রাজা দুর্য্যোধনে।
ধৃতরাষ্ট্রস্থানে কহে অতি ক্রোধ মনে।।
তথা রাজা মান্য পাইয়া আসিল স্বদেশ।
অনেক বৎসর ছিল শুভ্র হৈয়া কেশ।।
পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম করিতে উচিত।
করিল সে সব ধর্ম্ম অতি বিপরীত।।
দুর্গোৎসব দোলোৎসব জলোৎসব চৈত্রে।
মাঘমাসে সূর্য্যপূজা করিল পবিত্রে।।
শ্রাবণ মাসেতে পূজা করে পদ্মাবতী।
গ্রামমুদ্রা[৩] করিছিল যেন রাজনীতি।।
বিযু সংক্রমণে পিতৃলোক শ্রাদ্ধ করে।
ব্রাহ্মণে অন্নাদি দান প্রাতে নিরন্তরে।।
নিত্য নৈমিত্তিক যত ক্রিয়া ক্রমে ছিল।
দ্বাদশ পুত্রের ঘরে বহু পুত্র হৈল।।

১। পাঠান্তর,—এহি মতে মহারাজা হইল অগ্নি কোণে।
যুধিষ্ঠির চাহিবার নিল ভীম সেনে।।

এই পাঠই শুদ্ধ এবং সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ ত্রিপুরা হইতে অগ্নিকোণে অবস্থিত নহে, সুতরাং "গেল অগ্নিকোণে" এই পাঠ সঙ্গত হইতে পারে না। মহারাজ ত্রিলোচন অগ্নিকোণে যায়েন নাই,—অগ্নিকোণ হইতে গিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী উক্তি—"অগ্নিকোণ হইতে আইসে লৈয়া নিজ প্রজা" পাঠ করিলে বুঝা যায়, "গেল অগ্নিকোণে" শব্দ ভ্রমসঙ্কুল।

২। মেখলী—মণিপুর।

৩। গ্রামমুদ্রা—গ্রাম নিরাপদে রক্ষার নিমিত্ত দৈবক্রিয়া বিশেষ।

কালক্রমে ত্রিলোচন অতি বৃদ্ধ হৈয়া।
দাক্ষিণ পুত্রেতে রাজ্য সমর্পণ দিয়া।।
শিবলোকে গেল রাজা মর্ত্ত্যলোক ত্যজি।
দাক্ষিণ করিল রাজা সর্ব্বলোক রাজি।।

ত্রিলোচনখণ্ডং সমাপ্তং।

দাক্ষিণ-খণ্ড

(ভ্রাতৃ-বিরোধ)

স্বর্গগামী হইলেক রাজা ত্রিলোচন।
দাক্ষিণ হইল রাজা তুষ্ট প্রজাগণ।।
শ্রাদ্ধব্যয় হৈয়া ধন পিতার যতেক।
একাদশ ভাই বাঁটি লইল পৃথক।।
একাদশ অংশ ধন করি পরিমিত।
তার মাঝে দুইভাগ নৃপের বিহিত।। [১]
এইক্রমে বিবর্ত্তিয়া[২] নিল পিতৃধন।
একাদশ ভাই মিলি বঞ্চিল আপন।।
রাজার অনুজ দশ হৈল সেনাপতি।
সর্ব্ব সেনা ভাগ করি দিল ভ্রাতৃপতি।।
পঞ্চ পঞ্চ সহস্র সেনা এক অংশ পায়।
পুরুষানুক্রমে এই রীতি হয়ে তায়।।
রাজার নিজের সেনা কিরাত সকল।
পূর্ব্বে দ্রুহ্যু সঙ্গে আইসে ক্ষত্রিয়ের বল।।
ত্রিলোচনে যুদ্ধে রাজা যত জিনিছিল।
রাজায়ে সে সব সেনা দশ ভাইকে দিল।।

১। পাঠান্তর—দ্বাদশ ভাগ ধন করিয়া প্রমাণ।
রাজা দুই ভাগ পাইল এক ভাগ আন।।

এই পাঠ শুদ্ধ। এগার জন ভ্রাতার মধ্যে ধন ভাগ হইল, রাজা দুই ভাগ পাইলেন, সুতরাং বার ভাগ না হইলে এই নিয়মে ধন বণ্টন হইতে পারে না।

২। বিবর্ত্তিয়া—এস্থলে ভাগ করিয়া বুঝাইবে।

ত্রিলোচনে স্বর্গে ভ্রাতৃ রাজ্যধন নিল।
শুনিয়া হেড়ম্ব রাজা মনে দুঃখ পাইল।।
প্রধান তনয় আমি ত্রিলোচন ঘরে।
মাতামহে দিছে আমা জনক ঈশ্বরে।।
রাজ্যধন জন যত জ্যেষ্ঠ পুত্রে পায়ে।
আমি জ্যেষ্ঠ জীবমানে[১] কনিষ্ঠে নিয়া যায়ে।।
পশ্চাতে হেড়ম্বপতি ভ্রাতৃকে লিখিল।
এই সব তত্ত্ব পত্রে দূত পাঠাইল।।
দূত গিয়া পত্র তত্ত্ব করিল গোচর।
একাদশ ভাই সনে দিলেক উত্তর।।
যেই তত্ত্ব লিখিয়াছ তাহা মিথ্যা নয়।
রাজার প্রধানপুত্রে রাজ্যপাট-লয়।।
হেড়ম্ব পতিয়ে তোমা পুত্র মান্যে নিছে।
পিতা বর্ত্তমানে তোমা স্বতন্ত্র করিছে।।
যদি পিতা তোমা রাজ্য ধন জন দিত।
পিতা বর্ত্তমানে তোমা স্বদেশে আনিত।। } ২
দাক্ষিণেকে রাজ্য দিল পিতা স্বর্গ হৈতে[৩]।
আমরা তোমাকে তাহা দিব যে কি মতে।।
শুনিয়া এসব কথা দূত ফিরি যায়ে।
শুনিয়া হেড়ম্বপতি দুঃখিত তাহায়ে।।
হেড়ম্ব হইয়া ক্রোধ যুদ্ধ সজ্জা করে।
পাত্র মিত্র সৈন্য পাঠায় যুদ্ধ করিবারে।।
হইল তুমুল যুদ্ধ দুই সৈন্য মাঝে।
ঢোল দগড় ভেরী নানা বাদ্য বাজে।।
হস্তী ঘোড়া বহু সৈন্য হেড়ম্বের ঠাট।
সপ্ত দিন যুদ্ধে হৈল ত্রিপুরার পাট[৪]।।

১। জীবমানে—জীবিত থাকিতে।

২। যদি তোমাকে রাজ্য ধন দেওয়া পিতার অভিপ্রেত হইত, তবে তিনি বর্ত্তমান থাকা কালেই তোমাকে স্বদেশে আনয়ন করিতেন।

৩। স্বর্গ হৈতে—স্বর্গীয় হইবার কালে।

৪। ত্রিপুরার পাট—ত্রিপুর রাজধানীতে।

কপিলা নদীর তীরে পাট ছাড়ি দিয়া।
একাদশ ভাই মিলি মন্ত্রণা করিয়া।।
সৈন্য সেনা সনে রাজা স্থানান্তরে গেল।
বরবক্র উজানেতে খলংমা[১] রহিল।।

খলংমায় রাজ্যপাট

তার তীরে কৈল পাট[২] দাক্ষিণ নৃপতি।
নানামতে তথা সর্ব্ব লোকের বসতি।।
এই মতে যুদ্ধ কৈল সর্ব্ব সহোদর।
গজ কচ্ছপের মত[৩] যুঝিল বিস্তর।।
আত্ম কলহ ভাতৃ ধনের জন্য হয়[৪]।
পিতৃ ধন জন হেতু বহু সেনা ক্ষয়।।
খলংমা করিল রাজ্য দাক্ষিণ নৃপতি।
কপিলা নদীর তীরে হেড়ম্ব বসতি।

১। খলংমা—বরচক্র (বরাক) নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ খলংমা নামে পরিচিত.

২। পাট—রাজধানী।

৩। গজ-কচ্ছপের উপাখ্যান; —বিভাবসু নামে অতিকোপনস্বভাব এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর সুপ্রতীক ভ্রাতার সহিত একান্নে থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া সর্ব্বদা অগ্রজের নিকট পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগের প্রস্তাব উত্থাপন করিতেন। একদা বিভাবসু এই সূত্রে ক্রুদ্ধ হইয়া অনুজকে কহিলেন, "ভ্রাতৃগণ পৈত্রিক ধন বিভাগ দ্বারা পরস্পর ধনগর্ব্বে মত্ত হইয়া বিরোধ আরম্ভ করে এবং তদ্ধেতু নানাবিধ অনিষ্ট সংসাধিত হয়, এই কারণে পৈত্রিক ধন বিভাগ করা সাধুগণের অভিপ্রেত নহে। আমি বারণ করা সত্ত্বেও তুমি এ বিষয়ে নিরস্ত হইতেছ না, অতএব তুমি বারণযোনি প্রাপ্ত হও।" সুপ্রতীক এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়া বিভাবসুকে কহিলেন, "তুমিও কচ্ছপযোনি প্রাপ্ত হও।" এই প্রকারে উভয় ভ্রাতা শাপপ্রভাবে গজ ও কচ্ছপ যোনিপ্রাপ্ত হইলেন, ইঁহারা জন্মান্তরীণ বৈরভাবের বশবর্ত্তী হইয়া উভয়ে প্রতিনিয়ত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন। একদা ইহাদের যুদ্ধকালে খগরাজ গরুড় উভয়কে ধরিয়া ভক্ষণ করায় এই যুদ্ধের নিবৃত্তি হয়।

মহাভারত—আদিপর্ব্ব ; ২৯ শ অঃ।

৪। ভ্রাতাগণের মধ্যে ধনের নিমিত্ত আত্মকলহ হইল।

লাঙ্গরোঙ্গ[১] আদি প্রজা কুকি তথা বৈসে।
দিলেক হেড়ম্বেশ্বরে সীমানা যে শেষে।।
বহুকাল বাস করে এই ক্রমে সবে।
পরম হরিষে লোকে নৃপতিকে সেবে।।
মল্লবিদ্যা-বিশারদ হৈল সেনাজন।
খঙ্গা চর্ম্ম লৈয়া পাঁচা খেলে[২] ঢালিগণ।।
খলংমা নদীর তীরে পাষাণ পড়িছে।
মলা হৈলে খঙ্গা লেঞ্জা[৩] তাথে ধারাইছে।।
খলংমা নদীর তীরে বালুচর আছে।
বীর সবের খঙ্গা চর্ম্ম[৪] তাথে রাখিয়াছে।।
বড় বড় যোদ্ধা সব বীর অতিশয়।
মহাবল পদভারে ক্ষিতি কম্প হয়।।
মদ্য মাংসে রত সব গোয়ার প্রকৃতি।
তৃণ প্রায় দেখে তারা গজমত্ত-মতি[৫]।।
ত্রিপুরার কুলে পুনঃ বহু বীর হৈল।
মদ্য পান করি সবে কলহ করিল।।
তুমুল হইল যুদ্ধ ঘোর পরস্পর।
তাহা নিবারিতে নাহি পারে নৃপবর।।
আত্মকুল কলহেতে মহাযুদ্ধ ছিল।
পড়িল অনেক বীর রক্তে নদী হৈল।।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে বড় অহঙ্কার।
অস্ত্রাঘাতে পড়ে যত নাহি সীমা তার।।
দীর্ঘ নিদ্রাগত[৬] বীরগণে ভূমি পূর্ণ।
ভূপতির যত গর্ব্ব সব হৈল চূর্ণ।।
পঞ্চাশ সহস্র বীর সে স্থানে মরিল।
এই স্থানের এই গুণ রাজায়ে জানিল।।

১। লাঙ্গরোঙ্গ—কুকি জাতির সম্প্রদায় বিশেষ। ২। পাঁচা খেলা—কৃত্রিমযুদ্ধ।

৩। লেঞ্জা—শূল। ৪। চর্ম্ম—ঢাল।

৫। গজমত্তমতি—মদমত্ত হস্তী।

৬। দীর্ঘ নিদ্রাগত—মৃত।

যদুবংশ ক্ষয় যেন মুহূর্ত্তেকে হৈল[১]।
চিন্তায়ে বিকল রাজা সর্ব্ব সৈন্য মৈল।।
মহাবল এই স্থানে বীর জন্ম হয়।
এই মাত্র দোষ আছে পুনঃ করে ক্ষয়।।
না রহিব এথাতে যাইব অন্য স্থান।
মন স্থির করে যাইতে তাহার উজান।।
অদ্য কল্য যাইব মনে বাসনা না ত্যজে।
সেই স্থানে কালবশ হৈল মহারাজে।।

তৈদাক্ষিণ খণ্ড

(রাজ-বংশমালা)

দাক্ষিণ মরিল রাজা তার পুত্র ছিল।
তৈদাক্ষিণ নাম রাজা তখনে করিল।।
প্রধান তনয় সে যে হৈল মহাবল।
শান্ত ধর্ম্ম মতিমন্ত বহু গুণ স্থল।।
বহুকাল সেই স্থানে পালিলেক প্রজা।
মেখলী রাজার কন্যা বিভা কৈলা রাজা[২]।।

১। যদুবংশধ্বংসের বিবরণ—একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও তপোধন নারদ দ্বারকা নগরে গমন করেন। সারণ প্রভৃতি কতিপয় মহাবীর তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ শাম্বকে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া তাঁহাদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে মহর্ষিগণ, ইনি অমিতপরাক্রম বভ্রুর পত্নী। মহাত্মা বভ্রু পুত্রলাভে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছেন, অতএব আপনারা বলুন ইনি কি প্রসব করিবেন।"

সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ এই প্রতারণায় রোষান্বিত হইয়া বলিলেন, দুর্ব্বৃত্তগণ, এই বাসুদেবতনয় শাম্ব, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশ বিনাশের নিমিত্ত ঘোরতর লৌহময় মুষল প্রসব করিবে। ঐ মুষল প্রভাবে মহাত্মা জনার্দ্দন ও বলদেব ভিন্ন যদুবংশের অন্য সকলেই উৎসন্ন হইবে।

অতঃপর বাসুদেবের উপদেশানুসারে যাদবগণ সপরিবারে প্রভাসতীর্থে গমন করিলেন এবং ব্রহ্মশাপ প্রভাবে তাঁহারা সুরামত্ত অবস্থায় পরস্পরে কলহ করিয়া একে অন্যের বিনাশ সাধন করিলেন। এই ভাবে যদুকুল নির্ম্মল হইবার পরে বলদেব সর্পাবয়ব ধারণ পূর্ব্বক ও বাসুদেব শায়িত অবস্থায় জরা নামক ব্যাধের শরাঘাতে লীলাসম্বরণ করিলেন। ব্রহ্মশাপপ্রভাবে যাদবগণ সুরামত্ত হইয়া আত্মকলহে এইভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

মহাভারত—মৌষলপর্ব্ব।

২। এই সময় হইতে মণিপুরের সহিত ত্রিপুরার বৈবাহিক সম্বন্ধের প্রথম সূত্রপাত হয়। কোন্ রাজার কন্যা বিবাহ করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

তাহার ঔরসে পুত্র সুদাক্ষিণ নাম।
রূপে গুণে সুদাক্ষিণ বড় অনুপাম।।
বহুকাল সেই রাজা রহিল তথাত।
সেই স্থানে রাজার মৃত্যু হৈল উৎপাত।।
তরদাক্ষিণ নাম রাজা তাহার তনয়।
বহুকাল পালে প্রজা নিতি যজ্ঞময়।।
ধর্ম্মতর নামে হৈল তাহার নন্দন।
বহুকাল রক্ষা কৈল রাজ্য ধন জন।।
তান পুত্র ধর্ম্মপাল হৈল নরপতি।
জীবহিংসা না করিল পালিলেক ক্ষিতি।।
সুধর্ম্ম নামেতে হয়ে তাহার তনয়।
সুখে প্রজা রাখিলেক সদয় হৃদয়।।
তরবঙ্গ হৈল রাজা তাহার নন্দন।
তান পুত্র দেবাঙ্গ পালিল সর্ব্ব জন।।
তান সুত নরাঙ্গিত পরে হৈল রাজা।
তান পুত্র ধর্ম্মাঙ্গদ পালিলেক প্রজা।।
রুক্মাঙ্গদ হৈল রাজা সুমাঙ্গ তৎপর।
নৌগযোগ রায় রাজা তাহার অন্তর।।
তরজুঙ্গ রাজা হৈল তানান তনয়।
তররাজ তান সুত বড় সাধু হয়।।
হামরাজ তার পুত্র ভাল রাজা হৈল।
তান পুত্র বীররাজ যুদ্ধ করি মৈল।।
শ্রীরাজ তান পুত্র অতি শুদ্ধমতি।
কত ধনজন তার নাহি সংখ্যা যদি।।
তাহান নন্দন হৈল শ্রীমন্ত ভূপতি।
লক্ষ্মীতর হৈল তান পুত্রের আখ্যাতি।।
লক্ষ্মীতব পুত্র ছিল তরলক্ষ্মী নাম।
মাইলক্ষ্মী সুত তান গুণে অনুপাম।।
নাগেশ্বর নাম হৈল তাহার তনয়।
যোগেশ্বর পুত্র তার পরে রাজা হয়।।

ঈশ্বর ফা নামে হৈল নন্দন তাহার।
করিল চৌরাশি বর্ষ রাজ্য অধিকার।।
তার পুত্র রংখাই হইল সু-রাজন।
রহিল অনেক বর্ষ পালিল ভুবন।।
ধনরাজ ফা নাম ছিল তাহান পুত্র।
মোচঙ্গ তাহান পুত্র পায়ে রাজ-ছত্র।।
মাইচোঙ্গ নামে রাজা জন্মে তান ঘরে।
ঊনষাইট বর্ষ সে যে রাজ্য ভোগ করে।।
তাভুরাজ নাম হৈল তাহার নন্দন।
তরফালাই ফা ছিল রাজা অতি শুদ্ধ মন।।
তাহার তনয় হৈল নৃপতি সুমন্ত।
তার সুত রাজা ছিল শ্রেষ্ঠ রূপবন্ত।।
রূপবন্ত নৃপতির পুত্র তরহাম।
তাহান তনয় ছিল নৃপতি খাহাম।।
কতর ফা তার পুত্র হইল নৃপতি।
বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ ধর্ম্মে শুদ্ধ মতি।।
কালাতর ফা নাম পুত্র হইল তাহার।
স্বজাতিতে তার প্রতি বহু ব্যবহার।।
তান ঘরে চন্দ্র ফা নামে তনয় হইল।
বহুকাল রাজ্য প্রজা সব সে পালিল।।
গজেশ্বর নামে ছিল নৃপতি নন্দন।
পালিল অনেক কাল রাজ্য প্রজাগণ।।
বীররাজ হৈল তান ঘরে এক সুত।
তান পুত্র নাগপতি বহু গুণযুত।।

শিক্ষ্মরাজের রাজ্য ত্যাগ

তান পুত্র শিক্ষ্মরাজ হৈল মহারাজা।
নরমাংস খায়ে সে যে ছাড়ে রাজ্য প্রজা।।
মৃগয়াতে গেল রাজা মৃগ না মিলিল।
ক্ষুধায়ে ব্যাকুল হৈয়া পাচকে বলিল।।

মাংস পাক করি আজি দিবা যে আমারে।
এ কথা কহিয়া গেল স্নান করিবারে।।
ভয় পাইয়া পাচক মনুষ্য মাংস আনে।
অষ্টমীতে নরবলি চৌদ্দদেব স্থানে।।
সেই মাংস আমি পাক করি বিধিমতে।
সুগন্ধি বহুল দিল না পারে চিনিতে।।
সুপক্ক হয়েছে মাংস গন্ধে আমোদিত।
খাইল ভূপতি মাংস ক্ষুধায়ে পীড়িত।।
এমত সুস্বাদ মাংস না খাইছি আর।
নিশ্চয় করিয়া কহ এ মাংস কাহার।।
ভয়েতে পাচক সব কম্পিত হইল।
ত্রস্ত হৈয়া তারা সবে কহিতে লাগিল।।
মাংস না পাইয়া ভয়ে করেছি কুকর্ম্ম।
মনুষ্যের মাংস দিয়া করিল অধর্ম্ম।।
কম্প হৈল নরপতি বৃত্তান্ত শুনিয়া।
পাপ কর্ম্ম কৈলা কেনে আমা ভয় পাইয়া।।
আর না করিব আমি রাজ্যের পালন।
যোগ সাধনাতে আমি চলে যাব বন[১]।।

১। "নাগপতেঃ সুতো জাত শিক্ষ্মরাজ ইতীরিতঃ।
স একদা বনং যাতো মৃগয়ার্থং মহীপতিঃ।।
বহুকালং বনং ভ্রান্ত্বা মৃগং ন প্রাপ্তবান্ নৃপঃ।
অতিশ্রান্তস্ততো রাজা নিজমন্দিরমগমৎ।
ততঃ ক্ষুধার্ত্তো নৃপতির্মাংসপাকার্থমুক্তবান।
মৃগমাংসম্ না প্রাপ্য বিহ্বলঃ পাচকস্তদা।।
অষ্টম্যাং দেবদত্তস্য নরস্য মাংসমানয়ৎ।
তন্মাংসমতি সৎপক্কং ভোজয়ামাস ভূমিপং।।
শিক্ষ্মরাজস্তু তদ্ভুক্ত্বা সন্তুষ্টঃ প্রাহ পাচকং।
ঈদৃশং সুরসং মাসং কুতস্ত্বং সমুপেতবান্।।
পাচকস্তু ততঃ প্রাহ ভূমিপং সুভয়াতুরঃ।
দেবদত্ত নরস্মৈ তন্মাংসং ভোজিতং ময়া।।
ইতি শ্রুত্বা ততো রাজা কম্পান্বিতকলেবরঃ।
হরে ত্রাহি হরে ত্রাহি বিমৃষ্যতি পুনঃ পুনঃ।।
মহাবৈরাগ্যমাস্থায় বনবাসমুপাশ্রিতঃ।" সংস্কৃত রাজমালা।

ভূপতি করিল পুত্র দেবরাজ নাম।
চলিল নৃপতি বনে নিজ মনস্কাম।।
পুত্র আদি সেনাগণ কাঁদিতে কাঁদিতে।
আগুবাড়ি দিল নিয়া কত দূর পথে।।
হর্ষ হৈয়া নরপতি বিদায় দিল প্রজা।
নমস্কার করিয়া ফিরিল দেবরাজা।।
দেবরাজ ঘরে পুত্র হইল দুরাশা।
বিরাজ তাহান পুত্র বিষ্ণু ভক্তি আশা।।
রাম কৃষ্ণ বিষ্ণু শিব মুখে জপে নিত্য।
সুচরিত্র মদ্য মাংসে রত নাহি চিত্ত।।
তার পুত্র সাগর ফা হৈল মহারাজা।
অনেক বৎসর সেহ পালিলেক প্রজা।।
মলয়জচন্দ্র রাজা তাহান তনয়।
সূর্য্য রায় নামে রাজা তার পরে হয়।।
তার পুত্র আচুঙ্গফালাই রাজা হৈল।
তার পুত্র চরাতর নামে রাজা ছিল।।
তার ঘরে পুত্র নাহি ভাই হৈল রাজা।
আচঙ্গ তাহার নাম বড়হি সুতেজা।।
বিমার হইল রাজা তাহার তনয়।
তার পুত্র কুমার পরেতে রাজা হয়।।

ছাম্বুলনগরে শিবাধিষ্ঠান

কিরাত আলয়ে আছে ছাম্বুল নগর।
সেই রাজ্যে গিয়াছিল শিব ভক্তি তর[১]।।

১। "বিমারস্য সুতো জাতঃ কুমারঃ পৃথিবীপতি।।
স রাজা ভুবনখ্যাতঃ শিবভক্তিপরায়ণঃ।
কিরাতরাজ্যে স নৃপশ্ছাম্বুল নগরান্তরে।।
শিবলিঙ্গং সমদ্রাক্ষীৎ সুবড়াই-কৃত-মঠে।
ততঃ শিবং সমভ্যর্চ্চ্যে নিত্যং তুষ্টাব ভূমিপঃ।" সংস্কৃত রাজমালা।

সুবড়াই খুঙ্গ নাম মহাদেব স্থান।
করিল প্রণতি ভক্তি সেই ভাগ্যবান।।
মহাদেবে রাখিছিল কুকী স্ত্রীকে নিয়া।
তাতে পার্ব্বতী উদ্দেশ করিলেক গিয়া।।
চুলেতে ধরিয়া নিল গলে দিল পারা।
তাহাতে কুকীর স্ত্রীর গলা গেল চিরা।।
সে অবধি কুকীর স্ত্রীর শব্দ নহে বড়।
এই কথা ত্রিপুরাতে প্রচার যে দড়[১]।।
　ছাম্বুল নগরে এক বিচিত্র কাহিনী।
লিঙ্গরূপ ধরে শিব সে স্থানে আপনি।।
রাত্রিযোগে কুকিনীতে শিবে ক্রীড়া করে।
প্রস্তর জানিয়া তারে ফেলায়ে অন্তরে।।
সেই স্থানেতে লোক গেল শতে দুই শতে।
এক জন বৃদ্ধি হয়ে না চিনে পশ্চাতে।।
এক মোচা অন্ন নিলে আর মোচা[২] বাড়ে[৩]।
তথাপিহ নাহি চিনে ধরিতে নাহি পারে।।
গুপ্ত ভাবে আছে তথা অখিলের পতি।
মনুরাজ সত্য যুগে পূজিছিল অতি[৪]।।
মনুনদী তীরে মনু বহু তপ কৈল।
তদবধি মনুনদী পুণ্য নদী হৈল।।
　কুমারের সুত রাজা সুকুমার নাম।
বহুকাল রাজ্য করে পূর্ণ মনস্কাম।।

১। দড়-দৃঢ়।　　২। মোচা—পাৰ্ব্বত্য জাতি সমূহের মধ্যে একটী প্রথা প্রচলিত আছে, তাহারা দূরবর্ত্তী স্থানে অথবা জুমক্ষেত্রে গমন কালে পর্ব্বত জাত পিঠালী পত্রদ্বারা অন্নের পুটলী বাঁধিয়া লয়। এই পুটলীর ভাত দীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত গরম থাকে। এই পুটলীকে 'মোচা' বলা হয়, এবং ইহার অভ্যন্তরস্থ অন্ন 'মোচা-ভাত' নামে অভিহিত।

৩। পাঠান্তর,—শত মোচা অন্ন নিলে এক মোচা বাড়ে।

৪। পুরা কৃতযুগে রাজন্ মনুনা পূজিতঃ শিবঃ।
তত্রৈব বিরলে স্থানে মনুনাম নদী তটে।
গুপ্তভাবেন দেবেশঃ কিরাতনগরেহবসৎ। সংস্কৃত রাজমালাধৃত যোগিনীতন্ত্রবচন।

তৈছরাও রাজপুত্র নৃপতি তখন।
রাজেশ্বর তার পুত্র হইল রাজন্।।
তার দুই সুত হৈল অতি গুণবান।
মহাবন অতি ক্রোধ অগ্নির সমান।।

মৈছিলি রাজোপাখ্যান

জ্যেষ্ঠ ভাই রাজা হৈল পিতৃস্বর্গ পর।
পুত্রের কামনা করি পূজিল ঈশ্বর।।
অনেক বৎসর রাজা দেবতা পূজিল।
দৈবের নির্ব্বন্ধে তান পুত্র না জন্মিল।।
আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে।
পূজা গৃহে গেল রাজা চন্তাই সহিতে।।
চতুর্দ্দশ দেবতাকে প্রত্যক্ষ দেখিল।
যার যেই নিজাসনে বসি পূজা লৈল।।
বর মাগিলেন রাজা পুত্রের কারণে।
না হইব তব পুত্র কহে ত্রিলোচনে।।
ক্রোধ হৈল নরপতি মৃত্যু না জানিল।
মারিল শিবেরে তীর পায়েতে পড়িল।।
ক্রোধ হইয়া পশুপতি তাকে শাপ দিল।
সেইক্ষণে মহারাজা অন্ধ হৈয়াছিল।।
শাপের মোচন কথা জিজ্ঞাসে চন্তাই।
অধমে করিছে পাপ ক্ষমহ গোসাই।।
তাহা শুনি শিবে কহে চন্তাইর প্রতি।
কলিযুগে যত লোক হৈব পাপমতি।।
দেখ নাহি দিব আমি পূজার সময়।
পদচিহ্ন পাইবেক যে সবে পূজয়।।
না হইব তান পুত্র রাজা পাপমতি।
পাপ কর্ম্ম করি তার কি হৈব অব্যাহিত।।
ভাল হবে মনুষ্যের রক্ত চিরি লৈব।
সেই রক্ত দিয়া পরে ভূত বলি দিব।।

নারীর সহিতে রাজা স্বতন্ত্র রহিব।
কত দিন পরে নৃপচক্ষু ভাল হৈব।।
এ বলিয়া হরিহর গেল নিজ স্থান।
রক্ত আনিবারে দূত পাঠায় স্থানে স্থান।।
মৈছিলি[১] নাম লোক গেল রক্তের কারণ।
ত্রস্ত হৈল দেশবাসী যত প্রজাগণ।।
পিতা মাতা করিছে পুত্রেতে অপ্রত্যয়।
পতি পত্নী ভেদ মনে হৈল অতিশয়।।
বনেতে না যায়ে কেহ[২] নাহি চলে পথে।
ভয়াতুর সব হৈল বাঁচিব কি মতে।।
অমঙ্গল হইল ভূপতির নিজ দেশ।
ধরি নিলে লোকে তাকে না পায়ে উদ্দেশ।।
ভূত বলি[৩] দিয়া নৃপের চক্ষু হৈল ভাল।
বৃদ্ধ হৈল সে ই রাজা গ্রাসিলেক কাল।।
মৈছিলি ভূপতি নাম লোকে তার খ্যাতি।
তান ভ্রাতৃ তৈচুঙ্গ ফা হৈল নরপতি।।
তার পুত্র নরেন্দ্র যে ইন্দ্রকীর্ত্তি পৌত্র।
ইন্দ্রকীর্তি ঘরেত বিদ্বান রাজপুত্র।।
বহুকাল পালন করিল প্রজাগণ।
তান পুত্র যশরাজা হৈল সুরাজন।।

১। মৈছিলি—ত্রিপুরা জাতির সম্প্রদায় বিশেষ। দেবার্চ্চনায় বলিদানের নিমিত্ত মনুষ্য সংগ্রহ করা ইহাদের কার্য্য ছিল। ২। ত্রিপুর রাজ্যের প্রজাসাধারণের বনজ বস্তু (বৃক্ষ, বাঁশ ইত্যাদি) সংগ্রহের নিমিত্ত বনে যাওয়া একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য। অনেকের ইহা উপজীবিকা মধ্যে পরিগণিত। ৩। ভূত বলি—শিবের অনুচর বর্গের অর্চ্চনা। মৎস্যপুরাণোক্ত দেবী-অর্চ্চনা বিধিতে লিখিত আছে,—

"বৃক্ষেষু পর্ব্বতাগ্রেষু পাতালেসু চ যে স্থিতাঃ।
ভূমৌ ব্যোম্নি স্থিতা যে চ তে মে গৃহ্নন্ত্বিমং বলিম্।"

'শান্তিস্বস্ত্যয়নকল্পদ্রুমে' ভূতবলির বিধি পাওয়া যায়, যথা :—

ওঁ ভূতেভ্যো নমঃ ইতি পাদ্যাদিভিঃ সংপূজ্য,
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মাষভক্তবলয়ে নমঃ। ইতি বলিঞ্চ সংপূজ্য,
ওঁ যে রৌদ্রা রৌদ্রকর্মাণো রৌদ্রস্থাননিবাসিনঃ।
মাতারোহপ্যুগ্ররূপাশ্চ গণাধিপতয়শ্চ যে।
ওঁ বিঘ্নভূতাশ্চ যে চান্যে দিগ্‌বিদিক্ষু সমাশ্রিতাঃ।
সর্ব্বে তে প্রীতমনসঃ প্রতিগৃহ্নন্ত্বিমং বলিম্। ইত্যাদি।

তান পুত্র হইলেক বঙ্গ মহারাজা।
আপনার নামে রাজা স্থাপিলেক প্রজা।।
তাহার তনয় ছিল রাজা গঙ্গা রায়।
তান পুত্র ছাক্রু রায় রাজচ্ছত্র পায়।।

ৈতদাক্ষিণখণ্ডং সমাপ্তং

প্রতীত খণ্ড

(প্রতিজ্ঞা নিবন্ধ)

প্রতীত নামেতে জন্মে তাহার তনয়।
হেড়ম্বপতির সঙ্গে করে পরিণয়।।
হেড়ম্ব রাজায়ে দূত পাঠায়ে তখন।
প্রতীত রাজার স্থানে কহে বিবরণ।।
তোমা জ্যেষ্ঠ ভাই ঘরে উৎপত্তি তাহার।
এক বংশে দুই রাজা দৈব হেতু যার।।
দুই ভাই কতকাল একত্রে বঞ্চিব।
অন্য লোকে শুনিলে যে ভেদ না জানিব।।
শত্রু সবে শুনি ভয় পাইবেক মনে।
সুখেতে করিব রাজ্য ভোগ দুই জনে।।
এ কথা শুনিয়া রাজা প্রতীত তখন।
জ্যেষ্ঠ ভাই কহিছে যে সেই বিলক্ষণ।।
প্রতিজ্ঞা নিবন্ধ করি দূত গেল চলি।
তারপরে রাজা গেল জ্যেষ্ঠ ভাই বলি।।
দুই নৃপে অনেক করিল সম্ভাষণ।
একাসনে বসে দোঁহে একত্রে ভোজন।।
সীমানা করিল রাজ্যের সত্য নির্ব্বন্ধিয়া।
রাজত্ব করিব ভোগ সুখেতে বসিয়া।।
দুই ভাই কহিলেক একত্র হইয়া।
কখন সীমানা কার না লঙ্ঘিব গিয়া।।

দৈবে যদিহ কাক ধবল বর্ণ হয়।
তথাপি প্রতিজ্ঞা দুইর না লঙ্ঘি নিশ্চয়।।
তোমা আমা দুই জনের যদি সত্য টলে।
বংশ নাশ হইবেক গ্রাসিবে যে কালে।।
এই তত্ত্ব শুনিলেক অন্য রাজগণ।
চিন্তাযুক্ত হইলেক তাহাদিগের মন।।
কামাখ্যা জয়ন্তা আদি আছে রাজা যত।
হেড়ম্বের পূর্ব্বোত্তর বৈসে আর কত।।
তাহারা শুনিয়া বার্ত্তা মন্ত্রণা করিয়া।
পরমা সুন্দরী নারী দিল পাঠাইয়া।।
বসিয়াছে দুই নরপতি এক স্থান।
আনিয়া দেখায়ে নারী দুই বিদ্যমান।।
শিখাইছে রাজা সবে সেই সুন্দরীরে।
ত্রিপুর রাজার পানে চাহ আঁখি ঠারে।।
হেড়ম্ব রাজার পানে না করিও মন।
ত্রিপুরেতে পুনঃ পুনঃ কর নিরীক্ষণ।।
প্রতীত ত্রিপুর রাজা বড়হি সুন্দর।
দেখিলে সুন্দরী তুমি বুঝিবা অপর।।
বয়োধিক কিছু হয়ে হেড়ম্বের পতি।
ধৈর্য্য হৈয়া না চাহিব সে যে নারী প্রতি।।
রাজাগণে শিখাইয়া কহিছিল যাহা।
রাজ আজ্ঞা অনুসারে নারী করে তাহা।।
নারী হেরি হেড়ম্বের ভূপতি ভুলিল।
হর্ষ মনে সেই ক্ষণে দূতেতে পুছিল[১]।।
আমার কারণে কিবা পাঠাইছে সুন্দরী।
নারী বলে ভজিব ত্রিপুর অধিকারী।।
লজ্জা পাইয়া হেড়ম্বেত ক্রোধ হৈল মনে।
কর্ণ নাসা কাটিতে যে বলিল তখনে।

১। পুছিল—জিজ্ঞাসা করিল।

হেড়ম্ব আজ্ঞাতে লোক আসে কাটিবার।
ভয়ে কন্যা ত্রিপুর রাজা ডাকে বারে বার।।
ক্রোধ হইয়া ত্রিপুর রাজা উঠে সভা হৈতে।
সুন্দরী ধরিয়া নিল আপনার হাতে।।
সসৈন্যে চলিল রাজা আপনার দেশে।
তাহাতে হেড়ম্ব রাজা ক্রোধ হয়ে শেষে।।
অশ্ব গজ সাজিলেক সৈন্য পরাক্রম।
আপনে হেড়ম্ব চলে যেন কাল যম।।
সত্য কৈল নরপতি এই ক্ষণে যাব।
সুন্দরীকে বধ করি ত্রিপুরে দেখাব।।
সসৈন্যে হেড়ম্ব আইসে ত্রিপুর নগরী।
হেড়ম্বের এই তত্ত্ব শুনিল সুন্দরী।।
জীবন বধের ভয়ে সুন্দরী আপন।
কাঁদিয়া কহিল শুন ত্রিপুর রাজন্।।
এই দেশ ছাড় রাজা আমা প্রাণ রাখ।
নহে আমি চলি যাব তুমি এথা থাক।।
সুন্দরী দেখিয়া রাজা ভুলিয়াছে মন।
খলংমার কূলে আইসে ত্রিপুর রাজন্।।
হেড়ম্ব ত্রিপুর রাজা না দেখে সে স্থান।
আপনে লজ্জিত রাজা বুঝিল সন্ধান।।
পাপিষ্ঠ সুন্দরী আমা করিলেক ভেদ।
প্রণয় ভাঙ্গিল দোহে করিল বিচ্ছেদ।।
ভাইয়ের কারণে চিন্তে হেড়ম্ব রাজায়ে।
কিসের কারণে ভাই বিদেশেতে যায়ে।।
দশ বৃদ্ধ ত্রিপুরার সেনাপতি স্থানে।
কন্যার প্রব্বসঙ্গ কহে হেড়ম্ব রাজনে।।
ত্রিপুর রাজার থানা সে স্থানে রাখিয়া।
হেড়ম্ব ফিরিয়া গেল সেনাপতি লৈয়া।।
এত মত রঙ্গেতে প্রতীত রাজা আসে।
শিব দুর্গা বিষ্ণু ভক্তি হইল বিশেষে।।

তান সুত হইল মালছি মহারাজা।
তাহান তনয় হৈল গগন সুতেজা।।
তান পুত্র নাওড়াই হইল প্রধান।
হামতার ফা তান পুত্র জন্মে দিব্য জ্ঞান।।
হামতার ফা নাম পরে যুঝার তখন।
রাঙ্গামাটি জিনি খ্যাতি যুঝারে আপন[১]।।
রাজবংশ কীর্ত্তি সব শুনি মহারাজা।
আর শুনিবারে আজ্ঞা করে মহাতেজা।।

প্রতীত খণ্ডং সমাপ্তং।

যুঝার খণ্ড

(লিকা অভিধান)

শ্রীধর্ম্মমাণিক্য রাজা পুনঃ জিজ্ঞাসিল।
রাঙ্গামাটি দেশ রাজা কি মতে পাইল।।
মহন্ত ত্রিপুর জাতি চন্দ্র বংশোদ্ভব।
তাহার বৃত্তান্ত কহ বিস্তারিয়া সব।।
পুরুষানুক্রমে কথা জানেন বিস্তর।
কহিতে লাগিল পুনঃ দুর্ল্লভেন্দ্রবর।।
রাঙ্গামাটি দেশেতে যে লিকা রাজা ছিল।
সহস্র দশেক সৈন্য তাহার আছিল।।
ধামাই জাতি[২] পুরোহিত আছিল তাহার।
অভক্ষ্য না খায়ে তারা সুভক্ষ্য ব্যভার।।
আকাশেত ধৌত বস্ত্র তারাহ শুখায়।
শুখাইলে সেই বস্ত্র আপনে নামায়।।
বৎসরে বৎসরে তারা নদী পূজা করে।
স্রোত যে স্তম্ভিয়া রাখে গোমতী নদীরে[৩]।।

১। রাঙ্গামাটি জয় করিয়া স্বয়ং 'যুঝার' অর্থাৎ যোদ্ধ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২। ধামাই--মঘ জাতির শাখা বিশেষ। ৩। প্রাচীনকালে নদীর পূজা করিবার কালে, মন্ত্র প্রভাবে নদীর স্রোত স্তম্ভিত হইত, এইরূপ কথিত আছে।

স্রোত বন্ধ রাখে তারা পূজা যত ক্ষণ।
পূজা সাঙ্গে পুনর্ব্বার স্রোতের বহন।।
ধর্ম্মেতে নিপুণ তারা নামে লিকা জাতি[১]।
রাঙ্গামাটি পূর্ব্ব স্থান তাহার বসতি।।
ত্রিপুরার চরগণ তাহাকে দেখিয়া।
যুদ্ধ হেতু সৈন্য সেনা গেলেক সাজিয়া।।
হস্তী ঘোড়া চলিলেক অনেক পদাতি।
ভিন্ন ভিন্ন ক্রমে চলে যার সেই রীতি।।
অগ্র হৈয়া সৈন্য চলে পীঠবর্ত্তী পরে।
লাঙ্গাই সৈন্য চলিলেক নাওড়াই তদন্তরে।।
যার যেই সেনা লইয়া ভ্রাতৃগণ রাজার।
সৈন্য মধ্যে চলিতেছে রাজা ত্রিপুরার।।
ডাইনে বামে দুই ভাগ সেনাপতিগণ।
বহু সেনাপতি রহে পৃষ্ঠেতে রক্ষণ।।
তাহার পশ্চাতে রহে আর সেনাপতি।
রাজ ভ্রাতৃ সকলেরে ত্রাণ করে অতি।।
ধ্বজ পতাকা কত সহস্রে সহস্রে।
নানা রঙ্গে চলিয়াছে নানা বর্ণ অস্ত্রে[২]।।
শুভক্ষণ করিয়া চলিল নৃপবর।
কুকী সৈন্য আগে আগে বানায়ে যে ঘর।।
অরণ্যের পূর্ব্ব ভাগে লিকা নামে ছড়া।
যত আছে ছড়াকূলে লিকা দফা পাড়া।।
ত্রিপুরার সৈন্যে যুদ্ধ করে পরিপাটি।
ভঙ্গ দিয়া সব লিকা গেল রাঙ্গামাটি।।

১। লিকা—মঘ জাতির শ্রেণী বিশেষ।

২। পৃথক্ পৃথক্ অস্ত্রধারী সৈন্যদলের (তীরন্দাজ, ঢালী, গোলন্দাজ ইত্যাদি), স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বর্ণের পতাকা প্রচলিত ছিল।

রাঙ্গামাটি রাজ্যপাট

এ সব বৃত্তান্ত শুনে লিকা নরপতি।
সর্ব্ব সৈন্য সাজিলেক যুদ্ধে শীঘ্রগতি।।
লিকা নরপতি বোলে তুষে বান্ধ গড়।
তুষে পদ নাহি দিব ত্রিপুর ঈশ্বর।।
লক্ষ্মীচরিত্র পুস্তকে লিখিল বহু দোষ।
শাস্ত্রজ্ঞ ত্রিপুরেশ্বর না পারিব[১] তুষ[২]।।
ধর্ম্মবন্ত লিকা রাজা কহে শাস্ত্র দিয়া।
বিনা যুদ্ধে ত্রিপুর রাজা যাইব ফিরিয়া।।
ধর্ম্ম শাস্ত্র অনুসারে স্থির করে মন।
বান্ধিল তুষের গড় যত সৈন্যগণ।।
ধর্ম ভাবি লিকা পতি তুষ গড়ে রৈল।
তুষের গড়ের' পরে ত্রিপুর আসিল।।
দুই সৈন্যে মহা যুদ্ধ হইল বিস্তর।
অন্ধকার কেহ কার না হয়ে গোচর।।

১। না পারিব—মারাইবে না, পদক্ষেপ করিবে না। ২। তুষ—ধান্যের খোসা। সমুদ্র মন্থনে কৃষ্ণবর্ণা, রক্তলোচনা, রুক্ষ পিঙ্গলকেশা, জরাযুক্তা অলক্ষ্মী উৎপন্না হইয়া দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার কর্ত্তব্য কি?" দেবগণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—

'যেষাং নৃনাং গৃহে দেবী কলহঃ সম্প্রবর্ত্ততে।
তত্র স্থানং প্রযচ্ছামো বস জ্যেষ্ঠে শুভান্বিতা।।
নিষ্ঠুরং বচনং যে চ বদন্তি যেহনৃ তং নরাঃ।
সন্ধ্যায়াং যে হি চাশ্নন্তি দুঃখদা তিষ্ঠ তদ্‌গৃহে।।
কপালকেশভস্মাস্থিতুষাঙ্গারাণি যত্র তু।
স্থানং জ্যেষ্ঠে তত্র তব ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।।" ইত্যাদি।

পদ্মপুরাণ—স্বর্গখণ্ডম্‌, ৪১ অঃ ৩৫-৩৭ শ্লোক।

এতদ্বারা জানা যাইতেছে, তুষ অলক্ষ্মীর প্রিয়বস্তু, সুতরাং তাহাতে পদার্পণ করিলে শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়। বঙ্গদেশের রমণী সমাজে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল দেখা যায়।

ভূমি কম্পমান হৈল রাঙ্গামাটি দেশে।
ত্রিপুরায়ে হৈল গড় লিকা ভঙ্গ শেষে।।
লিকা নরপতি তাহে ডাকিয়া কহিল।
ত্রিপুরের নরেশ্বর শাস্ত্র না মানিল।।
নাহি জান ধর্ম্ম শাস্ত্র তুষে দিলা পদ।
কতকাল জীবে তুমি না রবে সম্পদ।।
এইমতে রাঙ্গামাটি ত্রিপুরে লইল।
নৃপতি যুঝার পাট[১] তথাতে করিল।।
লিকা জাতি করিলেক আপনার দল[২]।
তার সৈন্য সেনা দিয়া করে নিজ বল।।
রহিল অনেক কাল সে স্থানে নৃপতি।
বঙ্গদেশ আমল[৩] করিতে হৈল মতি।।
বিশালগড় আদি করি পর্ব্বতিয়া গ্রাম।
কালক্রমে সেই স্থান হৈল ত্রিপুর ধাম।।
বৃদ্ধ হৈল নরপতি দন্ত বিগলিত।
কালবশ হৈল রাজা সে রাঙ্গামাটিত।।
নৃপতির দাহ ক্রিয়া কৈল যেই স্থলে।
বৈকুণ্ঠপুরী[৪] তার নাম সর্ব্ব লোকে বোলে।।
শ্মশান উপর মঠ দিলেক নির্ম্মল।
ঘর নির্ম্মাইয়া রহে প্রহরী সকল।।

১। যুঝার পাট—যুঝার ফায়ের রাজধানী।

২। লিকাদিগকে নিজ দলভুক্ত করিলেন। প্রাচীন কালে বিজিত সৈন্যদিগকে রাজ-সৈন্যদলে গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল।

৩। আমল—দখল, আয়ত্ত।

৪। রাজ পরিবারের সমাধি ক্ষেত্রকে 'বৈকুণ্ঠ পুরী' এবং 'মুক্তিশিলা' ইত্যাদি নাম দেওয়া হইত।

রাজ-বংশমালা

জাঙ্গে ফা নামেতে তার পুত্র হৈল রাজা।
নানা স্থানে গিয়া করে চৌদ্দদেব পূজা।।
ফেণী নদী তীরে আর মোহরীর তীরে।
দেশের পশ্চিমে পূজে লক্ষ্মীপতি ধারে।।
পূর্ব্বদিকে পূজে আদ্যে অমরপুরেতে।
চতুর্দ্দশ দেব পূজে দৃঢ় ভক্তি মতে।।
তার পুত্র দেব রায় রাজা হৈল পরে।
গো ব্রাহ্মণ দৃঢ় ভক্তি তাহার অন্তরে।।
দেব রায়ের পুত্র শিব রায় ফা যে নাম।
বহুকাল পালে রাজ্য রূপ গুণ ধাম।।
তার পুত্র ডুঙ্গুর ফা হইল নরবর।
পালিল অনেক কাল লোকেরে বিস্তর।।
খাডঙ্গ ফা রাজা হৈল তাহার তনয়।
তার পুত্র ছেঙ্গ ফালাই পরে রাজা হয়।।
তাহার না ছিল পুত্র কর্ম্মদোষ পাশে।
তান ভাই ললিত রায় রাজা হৈল শেষে।।
মুকুন্দ ফা হইল রাজা তাহার তনয়।
কমল রায় নামে রাজা তান পুত্র হয়।।
কৃষ্ণদাস নামে রাজা তনয় তাহার।
দুই রাণী ঘরে হৈল পঞ্চ পুত্র তার।।
ছোট স্ত্রীর তনয় যশ ফা নামে রাজা।
তার পুত্র মুচঙ্গ ফা পালে সব প্রজা।।
পর স্ত্রীতে অবিরত অধর্ম্ম করিল।
সেই পাপে তার ঘরে পুত্র না জন্মিল।।
সাধু রায় নামে তার ছোট ভাই ছিল।
সর্ব্ব লোকে রাজি হইয়া তাকে রাজা কৈল।।

আছিল অনেক বর্ষ সেই মহারাজ।
তার কালে আনন্দে বঞ্চিল সব প্রজা।।
হইল প্রতাপ রায় তাহার তনয়।
পর নারী রূপবতী লোভ অতিশয়।।
সেই পাপে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষয় হইল।
মধ্যম পুত্র ঔরসে পৌত্র যে জন্মিল।।
তার নাম বিষ্ণুপ্রসাদ হইল প্রচার।
বহুকাল রাজ্য কৈল সুধর্ম্ম আচার।।
তার পুত্র বাণেশ্বর হইলেক রাজা।
তার পুত্র বীরবাহু হৈল মহা তেজা।।
সম্রাট হইল পরে তাহার নন্দন।
তার পুত্র চাম্পা নামে অতি সুশোভন।।
মেঘ নামে তার পুত্র পরে রাজা হৈল।
ছেঙ্কাচাগ নামে রাজা তার পুত্র ছিল।।
ছেংথোম্ফা নাম হৈল তাহার তনয়।
গৌড়ের রাজার সঙ্গে তার যুদ্ধ হয়।।

যুঝার খণ্ডং সমাপ্তং

ছেংথুম্ ফা খণ্ড

(মহাদেবীর বীরত্ব)

হীরাবন্ত খাঁ নামে বঙ্গের চৌধুরী[১]।
লুঠিলা তাহার রাজ্য বীরধর্ম্ম স্মরি।।
হীরা আদি নবরত্ন[২] ভরিয়া নৌকায়।
বৎসরান্তে এক নৌকা গৌড়েতে যোগায়।।

১। হীরাবন্ত সম্বন্ধে নানা ব্যক্তি নানা কথা বলিয়াছেন। পরলোকগত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মত এই :—

"ত্রিপুরেশ্বরের অধিকার মধ্যে—"হিরাবন্ত" নামক জনৈক ধনবান সামন্ত বাস করিতেন। তিনি বঙ্গেশ্বরের প্রধান কর্ম্মচারী ও বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। হীরাবন্ত ত্রিপুর রাজের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য মহারাজ ছেংথুম্ ফা বৃহৎ একদল সৈন্যসহ তিনজন সেনাপতি প্রেরণ করিলেন।"

কৈলাস বাবুর রাজমালা—২য় ভাঃ, ২য় অঃ, ২৪ পৃঃ।

শ্রীহট্টের ইতিহাস প্রণেতাও উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন, তিনি বলেন—"হীরাবন্ত নামে তাঁহার (ছেংথুম ফার) জনৈক সামন্ত তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য সৈন্য প্রেরিত হইলে হীরাবন্ত ভয়াতুর হইয়া গৌড়েশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করেন।"

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—২য় ভাঃ, ১ম খঃ, ৬ষ্ঠ অঃ।

সংস্কৃত রাজমালা অনুসরণে উপরিউক্ত মত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। রাজমালা বলেন,—

"অস্য রাজ্যে হীরাবন্তঃ স্থিতো বহুকরপ্রদঃ।
বঙ্গাধ্যক্ষোহতিদুর্বৃত্তো মহাবলপরাক্রমঃ।।
তং রাজানমবজ্ঞায় দিল্লীশ্বরমুপাগতঃ।
ইতি শ্রুত্বা ততো রাজা ক্রোধাৎ প্রচলিততেন্দ্রিয়ঃ।।
বঙ্গে সংপ্রেষয়ামাস মহাসেনাপতিত্রয়ং।"

বাঙ্গালা রাজমালা এ কথা বলেন না। এই পুঁথির মতে হীরাবন্ত বঙ্গের অধীনস্থ একজন চৌধুরী ছিলেন এবং ত্রিপুরেশ্বর তাঁহাকে ও গৌড়েশ্বরকে জয় করিয়া মেহেরকুল প্রদেশ অধিকার করেন।

২। নবরত্ন-"মুক্তা-মাণিক্য-বৈদুর্য্য-গোমেদান্ বজ্রবিদ্রুমৌ।
পদ্মরাগং মরকতং নীলঞ্চেতি যথাক্রমাৎ।।"—তন্ত্রসার।

(১) মুক্তা, (২) মাণিক্য (চুণী), (৩) বৈদুর্য্য (নীলকান্তমণি), (৪) গোমেদ (পীতবর্ণের মণি বিশেষ), (৫) হীরক, (৬) বিদ্রুম (প্রবাল), (৭) পদ্মরাগ (তাম্রবর্ণ বিশিষ্ট মণি), (৮) মরকত (পান্না), (৯) নীলা, এই সকল জাতীয় মণি নবরত্ন মধ্যে পরিগণিত হয়।

এক নৌকা ভেটি সে যে পায় মেহারকুল[১]।
লুঠিল তাহার রাজ্য সে হইছে ব্যাকুল।।
এ সব বৃত্তান্ত সে যে গৌড়েতে কহিল।
রাঙ্গামাটি যুঝিবারে গৌড় সৈন্য আইল।।
দুই তিন লক্ষ সেনা আসিল কটক।
মিলিতে চাহেন রাজা[২] দেখি ভয়ানক।।
সৈন্য সেনাপতি সবে অনুমতি দিল[৩]।
নৃপতিকে মহাদেবী অনেক ভর্ৎসিল।।
অখ্যাতি করিতে চাহ আমা বংশে তুমি।
বলে, আসি দেখ রঙ্গ যুদ্ধ করি আমি।।
এ বলিয়া ঢোলে বাড়ি দিতে আজ্ঞা কৈল[৪]।
যত সৈন্য সেনাপতি সব সাজি আইল।।
মহাদেবী জিজ্ঞাসিল বিনয় করিয়া।
কি করিবা পুত্র সব কহ বিবেচিয়া।।
গৌড় সৈন্য আসিয়াছে যেন যম কাল।
তোমার নৃপতি হৈল বনের শৃগাল[৫]।।
যুদ্ধ করিবার আমি যাইব আপনে।
যেই জন বীর হও চল আমা সনে[৬]।।
রাণী রাজ্য শুনি সভে বীর দর্পে বোলে।
প্রতিজ্ঞা করিল যুদ্ধে যাইব সকলে।।
তাহা শুনি রাজরাণী হরষিত হৈল।
সেনাপতি নারীগণ সব আনাইল।।

১। সদর রাজস্বের পরিবর্ত্তে বার্ষিক এক নৌকা দ্রব্য উপঢৌকন প্রদান করা হইত।

২। মিলিতে চাহেন-সন্ধি করিতে চাহেন।

৩। সন্ধি করিবার নিমিত্ত অনুমতি হইয়াছিল।

৪। পূর্ব্বকালে রাজবাড়ীতে একটী নাগড়া (দামামা) থাকিত। তাহা বাজাইলে সৈন্যগণ এবং নিকটবর্ত্তী প্রজাবর্গ রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইতে বাধ্য ছিল। সেকালে এতদ্দ্বারা বর্ত্তমান সময়ের বিগুলের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত।

৫। যুদ্ধভয়ে রাজা শৃগাল বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন।

৬। এই যুদ্ধের বিবরণ পরবর্ত্তী টীকায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

মহাদেবী মন্ত্রী সেনা রমণী লইয়া।
রন্ধন করায়ে বহু সাক্ষাতে বসিয়া।।
মহিষ গবয় ছাগ অনেক কাটিল।
পুঞ্জে পুঞ্জে অন্ন সভে রন্ধন করিল।।
মেঘ ছাগাদি হংস শূকর অগণ্য।
হরিণাদি করি যত পক্ষী বন্য অন্য।।
সহস্রে সহস্রে করে মদ্যের কলস।
দধি দুগ্ধ আনিলেক অনেক সুরস[১]।।
চারিদণ্ড থাকিতে দিবা ভক্ষ আরম্ভিল।
আনন্দে সকল সৈন্যে ভোজন করিল।।
প্রাতঃকালে সত্য করি চলিলেক সৈন্য।
পথ বন্ধ করি রৈল সৈন্য অগ্রগণ্য[২]।।
রাজার অসংখ্য সৈন্য যে কালে চলিল।
সিংহনাদ করি রণবাদ্য আরম্ভিল।।

গৌড়ের সঙ্গে যুদ্ধ

দুই সৈন্য আগু হৈয়া যুদ্ধ আরম্ভন।
অগণ্য গৌড়ের সৈন্য ভয় পায় তখন।।
ভঙ্গ দিল গৌড় সৈন্যে হইয়া কাতর।
খেদায়ে ত্রিপুর সৈন্যে কাটিল বিস্তর।।
তিন পথে ভঙ্গ দিয়া যায়ে গৌড়গণ।
ত্রিপুরায়ে তিন পথে কাটে অনুক্ষণ।।
স্বর্ণ খড়্গ চর্ম্ম তার শিরে স্বর্ণ পাগ।
অঙ্গেতে সোণার জিরা[৩] হইয়াছে রাগ।।

১। এই ভোজে আর্য্য ও অনার্য্য উভয় শ্রেণীর লোকের খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা নানা জাতীয় লোকের উপস্থিতি সূচিত হইতেছে।

২। অগ্রগামী সৈন্যদল মুসলমানগণের পথ অবরোধ করিল।

৩। জিরা—ইহা পার্শিভাষা, বিশুদ্ধ শব্দ 'জেরা'। যুদ্ধের পোশাককে 'জেরা' বলে।

চতুর্দ্দশ দেবতায়ে আগে চলি যায়।
সেনাপতি জানিয়া ত্রিপুরা পিছে ধায়[১]।।
চতুর্দ্দশ দেবতা অগ্রে যাইয়া কাটে।
পড়িল অশেষ সৈন্য দেবের কপটে।।
সহস্রেক অশ্ব পড়ে হস্তী শতে শত।
অগণ্য পড়িল সৈন্য পদাতি বহুত।।
দুই দণ্ড বেলা উদয় হৈল মহারণ।
এক দণ্ড বেলা থাকে সন্ধ্যা ততক্ষণ।।
এমত সময় রাজার ঊর্দ্ধে দৃষ্টি হৈল।
দেখিল গগনে এক কবন্ধে নাচিল।।
তাহা দেখিয়া সৈন্যের লোমাঞ্চিত হয়।
এক দণ্ড নাচি মুণ্ড ভূমিতে পড়য়।।
রাম কৃষ্ণ নারায়ণ নৃপতি স্মরিল।
রামায়ণ প্রমাণ যে রাজায়ে বলিল[২]।।
এক লক্ষ নর যদি যুদ্ধ করি মরে।
তবে সে কবন্ধ নাচে গগন উপরে।।
লক্ষ জীব মরিলেক জানিল নিশ্চয়।
এ কথা আমার বংশে কহিব যে হয়।।
এ বলিয়া ভূপতির হৈল হর্ষ মন।
চতুর্দ্দিকে দেখে নাহি বসিতে আসন।।
বসিতে আসন নৃপে কেহত না দিল।
রাজার জামাতা সেই কালে বিবেচিল।।

১। সেনাপতির প্রতি দেবত্বের আরোপ দ্বারা ত্রিপুর সৈন্যগণের অসাধারণ দেবভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

২। উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তিধারিণী রণরঙ্গিনী সীতা সহস্রস্কন্ধ রাবণকে বধ করিয়া, তাহার মুণ্ড লইয়া মাতৃকাগণের সহিত রণাঙ্গণে কন্দুক ক্রীড়ায় প্রবৃত্তা হইলেন (তৎকালে,—

"ন কোহপি রাক্ষসস্তত্র করপাদশিরোযুতঃ।
কবন্ধা যে চ নৃত্যন্তি তেষাং পাদা প্রতিষ্ঠিতাঃ।।
কবন্ধং রাবণস্যাপি নৃত্যন্তং চ ব্যলোকয়ৎ।
তদ্‌দৃষ্ট্বা সুমহাঘোরং প্রেতরাজপুরোপমম্।।"

অদ্ভুত রামায়ণ—২৪ শ সর্গ, ৩৫-৩৬ শ্লোক।

তুলসী দাসের রামায়ণে লিখিত এতদ্বিষয়ক বিবরণ পরবর্ত্তী টীকায় দ্রষ্টব্য।

যুদ্ধ স্থানে পড়িয়াছে মত্ত হস্তীগণ।
ত্বরিতে কাটিয়া আনে বৃহৎ দশন।।
নৃপতিকে বসিতে দিলেক দন্তাসন।
জামাতার পরাক্রম দেখিল রাজন।।
নৃপতি বসিল দন্তে হরষিত মন।
জামাতাকে তুষ্ট রাজা হইল আপন।।
পুত্রের সমান মান্য জামাতাকে করে।
তদবধি পুত্র জামাই বসে একত্তরে।।
ত্রিপুর রাজার পুরে যতেক জামাতা।
এক সের চাউল অন্ন গাতিঘরে[১] বাটা।।
এক জামাতা বিক্রম করে দৈবগতি।
তদবধি রাজার জামাতা সেনাপতি[২]।।
মেহারকুল ত্রিপুরার এইমতে হৈল।
চিরকাল প্রজাকে রাজা পালন করিল।।
তার পুত্র আচোঙ্গ হইল মহারাজা।
বহুদিন রাজ্য পালে সুখে ছিল প্রজা।।
আচোঙ্গ রাজার নাম আচোঙ্গ মা রাণী।
তদবধি রাজা রাণী এক নাম জানি।।
আচোঙ্গ নৃপতি স্বর্গী হইল যখন।
তার পুত্র খিচোঙ্গ রাজা হইল আপন।।
খিচোঙ্গ মা নামে ছিল তাহার রমণী।
বিচিত্র বসন শিক্ষা নির্ম্মায়ে আপনি।।
বৃদ্ধ হৈল নরপতি ভোগি নানা সুখে।
নাহি ছিল কোন মতে প্রজা পীড়া লোকে।।

১। গাতিঘর—পাকশালা। রাজ সরকার হইতে প্রত্যেক জামাতার নিমিত্ত একসের চাউলের অন্ন পাকের বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

২। এই সময় হইতে রাজজামাতা সেনাপতিপদে বরিত হইবার নিয়ম অনেক কাল চলিয়াছিল।

ডাঙ্গর ফা খণ্ড

(কুমারগণের পরীক্ষা)

তার পুত্র ডাঙ্গর ফা নামে নরপতি।
নানাস্থানে পুরী করি ছিল মহামতি।।
ডাঙ্গর মা ছিলেন তান পত্নীর যে নাম।
করিল অনেক নারী[১] বহু বিধ কাম।।
অষ্টাদশ পুত্র হৈল ডাঙ্গর ফার তাতে।
মনেতে চিন্তিল রাজা রাজ্য দিব কা'তে।।
একাদশী ব্রত রাজা আপনে রহিল।
অষ্টাদশ পুত্রকে যে ব্রত রাখাইল।।
কুক্কুর রক্ষক লোক ডাকিয়া নৃপতি।
গোপনে কহিল রাজা এই তার প্রতি।।
কালি দিন কুক্কুর রাখিয়া উপবাস।
পারণা দিবস কুক্কুর আন আমা পাশ।।
আজ্ঞা করিলে আমি কুক্কুর ছাড়ি দিবা।
যদি বা না রাখ আজ্ঞা প্রাণে সে মরিবা।।
এ বলিয়া নরপতি সংযম করিল।
অষ্টাদশ পুত্রকে যে সংযম রাখিল।।
পারণা দিবসে রাজা বসিল ভোজনে।
পংক্তি করি বৈসাইল সকল নন্দনে।।
পারণা করিতে সভে অন্ন আনি দিল।
জ্যেষ্ঠানুক্রমেতে তারা খাইতে আরম্ভিল।।
কুক্কুর লইয়া রক্ষক চলে সমুদিত।
ভোজন কালে নৃপতির হৈল উপস্থিত।।

১। ডাঙ্গর্ফাখ্যঃ সুতস্তস্য মহাবলপরাক্রমঃ।
অষ্টোত্তরশতং কন্যাং ক্রমাৎ পরিণিনায় সঃ।।
সংস্কৃত রাজমালা

পঞ্চগ্রাস[১] পুত্র সবে অন্ন যে খাইছে।
কুক্কুর রক্ষকে রাজা ইঙ্গিত করিছে।।
ত্রিশ কুক্কুর ছাড়ি দিল রাজপুত্র থালি[২]।
বড় ক্ষুধাতুর ছিল কুক্কুর সকলি।।
অন্ন দেখিয়া কুক্কুর মহাবল হৈল।
দেখিতে ত্বরিতে কুক্কুর পাত্রে মুখ দিল।।
অন্ন ছাড়ি উঠিল রাজ সতর তনয়।
কনিষ্ঠ রত্ন ফা করে চতুরতাময়।।
কুক্কুরে আসিয়া অন্নে মুখ দিতে চায়।
সেই কালে কত অন্ন দূরেতে ফেলায়।।
সেই অন্ন কুক্কুরে যাবত তাতে খায়।
সেই কালে রাজপুত্র উদর পূরায়।।
এই রূপে ক্ষুধা নিবারিল রাজসুত।
নৃপ দেখে চতুরতা তার অদ্ভুত।।
বালক হইয়া বুদ্ধি প্রকাশিল এত।
রাজ্যাধিপ হৈব সে যে জানিল সতত[৩]।।

১। পঞ্চগ্রাস ভোজনের প্রারম্ভে গণ্ডুষ করা।

২। ভোজনে চ সমারদ্ধে দৈবাৎ কুক্কুরপালকং।
সমুল্লঙ্ঘ্য চ তে স্পৃষ্টাঃ প্রায়শঃ স্বস্বকুক্কুরৈঃ।
সংস্কৃত রাজমালা।

এই ঘটনার বর্ণন করিতে যাইয়া কৈলাসবাবু বলিয়াছেন, ‘‘তিনি (ডাঙ্গর ফা) পুত্রগণের ভবিষ্যৎ রাজ্যাধিকারিত্ব স্থিরকরণ মানসে যুদ্ধের কুক্কুট সকল নিরাহারে আবদ্ধ রাখিতে ভৃত্যকে অনুমতি করেন পরে যখন স্বয়ং পুত্রগণের সহিত একত্রে আহার করিতে বসিলেন, তখন একজন অনুচরকে ঐ সকল কুক্কুট আহারস্থলে আনিয়া ছাড়িয়া দিতে গোপনে আদেশ করিলেন।’’
কৈলাসবাবুর রাজমালা,—২য় ভাঃ, ২য় অঃ।

কৈলাসবাবু ভ্রমবশতঃ ‘কুক্কুর’ স্থলে ‘কুক্কুট’ বলিয়াছেন।

৩। অন্য পুত্রগণের ভোজন কুক্কুরকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল। রত্ন ফা কতক অন্ন দূরে নিক্ষেপ করায় কুকুর সমূহ তাহা খাইতে লাগিল, ইত্যবসরে তিনি উদর পূর্ণ করিলেন। পুত্রের বুদ্ধিপ্রাখর্য্য সন্দর্শনে রাজা বুঝিলেন এই পুত্রই রাজ্যাধিকারী হইবেন।

রাজ্য বিভাগ

নিজ রাজ্য ভ্রমি রাজা সকল দেখিল।
সপ্তদশ পুত্রে রাজ্য ভাগ করি দিল।।
রাজা ফা নামেতে পুত্র রাজার প্রধান।
রাজা করিল তাকে রাজনগর স্থান।।
কাইচরঙ্গ রাজ্যে রাজা করে আর পুত্র।
আর পুত্র রাজা হৈল আচরঙ্গ যত্র।।
আর পুত্র ধর্ম্মনগরেত রাজা ছিল।
আর সুত তারক স্থানেতে রাজা হৈল।।
বিশালগড়েতে রাজা হৈল একজন।
খুটিমুড়া দিল এক নৃপতি নন্দন।।
নাসিকা দেখিয়া খর্ব্ব আর যে কোঙর।
নাকিবাড়ী তাকে দিল ত্রিপুর ঈশ্বর।।
আগর ফা পুত্রে রাজা আগরতলা দিল।
মধুগ্রামে আর সুত ভূপতি হইল।।
থানাংচি স্থানেতে রাজা হৈল একজন।
না মানিল লোকে তাকে অন্যায় কারণ।।
লোমাই নামেতে পুত্র বড় শিষ্ট ছিল।
মোহরী নদীর তীরে নৃপতি করিল।।
লাউগঙ্গা মোহরীগঙ্গা তথা নদী বসে।
আর ভ্রাতৃসঙ্গে রাজা বসে সেই দেশে।।
আচোঙ্গ ফা নামেতে যে আর পুত্র ছিল।
বরাক নদী সীমা করি তাকে রাজা কৈল।।
তৈলাইরঙ্গ স্থলে রাজা হৈল আর জন।
ধোপা পাথরেত রাজা আর এক জন।।
আর এক পুত্র দিল মণিপুর স্থানে।
সতর পুত্রেরে রাজ্য দিলেক প্রমাণে।।

রত্ন ফা গৌড়ে

বঙ্গ সঙ্গেতে রাজা বড় সুখ পাইল।
ভক্ষ্যভোজ্য সুখ ভোগ অনেক করিল।।
প্রণয় করিল রাজা গৌড়েশ্বর সঙ্গে।
কনিষ্ঠ পুত্র পাঠাইল লোক সঙ্গে রঙ্গে।।
নানা তীর্থ দেখিবেক রাজার তনয়।
গঙ্গাজল স্থান পানে হবে পুণ্যচয়।।
দুইশ চল্লিশ সেনা দিল নানা জাতি।
রত্ন ফা নামেতে পুত্র পাঠায়ে নৃপতি।।
তান মাতা মনদুঃখে কাঁদিল বিস্তর।
সে কথা লোকেতে গীত গায়ে ততঃপর[১]।।
ত্রিপুরার কত যন্ত্র ছাগ অন্ত্রে বাজে।
সেই যন্ত্রে গায়ে গীত ত্রিপুরা সমাজে।।
কত দিনে গৌড়ে গেল নৃপতি নন্দন।
পুত্র স্নেহ করে গৌড়েশ্বর মহাজন।।
সভাতে সন্মান বহু পায়ে দিনে দিনে।
গৌড়েশ্বরে সব কথা জিজ্ঞাসে আপনে।।
শত্রু মিত্র সভাতে যে কৌতুক হইল।
কেহ ভাল কেহ মন্দ তাহাকে বলিল।।
কার্ত্তিক মাসেতে ঘুঘুরা কীট যে পড়িল।
গর্ত্ত খনি কুকী লোকে তাহাকে খাইল।।
লোক মুখেতে তাহা শুনেন গৌড়েশ্বর।
হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে কুমারের তর[২]।।
তোমার রাজ্যের কুকী কীট ধরি খায়।
প্রণমিয়া রাজপুত্র বলিল তাহায়।।

১। এই সকল গীত বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা বহুচেষ্টা করিয়াও তাহার উদ্ধার করিতে পারি নাই।

২। কুমারের তর কুমারের প্রতি, কুমারকে।

তোমার রাজ্যেতে যত জাতি প্রজা বৈসে।
তাহার ভক্ষণ দ্রব্য তোমাতে কি আসে[১]।।
নানা জাতি লোক সব আমা সঙ্গে আছে।
কুকী কিরাত জাতি পিতায়ে সঙ্গে দিছে।।
সে সকল লোকে নানা দ্রব্য আনি খায়।
কখনেহ অনাচার নাহি ত্রিপুরায়।।
গৌড়েশ্বরে জানিলেক এই বড় রাজা।
নানাবিধ জাতি আছে এহান যে প্রজা।।
অধিক হইল মান্য নৃপতি তনয়।
দিনে দিনে গৌড়াধিপ প্রীতি অতিশয়।।
এই মতে কত বৎসর তথাতে আছিল।
পরমানন্দেতে গঙ্গা স্নানাদি করিল।।
এক দিন গৌড়েশ্বর দ্বারেতে কুমার।
সময় না পায়ে তাতে বসিছিল দ্বার[২]।।
শুভক্ষণ শুভ দিন ছিল সোমবার।
বেশ্যাগণ আসে গৌড়পতি মিলিবার।।
হিরণ্য রচিত ভূষা স্বর্ণ বস্ত্র পৈরি।
যোগান ধরিছে তাতে পরম সুন্দরী।।
শকটে চলিছে কেহ ঘোটক উপর।
নিশান ধরিছে কেহ নফর চাকর।।
প্রধানিকা চলিয়াছে চতুর্দ্দোলে চড়ি।
আগে পাছে চলে কত হাতে লৈয়া ছড়ি।।
লোক সব নিকট যায়ে দেখিবার তরে।
ছড়িদারে মারিয়া অন্তর করে দূরে।।
এসব ব্যভার[৩] দেখি রাজার নন্দন।
গৌড়েশ্বর পত্নী জ্ঞান করিল তখন।।

১। তোমার রাজ্যের নানা জাতীয় প্রজা যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহা ভোজন জনিত দোষ কি তোমার প্রতি আরোপিত হয়?

২। দরবারে যাইবার সময় না হওয়ায় দ্বারে উপবিষ্ট ছিলেন।

৩। ব্যভার—ব্যবহার।

সম্ভ্রমে উঠিয়া গিয়া আগে দাঁড়াইল।
ভূমিগত হৈয়া শির প্রণাম করিল।।
কোথাকার পুরুষ সে বেশ্যা জিজ্ঞাসিল।
সুন্দর অবোধ দেখি কটাক্ষে হাসিল।।
তাহার নমস্কার হেরি যত গৌড়বাসী।
বহু উপহাস্য করে কৌতুকেতে বসি।।
নগরিয়া হাসে যত নাগরী সকল।
গৌড়ের নাগরী লোক কুতর্ক কুশল।।
তাহা শুনি হাসিলেক গৌড় অধিপতি।
কুমারেকে ডাকাইয়া নিল শীঘ্রগতি।।
পুছিলেক গৌড়াধিপে এ সব বৃত্তান্ত।
তুমি ভক্তি কর কেন বেশ্যাকে একান্ত।।
প্রণাম করিয়া কহে রাজার কুমার।
গৌড়েশ্বর পত্নী জ্ঞানে করি নমস্কার।।
আড়ষ্ট ভাব কথা তার শুনিয়া তখনে।
বহু দয়া উপজিল গৌড়েশ্বর মনে।।
জিজ্ঞাসিল প্রীতিবাক্য গৌড়ের ঈশ্বর।
অতি ক্ষীণ হৈছে কেন তোমা কলেবর।।
তোমার পিতায়ে নাহি পাঠায়ে যে ধন।
সেই হেতু দুঃখ পাও আমার ভবন।।
তাহা শুনি কহিলেক নৃপতি নন্দন।
গৌড় রাজ্যে দুঃখ নাহি অন্নের কারণ।।
পিতায়ে ভ্রাতৃকে দিল ভাগ করি রাজ[১]।
আমাকে পাঠাইয়া দিল তোমার সমাজ[২]।।
তব কৃপা হৈলে সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হবে।
গৌড়েশ্বরে জিজ্ঞাসিল কি কর্ম্ম করিবে।।

১। রাজ—রাজ্য, রাজত্ব।

২। সমাজ—সভা।

অনেক কটক দিব নিবা তোমা সঙ্গে।
আপনা রাজ্যেতে যাইয়া রাজা হও রঙ্গে।।

ডাঙ্গর ফা খণ্ডং সমাপ্তং

রত্নমাণিক্য খণ্ড

(মাণিক্য খ্যাতি)

অনুমতি পাইলেক নৃপতি তনয়।
গৌড়াধিপে সৈন্য তাকে দিল অতিশয়।।
রত্ন ফা চলিল নিজ রাজ্য লইবারে।
কত দিনে আসিলেক জামির খাঁর গড়ে।।
গড় জিনি রাঙ্গামাটি ছাড়াইয়া লৈল।
ডাঙ্গর ফার সৈন্য সব পর্ব্বতেত গেল।।
আর রাজপুত্র সভে ভঙ্গ দিল তায়।
গৌড় সৈন্য তার পাছে খেদাইয়া যায়।।
থানাংচি পর্ব্বতে রাজা ডাঙ্গর ফা মরিল।
আর যত রাজপুত্র লড়াইয়া ধরিল।।
ভঙ্গ দিতে যে যে স্থানে যে কর্ম্ম করিল।
সেই স্থানের নাম তার সে মতে রাখিল।।
গবয় কাটিল যথা ত্রিমুনিয়া ধার।
তৈতানব পাড়া নাম ত্রিমুনি জাগার।।
ভঙ্গ দিতে যেই স্থানে করিল মন্ত্রণা।
ছায়ের নদী নাম তার বলে সর্ব্ব জনা।।
দুই নদী কূলে প্রজা মিলি বিদায় হৈল।।
তৈলাইঙ্গ নাম তার লোকে খ্যাতি রৈল।।
ধরিতে ক্রন্দন যথা নৃপতি নন্দন।
কাবতৈ বলিয়া তারে বলে সর্ব্বজন।।
মুড়া[১] কাটি রাজ ভ্রাতৃ আনে যেই স্থানে।
সমার করিয়া নাম বোলে সর্ব্ব জনে।।

১। মুড়া,—মস্তক, পর্ব্বতের শৃঙ্গ। এস্থলে শৃঙ্গকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

কদলীর খোল যথা করিল ভক্ষণ।
তৈলাইফাঙ্গ নাম তার রাখে প্রজাগণ।।
সর্ব্ব ভ্রাতৃ জিনিয়া পাইল রাজ্য স্থান।
পুনর্ব্বার গেল গৌড়েশ্বর বিদ্যমান।।
বহুকরি হস্তী নিল অতি বৃহত্তর।
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল গৌড়ের ঈশ্বর।।
রাজপুত্র জানবান হেন হৈল জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর আপনেহ করিল ব্যাখ্যান।।
রত্ন ফা নাম তার পিতায়ে রাখিছিল।
রত্ন মাণিক্য খ্যাতি গৌড়েশ্বরে দিল[১]।।
তদবধি মাণিক্য উপাধি ত্রিপুরেশে।
বিদায় হইয়া রাজা চলিলেক দেশে।।

বঙ্গ উপনিবেশ

গৌড়েশ্বর স্থানে পুনঃ কহিলেক আর।
বঙ্গলোক[২] কত পাইলে রাজ্যেতে নিবার।।
পুনঃ দশ হস্তী দিল গৌড়েশ্বর তরে।
তুষ্ট হৈয়া আজ্ঞা দিল বঙ্গ অধিকারে[৩]।।

১। এই সময় বঙ্গের সিংহাসনে সুলতান সামসুদ্দিন ও দিল্লীর আসনে সম্রাট ফিরোজ তোগলক অধিষ্ঠিত ছিলেন। সংস্কৃত রাজমালার মতে এই উপহার দিল্লীশ্বরকে দেওয়া হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ইহা দিল্লীর বাদশাহকে কি গৌড়েশ্বরকে প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে নির্ণয় করিবার উপায় নাই। এ বিষয় পরবর্ত্তী টীকায় সন্নিবিষ্ট ''রাজচিহ্ন'' শীর্ষক আখ্যায়িকায় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

কথিত আছে, ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ত্তমান কৈলাসহর বিভাগের অন্তর্গত জঙ্গলে শিকার উপলক্ষে যাইয়া মহারাজ রত্নমাণিক্য উক্ত মণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন. তদবধি সেই স্থানের নাম "মাণিক ভাণ্ডার'' হইয়াছে।

২। বঙ্গলোক বাঙ্গালী।

৩। বঙ্গের প্রজাদিগকে রাজার অধিকারে (রাজ্যে) নেওয়ার অনুমতি দিলেন।

পরয়ানা[১] করি দিল বার বাঙ্গলাতে[২]।
নবসেনা[৩] যতেক মিলানি করি দিতে।।
দশ হাজার ঘর বঙ্গ দিতে আজ্ঞা হৈল।
বঙ্গে আসি সেনা চারি হাজার পাইল।।
ভদ্রলোক প্রভৃতি যতেক নবসেনা।
স্বর্ণগ্রামে পাইল শ্রীকর্ণ[৪] কত জনা।।

১। পরয়ানা—আদেশপত্র।

২। বার বাঙ্গলা,—বারভূঁয়ার শাসনাধীন বঙ্গদেশ। দ্বাদশজন ভৌমিক বা রাজা উপাধিধারী জমিদার কর্ত্তৃক বঙ্গ দেশ শাসিত হইত। আইন ই আকবরী, আকবরনামা প্রভৃতি মুসলমান ইতিহাসে এই সামন্তগণের মধ্যে কাহারও কাহারও নামোল্লেখ আছে। ইঁহারা সকলেই প্রায় আকবর সাহের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। মুসলমান সম্রাটগণ ইঁহাদের নিকট হইতে বঙ্গদেশের কর গ্রহণ করিতেন, এবং প্রয়োজন হইলে সৈন্য সংগ্রহদ্বারা দিল্লীশ্বরের সাহায্য করিতে ও অন্যবিধ আদেশ প্রতিপালন করিতে তাঁহারা বাধ্য থাকিতেন। দ্বাদশ ভৌমিকের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

(১) রাজা কন্দর্প নারায়ণ রায় ;—ইনি বঙ্গজ কায়স্থ। চন্দ্রদ্বীপ ইঁহার শাসনাধীন ছিল।
(২) প্রতাপাদিত্য ;—ইনি যশোহরের শাসনকর্ত্তা, বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন।
(৩) লক্ষ্মণ মাণিক্য ;—ইনি বঙ্গজ কায়স্থ বংশীয়, ভুলুয়া ইঁহার অধিকারভুক্ত ছিল।
(৪) মুকুন্দ রায় ;—ইনি দেব বংশীয় এবং ভূষণার অধিপতি ছিলেন।
(৫) চাঁদ রায় ও কেদার রায় ;—ইঁহারাও দেব বংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ। বিক্রমপুরে ইঁহাদের শাসন দণ্ড পরিচালিত হইতেছিল।
(৬) চাঁদ গাজি ;—ইনি চাঁদপ্রতাপের শাসনকর্ত্তা, জাতি মুসলমান।
(৭) গণেশ রায় ;—উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ, ইনি দিনাজপুরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।
(৮) হাম্বীরমল্ল ;—মল্লবংশীয়, বিষ্ণুপুরের অধিপতি ছিলেন।
(৯) কংসনারায়ণ ;—ইনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, তাহিরপুরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।
(১০) রামচন্দ্র ঠাকুর ;—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, পুঁটীয়া ইঁহার শাসনাধীন ছিল।
(১১) ফজল গাজি ;—ইনি মুসলমান, ভাওয়ালে ইঁহার শাসনদণ্ড পরিচালিত হইত।
(১২) ঈশা খাঁ মসনদ আলী ;—ইনি মুসলমান, খিজিরপুর ইঁহার করতলস্থ ছিল।

৩। নবসেনা ;—নবশাক জাতি, এই নয় জাতি শূদ্রমধ্যে পরিগণিত। পরাশর সংহিতা বলেন,—

"গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজী।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কঃ।।

গোপ, মালাকার, তিলি, তাঁতি, মোদক, বারুই, কুম্ভকার, কর্ম্মকার ও নাপিত এই নয় জাতি নবশাক ও নবসেনা মধ্যে গণ্য।

৪। কায়স্থ জাতির শাখা বিশেষকে 'শ্রীকরণ' বলে। লিপিব্যবসায়ী বলিয়া এই আখ্যা হইয়াছে। "শ্রীকর্ণ" ও "শ্রীকরণ" অভিন্ন শব্দ।

সে সব সহিতে রাজা রাজ্যেতে আসিল।
রাঙ্গামাটি দুই হাজার ঘর বসাইল।।
রত্নপুরে বসাইল সহস্রেক ঘর।
যশপুরে বসাইল পঞ্চশত পর।।
হীরাপুরে পঞ্চশত ঘর বৈসাইল।
এই মতে রাঙ্গামাটি নবসেনা গেল[১]।।
ধর্ম্ম প্রতি প্রীতিমতি রত্ন নৃপবর।
রাম কৃষ্ণ নারায়ণ শব্দ নিরন্তর।।
সর্ব্ব জন মিলিলেক আর মিলে কুকী।
প্রজা লোক সুখে বসে নাহি কেহ দুঃখী।।
চৌগাম[২] খেলয়ে রাজা রত্ন নৃপবর।
চতুর্দ্দিকে গজ অশ্বে যোগান বিস্তর।।
রাঙ্গামাটি স্থানে হস্তী অল্প আয়ু হয়।
এক সন্ন্যাসীর স্থানে নৃপে জিজ্ঞাসয়।।
সে সাধুয়ে রাঙ্গামাটি ঔষধি গাড়িল[৩]।
তদবধি হস্তী আয়ু বিশাল[৪] হইল।।
বৃদ্ধ হৈল নরপতি কালক্রম পাইয়া।
তান দুই পুত্র ছিল বলবন্ত হৈয়া।।
প্রতাপ জ্যেষ্ঠের নাম মুকুট কনিষ্ঠ।
মহাসত্ত্ব দুই ভাই পরম বলিষ্ঠ।।
রত্ন মাণিক্য রাজা স্বর্গে হৈল গতি।
অধার্ম্মিক প্রতাপ মাণিক্য হৈল খ্যাতি।।

১। ত্রিপুররাজ্যে ইতি পূর্ব্বে বাঙ্গালীর আগমন হইয়া থাকিলেও এতদ্দ্বারা রাজ্যমধ্যে নানা জাতীয় বাঙ্গালী বসতির সূত্রপাত হইয়াছিল।

২। চৌগাম খেলা ;—ইহা পারসী ভাষা, 'চৌগান্ খেলা' বিশুদ্ধ শব্দ, কোন কোন দেশে চৌঘান বাজিও বলে। কাশ্মীরের উত্তরবর্ত্তী লদাক ও তিব্বতে এই ক্রীড়ার বিশেষ প্রচলন আছে। এই খেলায় অশ্বে আরোহণ করিয়া একটি ভাটাকে দণ্ডদ্বারা আঘাত করিতে করিতে হইয়া যায়। ইহা ইংরেজদিগের (Hockey) খেলার ন্যায়। তিব্বতীয় ভাষায় এই খেলাকে পোলো বলে।

৩। গাড়িল ;—পুঁতিল।

৪। আয়ু বিশাল ;—দীর্ঘায়ু।

তাহানে মারিল রাত্রে দশ সেনাপতি।
পরে মুকুট মাণিক্য হৈল রাজখ্যাতি।।
বলবন্ত মুকুট মাণিক্য মহাবীর।
বহু দিন রাজ্য কৈল হইয়া সুস্থির।।
তাহান তনয় মহামাণিক্য নৃপবর।
ধর্ম্মেতে পালিল রাজ্য অনেক বৎসর।।
তান পুত্র হৈলা তুমি শ্রীধর্ম্ম মাণিক্য।
যাহা জানি বলিয়াছি তোমাতে যে মুখ্য।।

পুরাণ-প্রসঙ্গ

নৃপতির মনে অতি বিবেক জন্মিল।
সেই বিপ্র সম্বোধিয়া পুনঃ জিজ্ঞাসিল।।
ত্রিলোচন সম রাজা ত্রিপুরের কুলে।
হবে কি এমত রাজা দেখ শাস্ত্র বলে।।
বাণেশ্বর শুক্রেশ্বর দুই দ্বিজবর।
নৃপতির বাক্য শুনি দিলেক উত্তর।।
যাহা জিজ্ঞাসিলা নৃপ বলি তত্ত্ব সার।
জন্মিব বিশিষ্ট রাজা বংশে ত্রিপুরার।।
হরগৌরী সংবাদেতে কহিছে শঙ্কর।
রাজ-মালিকা তন্ত্রে শুনহ নৃপবর।।
এ বলিয়া দুই দ্বিজে তন্ত্র দেখাইল।
হরগৌরী সংবাদেতে প্রমাণ পাইল।।

অথ শ্লোকঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

বর্ম্মান্তে তু গতে ভূপে ক্রোধস্যাক্ষো ভবিষ্যতি।
সসাধ্য গ্রহযুগ্মাব্দং ততোহসৌ ন ভবিষ্যতি।।

পুনরপি কহিলেক সেই দ্বিজগণ।
অধর্ম্মী হইলে রাজা ত্বরিতে পতন।।

পৃথিবী কাহার নহে পুণ্য নিত্য সার।
ভোজবাজি প্রায় জান অসার সংসার।।
জীবন যৌবন ধন জল-বিম্ব[১] প্রায়।
সুসময় কালে আসে কুসময়ে যায়।।
শাশ্বত[২] না হয়ে কিছু বিচিত্র সংসার।
না জানিয়া মূঢ় নৃপে বোলে কাট মার।।

ইতি রাজমালায়াং শ্রীধর্ম্মমাণিক্য জিজ্ঞাসা
দুর্ল্লভেন্দ্র চন্তাই বাণেশ্বর শুক্রেশ্বর দ্বিজ কথনং সমাপ্তং।।

১। জলবিম্ব—বুদ্বুদ।

২। শাশ্বত—নিত্য।

শ্রীরাজমালা

প্রথম লহরের মধ্যমণি

(টীকা)

প্রথম লহরের মধ্যমণি

(টীকা)

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।।

গ্রন্থভাগে উল্লিখিত যে সকল বিষয়ের বিবৃতি পাদটীকায় সন্নিবিষ্ট করিবার সুবিধা ঘটে নাই, সেই সমস্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই টীকায় প্রদান করা যাইতেছে। রাজমালার উক্তির সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলে, বিষয়গুলি স্পষ্টতর রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

রাজমালা প্রথম লহর ও তাহার রচয়িতাগণ

(মূল গ্রন্থের ৩—৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বঙ্গভাষায় গ্রন্থরচনার প্রারম্ভকাল নির্ণয় করা সময় সাপেক্ষ

বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনার পদ্ধতি কতকাল পূর্ব্বে, কোন সময় প্রথম আরম্ভ হইয়াছে, অদ্যাপি তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে নাই। নিত্য নূতন প্রাচীন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতেছে, এবং এই আবিষ্কারের ফলে ক্রমশঃ প্রাচীন সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, এখনও কত গ্রন্থ লোক-লোচনের অগোচর রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে? এরূপ অবস্থায় বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীনত্ব নির্দ্ধারণ করা বহু সময় সাপেক্ষ বলিয়া মনে হয়।

রাজাবলী

ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত "রাজাবলী" একখানা প্রাচীন গ্রন্থ, ইহা আট শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়াছিল, সেই গ্রন্থ বর্ত্তমান কালে দুষ্প্রাপ্য। স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" এই পুথির উল্লেখ আছে। এতকাল উক্তগ্রন্থ বঙ্গভাষার আদি গ্রন্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছিল; কিন্তু অধুনা নয়শত বৎসরের প্রাচীন দুই একখানা গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। তদ্ব্যতীত রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ এবং মাণিকচাঁদ ও গোবিন্দচন্দ্রের গান আটশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এরূপ স্থলে রাজাবলীকে বঙ্গভাষার আদি গ্রন্থ বলা যাইতে না পারিলেও, ইহা যে ভাষার আদিম অবস্থার গ্রন্থ, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। উহার সমসাময়িক বা পূর্ব্ববর্ত্তীকালের উপরি উক্ত তিন চারি খানা ব্যতীত অন্য কোনও গ্রন্থ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই।

কেহ কেহ বলেন, 'রাজাবলী' নামক স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ ছিল না। ইহা রাজমালার নামান্তর মাত্র। যে গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থির মীমাংসায় উপনীত হওয়াও দুরূহ ব্যাপার। এরূপ স্থলে উপরি উক্ত মতের প্রতিবাদ চলে না; অথচ, পূর্ব্বোক্ত মতের প্রতি আস্থা স্থাপনের যোগ্য কোন প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে না, সকলেই অন্ধকারে ঢিল নিক্ষেপ করিয়াছেন।

রাজমালা

মহারাজ ত্রিলোচনের অধস্ত ১০২ স্থানীয় ভূপতি ধর্ম্মমাণিক্যের শাসনকালে তাঁহার অনুজ্ঞায় ত্রিপুরার অন্যতম ইতিহাস 'রাজমালা' (প্রথম লহর) রচিত হয়, এতদ্দ্বারাই রাজমালা রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল। ইহার ভাষা স্থানে স্থানে অতিরঞ্জিত বা অন্ধ-বিশ্বাস-মূলক হইলেও, ঐতিহাসিক উপাদানের হিসাবে ইহার মূল্য অনেক বেশী। এই গ্রন্থ মহীশূরের প্রাচীন ইতিবৃত্ত 'রাজাবলীকথে', কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণী', ও জৈন ইতিহাস মেরুতুঙ্গের 'প্রবন্ধ চিন্তামণি' প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থের ন্যায় মূল্যবান ও প্রামাণিক। সতর্কতার সহিত বাছিয়া লইলে, রাজমালা হইতে অনেক মূল্যবান রত্ন উদ্ধার করা যায়।* এই গ্রন্থের প্রস্তাবনায় লিখিত আছে ;—

"ত্রিলোচন বংশে মহামাণিক্য নৃপতি।
তান পুত্র শ্রীধর্ম্ম মাণিক্য নাম খ্যাতি।।
বহু ধর্ম্মশীল রাজা ধর্ম্মপরায়ণ।
ধর্ম্মশাস্ত্রক্রমে প্রজা করিছে পালন।।
এককালে মহারাজ বসি ধর্ম্মাসনে।
রাজবংশাবলীকীর্ত্তি শ্রবণেচ্ছা মনে।।
দুর্ল্লভেন্দ্র নাম ছিল চন্তাই প্রধান।।
চতুর্দ্দশ দেবতা পূজাতে দিব্যজ্ঞান।।
ত্রিপুরের বংশাবলী আছয়ে অশেষ।
রাজকুল কীর্ত্তি সব জানেন বিশেষ।।
বাণেশ্বর শুক্রেশ্বর দুই দ্বিজবর।
আগমাদি তন্ত্র তত্ত্ব জানেন বিস্তর।।
* * * * *
তিনেতে জিজ্ঞাসা রাজা করে এ বিষয়।।

---

* এই গ্রন্থ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড্ লং সাহেব (Rev. James Long) বলিয়াছেন,—As though interspersed with a variety of Legends and myths, it gives us a picture of the State of Hindu Society and customs in a country little known to Europeans.

J.A.S.B.---Vol., XIX

তারা তিনে কহে রাজা কর অবধান।
তোমার বংশের কথা নিশ্চয় প্রমাণ।।"

উদ্ধৃত অংশ আলোচনায় জানা যাইতেছে, মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের আদেশে চন্তাই দুর্ল্লভেন্দ্র এবং বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর নামক সভাপণ্ডিতদ্বয় রাজমালা রচনা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। দুর্ল্লভেন্দ্র চতুর্দ্দশ দেবতার প্রধান পূজক ছিলেন। সেকালে চন্তাইগণের দেব সেবার কার্য্য ব্যতীত রাজ বংশাবলী এবং রাজত্বের ইতিহাস কণ্ঠস্থ রাখা আর একটী কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল ; এবং প্রয়োজন মতে তাঁহারা ত্রিপুর ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতেন। এ জন্যই বলা হইয়াছে,—"পূর্ব্বে রাজমালা ছিল ত্রিপুর ভাষাতে।" ত্রিপুর ভাষায় বর্ণমালা প্রচলিত নাই, সুতরাং ঐতিহাসিক বিবরণ কণ্ঠস্থ রাখা হইত, ইহাই বুঝা যায়। এই কারণেই রাজমালা রচনা কার্য্যে দুর্ল্লভেন্দ্র চন্তাই বেদব্যাসের আসন পাইয়াছিলেন ; গণেশরূপী বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর, দুর্ল্লভেন্দ্রের উক্তি কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

রাজমালার রচয়িতাগণ

বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বরের প্রকৃত পরিচয় সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়া, নানা ব্যক্তি নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইঁহারা ত্রিপুরা জেলার লোক. আবার, কাহারও কাহারও মতে কবিদ্বয় শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন। শ্রীহট্টের ইতিহাস প্রণেতাও শেষোক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন; কিন্তু কোন পক্ষই প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা আত্ম বাক্য পোষণ করিতে পারেন নাই। গ্রন্থের ভাষা আলোচনা করিলে বুঝা যায়, কবিদ্বয় ত্রিপুরা, নোয়াখালী কিম্বা শ্রীহট্ট অঞ্চলের লোক ছিলেন। গ্রন্থভাগে সেই সকল জেলায় ব্যবহৃত অনেক শব্দ পাওয়া যায়। আমরা এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া নিম্নোক্ত কতিপয় কারণে কবিদ্বয়কে শ্রীহট্ট নিবাসী বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম।

বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর পরিচয় সম্বন্ধে মতদ্বৈধ

(১) ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী আসাম প্রদেশে থাকায়, পূর্ব্বকালে রাজ দরবারে সেই অঞ্চলের ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। সুতরাং সভা পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর তদঞ্চলের লোক হইবার সম্ভাবনাই অধিক।

(২) মহারাজ আদি ধর্ম্ম ফা, রাজমালা রচনার অনেক পূর্ব্বে, মিথিলা হইতে পঞ্চ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া এক বিরাট যজ্ঞ সম্পাদন করেন। এই যজ্ঞ বর্ত্তমান শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্নিবিষ্ট স্থানে হইয়াছিল; অথচ এরূপ প্রসিদ্ধ একটী ঘটনার বিষয় রাজমালায় উল্লেখ করা হয় নাই। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রণেতা সুহৃদ্বর শ্রীযুত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় এতদ্বিষয়ে বলিয়াছেন,—

"শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে রাজমালা রচনা করেন। ইঁহারা যজ্ঞকালের বহু পরবর্ত্তী,

আধুনিক লোক, এবং বোধ হয় সাম্প্রদায়িক শ্রেণীর নহেন; তাই এই বিষয়টি (যজ্ঞের বিষয়টা) ভুল করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।।"*

অচ্যুত বাবুর এই ইঙ্গিত দ্বারা আমাদের আর একটী কথা মনে পরিয়াছে ; যজ্ঞ উপলক্ষে মিথিলা হইতে সমাগত ব্রাহ্মণগণ শ্রীহট্ট অঞ্চলে "সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ" নামে অভিহিত। এই সাম্প্রদায়িকগণের আগমনে, শ্রীহট্টের প্রাচীন বংশীয় ব্রাহ্মণগণের গৌরব কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর সম্ভবতঃ সাম্প্রদায়িক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না, এই কারণে নিজ কুলের গ্লানিকর যজ্ঞ ও মৈথিল ব্রাহ্মণের আগমন বৃত্তান্ত প্রচ্ছন্ন রাখা বিচিত্র নহে। শ্রীহট্ট ব্যতীত, ত্রিপুরা বা নোয়াখীলী জেলার ব্রাহ্মণগণের, উক্ত ঘটনায় কোনরূপ ক্ষতি বৃদ্ধি ঘটে নাই, সুতরাং পণ্ডিতদ্বয় ঐ সকল জেলা বাসী হইলে, যজ্ঞের কথা উল্লেখ না করিবার কারণ ছিল না। এরূপ প্রসিদ্ধ একটী ঘটনার কথা জানা না থাকায় কিম্বা ভ্রম প্রযুক্ত উল্লেখ করা হয় না, ইহা সম্ভব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না, ইচ্ছাকৃত বলিয়াই মনে হয় ; এবং এই কারণেই পণ্ডিতদ্বয়কে শ্রীহট্টবাসী প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশীয় বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে।

(৩) গ্রন্থ ভাগে ব্যবহৃত অনেক শব্দ একমাত্র শ্রীহট্ট অঞ্চলে ব্যবহার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে 'উভা' শব্দটী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ; প্রাচীন রাজমালার আদ্যন্ত আলোচনা করিলে এই শব্দটীর বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হইবে। শ্রীহট্টে ব্যবহৃত 'উভা শব্দের অর্থ দণ্ডায়মান। রাজমালায় ঠিক এই অর্থেই উক্ত শব্দের ব্যবহার পাওয়া যাইতেছে, যথা ;—

(১) "গজভীম নারায়ণ উভা হৈয়া কৈল।"

(২) "বসিবার যোগ্য যেই সেই জন বৈসে।
বাজুধরি আর সব উভা চারি পাশে।।"

(৩) "এক এক ত্রিপুর যে এক এক বঙ্গ।
পংক্তি করি উভা কর বন্ধু হউক সঙ্গ।" ইত্যাদি।

'উভা' শব্দ অন্য দেশে প্রচলিত থাকিলেও তাহা ঠিক দণ্ডায়মান অর্থে ব্যবহৃত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায় না; যথা—"উভা করি বাঁধে চুল" ইত্যাদি। কেবল শ্রীহট্টেই 'দণ্ডায়মান' স্থলে 'উভা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; এতদ্বারাও কবিদ্বয় শ্রীহট্টবাসী বলিয়া সূচিত হয়।

আবার কেহ কেহ বলেন, শ্রীহট্ট জেলা হইতে এক সময়ে "ভাট' নামক ব্রাহ্মণ শ্রেণী সমস্ত বঙ্গদেশের ঐতিহাসিক ঘটনা ও রাজন্যবর্গের কীর্ত্তি কাহিনী গাথায় বাঁধিয়া গান করিয়া বেড়াইতেন। এই ভাটদের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল

১। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ের টীকা।

বাণিয়া চঙ্গ। এককালে "সূত, মাগধী, বন্দী" মগধ রাজধানীতে এইরূপ ঐতিহাসিক গাথা রচনার ভার লইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ বঙ্গ সাহিত্যের বহু স্থানে পাওয়া যায়। মগধ ধ্বংসের পরে এই ভাট ব্রাহ্মণদের একটা উপনিবেশ শ্রীহট্টে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সূত্রে তাঁহারা শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বরকে ইতিহাস বিশ্রুত ভাট বংশীয় বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু রাজমালার উক্তি এই মতের পরিপন্থী; উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে, মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের কুমিল্লাস্থ ধর্ম্মসাগর উৎসর্গ কালে ইঁহারা রাজ পুরোহিত ছিলেন, এবং এতদুপলক্ষে, বারাণসী ধাম হইতে সমাগত কৌতুকাদি বিপ্রের সহিত একই সনন্দ দ্বারা একত্রে ভূমিদান পাইয়াছিলেন। এই অবস্থায় কবিদ্বয়কে ভট্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

আমরা শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বরের তথ্য সংগ্রহের মানসে, অতীতের তমসাচ্ছন্ন পথে আগ্রহান্বিত চিত্তে পথভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় বিচরণ করিতেছিলাম, এই সময় সৌভাগ্য বশতঃ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পিতামহ বংশোদ্ভব, পরমভাগবত, ঢাকা দক্ষিণ নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার মিশ্র মহাশয় আগরতলায় আগমন করেন। তাঁহার সহিত নানা বিষয়ক আলাপের পর, তিনি কবিদ্বয়ের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, এবং অল্প দিন হইল, দয়া করিয়া যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা আলোচনায় জানা যায়, বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত ঢাকা দক্ষিণ পরগণাস্থ ঠাকুরবাড়ী গ্রাম নিবাসী ছিলেন ; ইঁহারা দুই সহোদর---বাণেশ্বর জ্যেষ্ঠ ও শুক্রেশ্বর কনিষ্ঠ। ইঁহারা শ্রীহট্টের প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশ সম্ভূত, ইঁহাদের কৌলিক উপাধি চক্রবর্ত্তী। ভ্রাতৃদ্বয় খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন ; কনিষ্ঠের বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি মনুষ্যের অবয়ব দর্শন করিয়া তাহার ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের সম্যক বিবরণ বলিতে পারিতেন। এই ভ্রাতৃযুগল ত্রিপুরেশ্বরের পুরোহিত এবং সভাপণ্ডিত ছিলেন।

পণ্ডিতদ্বয়ের প্রকৃত পরিচয়

বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর যে ব্রহ্মোত্র ভূমি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নিজ বাস গ্রাম ঠাকুর বাড়ী ও অন্যান্য মৌজায় অবস্থিত এবং "বাণেশ্বর চক্রবর্ত্তীর ছেগা" নামে পরিচিত ছিল। বাণেশ্বর জ্যেষ্ঠ বিধায় সম্ভবতঃ তাঁহার নামেই সম্পত্তির সনন্দ-পত্র সম্পাদিত হইয়া থাকিবে, শুক্রেশ্বরও জ্যেষ্ঠের সহিত তাহাতে অধিকারী ছিলেন। এতদুভয়ের বংশ বিলুপ্ত হওয়ায়, তাহাদের সম্পত্তি দৌহিত্র বংশের হস্তগত হয়। এই ব্রহ্মোত্রের সনন্দ বিনষ্ট হওয়ার দরুণ বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভে তাহা বাজেয়াপ্ত হইয়া করদ ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। তৎপরেও এই সম্পত্তি কিয়ৎকাল পণ্ডিতদ্বয়ের দৌহিত্র বংশের হাতেই ছিল, কালক্রমে তাহা হস্তান্তরিত হইয়াছে। এই বিবরণ সংগ্রহকারী

ব্রহ্মোত্র ভূমির বিবরণ

মিশ্র মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণ বাণেশ্বরের দৌহিত্র বংশের গুরু ছিলেন। সেই সূত্রে উক্ত সম্পত্তির কিয়দংশ ইঁহাদের হস্তেও আসিয়াছে। এই জন্যই পণ্ডিতদ্বয়ের লুপ্তপ্রায় বিবরণ সংগ্রহ করা মিশ্র মহাশয়ের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে ; এবং এই ঘনিষ্ঠতার দরুণ তাঁহার সংগৃহীত বিবরণ প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাঁহার সৌজন্যে এই সম্পত্তি সংসৃষ্ট একখণ্ড নোটিশ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। বাণেশ্বরের দৌহিত্রবংশীয় রামকান্ত শর্ম্মার মৃত্যুর পর তদীয় ওয়ারিশ কৃষ্ণনাথ শর্ম্মা পূর্ব্বোক্ত ভূমির বন্দোবস্তের প্রার্থনা করায়, তদুপলক্ষে এই নোটিশ প্রচার হইয়াছিল। তাহা আলোচনায় জানা যাইতেছে, খৃঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও (ব্রহ্মোত্র রহিত হইবার সুদীর্ঘকাল পরেও) উক্ত ভূভাগের "ব্রহ্মোত্র বাণেশ্বর চক্রবর্ত্তী ছেগা" নাম স্থিরতর ছিল। উক্ত নোটিশের প্রতিকৃতি এস্থলে প্রদত্ত হইল, পাঠ-সৌকর্য্যার্থ তাহার অবিকল প্রতিলিপিও নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ;—

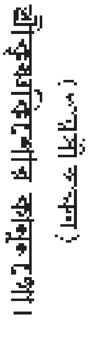

মোহর।
(ছাপ অস্পষ্ট)

বং হুকুম খান বাহাদুর সাহেব
(পারসী স্বাক্ষর)
শ্রী আলাউদ্দীন আহাম্মদ
১৩১০ নং

নং ৩১৯০ মং
এস্তেহার নামা কাচারি ডিপুটী কালেক্টারি—
জেলা শ্রীহট্ট জানীবা।

জেহেতুক পং ঢাকাদক্ষিণের বর্ম্মউর্ত্তর বাণেশ্বর চক্রবর্ত্তী ছেগার বন্দোবস্ত কারক রামকান্ত সর্ম্মার মৃত্যু হওয়া প্রচারে সাং পং কুবকাবাদ মৌং দত্তবালীর কৃষ্ণনাথ সর্ম্মা মৃতব্যক্তির সত্বে উর্ত্তরাধিকাররিযুত্রে সত্ববান ও দখলকার থাকা বিবণে* মৃতব্যক্তির দখলী জমী বন্দোবস্ত করার বাসনায় একখানা দরখাস্ত ওপস্থীত করিয়াছে। অতএব অদ্য দিবসের হুকুমানুযায় ১৫ রোজ ম্যাদে এস্তেহার দেওয়া যাইতেছে জে মৃতব্যক্তির অন্য উর্ত্তরাধিকারি আর কেহ থাকীলে উক্ত ম্যাদ মধ্যে আপন উর্ত্তরাধিকারিত্বের প্রমানাদি সহকারে হাজির আসিয়া বিহিত প্রতিকার করিবেক নতু ম্যাদগতে কেহর কোন আপত্তী যুনা জাবেক না এহা অত্যাবষ্যক জানিবায় ইতি সন ১৮৪৮ ইং ১০ আগস্ট।

স্বাক্ষর
শ্রী ভৈরবচন্দ্র দেব,
মোহরের।

১। 'বিবরণে' স্থলে 'বিবণে' লিখিত হইয়াছে।

রাজমালা —৬

প্রথম লহর—৮০ পৃষ্ঠা।

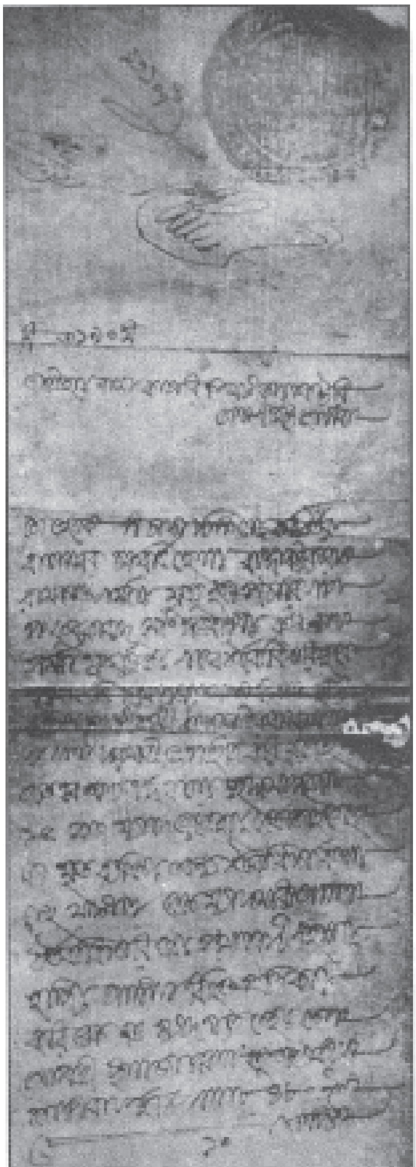

বাণেশ্বর চক্রবর্ত্তী ছেগারভূমি সম্পর্কীত আদেশ লিপি।

[illegible]

[illegible]

কালের কুটিল আবর্ত্তনে বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বরের দৌহিত্রবংশও বিলুপ্ত হইয়াছে। বাণেশ্বরের দৌহিত্র বংশের শেষ পুরুষ বৃন্দাবনচন্দ্র শর্ম্মা পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছেন; তিনি চিরকুমার ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতেই এই বংশ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছে।

উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের বাস্তুভিটা নানা হাত ঘুরিয়া, শিশুরাম দে নামক জনৈক শূদ্র জাতীয় মধ্যবিধ অবস্থাপন্ন গৃহস্থের আবাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে। অল্পদিন যাবত শিশুরাম পরলোক প্রাপ্ত হওয়ায় তদীয় পুত্রগণ সেই ভবনে বাস করিতেছে।

শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বরের এতদতিরিক্ত বিবরণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই; ভবিষ্যতে আরও নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়া বিচিত্র নহে, আমরা সেই সুদিন দেখিব বলিয়া আশা করি না। সংগৃহীত বিবরণ আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে, আমাদের পূর্ব্ব অনুমান এতদ্দ্বারা অক্ষুণ্ণ প্রতিপন্ন হইতেছে।

রাজমালার প্রাচীনত্ব

মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের শাসন কালে রাজমালা রচিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সিংহাসনারোহণের শকাঙ্ক উক্ত গ্রন্থে লিখিত হয় নাই। স্বর্গীয় কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহাশয় ধর্ম্মমাণিক্যের সময় নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি বলেন,—“১৩২৯ শকাব্দে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন”। চাক্‌লে রোসনাবাদের সেটেলমেণ্ট অফিসার মিঃ জে, জি, কমিং, আই, সি, এস্ (J. G. Cumming, I.C.S.) সাহেব তাহাই বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ; তাঁহার মতে ১৪০৭ খৃঃ অব্দে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য সিংহাসনারূঢ় হইয়াছেন। তাঁহাদের এই নির্দ্ধারণ অভ্রান্ত নহে। ধর্ম্মমাণিক্য ১৩৮০ শকে ধর্ম্মসাগর উৎসর্গোপলক্ষে এক তাম্রশাসন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করিয়াছিলেন,* এবং বত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন,†— রাজমালায় এই দুইটী কথা পাওয়া যাইতেছে। কৈলাস বাবু প্রভৃতির নির্দ্ধারণ মতে যদি ১৩২৯ শক রাজ্যারোহণের সময় ধরা যায়, তবে উক্ত শক হইতে ১৩৮০ শক পর্য্যন্ত ৫১ বৎসর হয়। সুতরাং যাঁহার শাসন কাল মাত্র ৩২ বৎসর

---

* “চন্দ্র বংশোদ্ভবঃ স্বাপ মহামাণিক্যজঃ সুধীঃ।
শ্রীশ্রীমদ্ধর্ম্মমাণিক্যভূপশ্চন্দ্রকুলোদ্ভবঃ।।
শাকে শূন্যাষ্টবিশ্বাব্দে বর্ষে সোমদিনে তিথৌ।
ত্রয়োদশ্যাং সিতে পক্ষে মেষে সূর্য্যস্য সংক্রমে।।” ইত্যাদি।
এই তাম্রঃপত্র, ধর্ম্মমাণিক্যখণ্ডে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইবে।

† “বত্রিশ বৎসর রাজা রাজ্য ভোগ ছিল।
সুমধুর বাক্যে রাজা প্রজাকে পালিল।।”
রাজমালা,—ধর্ম্মমাণিক্য খণ্ড।

ব্যাপী, এবং ১৩৮০ শকে যিনি বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহার রাজ্যাভিষেকের শকাঙ্ক ১৩২৯ হইতে পারে না।

দ্বিজ বঙ্গচন্দ্রের রচিত "ত্রিপুর বংশাবলী" নামক কবিতা পুস্তকে লিখিত আছে, মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য ৮৪১ হইতে ৮৭২ ত্রিপুরাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। এই হিসাবে, ১৩৫৩—১৩৮৪ শক (১৪৩১-১৪৬২ খৃঃ) তাঁহার শাসন কাল নির্দ্ধারিত হইতেছে। আমরা এই নির্দ্ধারণকেই বিশুদ্ধ বলিয়া মনে করি; কারণ, এতদ্বারা রাজমালার মত সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হয়। মহারাজ ৩২ বৎসর রাজ্য পালন করিয়াছেন, এবং ১৩৮০ শকে বিদ্যমান ছিলেন, উক্ত সময় নির্দ্ধারণ দ্বারা, এই দুইটী কথার সামঞ্জস্য রক্ষা হইতেছে। সুতরাং ধর্ম্মমাণিক্য ১৪৩১ খৃঃ হইতে ১৪৬২ খৃঃ পর্য্যন্ত ৩২ বৎসর কাল রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত আমরা সমীচীন মনে করি। রাজমালা প্রথম লহর এই ৩২ বৎসর কাল মধ্যে কোন এক সময় রচিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহা পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থ। যেকালে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রেমরসাত্মক পদাবলীর সুমধুর ঝঙ্কারে বঙ্গদেশ মুখরিত হইতেছিল, সেই সময় ত্রিপুরার নিভৃত গিরিকুঞ্জে, চন্তাই দুর্ল্লভেন্দ্র এবং পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর রাজমালা রচনা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণও ইহার সমসাময়িক।

রাজাবলীর অভাবে রাজমালাই বঙ্গভাষায় প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ; এই গ্রন্থ দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাস রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল। অতঃপর বৈষ্ণব মহাজন দিগের মধ্যে অনেক ব্যক্তিকে ইতিহাস রচনা কার্য্যে ব্রতী হইতে দেখা গিয়াছে। চৈতন্য মঙ্গল, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, ভক্তি-রত্নাকর, প্রেম বিলাস, অদ্বৈত প্রকাশ এবং নানা ব্যক্তির লিখিত করচা ইত্যাদি চরিতাখ্যান ও ঐতিহাসিক গ্রন্থনিচয় বৈষ্ণব যুগের সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি। কিন্তু রাজত্বের ইতিহাস কিম্বা রাজনীতিক আলোচনা রাজমালা ব্যতীত অন্য কোন প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না।

রাজমালাই বঙ্গভাষায় প্রথম ইতিহাস

রাজমালা রাজগণের ইতিহাস, রাজ্যের ইতিবৃত্ত নহে। ইহাতে রাজগণের সিংহাসনারোহণ, রাজ্যচ্যুতি, সমর কাহিনী, শাসন বিবরণী ও রাজ পরিবার সংসৃষ্ট প্রধান প্রধান ঘটনাবলী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থ আলোচনায় ত্রিপুরার প্রাচীনকালের শৌর্য্য-বীর্য্য ও রাজনীতি বিষয়ক বিবিধ তথ্য পাওয়া যায়, অন্য বিষয়ের বিবরণ বড় বেশী নাই। ইহাতে অনেক ঘটনার কাল-নির্ণয়োপযোগী বিবরণ সন্নিবিষ্ট হয় নাই; অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা বাদ পড়িয়াছে, এবং কোন কোন স্থলে দুই একটী ভ্রম সঙ্কুল বিবরণও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া সুদীর্ঘকালের বিবরণ

রাজমালা রাজগণের ইতিহাস

সংগ্রহ করিতে যাওয়া এবং ত্রিপুরা ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে উক্ত ভাষায় কথিত বাক্য হইতে বিবরণ সংগ্রহ করা নিতান্তই দুরূপ ব্যাপার। এই কারণে কিঞ্চিৎ ভ্রম প্রমাদ এবং অসম্পূর্ণতা সঙ্ঘটন অনিবার্য্য বলিয়া মনে হয়। এবম্বিধ সামান্য ক্রুটী সত্ত্বেও ঐতিহাসিক উপাদানের নিমিত্ত রাজমালাকে অমূল্য রত্ন বলা যাইতে পারে। প্রাচীন সাহিত্যের হিসাবেও ইহার মূল্য অসাধারণ। প্রথম লহরে যে সকল উল্লেখ যোগ্য বিষয় আছে, নিম্নে তাহার সার সঙ্কলন করা যাইতেছে।

কিরাত দেশ ও তাহার অবস্থান

(মূল গ্রন্থের ৫-৬ পৃষ্ঠা)

রাজমালার প্রথম লহরে, দৈত্য খণ্ডে লিখিত আছে ;—

"বৃষপর্ব্বার কন্যা যে শর্ম্মিষ্ঠা তনয়।
দ্রুহ্যু নামে রাজা হৈল কিরাত আলয়"।।

অন্যত্র পাওয়া যায়,—

"দ্রুহ্যু বংশে দৈত্য রাজা কিরাত নগর।
অনেক সহস্র্য বর্ষ হইল অমর।।"

এতদ্বারা জানা যাইতেছে, দ্রুহ্যু বংশ (ত্রিপুর রাজ বংশ) কিরাত প্রদেশের অধিপতি হইয়াছিলেন। এই কিরাত দেশের অবস্থান সম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে ;—

"কিরাত আলয় সব অগ্নি কোণ দেশ।
এই রাজ্য পিতা আমায় দিয়াছে বিশেষ।।"

ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট ও কাছাড় প্রভৃতি জনপদের পূর্ব্ব-প্রান্তস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ প্রাচীনকালে 'কিরাত দেশ' নামে অভিহিত হইত। যযাতির রাজধানী হইতে উক্ত অঞ্চল অগ্নিকোণে অবস্থিত ; এই কারণেই বলা হইয়াছে ;—"কিরাত আলয় সব অগ্নি কোণ দেব।"

পুরাণোক্ত প্রমাণ দ্বারাও উক্ত প্রদেশ 'কিরাত দেশ' বলিয়া নির্ণীত হইতেছে, যথা :—

"ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদান্ নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুমান্ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্।
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গন্ধর্ব্বস্তথা বারুণঃ।।
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রস্তু দ্বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ।

পূর্ব্বে কিরাতা যস্য স্যুঃ পশ্চিমে যবনা স্থিতাঃ।।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ।।”

বিষ্ণু পুরাণ,---২য় অংশ, ৩য় অধ্যায়, ৬-৮ শ্লোক।

মর্ম্ম ;—“এই ভারতবর্ষের নয় ভাগ আছে, শ্রবণ কর। ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব্ব, বরুণ এবং এই সাগর সংবৃত দ্বীপ। তাহাদের মধ্যে নবম এই দ্বীপ উত্তর দক্ষিণে সহস্র যোজন দীর্ঘ। ইহার পূর্ব্ব দিকে কিরাতগণ আছে, পশ্চিম দিকে যবনেরা অবস্থিত এবং মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ বাস করিতেছে।”

মার্কণ্ডেয় পুরাণে পাওয়া যায়,—

“ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদান্ নিবোধ মে।

সমুদ্রান্তরিতা জ্ঞেয়াস্তে ত্বগম্যাঃ পরস্পরম্।।

ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুমাংস্তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্।

নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বো বারুণস্তথা।।

অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ।

যোজনানাং সহস্রং বৈ দ্বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ।।

পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাস্তথা।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চান্তঃ স্থিতা দ্বিজঃ।।”

মার্কণ্ডেয় পুরাণ---৫৭শ অধ্যায়, ৪-৮ শ্লোক।

মর্ম্ম ;---“এই ভারতবর্ষে সমুদয় নয়টী বিভাগ,—বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই সমস্ত বিভাগ পরস্পর অগম্য, যেহেতু সমুদ্র কর্ত্তৃক বিচ্ছিন্ন। ইহাদের নাম ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান, তাম্রবর্ণ গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব্ব ও বারুণ ; ইহাদের মধ্যে নবম দ্বীপ সাগর সংবৃত। ইহা দক্ষিণোত্তরে সহস্র যোজন। ইহার পূর্ব্বে কিরাত, পশ্চিমে যবন এবং মধ্য ভাগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের বাস।”

উদ্ধৃত বচন দ্বারা কিরাত দেশ ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তবর্ত্তী বলিয়া জানা যাইতেছে। মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড এবং বামন প্রভৃতি পুরাণের মতেও কিরাত দেশ ভারতের পূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত। মহাভারতে পাওয়া যায়, প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি ভগদত্ত, চীন ও কিরাত সৈন্য লইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; যথা :---

“স কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চ বৃতঃ প্রাগ্জ্যোতিষোহভবৎ।

অন্যৈশ্চ বহুভির্যোধৈঃ সাগরানূপবাসিভিঃ।।”

মহাভারত,---সভাপর্ব্ব, ২৬ অঃ, ৯ শ্লোক।

এতদ্দ্বারা নির্ণীত হইতেছে, চীন ও কিরাত দেশ প্রাগ্জ্যোতিষ রাজ্যের সন্নিহিত। প্রাগ্জ্যোতিষের বর্ত্তমান নাম আসাম। অতএব ভারতবর্ষের পূর্ব্ব

প্রান্তে কিরাত দেশের অবস্থান মহাভারত দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে। সভাপর্ব্বে আরও পাওয়া যায়,---

"যে পরার্দ্ধে হিমবতঃ সূর্য্যোদয়গিরৌ নৃপাঃ।
কারূষে চ সমুদ্রান্তে লৌহিত্যমভিতশ্চ যে।।
ফলমূলাশনা যে চ কিরাতাশ্চর্ম্মবাসসঃ।
ক্রূরশস্ত্রা ক্রূরকৃতস্তাংশ্চ পশ্যাম্যহং প্রভো।।"

মহাভারত,---সভাপর্ব্ব, ৫২ অঃ, ৮-৯ শ্লোক।

এই শ্লোক আলোচনায় পাওয়া যাইতেছে, হিমালয়ের পূর্ব্বে লৌহিত্য নদীর পর পারে, 'কিরাত' নামে প্রদেশ ছিল। পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমী কিরাত জাতিকে "Chirrhadae" নামে অভিহিত করিয়াছেন, এবং তিনিও এই জাতিকে ভারতবর্ষের পূর্ব্বপ্রান্তবাসী বলিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশ ও কম্বোজ হইতে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে সকল শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ঐ সকল প্রদেশের আদিম অধিবাসী পার্ব্বত্য জাতিসমূহকে 'কিরাত' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে, এক সময়ে হিমালয়ের পূর্ব্বাংশস্থিত বর্ত্তমান ভূটান, আসামের পূর্ব্বাংশ, মণিপুর, ত্রিপুরা ও ব্রহ্মদেশ এবং চীন সমুদ্রের তীরবর্ত্তী কম্বোজ পর্য্যন্ত স্থানে কিরাত জাতির বাস ছিল এবং সেই সকল স্থান 'কিরাত ভূমি' বলিয়া অভিহিত হইত। এখনও নেপালের পূর্ব্বাংশ হইতে আসাম, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের পার্ব্বত্য প্রদেশে কিরাতগণ বাস করিতেছে ; ইহারা নেপালে 'করান্তি' এবং আসাম, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশে নাগা, কুকি, গারো ও মঘ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ।

শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে কিরাত ভূমির অবস্থান নিম্নোক্তরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে ;---

তপ্তকুণ্ডং সমারভ্য রামক্ষেত্রান্তকং শিবে।
কিরাতদেশো দেবেশি বিন্ধ্যশৈলেহবতিষ্ঠতে।।"

উক্ত তপ্তকুণ্ড জয়ন্তীয়ার পাঁচভাগ পরগণানয় হরিপুর নামক স্থানে অবস্থিত। মধুকৃষ্ণাত্রয়োদশীতে এই স্থানে বহু যাত্রী সমাগত হইয়া স্নান ও তর্পণাদি করিয়া থাকে। উক্ত কুণ্ডের বিশেষত্ব এই যে, উহার জলরাশি শীতল, অথচ গর্ভস্থ ভূমি অতিশয় উষ্ণ। অনেকে অনুমান করেন, কুণ্ডের তলদেশস্থ ভূগর্ভে কোনরূপ দাহ্য পদার্থ আছে।* এই কুণ্ড এবং উদ্ধৃত শ্লোকের তপ্তকুণ্ড অভিন্ন বলিয়াই

* "Another Sacered pool is known as Taptakunda and is situated in Paragana Panchbhag in Jaintia. This pool is said to become quite warm on the occassion of the Baruni and it is possible that the water has in reality some mineral properties."

Assam District Gazetteer, Vol. II (Sylhet) Chap. III-p 89.

বুঝা যায়। বঙ্গোসাগরের অঙ্কশায়ী আদিনাথ তীর্থের অপর তীরবর্ত্তী তীর্থের নাম রাম-ক্ষেত্র। এই স্থান আদিনাথ হইতে আরাকান (রেঙ্গুণ) গমনের পথপার্শ্বে কক্সবাজার মহকুমার অন্তর্গত রামু থানার এলাকায় অবস্থিত। সাধারণতঃ এই তীর্থকে 'রামকোট' বা 'রামটেক' বলা হয়।* শ্লোকোক্ত বিন্ধ্যশৈল, মধ্য ভারতে সংস্থিত (আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথের মধ্যবর্ত্তী) বিন্দ্যগিরি নহে, এই পর্ব্বত মণিপুর রাজ্যের উত্তরপ্রান্ত এবং কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলার বক্ষ জুড়িয়া অবস্থান করিতেছে। এই পর্ব্বতমালা হইতে প্রবাহিত বরবক্র (বরাক) নদী, কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলার প্রধান নদীমধ্যে পরিগণিত। উক্ত পর্ব্বত যে 'বিন্ধ্যশৈল' নামে আখ্যাত ছিল, বায়ু পুরাণ আলোচনায় তাহা জানা যাইতেছে,---

"বিন্ধ্যপাদ সমুদ্ভুতো বরবক্রঃ সুপুণ্যদঃ।

রাজরাজেশ্বরী তন্ত্রেও কিরাত দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের উক্তি শক্তিসঙ্গম তন্ত্রেরই পরিপোষক। † তদ্দারাও ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত কাছাড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি পার্ব্বত্য ভূমিই কিরাত দেশ বলিয়া সূচিত হইতেছে।

এরিয়ান, ডিওডোরাস্ এবং টলেমী প্রভৃতির লিখিত গ্রন্থে 'কিরাদিয়া' প্রদেশের নাম পাওয়া যায়। ঢাকার ইতিহাস প্রণেতা স্নেহভাজন শ্রীমান যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় এবং শ্রীহট্টের ইতিহাস প্রণেতা সুহৃদ্দর শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়ের মতে এই 'কিরাদিয়া' ও ত্রিপুর রাজ্য অভিন্ন, কিরাত প্রদেশকেই 'কিরাদিয়া' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ‡ এই মত সমর্থন যোগ্য। পেরিপ্লুস গ্রন্থে কিরাদিয়া প্রদেশের পূর্ব্বসীমা, গঙ্গানদীর মোহনা বলিয়া লিখিত আছে। ¶ এই লিপি অভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না। কিরাদিয়া, কিরাতভূমি বা ত্রিপুর রাজ্যের নামান্তর, পূর্ব্বোক্ত মত আলোচনার এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে। মহাভারতে এই প্রদেশকে 'সুহ্মদেশে' বলা হইয়াছে।

বরাহ মিহিরের বৃহৎ সংহিতায় ভারতের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে 'কিরাত' নামক

---

* নাগপুরের সন্নিহিত পর্ব্বতে আর একটী রামক্ষেত্রে অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এই তীর্থও রামগিরি, রামকোট ও রামটেক ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উক্ত উভয় তীর্থ শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র পদস্পর্শে 'রামক্ষেত্র' এবং 'তীর্থ' আখ্যা লাভ করিয়াছে।

† "তণ্ডুলানাং সমারভ্য রামক্ষেত্রোন্তরং শিবে।

‡ কিরাত দেশো দেবেশি বিন্ধ্য শৈলান্ত গোমহান্।।"

ঢাকার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১ম অধ্যায়, ও শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ২য় ভাগ ১ম খণ্ড—৩য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

¶ Mc Crindle's Ancient India as described by Ptolemy, Page-291 Periplus of the Erythrean Sea."

অন্য জনপদের উল্লেখ আছে।* উক্ত কিরাত ভূমির সহিত রাজমালার সংসৃষ্ট কিরাত দেশের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই।

স্থূল কথা, কিরাত দেশ যে ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত, এবং ত্রিপুর রাজ্য প্রাচীন কিরাত দেশের অন্তর্ভুক্ত, পূর্ব্বোক্ত প্রমাণাদি দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে, এ বিষয়ে এতদতিরিক্ত প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা যায় না।

এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে,—কিরাত দেশ আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্ভূত কিনা? শাস্ত্রকারগণের মতবৈষম্যের দরুণ এই প্রশ্নে সমাধান কিছু জটিল বলিয়া মনে হইতেছে। ভগবান মনু আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমুদ্রের উল্লেখ করিয়াছেন ;—

"আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধা।।"

মনুসংহিতা, ২য় অঃ, ২২ শ্লোক।

পুরাণ সমূহের মতে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব সীমায় কিরাত ও পশ্চিম সীমায় যবন দেশ অবস্থিত। † এ স্থলে আর্য্যাবর্ত্তের একমাত্র পূর্ব্ব সীমা নির্দ্দেশ করাই প্রয়োজন। পুরাণকারগণের মত আলোচনায় স্পষ্টই বুঝা যায়, তাঁহারা বঙ্গদেশ পর্য্যন্তই আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব সীমা ধরিয়াছেন ; বঙ্গের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত ভূভাগ (কিরাত ভূমি) তাঁহাদের মতে আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে অবস্থিত। মনু, সমুদ্র দ্বারা আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই সমুদ্রের নামোল্লেখ করেন নাই। অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যাইবে, এক কালে কমলাঙ্ক (কুমিল্লা) প্রভৃতি বিস্তীর্ণ জনপদ সমুদ্রের অঙ্কশায়ী ছিল। তাহার বহু পরবর্ত্তী কালেও মেঘনাদকে সাগর সঙ্গম লাভের নিমিত্ত ঝাপ্টার মোহনা অতিক্রম করিতে হইত না। অপর দিকে, লৌহিত্য সাগরের বিস্তৃতিও কম ছিল না। অতএব সেকালে যে সুবিশাল জলরাশি দ্বারা বঙ্গদেশ ও কিরাত ভূমি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। মনু যদি এই সমুদ্রেরই উল্লেখ করিয়া থাকেন, তবে পুরাণের মতের সহিত তাঁহার মতের সামঞ্জস্য

---

* "নৈর্ঋ ত্যাং দিশি দেশাঃ পহ্লব কাম্বোজ-সিন্ধু-সৌবীরাঃ।
বড়বামুখার বাম্বষ্ঠ-কপিল-নারীমুকানর্ত্তাঃ।।
ফেণ-গিরি-যবনমাকরকর্ণপ্রাবেয়া পারশর শূদ্রাঃ।
বর্ব্বর-কিরাতখণ্ড-ক্রব্যাশ্যাভীর-চঞ্চু কা।।" ইত্যাদি।

বৃহৎসংহিতা—১৪শ অঃ, ১৭-১৮ শ্লোক।

† পূর্ব্বে কিরাতা হ্যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্মৃতাঃ।।"

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—৪৯ অঃ।

ব্রহ্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ ও বামনপুরাণ প্রভৃতিরও ইহাই মত।

রক্ষা করা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে যখন বঙ্গভূমি ও কিরাতদেশের মধ্য ভাগে সমুদ্রের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন মনু সেই সমুদ্রকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, এরূপ সিদ্ধান্তই সরল এবং সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

রাজমালার মতেও কিরাতভূমি আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভূত বলিয়া স্থিরীকৃত হইতেছে; তাহা না হইলে মহারাজ দৈত্য, কিরাত ভূমিতে বসিয়া পুণ্যক্ষেত্র আর্য্যাবর্ত্ত পরিত্যাগ জনিত গ্লানি অনুভব করিতেন না। এতদ্বিষয়ে রাজমালায় বর্ণিত হইয়াছে,—

"কিরাত আলয় যত অগ্নিকোণ দেশে।
ভাল রাজ্য বাপে মোরে দিয়াছে বিশেষে।।
কতেক জন্মের আছে পাপের সঞ্চয়!
তে কারণে বাপে দিছে কিরাত আলয়।।
আর্য্যাবর্ত্ত হ'তে ভূমি নাহি পৃথিবীতে।
ত্রৈলোক্য দুর্ল্লভ স্থল জগত বিদিতে।।
যে স্থানে জন্মিতে ইচ্ছা করে দেবগণ।
সাধুসঙ্গ লভে ধর্ম্ম, ত্যজিয়া গগন।।
* * * * *
এইমাত্র দেখিতেছি কিরাত আলয়।
ভয়ঙ্কর পশু যত সিংহের উদয়।।" ইত্যাদি।

রাজমালা,—দৈত্যখণ্ড ৭ পৃষ্ঠা।

মহারাজ দৈত্যের এই উক্তি, কিরাতদেশ আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে থাকিবার প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কালক্রমে সমুদ্র মজিয়া, অল্প পরিসর নদী মাত্র অবশিষ্ট থাকায়, কিরাতভূমি হইতে বঙ্গদেশে যাতায়াত সুগম হইয়াছে এবং সমুদ্র দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে সরিয়া যাইবার দরুণ উভয় প্রদেশ পরস্পর সন্নিহিত হওয়ায় ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কারণে দ্রুহ্যবংশীয়গণ কর্ত্তৃক কিরাত প্রদেশ আর্য্য অধ্যুষিত হওয়ার পরবর্ত্তীকালে উক্ত প্রদেশ বঙ্গের অঙ্গগত এবং আর্য্যাবর্ত্তের অংশ মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

পারিবারিক কথা

রাজা সকল সমাজেরই শাসক এবং পোষক, কিন্তু তিনি কোনও সমাজের অধীন নহেন। রাজমালার একমাত্র রাজন্যবর্গের ইতিহাস, সুতরাং ইহাতে সামাজিক বিবরণ খুব কমই পাওয়া যায়। পারিবারিক যে সকল কথার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, তাহার স্থূলমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রাজা সমাজের অধীন নহেন

ক্ষত্রিয়বংশকে কেন 'ত্রিপুরা' বলা হয়, এই প্রশ্ন রাজমালা রচনা কালেই উত্থাপিত হইয়াছিল।

ত্রিপুর খ্যাতি

"ধর্ম্মমাণিক্য রাজা পরে জিজ্ঞাসিল
ক্ষত্রিয় বংশেতে কেন ত্রিপুর নাম হইল।।"

ত্রিপুরখণ্ড---৮ পৃষ্ঠা।

রাজমালার রচয়িতাগণ শাস্ত্রীয় প্রমাণাদির দ্বারা এই প্রশ্নের যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা ইঙ্গিত মাত্র। সেই ইঙ্গিত বাক্য আলোচনায় জানা যায়, ত্রিপুর ভূমিতে জন্ম হেতু রাজবংশ ত্রিপুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন*। এতৎ সম্বন্ধে পরলোকগত কৈলাশ চন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন,—

'দৈত্যের ঔরসে ত্রিপুরের জন্ম। তিনি কিরাত নামের উচ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক স্বীয় নামানুসারে রাজ্যের নাম "ত্রিপুরা" এবং স্বজাতীয় ব্যক্তিবর্গ্যকে "ত্রিপুরাজাতি" বলিয়া প্রচার করেন।"

কৈলাস বাবুর রাজমালা---২য় ভাগ, ২য় অঃ।

বিশ্বকোষ সম্পাদকমহাশয় কৈলাসবাবুর মত গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রণেতা বলেন, সম্ভবতঃ যুঝারুফার সময়ে রাজ্যের নাম ত্রিপুরা হইয়াছে। † রাজ্যের নাম কোন সময়ে কি কারণে "ত্রিপুরা" হইয়াছিল, তদ্বিষয় পূর্ব্বভাষে আলোচনা করা হইয়াছে। এস্থলে রাজ পরিবার ও ঠাকুর পরিবারের 'ত্রিপুর' আখ্যা প্রাপ্তির কারণ নির্দ্ধারণ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য।

কৈলাস বাবু প্রভৃতির মত অপেক্ষা রাজমালার মতই আমরা অধিকতর সুসঙ্গত বলিয়া মনে করি। কারণ, কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের আখ্যা, ব্যক্তি বিশেষের নাম হইতে প্রাপ্ত হইবার দৃষ্টান্ত অপেক্ষা, বাসস্থানের নাম হইতে পাইবার দৃষ্টান্ত অধিক পরিমাণে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলেও স্থানের নাম হইতে আখ্যা গ্রহণের সম্ভাবনাই অধিক। যেমন বঙ্গদেশবাসী সকল জাতিই 'বাঙ্গালী', উড়িষ্যাবাসী জাতি মাত্রেই 'উড়িয়া' আসাম প্রদশের সকল জাতিই 'আসামী' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্রূপ ত্রিপুরাবাসী সকল জাতিই "ত্রিপুর" বা "ত্রিপুরা" আখ্যায় পরিচিত। ত্রিপুর রাজ্যের অতীত কালের অম্লান গৌরব ও সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি কাহিনী স্মরণ করিয়া ত্রিপুরাবাসিগণ বর্ত্তমানকালেও গর্ব্বানুভব করে। এরূপ অবস্থায় অতীতকালে, 'ত্রিপুর' আখ্যাকে গৌরবান্বিত মনে করা স্বাভাবিক ; ইহার দৃষ্টান্তও রাজমালায় বিস্তর পাওয়া যাইবে। মহারাজ ত্রিলোচনের দ্বাদশপুত্র 'বারঘর ত্রিপুর' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; যথা—

---

* প্রথম লহরের ৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—ভাগ, ১ম ভাগ, ১ম খণ্ড ৪র্থ অঃ।

"ত্রিলোচন ঘরে বার পুত্র উপজিল।
বারঘর ত্রিপুর নাম তার খ্যাতি হইল*।।
রাজবংশ ত্রিপুরা সে রাজা হৈতে পারে।
ত্রিপুরা রাজ্যেতে ছত্র অন্যে নাহি ধরে।।
দৈবগতি রাজার না হয়ে যদি পুত্র।
তবে রাজা হৈতে পারে ত্রিপুরের সূত্র।।
দ্বাদশ ঘরেতে যেন পুত্র জন্ম হয়।
রাজবংশ ত্রিপুরা তাহাকে লোকে কয়।।"

ত্রিলোচন খণ্ড---২৫ পৃষ্ঠা।

মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য সন্ন্যাসীবেশে, বারাণসীধামে অবস্থানকালে কৌতুক নামক ব্রাহ্মণের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান উপলক্ষে বলিয়াছিলেন,—

"সন্ন্যাসীয়ে বলে আমি জাতিয়ে ত্রিপুর।
অগ্নিকোণে রাজ্য আমা হয় বহুদূর।।"

(রত্নমাণিক্য খণ্ড।)

যুবরাজ চম্পক রায়, নরেন্দ্র মাণিক্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পলায়নপর হইয়া, চট্টগ্রামে, ফকির সেখসাদির নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান কালে বলিয়াছিলেন ;—

"ত্রিপুর বংশেতে জন্ম বসি উদয়পুর।
জ্ঞাতি সঙ্গে বাদ করি হইছি বাহির।।"

(চম্পক বিজয়)

ঠাকুর বংশীয় কোন কোন ব্যক্তি আদালতে আপনাকে "ত্রিপুর" বলিয়া পরিচয় প্রদান করিবার দৃষ্টান্তও পাওয়া যাইতেছে, ইহা অধিক প্রাচীনকালের কথা নহে। সেকালে রাজা প্রজা সকলেই আপনাদিগকে 'ত্রিপুর' নামে অভিহিত করিতেন এবং রাজপরিবার ও ঠাকুর পরিবার প্রভৃতি 'ত্রিপুর ক্ষত্রিয়' নামে আখ্যাত হইতেন। বর্ত্তমান কালেও এই আখ্যা পরিত্যাগ করা হয় নাই ; সম্ভবতঃ ইহা অনন্ত ভবিষ্যৎ ব্যাপিয়া অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

মহারাজ ত্রিলোচনের পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতিবৃন্দ, এবং তাঁহার পরবর্ত্তী পঁচিশজন রাজার কোনও বিশেষ উপাধি থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায় না। ত্রিলোচনের অধস্তন ২৬শ সংখ্যক ভূপতি মহারাজ ঈশ্বর (নামান্তর নীলধ্বজ) 'ফা' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদবধি মহারাজ রত্নমাণিক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী,

'ফা উপাধি'

* ত্রিপুর ইতিহাসের সহিত বেহারের ইতিহাসোক্ত নিয়ম প্রণালীর অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন রায় বাহাদুরের সৌজন্যে আমরা বেহারের ইতিবৃত্ত "রাজাবলী" নামক হস্তলিখিত গ্রন্থ দেখিয়াছি, তাহা জয়নারায়ণ ঘোষ মুন্সী কর্ত্তৃক বিরচিত। উক্ত গ্রন্থে, রাজা শিশুসিংহের বাল্যসখা দ্বাদশ বালককে 'বারঘরিয়া' উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল।

রাজা ফা (নামান্তর হরিরায়) পর্য্যন্ত ৭১ জন ভূপতির ‘ফা’ উপাধি ছিল। মহারাজ রত্নমাণিক্যের সময় হইতে ‘ফা’ উপাধির পরিবর্ত্তে ‘মাণিক্য’ উপাধি আরম্ভ হইয়াছে। শেষোক্ত উপাধিটী মুসলমানের প্রদত্ত, সেকথা স্থানান্তরে বলা হইবে।

কেহ কেহ বলেন, শ্যান ও ব্রহ্মদেশীয় ভূপতিগণ ‘ফ্রা’ উপাধি ধারণ করিতেন, এই ‘ফ্রা’ হইতে ‘ফা’ শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। একথার ভিত্তি আছে কিনা জানি না। ‘ফা’ শব্দ ত্রিপুরা ভাষা জাত, ইহার অর্থ ‘পিতা’। ‘ফ্রা’ শব্দ প্রভুবাচক। এই উভয় শব্দে অর্থগত বিশেষ পার্থক্য না থাকিলেও, ত্রিপুর ভূপতিগণ ত্রিপুরা ভাষাসম্ভূত ‘ফা’ উপাধিই গ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা রাজভক্ত পার্ব্বত্য প্রজাগণ, রাজাকে পিতা জ্ঞানে এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিল, এরূপ অনুমান করাই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এই উপাধি যে প্রভুবাচক নহে—পিতাবাচক, মহারাণীগণের উপাধির সহিত মিলাইলেও তাহাই প্রতিপন্ন হইবে; যথা,—আচোঙ্গ ফা রাজা—আচোঙ্গ মা রাণী; খিচোং ফা রাজা—খিচোং মা রাণী, ইত্যাদি। এতদ্দারা রাজাকে পিতা এবং রাণীকে মাতা বলা হইয়াছে। সুতরাং ‘ফা’ উপাধি ত্রিপুরাভাষা জাত এবং পিতা অর্থবাচক তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। অন্যান্য দেশেও সম্মান ভাজন ব্যক্তির প্রতি ‘পিতা’ শব্দের আরোপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। খ্রীষ্টান সমাজে ধর্ম্মযাজককে ‘Father’ বলা হয়; তাহারা ঈশ্বরকেও ‘Father’ বলিয়া থাকে। রোমদেশে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ ‘Father’ পদবাচ্য। আমাদের দেশেও এবম্বিধ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এরূপ অবস্থায় রাজভক্ত প্রকৃতিপুঞ্জ দেবোপম রাজাকে ‘পিতা’ বলিবে, ইহা বিচিত্র নহে। আসামের ‘অহোম’ নৃপতিগণও ‘ফা’ উপাধি ধারণ করিতেন। কিন্তু ত্রিপুরেশ্বরগণ তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই এই আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। অহোমগণ ত্রিপুর রাজ্যের অনুকরণে উক্ত উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়।

ত্রিপুর রাজ্য স্থাপনের সময় হইতে সুদীর্ঘকাল উক্ত স্থান বিশেষ দুর্গম ছিল। রাজ্যের পশ্চিম অঞ্চল জলমগ্ন থাকায় দূরবর্ত্তীস্থানে যাতায়াত নিতান্তই কষ্টসাধ্য এবং বিপদসঙ্কুল ছিল বলিয়া জানা যায়। এজন্য প্রথমাবস্থায় সাধারণঃ পার্শ্ববর্ত্তী রাজপরিবার কিম্বা

বৈবাহিক বিবরণ

সম্ভ্রান্ত পরিবারের সঙ্গেই ত্রিপুর রাজবংশের বিবাহাদি সম্বন্ধ সঙ্ঘটিত হইত। রাজমালা প্রথম লহরে সন্নিবিষ্ট সকল রাজার বিবাহের বিবরণ বর্ত্তমান কালে পাওয়া যাইতেছে না, তাহা সংগ্রহ করিবার উপায়ও নাই। যাহা সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে, তদ্দারা জানা যায়, মহারাজ ত্রিলোচন হেরম্বের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।* তৈদক্ষিণ, মণিপুরের রাজকন্যা বিবাহ

* “হেরম্বে কহিল দূত এইক্ষণ চল।।
কন্যাকে বিবাহ দিতে চাহিয়ে সত্বর।
শীঘ্রগতি বৈলা আইস ত্রিলোচন বর।। রাজমালা,—ত্রিলোচন খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা।

করেন।* আচঙ্গ ফা (নামান্তর কুঞ্জহোম ফা) জয়ন্তার রাজকুমারীকে পরিণয় করিয়াছিলেন।† রাজমালা প্রথম লহরের অন্তর্ভুক্ত অন্য কোন রাজার বিবাহের বিবরণ সংগ্রহ করিতে আমরা সক্ষম হইলাম না।

রাজপরিবারে বহু বিবাহের প্রথা পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। কথিত আছে, মহারাজ ত্রিলোচন শিল্প-নিপুণা ২৪০টী মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ উদয় মাণিক্যও ২৪০টী বিবাহ করিবার কথা রাজমালায় পাওয়া যায়। ত্রিপুরার ইতিহাসে ইহাই সর্ব্বোচ্চ বিবাহ সংখ্যা বলিয়া জানা যাইতেছে। এতদ্ব্যতীত অল্পাধিক পরিমাণে প্রায় সকল রাজাই বহুবিবাহ করিয়াছেন। একাধিক মহিষী গ্রহণ না করিয়াছেন ত্রিপুরেশ্বরগণের মধ্যে এমন কেহ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

বহু বিবাহের প্রশ্রয়

ত্রিপুর-ভূপতিবৃন্দ প্রাচীন কৌলিক পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সর্ব্বদা বিশেষ সচেষ্ট ও যত্নবান। মহারাজ ত্রিলোচনের বিবাহকালে বহিঃপুরে মনোহর বেদিকার উপর, উপর্য্যুপরি একবিংশতি চন্দ্রাতপ খাটাইয়া তাহার চারি কোণে মঙ্গলসূচক রম্ভাতরু, কাষ্ঠনির্ম্মিত রম্ভাফল এবং বেদিকার চতুষ্পার্শে ফল-পুষ্প পল্লব-সুশোভিত মঙ্গলঘট স্থাপন করা হইয়াছিল। এতৎ সম্বন্ধে রাজ রত্নাকরে লিখিত আছে ;---

প্রাচীন পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার আশ্রয়

"বহিঃপুরেচ কৃতবান বেদিকাং সমুনোহরং
উপর্য্যুপরি তস্যাশ্চ একবিংশতিসংখ্যকান্।
চন্দ্রাতপান্ স্থাপয়িত্বা চতুষ্কোণে সুমঙ্গলান্
রম্ভাতরুং স্তৎ ফলানি দারুভিঃ নির্ম্মিতানি চ।
বেদিকায়াশ্চতুষ্পার্শ্বে প্রসূনফলপল্লবৈঃ
শোভিতান্ কলসাংশ্চৈব স্থাপয়ামাস যত্নতঃ।"

মর্ম্ম ;---"বহিঃপুরে এক মনোহর বেদিকায় উপর্য্যুপরি একবিংশতি

---

* "বহুকাল সেই স্থানে পালিলেক প্রজা।
মেখলী রাজার কন্যা বিভা কৈল রাজা।।"
তৈদাক্ষিণ খণ্ড,—৩৮ পৃষ্ঠা।

† "আচঙ্গ ফা ওরফেতে কুঞ্জহোম ফা নাম।
বলবীর্য্য পরাক্রমে পিতৃ গুণধাম।।
বিবাহ করিয়াছিল জন্তা রাজ কুমারী।"
ত্রিপুর বংশাবলী

বিবাহ-বেদী।

চন্দ্রাতপ স্থাপন পূর্ব্বক তাহার চারিকোণে মঙ্গলসূচক রম্ভাতরু, কাষ্ঠনির্ম্মিত রম্ভাফল এবং বেদিকার চতুষ্পার্শ্বে ফল-পুষ্প-পল্লবে সুশোভিত কলস সকল স্থাপিত করিলেন।"

ত্রিপুর রাজ পরিবারের বিবাহকালে অদ্যাপি সেই সকল নিয়ম অবিকলরূপে প্রতিপালিত হইতেছে। ত্রিলোচনের জন্মকালে তাঁহার নিনেত্র লক্ষিত হইয়াছিল, তদবধি রাজপরিবারস্থ পুরুষগণের বিবাহকালে ললাট দেশে চন্দন দ্বারা একটী চক্ষু অঙ্কিত হয়। এই কৌলিক নিয়মও অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে।

ঠাকুর পরিবারের মধ্যেও রাজ পরিবারের নিয়মানুসারে বিবাহের বেদী প্রস্তুত হয়; কিন্তু চন্দ্রাতপের সংখ্যা সকলের সমান নহে; পারিবারিক মর্য্যাদানুসারে ইহার সংখ্যা নির্দ্ধারিত আছে।

ত্রিপুর রাজ্যে কিয়ৎকাল রাজার নামানুসারে রাণীর নামকরণ হইবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যথা ;—

রাজা ও রাণীর একনাম।

(১) "আচোঙ্গ রাজার নাম আচোঙ্গ মা রাণী।
তদবধি রাজা রাণী এক নাম জানি।।"

(২) "আচোঙ্গ নৃপতি স্বর্গী হইল যখন।
তাঁর পুত্র খিচোং রাজা হইল আপন।।
খিচোং মা নামে ছিল তাঁহার রমণী।"

(৩) "তাঁর পুত্র ডাঙ্গর ফা নামে নরপতি।
নানাস্থানে পুরী করিছিল মহামতি।।
ডাঙ্গর মা ছিল তান পত্নীর যে নাম।" ইত্যাদি।

এই সকল নাম শুনিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন, ইহা ইংরেজ সমাজের স্বামী স্ত্রীর এক নামযুক্ত 'লর্ড—লেডি' কিম্বা 'মিষ্টার—মিসেস' এর অনুকরণ। প্রকৃতপক্ষে এতদ্দেশে মুসলমান শাসন বিস্তারেরও অনেক পূর্ব্বে ঐ সকল নামকরণ হইয়াছিল, সুতরাং ইহা যে ইংরেজী গন্ধ বিবর্জ্জিত, সে বিষয় কেহ সন্দেহ করিবেন না।

রাজা ও রাজপরিবারের শিক্ষানুরাগ

রাজমালার প্রথম লহরে, অধিকাংশ নরপতির নাম মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের জীবন কাহিনী ও শাসন বিবরণী লিখিত হয় নাই। এই কারণে রাজগণের ও রাজ পরিবারের শিক্ষা বিষয়ক বিবরণ সংগ্রহ করা বর্ত্তমান কালে অসাধ্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। রাজমালা আলোচনায় যে আভাস পাওয়া যায়, তদ্দারা বুঝা যাইতে পারে, প্রাচীনকালে শিক্ষার প্রতি রাজ পরিবারের বিশেষ অনুরাগ ছিল। মহারাজ দৈত্য স্বীয় অনাবিষ্ট পুত্র ত্রিপুরের শিক্ষা বিধানের নিমিত্ত বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছিলেন, কিন্তু--- "পঠাইতে যত্ন কৈল পুত্র না পঠিল।" ত্রিপুর নিতান্তই গোঁয়াড় গোবিন্দ এবং

অত্যাচারী হইয়াছিলেন ; এরূপ অধার্ম্মিক ও অশিক্ষিত রাজা ত্রিপুর রাজবংশে কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই ; কিন্তু ত্রিপুরের পুত্র মহারাজ ত্রিলোচন, সকল বিষয়েই সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা ও অলৌকিক গুণ সম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে ;---

"মহারাজা সুচরিত্র প্রকৃতি সুন্দর।
সাধুভাব দেবরূপ বিনয় বিস্তর।।
উন্মত্ত মাৎসর্য্য হিংসা নাহিক তাহার।
যেই জন যেই মত সেই ব্যবহার।।
অহঙ্কার ক্রোধ বশ করিল উত্তম।
নরদেহে ত্রিলোচন কে বা তান সম।।
যুদ্ধেতে অগ্নির তুল্য ক্ষমায়ে পৃথিবী।
নবীন কন্দর্প রূপে তেজে মহারবি।।
বাক্যে বৃহস্পতিসম শুক্রতুল্য জ্ঞান।
নানাবিধ যন্ত্র শিক্ষা তালে ছিল জ্ঞান।।
সুখ্যাতি শুনিয়া আসে নানা দেশী দ্বিজ।
তাহাতে শিখিল বিদ্যা যত পাই বীজ।।
বৈষ্ণব চরিত্র সব সাধুর আচার।
নিপুণ হইল রাজা কাল ব্যবহার।।"

ত্রিলোচন খণ্ড,—১৯ পৃষ্ঠা।

সে কালে সুশিক্ষিত লোকের অভাব প্রযুক্ত কিরাত দেশে পুত্রগণের শিক্ষার সুব্যবস্থা করা দুঃসাধ্য হইলেও রাজগণ সে বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না, রাজমালা আলোচনায় ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। তখন ত্রিপুর রাজ্যে বর্ত্তমান বাঙ্গালী সমাজের ন্যায় কেবল পুঁথিগত বিদ্যারই চর্চ্চা হইত এমন নহে; রাজনীতি, সমাজনীতি, ব্যবহারনীতি, যুদ্ধ বিদ্যা, সঙ্গীত শাস্ত্র, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ইত্যাদি সকল বিষয়েরই চর্চ্চা ছিল। শারীরিক উন্নতিকল্পে মল্লবিদ্যাও অভ্যাস করিতে হইত। রাজ-পরিবারস্থ ব্যক্তিবৃন্দের লক্ষণ বর্ণন উপলক্ষে রাজমালা বলেন,—

"মহাবল পরাক্রান্ত বেগবন্ত বড়।
কদলীর তুল্য জানু জঙ্ঘা মহোহর।।
মল্লবিদ্যা অভ্যাসে ত বাহুস্থূল হয়।
যেন শাল বৃক্ষ দৃঢ় জানিয় নিশ্চয়।।"

ত্রিলোচন খণ্ড,—২৬ পৃষ্ঠা।

সৈনিক বিভাগে কেবল কুঁচ কাওয়াজ হইত এমন নহে, সেই বিভাগেও মল্লবিদ্যার চর্চ্চা থাকিবার প্রমাণ রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে ;—

"মল্লবিদ্যা বিশারদ হৈল সৈন্যগণ।
খড়্গ চর্ম্ম লইয়া পাঁচা খেলে ঢালিগণ।।"
(দক্ষিণ খণ্ড,---৩৭ পৃষ্ঠা।)

রাজপরিবারের শিক্ষার সুবিধা ও প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবার অনেক দৃষ্টান্ত রাজমালায় পাওয়া যায়। মুকুট মাণিক্যের পুত্র মহামাণিক্য এবং তৎপুত্র ধর্ম্মমাণিক্য বহুশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন।

ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মাচরণ

ধর্ম্মমত সম্বন্ধীয় আভাষ

ত্রিপুরভূপতিবৃন্দ ধর্ম্মমতে বিশেষ উদার ছিলেন, তাঁহারা কোনও একটী সাম্প্রদায়িকমতে নিবদ্ধ থাকিতেন না। অতঃপর আমরা কুলদেবতার (চতুর্দ্দশ দেবতার) বিবরণ প্রদান করিব, তাহা আলোচনায় জানা যাইবে, তন্মধ্যে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতাই আছেন। ত্রিপুররাজবংশীয়গণের লক্ষণ বর্ণন উপলক্ষে রাজমালা বলিয়াছেন ;---

"হরি হর দুর্গা প্রতি দৃঢ় ভক্তি যার।
ত্রিপুর বংশেতে জন্ম নিশ্চয় তাহার।।"
ত্রিলোচন খণ্ড---২৬ পৃঃ।

ধর্ম্মমত সম্বন্ধীয় উদারতা

যে বংশের ইহাই প্রধান লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত, সেই বংশ যে ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে কোনও সম্প্রদায় বিশেষের মতে আবদ্ধ ছিলেন না, এ কথা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। কোন কোন রাজা স্বীয় বিশ্বাসানুসারে শৈব, শাক্ত বা বৈষ্ণব মতাবলম্বী না হইয়াছেন, এমন নহে। পূর্ব্বভাষ আলোচনায় জানা যাইবে, এই রাজবংশ প্রথমতঃ শৈব ছিলেন, ক্রমশঃ মত পরিবর্ত্তনের দরুণ পরিশেষে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা বৈষ্ণব হইলেও শিব ও শক্তির প্রতি চিরদিনই সমান আস্থাবান। এতদুপলক্ষে একটী বিশেষ মূল্যবান কথা মনে পড়িল, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

একদা কলিকাতায় সম্মিলন কালে, দ্বারবঙ্গাধিপ ত্রিপুরেশ্বর স্বর্গীয় রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"ধর্ম্ম সম্বন্ধে আপনি কোন্ মতাবলম্বী?" এই প্রশ্নের উত্তরে মাণিক্য বাহাদুর বলিয়াছিলেন,—"ত্রিপুরার রাজা হিসাবে আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হইলে, কথা কিছু বিস্তৃত হইবে। আমরা পুরুষানুক্রমে পীঠদেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর সেবা করিয়া আসিতেছি, বিধিমত ছাগাদি বলিদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা হয়। আমার কুলদেবতার

(চতুর্দ্দশ দেবতার) মধ্যে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতাই আছেন, সেই সকল দেবতার অর্চ্চনায়ও ছাগাদি বলি দেওয়া হইতেছে। এমন কি, আমার সিংহাসনের পূজায়ও পাঁঠা বলির ব্যবস্থা আছে। পূর্ব্ব-পুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত শিব ও শক্তিমূর্ত্তি এবং বিষ্ণু বিগ্রহ অনেক আছে। শিব, শক্তি ও বিষ্ণুর অর্চ্চনা ত্রিপুর-রাজধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত, সুতরাং রাজা হিসাবে আমিও সেই সমস্ত দেবতার সেবক। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি বৈষ্ণব।'' এই উত্তর শুনিয়া দ্বারভাঙ্গাধিপতি বিস্মিতভাবে বলিয়াছিলেন—''ইহা সার্ব্বভৌম সম্রাটের যোগ্য কথা! আপনার উত্তর শুনিয়া আমি পরম প্রীতিলাভ করিলাম।''

ত্রিলোচন যে সকল ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন রাজমালায় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, যথা :—

''দুর্গোৎসব দোলোৎসব জলোৎসব চৈত্রে।
মাঘমাসে সূর্য্যপূজা করিল পবিত্র।।
শ্রাবণ মাসেতে পূজা করে পদ্মাবতী।*
গ্রাম মুদ্রা করিছিল যেন রাজনীতি।।
বিষ্ণু-সংক্রমনে পিতৃলোক শ্রাদ্ধ করে।
ব্রাহ্মণে অন্নাদিদান প্রাতে নিরন্তরে।।'' ইত্যাদি।

ত্রিলোচন খণ্ড—৩৩ পৃষ্ঠা।

এই সকল প্রাচীন নিয়ম বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে।

মহারাজ বিমারের পুত্র কুমার বিশেষ ধার্ম্মিক এবং শিবানুরক্ত ছিলেন। তিনি মনু নদীর তীরবর্ত্তী ছাম্বুল নগরে শিব দর্শনার্থ গমন করেন এবং আজীবন তথায় অবস্থান করিয়া শিবোপাসনায় নিযুক্ত ছিলেন। এ বিষয় রাজমালায় লিখিত আছে,—

''তার পুত্র কুমার পরেতে রাজা হয়।।
কিরাত আলয়ে আছে ছাম্বুল নগর।
সেইরাজ্যে গিয়াছিল শিবভক্তি তর।।
* * * * *
গুপ্তভাবে আছে তথা অখিলের পতি।
মনুরাজ সত্যযুগে পূজিছিল অতি।

---

* পদ্মাবতী—বিষহরি। এই দেবীর অর্চ্চনা আমাদের দেশে নিতান্ত আধুনিক নহে, বণিকরাজ চন্দ্রধর এই পূজার প্রথম প্রবর্ত্তক বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

দ্বারবঙ্গাধীশ্বর—
মহারাজ রামেশ্বর সিংহ

ত্রিপুরাধিপতি—
স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য।

মনু নদী তীরে মনু বহু তপ কৈল।
তদবধি মনুনদী পুণ্যনদী হৈল।।" তৈদক্ষিণ খণ্ড---৪৩ পৃষ্ঠা।

সংস্কৃত রাজামালা বলেন ;—

"বিমারস্য সুতো জাতঃ কুমারঃ পৃথিবীপতিঃ।
স রাজা ভুবন খ্যাতঃ শিবভক্তি পরায়ণঃ।।
কিরাত রাজ্যে স নৃপশ্ছাম্বুল নগরান্তরে।
শিব লিঙ্গং সমদ্রাক্ষীৎ সুবড়াই কৃতে মঠে।। ‡
ততঃ শিবং সমভ্যর্চ্চ্য নিত্যং তুষ্টাব ভূমিপঃ।
রাজা শ্রুত্বেদমাশ্চর্য্যং পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতঃ।।
কথমত্র মহাদেবঃ কিরাত নগরে স্থিতঃ।
ইতি রাজ বচঃ শ্রুত্বা মুকুন্দো ব্রাহ্মণোহব্রবীৎ।।
পুরাকৃৎ যুগে রাজন্ মনুনা পূজিতঃ শিবঃ।
অত্রৈব বিরলে স্থানে মনু নাম নদীতটে।।
গুপ্তভাবেন দেবেশঃ কিরাত নগরে বসৎ।" ইত্যাদি।

এই ছাম্বুল নগর কোথায়, তাহা আলোচ্য বিষয়। বিশ্বকোষ সম্পাদক বলেন,—

"মহারাজ বিমারের পুত্র কুমার রাজা হইয়া শ্যামল নগরে শিব-দর্শনার্থ গমন করেন। শ্যামল নগর শিবের প্রিয় ক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই শ্যামল নগর কোথায় তাহা জানা যায় না। তবে, চট্টগ্রামের উত্তর দিকস্থ পর্ব্বতের সুপ্রসিদ্ধ শম্ভুনাথ শিবমন্দির অতি প্রাচীন কালে ত্রিপুরাধিপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া কথিত হয় এবং এখনও সেই মন্দির সংস্কারের ব্যয় ত্রিপুরা রাজ কোষ হইতে দেওয়া হয়। বোধ হয় এই স্থানই সেকালে শ্যামল নগরে নামে কথিত হইত।"

ছাম্বুল নগর

অভিজ্ঞতার অভাবে এরূপ প্রমাদে পতিত হওয়া অনিবার্য্য। ছাম্বুল বা শ্যামলনগর মনু নদীতীরে অবস্থিত, রাজমালায় একথা স্পষ্টতররূপে উল্লেখ হইয়াছে। মনু নদী ত্রিপুর রাজ্যের উত্তর প্রান্তে প্রবাহিত, এই নদীর তীরে উক্ত রাজ্যের কৈলাসহর বিভাগীয় আফিস সংস্থাপিত রহিয়াছে। আর শম্ভুনাথ (সীতাকুণ্ডতীর্থ) রাজ্যের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত। নগেন্দ্র বাবু স্থানীয় অবস্থা না জানায় এতদুভয়ের একতা প্রতিপাদনে প্রয়াস পাইয়াছেন। বিশেষতঃ 'ছাম্বুল নগর' স্থলে 'শ্যামল নগর' বলিয়া তিনি আর একটী ভুল করিয়াছেন।

ছাম্বুল নগরের অবস্থান বর্ত্তমান কালে নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে নির্দ্ধারণ করা দুঃসাধ্য

‡ 'সুবড়াই কৃতে মঠে' এই বাক্যদ্বারা বুঝা যায়, মহারাজ ত্রিলোচন (নামান্তর সুবড়াই) ছাম্বুল নগরে শিব মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মন্দির উনকোটী তীর্থে নির্ম্মিত হইয়াছিল মনে হয়। তথায় বিস্তর প্রাচীন ইষ্টক আছে এবং মন্দিরের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।

হইলেও একেবারে অসাধ্য নহে। রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে,—এই স্থান মনু নদীর তীরবর্ত্তী, মহর্ষি মনু এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন, তথায় কিরাত নগর ছিল এবং সেই নগরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে কৈলাসহর ও তৎসন্নিহিত ঊনকোটী তীর্থের প্রাচীন নাম ছাম্বুল নগর ছিল, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। লংলা প্রভৃতি স্থান কিরাতগণের আবাসভূমি ছিল, মহারাজ ধর্ম্মধরের তাম্রশাসনে একথা পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং "কিরাতনগর" শব্দ দ্বারাও উক্ত তীর্থস্থানকে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। ইহার সন্নিহিত পর্ব্বতমালায় বর্ত্তমান কালেও কিরাতগণ (কুকিগণ) বাস করিতেছে।

ছাম্বুল নগরের অবস্থান নির্ণয়

দান ও যজ্ঞ ত্রিপুরভূপতিবৃন্দের অম্লান কীর্ত্তি। রাজমালার কোন কোন স্থলে এই কীর্ত্তিকাহিনীর ইঙ্গিত মাত্র পাওয়া যায়, কোন কোন প্রসিদ্ধ ঘটনার একেবারেই উল্লেখ করা হয় নাই। এই ত্রুটী রাজমালা রচয়িতার ইচ্ছাকৃত কি প্রমাদমূলক, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। আমরা রাজমালার রচয়িতাগণের পরিচয় প্রদানোপলক্ষে পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা আলোচনা করিলে স্বতই অনুমিত হইবে, যজ্ঞসম্বন্ধীয় কথা ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিহার করাও বিচিত্র নহে। যাহাহইক, আমরা রাজমালার প্রথম লহর সংশ্লিষ্ট যজ্ঞবিবরণ যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদান করিলাম।

যজ্ঞ বিবরণ

মহারাজ ত্রিপুরের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ইতিহাস অতীতের অন্ধকারময় গহ্বরে বিলীন হইয়াছে, তাহার উদ্ধার সাধনের উপায় নাই। ত্রিপুরের পরবর্ত্তী অনেক রাজার বিবরণও বর্ত্তমান মানব সমাজের অগোচর, রাজমালায় তাঁহাদের নাম মাত্র পাওয়া যাইতেছে। ত্রিপুরের পুত্র মহারাজ ত্রিলোচন এক যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন ;* এই যজ্ঞ ত্রিবেগ নগরস্থিত রাজধানীতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালে এ বিষয়ের নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। ত্রিলোচনের অধস্তন চতুর্থ স্থানীয় মহারাজ তরদাক্ষিণ সর্ব্বদা যজ্ঞাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। † ইনি বরবক্র নদীর তীরবর্ত্তী খলংমা রাজধানীতে রাজত্ব করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার যজ্ঞ এই স্থানেই সমাহিত হইয়াছিল, এরূপ বলা যাইতে পারে। ইহার পরবর্ত্তী অনেক পুরুষের বিবরণ পাওয়া যাইতেছে না।

---

* "ত্রিলোচন এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিবার জন্য গঙ্গাসাগর ক্ষেত্রে লোক পাঠাইয়াছিলেন। *** ব্রাহ্মণেরা ত্রিপুর জীবিত আছেন বলিয়া প্রথমতঃ আসিতে স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু শেষে ত্রিপুরের মৃত্যুসংবাদে বিশ্বাস হওয়ায়, তাঁহারা গিয়া ত্রিলোচনের যজ্ঞ সম্পন্ন করেন."

বিশ্বকোষ,—৮ম ভাগ।

† "তরদাক্ষিণ নাম রাজা তাহার তনয়।
বহুকাল পালে প্রজা নীতি যজ্ঞময়।।"

ত্রিলোচনের অধস্তন ৭৫ স্থানীয় মহারাজ কিরীট (নামান্তর ডুঙ্গুরফা, দানকুরুফা বা হরিরায়) দারুণ অনাবৃষ্টি নিবারণকল্পে এক বিরাট বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন ; কিন্তু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব প্রযুক্ত এই কার্য্য সম্পাদন করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। এই সময় কামরূপ প্রদেশে সদ্‌ব্রাহ্মণের অভাব না থাকিলেও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দুষ্প্রাপ্য ছিল। 'বৈদিক সংবাদিনী' নামক কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, মহারাজ অনন্যোপায় হইয়া, এই কার্য্য সম্পাদনক্ষম ব্রাহ্মণ পাইবার নিমিত্ত মিথিলাধিপতির নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন। তৎকালে বলভদ্র সিংহ নামক ভূপতি মিথিলার রাজা ছিলেন।* তিনি ত্রিপুরেশ্বরের অনুরোধ রক্ষার নিমিত্ত পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ত্রিপুরায় গমন করিতে বলেন। কিন্তু কামরূপ প্রদেশ সদাচার বর্জ্জিত বলিয়া তাঁহারা প্রথমতঃ রাজাজ্ঞা শ্রবণে নিতান্তই দুঃখিত হইয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহারা দেশের অবস্থাদি জানিবার নিমিত্ত একজন সুবিবেচক ব্যক্তিকে পাঠাইলেন। সেই ব্যক্তি মিথিলায় প্রত্যাগমন করিয়া জানাইল, ত্রিপুর রাজ্য সদাচার বর্জ্জিত নহে, তথাকার রাজা চন্দ্রবংশ সম্ভূত, এবং বরবক্রাদি পুণ্যসলিলা নদীপ্রবাহে সেইস্থান পুণ্যপ্রদ হইয়াছে।† অতঃপর, বৎস গোত্রীয় শ্রীনন্দ, বাৎস্য গোত্রীয় আনন্দ, ভরদ্বাজ গোত্র সম্ভূত গোবিন্দ, কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রজ শ্রীপতি এবং পরাশর গোত্রীয় পুরুষোত্তম, এই পঞ্চতপস্বী ৬৪১ খৃঃ অব্দে ত্রিপুরায় আসিয়া যজ্ঞ সম্পাদন, এবং মহারাজ কিরীট প্রথম ধর্ম্মকার্য্যে বৃত হওয়ায়, তাঁহাকে 'আদিধর্ম্মপা' নামে অভিহিত করেন।‡ শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান ভানুগাছ পরগণাস্থ মঙ্গলপুর গ্রামে এই যজ্ঞ হইয়াছিল, তথায় সেই যজ্ঞকুণ্ডের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যজ্ঞ সমাপনান্তে তপস্বিগণ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। কিন্তু মহারাজ দানকুরু ফা (আদিধর্ম্ম পা) তাঁহাদিককে ছাড়িতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন, এবং সেই স্থানে বাস করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিককে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ মহারাজার বিনয়ে পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহার অনুরোধ পালন করিতে সম্মত হইলেন। §

আদিধর্ম্মপার যজ্ঞ

---

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস,—২য় ভাগ, ৩য় অংশ, ১৮৫ পৃষ্ঠা।

† বৈদিক সংবাদিনী দ্রষ্টব্য।

‡ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—২য় ভাগ, ৩য় অংশ, ১৮৫ পৃঃ ও শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

§ "বৈদিক সংবাদিনী" গ্রন্থ ও ১৩০৭ বাং কার্ত্তিক মাসের 'নব্যভারত' পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

এতদুপলক্ষে মহারাজ একখণ্ড তাম্রশাসন দ্বারা তাঁহাদিককে কতক ভূমি দান করিয়াছিলেন। বৈদিকসংবাদিনীধৃত তাম্রফলকোৎকীর্ণ শ্লোক নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

আদিধর্ম্মপার তাম্রশাসন

"ত্রিপুরা পর্ব্বতাধীশঃ শ্রীশ্রীযুক্তাদি ধর্ম্মপাঃ।
সমাজ্ঞং দত্ত পত্রঞ্চ মৈথিলেযু তপস্বিযু।।
বৎস-বাৎস্য-ভরদ্বাজ কৃষ্ণাত্রেয় পরাশরাঃ।
শ্রীনন্দানন্দ গোবিন্দ শ্রীপতি পুরুষোত্তমাঃ।।
প্রাচীচ্যামুত্তরস্যাঞ্চ বক্রগা ক্রোশিরানদী।*
দক্ষিণস্যাঞ্চ পূর্ব্বস্যাং হাঙ্কালা কৌকিকা পুরী। †
এতন্মধ্যাং সশস্যাঞ্চ টেঙ্গরী কুকিকর্ষিতাং। ‡
প্রলভ্য দত্তাং তদ্ভূমিং তেযু পঞ্চতপস্বিযু।।
মকরস্থে রবৌ শুক্লপক্ষে পঞ্চদশী দিনে।
ত্রিপুরা চন্দ্র বাণাব্দে প্রদত্তা দত্ত পত্রিকা।।"

---

* প্রদত্ত ভূভাগের উত্তর ও পশ্চিম সীমায় বক্রগামিনী কুশিয়ারা নদী প্রবাহিতা। 'কুশিয়ারা' বরবক্রের অংশ বিশেষের নাম।

† পূর্ব্ব ও দক্ষিণে হাঙ্কালা সম্প্রদায়ের কুকিগণের বাসভূমি ছিল। এই 'হাঙ্কালা' নামানুসারে, সুবিস্তীর্ণ 'হাকালুকি' হাওরের নাম হইয়াছে। শ্রীহট্ট অঞ্চলে জলমগ্ন স্থান বা বিস্তীর্ণ বিলকে 'হাওর' বলে, 'হাওর' শব্দ 'সাগর' শব্দের অপভ্রংশ। উক্ত অঞ্চলে 'স' স্থলে 'হ' উচ্চারণের দৃষ্টান্ত অনেক আছে। পূর্ব্বকালে 'গ' স্থলে "য়" উচ্চারণের দৃষ্টান্ত, বিরল নহে। বৈষ্ণব পদাবলীতে 'নাগর' শব্দের স্থলে 'নায়র' 'সাগর' শব্দ স্থলে 'সায়র' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। এস্থলে 'সাগর' শব্দের 'স' স্থলে 'হ' এবং 'গ' স্থলে 'ও' ব্যবহৃত হওয়ায় সাগর শব্দ 'হাওর' রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহা সায়র শব্দেরই অপভ্রংশ। হাকালুকি হাওর সম্বন্ধে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে একটী প্রবাদ মূলক বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা এই,—প্রাচীনকালে এইস্থান সমভূমি ছিল। তথাকার অধিবাসী কয়েকটী ব্রাহ্মণ সদাচার বিবর্জ্জিত ছিলেন, তাঁহারা যথেচ্ছাচারে শিবপূজা করিতেন। একটী নীচজাতিয়া দাস অশুচিভাবে পুষ্পচয়ন করিত। কেবল একজন ব্রাহ্মণ এই সকল ব্যবহারে অন্তরে ব্যথা পাইতেন ও শুদ্ধভাবে শিবপূজা করিতেন। অবশেষে যখন তাঁহাদের পাপের ভরা পূর্ণ হইল, তখন একদা সেই শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণকে স্থানান্তরে পলাইয়া যাইতে দৈবাদেশ হইল। এদিকে হঠাৎ দৈব উৎপাত উপস্থিত হইল, একসঙ্গে ঝড় ও ভূমিকম্প ভীমবেগে প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত করিল, দেখিতে দেখিতে সেই স্থান অদৃশ্য হইয়া গেল। প্রবাদ অনুসারে সেই স্থানই হাকালুকি হাওর হইয়াছে।"

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত,—২য় ভাগ, ২৬ অঃ, ১৬ পৃঃ।

এই কিম্বদন্তী দ্বারা জানা যায়, উক্তস্থানে পূর্ব্বে জনপদ ছিল, ভূমিকম্পে ধ্বসিয়া যাওয়ায়, তাহা হাওরে পরিণত হইয়াছে।

‡ টেঙ্গরী নামক কুকি সম্প্রদায় এইস্থানে জুম চাষ করিত। উক্তস্থান ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবার পর, কুকিগণ দূরবর্ত্তী পর্ব্বতে যাইয়া বাস করিতে থাকে।

অনুবাদ

ত্রিপুরা পর্ব্বতাধীশ্বর শ্রীশ্রীযুত ধর্ম্মফা (পাল) মিথিলাদেশীয় তপস্বিদিগকে এই দানপত্র প্রদান করিবার অনুমতি দেন। ঐ তপস্বিদিগের নাম,---বৎস গোত্রজ শ্রীনন্দ, বাৎস্য গোত্রজ আনন্দ, ভরদ্বাজ গোত্রজ গোবিন্দ, কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রজ শ্রীপতি এবং পরাশর গোত্রজ পুরুষোত্তম। পশ্চিম ও উত্তর দিকে বক্রগামিনী ক্রোশিরা (কুশিয়ারা) নদী, দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে হাঙ্কালা-কুকিপল্লী। এই চতুঃসীমাবস্থিত টেঙ্গরী সম্প্রদায়ের কুকি কর্ত্তৃক কর্ষিত সশস্যাভূমি লইয়া ৫১ ত্রিপুরাব্দে মাঘীপূর্ণিমা দিনে এই দত্ত পত্রিকা দান করেন।

এই তাম্রফলকের সংস্কৃত স্থানে স্থানে ভুল পরিলক্ষিত হয়। এই কিঞ্চিন্ন্যুন ১৩০০ বৎসরের প্রাচীন। এই সনন্দ দ্বারা পঞ্চবিপ্রকে ভিন্ন ভিন্ন পাঁচখণ্ড ভূমি দান করায়, উক্ত স্থান "পঞ্চখণ্ড" নামে অভিহিত হইয়াছে। শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান পঞ্চখণ্ড পরগণা উক্ত ভূ-ভাগ লইয়া সৃষ্ট হইয়াছে। ভূমিদান কালে এই স্থানে ত্রিপুর রাজদণ্ডের অধীন ছিল।

"আসামের বিশেষ বিবরণ" পুস্তিকায় এই ভূমিদানের বিষয় উল্লেখ আছে, যথা ; --"প্রায় ১৩০০ বর্ষ অতীত হইল, ত্রৈপুর ভূপতি আদি-ধর্ম্মপা কুশিয়ারা নদীর দক্ষিণ ও পূর্ব্ব এবং হাকালুকি হাওরের পশ্চিমে কতক ভূমি শ্রীনন্দ, আনন্দ, গোবিন্দ, শ্রীপতি এবং পুরুষোত্তম নামে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে দান করেন। ইহাদিগকে তিনি কোনও যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য মিথিলা হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন।"

মৈথিলি ব্রাহ্মণের উপনিবেশ স্থাপন

ব্রাহ্মণগণ এদেশে বাস করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়া ছিলেন না। ত্রিপুরেশ্বরের অনুরোধে যখন এদেশবাসী হওয়া স্থিরীকৃত হইল, তখন তাঁহারা পরিবারবর্গ আনয়নের নিমিত্ত স্বদেশে গমন করিলেন। এদেশে আসিয়া শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ড এবং বৈবাহিক সম্বন্ধাদি সম্পাদনের সুবিধার নিমিত্ত, তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন কালে, কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদ্গল্য, স্বর্ণকৌশিক ও গৌতম গোত্রজ পাঁচজন ব্রাহ্মণকে এবং ভৃত্য ও নাপিত ইত্যাদি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সমাগত বিপ্রগণ সকলেই শ্রীহট্ট অঞ্চলে "সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ" নামে অভিহিত এবং বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে 'বৈদিক সংবাদিনী' গ্রন্থে লিখিত আছে ;--

"ততঃ স্বদেশীয়-স্বগন-বিরহেণ তে ক্লিষ্টাঃ সন্তঃ পুনঃ স্বদেশং গত্বা অবশিষ্ট পঞ্চগোত্রীয়ৈস্তপস্বিভিঃ সমবেতাঃ স্ব স্ব কুটুম্ব পুরোহিত-যজমানৈঃ শিষ্য-ভৃত্য-নাপিতাদিভিঃ সহ

এতস্মিন্নেব পঞ্চখণ্ডাখ্যদেশে *** বসতিং পরিকল্প্য মৈথিল কুলাচারতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারতশ্চ নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মকলাপং এতদ্দেশীয়াচরণা প্রযুক্তং কর্ম্মচ বিধায় স্থিতাঃ স্বগণৈঃ সাম্প্রদায়িক শ্রেণীবদ্ধাঃ স্বাচ্ছন্দং প্রতিবাসিতা।”

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগে এ বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। এ স্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এই তাম্রফলক ব্যতীত আর একখানা তাম্রফলকের বিবরণ অতঃপর প্রদান করা হইবে।

তাম্রফলক সম্বন্ধীয় আলোচনা

এতদুভয় শাসন সম্বন্ধে গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ১৮৯৭ খৃঃ অবদে প্রকাশিত “Report on the progress of Historical Researches in Assam” নামক গ্রন্থের ১২শ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

“Two Copper plates of Tripura kings have been reported by Babu Giris Chandra Das, who sent me copies of the inscriptions. The plates, themselves, however are not forthcoming at present, and it is feared that they have been lost. The first plate, it is said, records a great Dharmapha, King of the mountains of Tippera, who invited five Vedic Brahmans from Mithila in the year 51 of Tippera ear.” Etc.,

মর্ম্ম :—

ত্রিপুর রাজন্যবর্গ সম্বন্ধীয়, দুইখানা তাম্রলিপি ছিল বলিয়া বাবু গিরীশচন্দ্র দাস রিপোর্ট করিয়াছেন। তৎসহ তিনি সেই দুইখানার লিখিত বিষয়ের অবিকল নকল পাঠাইয়াছেন। তাম্রলিপি দুই খণ্ড এইক্ষণ পাওয়া যাইতেছে না, সম্ভবতঃ তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। একখানা তাম্রলিপিতে উল্লেখ ছিল, পার্ব্বত্যত্রিপুরার বিখ্যাত রাজা ধর্ম্ম ফা ৫১ ত্রিপুরাব্দে পাঁচজন মৈথিলী বৈদিক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন।

গেইট সাহেব প্রণীত আসামের ইতিহাসের ২৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—”The inscriptions of two old copper plates recorded the grant of land of Brahmanas”&c.

শ্রীহট্টের ইতিহাস প্রণেতা মহাশয় এই তাম্রফলক সম্বন্ধে কতিপয় কারণে সন্দিহান হইয়াছেন। তিনি বলেন ;—

“আমাদের বিবেচনায় যজ্ঞ ও ভূমিদান যথার্থ হইলেও দান পত্র গুলি বহু পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। বিবরণটা প্রসিদ্ধ, অনেকেই জ্ঞাত ছিলেন, এবং তাহাই অবলম্বনে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ বংশীয় একব্যক্তি (ঁ শ্যাম সুন্দর ভট্টাচার্য্য) ইদানীং বৈদিক সংবাদিনী রচনা করিয়া যতটা কিংবদন্তীর সহায়তাতে পারেন, ততটা ইতিহাস রূপে নিবন্ধ করিয়াছেন। তাম্রফলক একটা কি দুইটা, ত্রৈপুর নৃপতি দিয়াছিলেন, ইহা ঠিক হইতে পারে, যজ্ঞকুণ্ডের অস্তিত্বে যজ্ঞ ব্যাপারও অমূলক নহে, ইহাও সূচিত হয়। তবে, তাম্রশাসনের প্রতিলিপি না পাইয়া বৈদিক সংবাদিনীকার নিজ ভাষায় উহার বিবরণ যতটা শুনিয়াছেন, ততটা স্বশক্তি অনুসারে পদ্যে রচনা করিয়াছেন।”*

* শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, টীকা ২৯ পৃঃ।

যে সকল কারণে তাম্রশাসনের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা উপেক্ষণীয় বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু তাম্রফলকের বর্ত্তমান প্রতিলিপি সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, তাহাতে মূল ঘটনার কোনরূপ ক্ষতি বৃদ্ধি আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। কেহ কেহ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের উপরিউক্ত উক্তি আলোচনা করিয়া, ব্রাহ্মণ আনয়ন ও যজ্ঞ সম্পাদন ইত্যাদি বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইতেছেন। আমরা কিন্তু এরূপ সন্দেহের কোনও হেতু খুঁজিয়া পাইতেছি না। যে গ্রন্থের উক্তির প্রতি নির্ভর করিয়া তাঁহারা সংশয়ান্বিত হইয়াছেন, সেই গ্রন্থ হইতেই অনুকূল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া নিম্নে দেওয়া যাইতেছে; ইহা আমাদের পক্ষে দ্বিরুক্তি হইলেও অপরিহার্য্য বলিয়া মনে করি।

(১) "দূতমুখে তাঁহারা এতদ্বৃত্তান্ত (সে দেশ জঘন্য নহে, এই বৃত্তান্ত) শ্রবণে তথায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন এবং বরবক্রতীর্থ যাত্রার সঙ্কল্প করতঃ বৎস, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয় ও পরাশর এই পঞ্চ গোত্রোৎপন্ন পাঁচজন তপস্বী এদেশে আগমন করিলেন। ইঁহাদের নাম যথাক্রমে—শ্রীনন্দ, আনন্দ, গোবিন্দ, শ্রীপতি ও পুরুষোত্তম ছিল।"*

(২) "ইঁহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, যথাবিধি যজ্ঞীয় দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইল এবং যথাকালে যজ্ঞ সমাপ্ত হইল (৬৪১ খৃঃ)"।

শ্রীহট্টের অন্তর্গত বর্ত্তমান ভানুগাছ পরগণাধীন মঙ্গলপুর গ্রামই যজ্ঞ সম্পাদনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্ণীত এবং সেই স্থানেই সঙ্কল্পিত যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হয়। সেই প্রাচীনতম যজ্ঞকুণ্ডের পরিচিহ্ন তথায় এখনও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।" †

(৩) "যজ্ঞ সম্পাদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ স্বদেশে গমনোন্মুখ হইলে, মহারাজ আদি ধর্ম্ম পা (ডুঙ্গুর অথবা দান কুরু ফা) পঞ্চতপস্বীকে সেই স্থানে বাস করিতে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক অনুরোধ করিলেন, ব্রাহ্মণগণ রাজার বিনয়ে তুষ্ট হইলেন ও তাঁহার রাজ্যে বাস করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন মহারাজ অতি আনন্দিত হইয়া, তাঁহাদিককে নিজ রাজ্যে ব্রহ্মত্র ভূমিদান করেন"। ‡

(৪) "ঐ স্থান ব্রাহ্মণদিগকে দান করায়, কুকিগণ দূর পর্ব্বতে চলিয়া যায় এবং তাহাদের পরিত্যক্ত স্থানটী পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে বিভক্ত হওয়ায়, পঞ্চখণ্ড নামে খ্যাত হয়।" §

(৫) "৬৪১ খৃষ্টাব্দের পরেই ব্রাহ্মণগণ শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডে উপনিবিষ্ট হন। তাঁহারা এদেশে বাস করিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছিলেন না, কিন্তু দৈববশতঃ এদেশেই যখন

---

* শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ অঃ, ৫৫ পৃষ্ঠা।

† শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ অঃ, ৫৫ পৃষ্ঠা।

‡ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ অঃ, ৫৫-৫৬ পৃষ্ঠা।

§ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ অঃ, ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা।

তাঁহাদিগকে বাস করিতে হইল এবং এদেশকে নিজেদের বাসের ও নির্জ্জনে ধর্ম্মসাধনের উপযোগী স্থান বলিয়া বোধ হইল, তখন তাঁহারা এদেশে চিরবাসের ব্যবস্থা করিবার জন্য একবার জন্মভূমে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। * * * * এদেশে আসিয়া নিজেদের শাস্ত্রীয় ব্যাপার ও সম্বন্ধাদি বিষয় কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়, এই অভিপ্রায়ে প্রত্যাগমন কালে তাঁহারা স্ব সমাজ সহ আরও কতিপয় ব্রাহ্মণকে এদেশে আনয়ন করা আবশ্যক বোধ করিলেন। তাঁহাদের বিশেষ অনুরোধে অপর পঞ্চগোত্রীয় অর্থাৎ কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদগুল্য, স্বর্ণকৌশিক ও গৌতম গোত্রীয় সপরিবার পাঁচজন দ্বিজ এবং ভৃত্যাদি ও নাপিতাদি সহ পঞ্চখণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।"*

(৬) সমস্ত বঙ্গদেশে রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের স্মৃতি সম্মানিত এবং সমস্ত বঙ্গদেশ রঘুনন্দনের মতে পরিচালিত, কিন্তু শ্রীহট্টের শাস্ত্রীয় "ক্রিয়া" মৈথিল বাচস্পতি মিশ্রের মতে সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহাতে উপলব্ধি হইবে যে, শ্রীহট্টে মৈথিল দ্বিজগণের প্রভাব কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল এবং কিরূপ বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। †

এতদ্ব্যতীত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস দ্বিতীয়খণ্ডে এতদ্বিষয়ক বিবরণ বিস্তৃত ভাবে বিবৃত রহিয়াছে। এই বিষয়ের এতদধিক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। সংগৃহীত প্রমাণ আলোচনায় জানা যাইবে,—

(১) ব্রাহ্মণদিগকে মিথিলা হইতে আনয়নের কথা সত্য এবং তাঁহাদের বংশধরগণ বর্ত্তমানকালেও বিদ্যমান আছেন।

(২) ব্রাহ্মণদিগকে পাঁচখণ্ডে বিভক্ত করিয়া ভূমি দান করায়, স্থানের নাম 'পঞ্চখণ্ড' হইয়াছে এবং সেই নাম অদ্যাপিও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

(৩) মঙ্গলপুর গ্রামে যজ্ঞ সম্পাদন হইবার বিষয় এখনও সকলেরই মুখে শুনা যায় এবং অদ্যাপি যজ্ঞকুণ্ডের চিহ্ন বিদ্যমান আছে, সুতরাং যজ্ঞ সম্পাদনের কথা সত্য।

(৪) সমাগত মৈথিল ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্য হেতু শ্রীহট্টে, বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত মৈথিল বাচস্পতি মিশ্রের মত অনুসারে শাস্ত্রীয় ক্রিয়া কাণ্ড সম্পন্ন হইতেছে।

এতগুলি প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বে, মৈথিল ব্রাহ্মণের আগমন ও যজ্ঞ সম্পাদন বিষয়ক প্রমাণের নিমিত্ত তাম্রশাসনের প্রতি নির্ভর করিবার কোনও প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না এবং তাম্রফলকের বর্ত্তমান প্রতিলিপি কৃত্রিম কি অকৃত্রিম, সে বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াও নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ উক্ত তাম্রফলকের অস্তিত্ব লোপ হইবার কথা গবর্ণমেন্টের রিপোর্ট আলোচনায়ও জানা

* শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ অঃ, ৫৭ পৃষ্ঠা।

† শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, ৫ম অঃ, ৫৮ পৃষ্ঠা।

যাইতেছে। যে বস্তু পাইবার উপায় নাই, তাহার সমালোচনা হইতে পারে না। সুতরাং আমরা উক্ত তাম্রফলক সম্বন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশ করিতে অসমর্থ।

মহারাজ দানকুরু ফায়ের (আদি ধর্ম্ম পা) অধস্তন ১৭শ স্থানীয় মহারাজ ধর্ম্মধর (ছেংকাচাগ্) ত্রৈপুরী ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে কৈলাসহরের রাজপাটে বিরাজমান ছিলেন। আদি ধর্ম্ম পার ন্যায় ইঁহাকেও ব্রাহ্মণগণ "স্বধর্ম্ম পা" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কৈলাসহর বিভাগীয় আফিসের দুই ক্রোশ উত্তরে রাজবাড়ী ছিল এবং রাজধানীর বিস্তার কাতালের দীঘী পর্য্যন্ত থাকিবার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজবাড়ীর স্থান এখন জঙ্গলাকীর্ণ ; এই বাড়ী মনু নদীর তীরে অবস্থিত ছিল, বর্ত্তমান কালে নদীর গতি পরিবর্ত্তন হইয়া প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে। এই বাড়ীর দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিক, গভীর হ্রদের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল, এখন পর্ব্বত বিধৌত মৃত্তিকা দ্বারা উক্ত হ্রদ ভরাট হইয়া বিলে পরিণত হইয়াছে। রাজবাড়ীর দক্ষিণ প্রান্ত হইতে পশ্চিম মুখীন্ একটী প্রশস্ত রাজপথ, সুপ্রসিদ্ধ হাকালুকি হাওর পর্য্যন্ত প্রসারিত থাকিয়া অদ্যাপি অতীত সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে। উক্ত সড়কের দুই পার্শ্বে দুইটী মৃত্তিকা-স্তূপ বিদ্যমান আছে, সাধারণে তাহাকে "কামান দাগার জান" বলে। এই নামের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, পূর্ব্বে সেই উচ্চস্থান হইতে কামান দাগা হইত।

মহারাজ ধর্ম্মধর

মহারাজ ধর্ম্মধরের শাসনকালে নিধিপতি নামক জনৈক ব্রাহ্মণ, তাঁহার দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। নিধিপতির আদি নিবাস সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। কেহ কেহ বলেন, তিনি আমাদের পূর্ব্বকথিত মিথিলাগত বাৎস্য গোত্রীয় আনন্দের বংশধর এবং তাঁহার অধস্তন ১৬শ স্থানীয় ; এই মতই বিশেষ প্রচলিত। মতান্তরে, তাঁহাকে কান্যকুব্জাগত বলা হয়। এই মতের পোষক মজঃফর নামক জনৈক মুসলমান গ্রাম্যকবির রচিত একটী প্রাচীন কবিতা প্রচলিত আছে, তাহা এই ;---

নিধিপতির প্রভাব

"বাৎস্য গোত্র যজুর্ব্বেদ কান্বশাখা নিজ।
কনৌজ হইতে আসিলেক নিধিপতি দ্বিজ।।"*

এই কবিতার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া কেহ কেহ নিধিপতিকে কান্যকুব্জাগত বলেন। আবার কোন কোন ব্যক্তি, নিধিপতি মিথিলাগত আনন্দের সন্তান, একথা সত্য মনে করেন। তাঁহারা বলেন, আনন্দের বংশধরের মধ্যে কোনও এক মহাপুরুষ কনৌজে চলিয়া গিয়াছিলেন, কিয়ৎকাল পরে সেই মহাপুরুষের বংশ

* শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, ৫ম অঃ—৬১ পৃষ্ঠা।

নিধিপতি সে স্থান হইতে পুনরাগমন করেন। এজন্যই "কনৌজ হইতে আসিলেক নিধিপতি দ্বিজ" বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় নিধিপতি যে আনন্দের বংশধর, একথা সর্ব্ববাদী সম্মত বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

নিধিপতি শাস্ত্রজ্ঞ, সুপণ্ডিত এবং অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার উপদেশানুসারে মহারাজ ধর্ম্মধর পূর্ব্বপুরুষগণের আদর্শ অনুসারে এক বিপুল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। নিধিপতিই এই যজ্ঞের হোতারূপে বরিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত মুসলমান কবির কবিতায় নিধিপতির যজ্ঞ সম্পাদন সম্বন্ধীয় অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, যথা ;—

ধর্ম্মধরের যজ্ঞ

"অগ্নিহোত্রী মহাশয় নাম নিধিপতি।
মুখ দ্বারা অগ্নি আনি দিলেন আহুতি।।

এই যজ্ঞস্থান ও যজ্ঞকুণ্ডের নিদর্শন কৈলাসহরের জঙ্গলাকীর্ণ রাজবাড়ীতে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে ; আমরা তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যজ্ঞকুণ্ডের স্থানটী সাধারণের নিকট "হোমের গাত" নামে পরিচিত। এতৎ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

"অন্য একটী স্থানকে লোকে অদ্যাপি "হোমের গাত" বলে। একজন স্থানীয় মুসলমান জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল---'এই স্থানটীকে লোকে 'হোমের গাত' বলে ; কেন এরূপ বলে, আমরা জানি না'।

"এই স্থানটী দীর্ঘে এবং প্রস্থে ১৬ হাত করিয়া হইবে। গর্ত্তটী প্রায় ভরাট হইয়া গিয়াছে। তথাপি কোন কালে সেখানে যে একটা গর্ত্ত ছিল, প্রান্তভাগের উচ্চতা দেখিয়া তাহা অনুমিত হয়।"*

এই হোমকুণ্ডের অস্তিত্ব এবং 'হোমের গাত' নাম দ্বারা স্পষ্টতররূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, এই স্থানেই দ্বিজ নিধিপতি কর্ত্তৃক মহারাজ ধর্ম্মধরের যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়াছিল। মহারাজ, নিধিপতির অসাধারণ কৃতিত্ব দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে এক বৃহৎ ভূভাগ ব্রহ্মত্র স্বরূপ প্রদান করেন। এই ভূমিদান সম্বন্ধীয় তাম্রশাসনের প্রতিলিপি নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

ধর্ম্মধরের তাম্রশাসন

"ত্রিপুরা পর্ব্বতাধীশঃ শ্রীশ্রীযুক্ত স্বধর্ম্ম পাঃ।
সমাজ্ঞং দত্ত পত্রঞ্চ মৈথিলায় তপস্বিনে।। †

---

* শ্রীশ্রীযুতের কৈলাসহর পরিভ্রমণ পুস্তিকা—৩০-৩১ পৃষ্ঠা।

† 'মৈথিলায়' শব্দ দ্বারা নিধিপতি, মিথিলাগত আনন্দের বংশধর ছিলেন, একথা প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীনিধিপতি বিপ্রায় বাৎস্য গোত্রায় ধর্ম্মিণে।
প্রাচ্যাং লংলাই* কুকিস্থানং প্রতীচ্যাং গোপলা নদী †
চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরস্য দক্ষিণস্যামরণ্যকম্। ‡
ক্রোশিরানদ্যুত্তরস্যাং প্রাগদত্ত স্থানমেব হি। ¶
এতন্মধ্যা সশস্যা যা মনুকূল প্রদেশিনী। ††
স পি প্রদত্তা তস্মৈতৎ বৈদিকায় তপস্বিনে।।
শুক্ল পক্ষে তৃতীয়ায়াং দিনে মেষগতে রবৌ।
চতুঃষষ্ঠী শতাব্দেতু ত্রৈপুরে দত্ত পত্রিকা।।" * *

অনুবাদ

"ত্রিপুরা পর্ব্বতাধীশ্বর শ্রীশ্রীযুত স্বধর্ম্ম পা (পাল) বাৎস্য গোত্রজ, ধার্ম্মিক তপস্বী মৈথিল ব্রাহ্মণ শ্রীনিধিপতিকে নিম্ন চতুঃসীমাস্থিত স্থান দান করেন। পূর্ব্বদিকে লংলাই কুকিস্থান, পশ্চিমে গোপলা নদী, দক্ষিণ দিকে চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরার অরণ্য এবং উত্তরে ক্রোশিরা নদী ও পূর্ব্বদত্ত স্থান। এতন্মধ্যবর্ত্তী মনুকূলস্থ সশস্যা-ভূমি উক্ত বৈদিক তপস্বিকে ৬০৪ ত্রিপুরাব্দের বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়াতে দত্ত পত্রিকা দ্বারা দান করেন।"

পূর্ব্বোদ্ধৃত গবর্ণমেন্টের রিপোর্ট আলোচনায় জানা যায়, প্রথমোক্ত তাম্র-শাসনের ন্যায় এই তাম্র-ফলকের অস্তিত্বও বর্ত্তমানকালে নাই। তাহা না থাকিলেও যজ্ঞ সম্পাদন এবং ভূমিদান সম্বন্ধে অনেক অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান আছে, তাহা আলোচনা করিলে,

---

* লংলাই-কুকিগণের বাসভূমি ছিল বলিয়া, স্থানের নাম 'লংলা' হইয়াছে। শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাংলা পরগণা এবং এই স্থান অভিন্ন।

† গোপলা নদী সাঁতগাও ও সমসেরগঞ্জের নিকট দিয়া বরাক নদীতে মিলিত হইয়াছে।

‡ এই অরণ্য বর্ত্তমানকালে "কমলপুর" নামে অভিহিত হইতেছে।

¶ ক্রোশিরা নদী—কুশিয়ারা নদী, ইহা বরাকের অংশ বিশেষ।

†† বর্ত্তমান ইন্দ্রনগর, ইন্দেশ্বর, ছয়চিরি, ভানুগাছ, বরমচাল, চৌয়াল্লিশ, সাতগাও ও বালিশিরা, এই সকল পরগণা পূর্ব্বকালে মনুকুল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা এক বিস্তীর্ণ জনপদ।

* * "চতুঃষষ্ঠী শতাব্দ" শব্দ দ্বারা সাধারণতঃ ৬৪০০ অব্দ বুঝায়, এস্থলে তদ্রূপ অর্থ গ্রহণীয় নহে। "চতুঃ"—৪, ষষ্ঠী—৬০, চতুরাধিক ষষ্ঠী অর্থ ধরিয়া "অঙ্কস্য বামাগতিঃ" এই নিয়মানুসারে ৬০৪ অব্দ হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়, "চতুঃষষ্ঠ্যা" পাঠ গ্রহণ করিয়া, ১৬৪ অব্দ স্থির করিয়াছেন। এই পাঠ বৈদিক সংবাদিনীধৃত পাঠের সহিত ঐক্য হয় না এবং অন্য কারণেও এরূপ পাঠ বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না, সেই কারণ পরে বলা যাইবে।

সনন্দের অভাব জনিত অসুবিধা অনুভূত হইবে না। দুই একটী প্রমাণের কথা নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে ;—

(১) হোমকুণ্ডের অস্তিত্ব অদ্যাপি বিদ্যমান আছে এবং 'হোমের গাত' নামটী অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। শ্রীহট্ট অঞ্চলে সাধারণতঃ গর্ত্তকে 'গাত' বলে।

(২) যজ্ঞের হোতা নিধিপতির বংশধরগণ অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন এবং তাঁহারা নিধিপতির বাসস্থান ইটাতেই বাস করিতেছেন।*

(৩) নিধিপতির প্রযত্নে পঞ্চখণ্ড হইতে অনেক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার প্রাপ্ত ভূভাগে বাসস্থান স্থাপন করেন। তাঁহাদের বংশধর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন।

(৪) Assam District Gazetteerএ এই তাম্রশাসনের বিষয় আলোচিত হইয়াছে ; তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

"In 1195 A. D. a Brahman named Nidhipati, who was descended from one of the five original immigrants from Kanoj, received a grant of land in what is now known as the Ita pargona, from the Tippera king".

Assam Districts Gazetteers, Chap, II (Sylhet), Page 22.

মর্ম্ম ;—"১১৯৫ খৃষ্টাব্দে নিধিপতি নামে এক ব্রাহ্মণ ত্রিপুরার মহারাজা হইতে আধুনিক ইটা পরগণা দানস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই নিধিপতি কনৌজ হইতে প্রথম আগত পঞ্চব্রাহ্মণের একজনের বংশধর।"

৬০৪ ত্রিপুরাব্দে ১১৯৪ খৃষ্টাব্দ হয়, এস্থলে ১১৯৫ লিখিত হওয়ায় এক বৎসর পশ্চাদবর্ত্তী করা হইয়াছে। নিধিপতি মিথিলা হইতে আগত আনন্দের বংশধর, আনন্দ কনৌজ হইতে সমাগত নহেন, কিন্তু নিধিপতি কনৌজ হইতে সমাগত বলিয়া একটী মত প্রচলিত আছে; সে বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি।

সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণশ্রেণীর প্রতিপত্তি

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রণেতা বলেন,—"নিধিপতির প্রযত্নে পঞ্চখণ্ড হইতে বহুতর দশ গোত্রীয় প্রধান দ্বিজ সেই সময় ইটায় গিয়া বাস করেন, ইহাতে অচিরকাল মধ্যে ইটা সৌষ্ঠবশালী জনপদে পরিণত হয়। এই সময় হইতে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রতিপত্তি হয়। দেশের মধ্যে তাঁহারা গুণে, ধনে ও জনে সর্ব্বপ্রকারেই ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। নিধিপতি যে ভূভাগ দান প্রাপ্ত হন, তাহা এক সুবিস্তীর্ণ জমিদারী,

* 'ইটা' নাম নিধিপতির কৃত। এই নামকরণ সম্বন্ধে দুইটী মত প্রচলিত আছে। কেহ বলেন, নিধিপতির আদিম বাসস্থান 'ইটোয়ার' নামানুসারে এই স্থানের নাম 'ইটা' করা হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, উক্ত স্থান জঙ্গলাকীর্ণ থাকা সময়ে ব্রাহ্মণগণ বাসভবন নির্ম্মাণের নিমিত্ত দূর হইতে ইটা (ডেলা) ছুড়িয়া স্থান নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, এজন্য স্থানের নাম 'ইটা' হইয়াছে।

সুতরাং নিধিপতি হইতে ইটায় একটী ক্ষুদ্ররাজ্যের সূত্রপাত হয়। বলিতে গেলে ইটা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ। একজন বিদেশাগত ব্রাহ্মণ শুধু নিজ গুণগৌরবে, জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রভাবে, এইরূপ একটী হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন।”*

যজ্ঞ সম্পাদন ও ব্রাহ্মণ স্থাপন সম্বন্ধীয় এতদধিক প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন দেখিতেছি না।

এস্থলে একটী কথার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন আছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়, আনন্দ প্রভৃতি বিপ্রমণ্ডলীর ও নিধিপতির প্রাপ্ত সনন্দ আলোচনা উপলক্ষে বলিয়াছেন ;—

(১) ত্রিপুর অথবা ত্রিলোচন ত্রিপুরাব্দের প্রবর্ত্তক।

(২) ত্রিপুরের অধস্তন ৭ম স্থানীয় মহারাজ ধর্ম্মপাল এবং ৮ম স্থানীয় মহারাজ সুধর্ম্ম-পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞকর্ত্তা এবং তাঁহারাই পূর্ব্বকথিত দুইখণ্ড তাম্রশাসন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করিয়াছিলেন।

(৩) আদি ধর্ম্ম পা ও স্বধর্ম্ম পা উভয়ে এক যজ্ঞকুণ্ডেই যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

(৪) প্রথমোক্ত সনন্দের অব্দাঙ্ক “ত্রিপুরা চন্দ্রবাণাব্দে” স্থলে “ত্রিপুরা চন্দ্রবাণাজ্ঞে” হইলে উভয় সনন্দের পরস্পর সামঞ্জস্য থাকে, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় সনন্দের সম্পাদন কাল “চতুঃষষ্ঠাশতাব্দেতু” ধরিয়া ১৬৪ ত্রিপুরাব্দ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

আমরা সসম্ভ্রণে এই সকল কথার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলেন, ত্রিপুর অথবা ত্রিলোচন, ত্রিপুরাব্দের প্রবর্ত্তক। আমরা পাইতেছি, মহারাজ ত্রিপুর হস্তীনায় রাজসূয় যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন, তিনি যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক। সুতরাং তাঁহার প্রাচীনত্ব সার্দ্ধ চারিসহস্র বৎসরের অধিক নির্ণীত হইতেছে। এরূপ অবস্থায়, যে অব্দের চতুর্দ্দশ শতাব্দী মাত্র চলিতেছে, সেই অব্দ মহারাজ ত্রিপুর বা তৎপুত্র ত্রিলোচন দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। এতৎ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে। স্থানান্তরে ত্রিপুরাব্দের প্রবর্ত্তক নির্দ্ধারণ পক্ষে চেষ্টা করায়, এস্থলে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না।

বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মতে, ত্রিপুরের অধস্তন ৭ম স্থানীয় মহারাজ ধর্ম্মপাল ও ৮ম স্থানীয় মহারাজ সুধর্ম্ম পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞকর্ত্তা এবং তাঁহারাই পূর্ব্বকথিত দুইখানা তাম্রশাসন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। এই নির্দ্ধারণও ঠিক নহে। আমরা দেখিতেছি,

* শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—২য় ভাগ, ১ম অঃ, ৬৭ পৃঃ

† শ্রী শ্রীযুতের কৈলাসহর ভ্রমণ পুস্তিকা।

প্রথম সনন্দ (আদি ধর্ম্মপার প্রদত্ত সনন্দ) ৫১ ত্রিপুরাব্দে সম্পাদিত হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় সনন্দ (স্বধর্ম্মপার প্রদত্ত সনন্দ) ৬০৪ ত্রিপুরাব্দে প্রদান করা হইয়াছে। সুতরাং উভয় সনন্দ ৫৫৩ বৎসর অগ্রপশ্চাৎ সম্পাদিত হইবার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। মহারাজ ধর্ম্মপাল, মহারাজ সুধর্ম্মের পিতা। সুতরাং পিতা পুত্রের মধ্যে এত অধিককাল ব্যবধান ঘটিতে পারে না। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যে হিসাব ধরিয়াছেন, তদনুসারেও প্রথম সনন্দের বয়স (১৩৩৪ ত্রিপুরাব্দে) ১২৮৩ বৎসর ও দ্বিতীয় সনন্দের প্রাচীনত্ব ১১৭০ বৎসর নির্ণীত হয় ; এই হিসাবেও উভয় সনন্দের মধ্যে ১১৩ বৎসর ব্যবধান দেখা যাইতেছে। পিতা পুত্রের মধ্যে এরূপ ব্যবধানও স্বাভাবিক হইতে পারে না।

আর একটী বিষয় আলোচনা করিলেও বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নির্দ্ধারণ অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়। তাঁহার নির্দ্দেশ মতে, মহারাজ সুধর্ম্ম ফা (যিনি ত্রিপুরের অধস্তন ৮ম স্থানীয়) হইতে নিধিপতি ভূমিদান পাইয়াছিলেন। এই হিসাবে দেখা যাইবে, দানকর্ত্তা (সুধর্ম্ম ফা) বর্ত্তমান মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের ১৩০ পুরুষ ঊর্দ্ধে এবং দান প্রতিগ্রাহী নিধিপতির অধস্তন ২৩।২৪ পুরুষ চলিতেছে মাত্র।* সুতরাং পণ্ডিত মহাশয়ের নির্দ্ধারণ বিশুদ্ধ বলিয়া ধরিবার উপায় নাই। আমরা বর্ত্তমান মহারাজের পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৫শ স্থানীয় মহারাজ ধর্ম্মধর (ছেংকাছাগ্) কে নিধিপতির স্থাপয়িতা বলিয়া নির্দ্ধারণ করাই সঙ্গত মনে করি। নিধিপতির বংশীয় প্রত্যেক পুরুষের পূর্ণ বয়স অনুসারে ২৩।২৪ পুরুষ চলিয়াছে, আর ত্রিপুরেশ্বরগণের কেবল রাজত্বকাল ধরিয়া পুরুষ গণনা করা হয় এবং অনেকস্থলে পুরুষানুক্রম রক্ষা না পাওয়ায়, ভ্রাতাদি দ্বারাও রাজ্য শাসিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় দাতা ও গ্রহীতা উভয় বংশের পুরুষ সংখ্যার উপরি উক্তরূপ তারতম্য পরিলক্ষিত হওয়া অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।

উভয় যজ্ঞ এক যজ্ঞকুণ্ডে সম্পাদিত হইয়াছিল, এই অনুমানও সমীচীন নহে। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, প্রথম যজ্ঞ সম্পাদনের ৫৫৩ বৎসর পরে দ্বিতীয় যজ্ঞ হইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয়ের মতেও উভয় যজ্ঞ, পরস্পর ১১৩ বৎসর ব্যবধান সাব্যস্ত হইতেছে। এত দীর্ঘ সময় অতীতে পুরাতন যজ্ঞকুণ্ডে পুনর্ব্বার যজ্ঞ হওয়া সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ দুইটী যজ্ঞকুণ্ডের অস্তিত্ব (মঙ্গলপুরে ও কৈলাসহরে) অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। এরূপ স্থলে, এক হোমকুণ্ডে উভয় যজ্ঞ সমাধানের কল্পনা প্রমাদ মূলক বলিয়াই মনে হয়। সনন্দের যে শকাঙ্ক

* "নিধিপতি হইতে তদ্বংশে ২৩।২৪ পুরুষ চলিতেছে"
শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত,—২য় ভাঃ, ১ম খণ্ডঃ, ৬৫ পৃঃ

নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, তাহাও নির্ভুল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে না। অন্য প্রমাণের অভাবে বৈদিক-সংবাদিনীধৃত সনন্দের প্রতিলিপিই অবলম্বনীয় বলিয়া মনে করি।

এ স্থলে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা সেই যজ্ঞ, আদিধর্ম্মপার যজ্ঞের কিঞ্চিন্ন্যূন এক শতাব্দী পরে সম্পাদিত হইয়াছিল। এরূপ একটী বিখ্যাত ঘটনার সম্বন্ধেও নানা মুনির নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়।

আদিশূরের যজ্ঞ সম্বন্ধে মতভেদ

ক্ষিতীশবংশাবলীতে লিখিত আছে, মহারাজের গৃহছাদে গৃধ্র বসিয়াছিল, সেই দোষ প্রশমনার্থে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। দুর্গা-মঙ্গলের মতে, আদিশূর বাজপেয় যজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, যথা ;—

"গৌর নগরেতে রাজা নাম আদিশূর।
বাজপেয় যজ্ঞ হবে তার নিজ পুর।।"

উক্ত গ্রন্থেই আবার অন্যবিধ কথাও পাওয়া যায়, যথা ;—

"প্রজার সতত পীড়া লোক বলে ক্ষীণ।
দুর্ভিক্ষ হইল দেশে ভূমি শস্যহীন।।
বন্যায় ডুবিয়া যায় কতশত দেশ।
দ্রব্যের মহার্ঘ দেখি প্রজাদের ক্লেশ।।"

এই সকল আধিদৈবিক উপদ্রব নিবারণকল্পে যজ্ঞ করা হইয়াছিল। কুলজি গ্রন্থের মতে, আদিশূর পুত্রেষ্টিযজ্ঞের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন।

গৌড়ে ব্রাহ্মণাগমনের কাল নির্ণয় লইয়া যে কতজনে কত কথা বলিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ক্ষিতীশবংশাবলীর মতে, ব্রাহ্মণগণ ৯৯৯ শকে এদেশে আসিয়াছিলেন।* বাচস্পতি মিশ্রের মতে ৯৫৪ শকে, † কুলার্ণবের মতে ৬৫৪ শকে, ‡ বারেন্দ্র কুলপঞ্জি মতে ৬০৪ বা ৬৫৪ শকে, § ভট্টগ্রন্থ মতে ৯৯৪ শকে, †† গৌড়ে ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছিলেন। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস কায়স্থ কৌস্তুভ,

---

*"নব নবত্যধিক নবশতী শকাব্দে।
প্রাগুপকল্পিত বাসে নিবেশয়ামাস।

† "বেদ বাণাঙ্ক শাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ"।

‡ "বেদ বাণাহিমেশাকে।"

§ "বেদ কলঙ্কষট্‌ক বিমিতে" বা "বেদকালম্ব ষট্‌ক বিমিতে।"

†† "শক ব্যবধান কর অবধান ব্রাহ্মণ পশ্চাৎ যদা।
অঙ্কে অঙ্কে বামাগতি বেদমুক্তা তদা।।
কন্যাগত তুলাঙ্ক অঙ্কে গুরু পূর্ণদিশে।
সহর পহর ত্যজিয়ে গৌড়ে প্রবেশিকা এসে।।

দত্তবংশ মালা, গৌড়ে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি এক গ্রন্থের সহিত অন্যগ্রন্থের ঐকমত্য দৃষ্ট হয় না। গৌড়েশ্বরের ন্যায় প্রখ্যাতনামা রাজা, জনতাপূর্ণ বঙ্গভূমিতে যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধেই এরূপ মত বিরোধ দেখা যাইতেছে, এই অবস্থায় তাহারও প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে, আসামের ন্যায় নিভৃত জনপদে যে যজ্ঞ হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মতভেদ পরিলক্ষিত হওয়া বিচিত্র নহে। অতএব এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা করিবার প্রয়োজন দেখিতেছি না।

গৌড়ে ব্রাহ্মণ আগমনের কাল

উক্ত উভয় যজ্ঞস্থল এবং ব্রহ্মত্র ভূমি কালের কুটিল আবর্ত্তনে ত্রিপুরার কুক্ষিচ্যুত এবং শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। ত্রিপুরায় ব্রাহ্মণ সংস্থাপন জনিত কীর্ত্তি শীঘ্র বিলোপের আশঙ্কা না থাকিলেও যজ্ঞকুণ্ডের চিহ্নের সহিত যজ্ঞ সম্বন্ধীয় স্মৃতি অচিরকাল মধ্যেই বিলুপ্ত হইবে বলিয়া মনে হয়।

ত্রিপুর রাজপরিবারের ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধীয় আরও অনেক কথা বলিবার আছে। রাজমালার নানা অংশে এতদ্বিষয়ক বিস্তর বিবরণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে ; পরবর্ত্তী লহর সমূহে তাহা ক্রমশঃ পাওয়া যাইবে। এস্থলে প্রথম লহর সংসৃষ্ট আর একটী মাত্র বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এ বিষয়ে নিরস্ত হইব।

ত্রিপুরেশ্বরগণের মধ্যে অনেকে রাজ্যশাসন ও রাজধর্ম্ম পালন করিয়া অন্তিম কালে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতেন। ঘটনাবৈচিত্র্য নিবন্ধন রাজৈশ্বর্য্যের প্রতি বীতরাগ হইয়া, বার্দ্ধক্য আগমনের পূর্ব্বে প্রব্রজ্যা গ্রহণের দৃষ্টান্তও বিরল নহে।* রাজমালার প্রারম্ভেই পাওয়া যায়, মহারাজ দৈত্য বার্দ্ধক্যে পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, যোগ সাধনের নিমিত্ত অরণ্যবাসী হইয়াছিলেন। যথা ;—

রাজগণের বানপ্রস্থ অবলম্বন

"অনেক সহস্র বর্ষ রাজ্য করি ভোগ।
পুত্রে সমর্পিল রাজ্য মনে বাঞ্ছ, যোগ।।
বনে গিয়া যোগ সাধি রাজার মৃত্যু হইল।
তান পুত্র ত্রিপুর কিরাত পতি ছিল।"

দৈত্য খণ্ড,---৮ পৃঃ।

ত্রিপুরেশ্বরগণের বানপ্রস্থ অবলম্বনের দৃষ্টান্ত ইহাই প্রথম নহে। দৈত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের বিবরণ রাজমালায় সন্নিবিষ্ট হয় নাই। রাজরত্নাকর আলোচনায় জানা যায়, মহারাজ দৈত্যের উর্দ্ধতন অনেক রাজাই বার্দ্ধক্যে বনগমন করিয়া যোগ সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীরাজ, বীররাজ, সুধর্ম্মা এবং ধর্ম্মতরঃ প্রভৃতি রাজাগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

নরপতি শিক্ষরাজ পাচকের দুর্ব্বুদ্ধিতার দরুণ, অজ্ঞাতসারে নরমাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে যখন তিনি সেই বৃত্তান্ত অবগত হইলেন ; তখন—

* প্রব্রজ্যা সম্বন্ধীয় নিয়ম ও তাহার ফল অগ্নিপুরাণের ১৬০ অধ্যায়ে ও গরুড় পুরাণের ১০২ অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে বর্নিত হইয়াছে।

"কম্প হৈল নরপতি বৃত্তান্ত শুনিয়া।
পাপ কর্ম্ম কৈলা কেনে আমা ভয় পাইয়া।।
আর না করিব আমি রাজ্যের পালন।
যোগ সাধনেতে আমি চলি যাই বন।।
ভূপতি করিল পুত্র দেবরাজ নাম।
চলিল নৃপতি বনে নিজ মনস্কাম।।"

দৈত্য খণ্ড,—৪১ পৃঃ।

এই সকল বিবরণ ত্রিপুরেশ্বরদিগের ধর্ম্মভীরুতার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। ইহাঁরা ধর্ম্ম সংরক্ষণের নিমিত্ত আরও বহুবিধ কার্য্য করিয়াছেন, এস্থলে তাহার সম্যক আলোচনা করা অসম্ভব।

শিল্প চর্চ্চা

ত্রিপুররাজ্যে বর্ত্তমানকালে যে শিল্পকলার উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তাহার বীজ আধুনিক নহে। সর্ব্বাপেক্ষা বস্ত্রশিল্পের নিমিত্তই ত্রিপুরা বিশেষ প্রসিদ্ধ ও গৌরবান্বিত। আমরা দেখিতেছি, প্রথমতঃ রাজপ্রাসাদে এই শিল্পের সূত্রপাত হইয়াছিল, পরে রাজ্যময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

সুবড়াই রাজার অনেক প্রাচীন গল্প ত্রিপুররাজ্যে প্রচলিত আছে। সুবড়াই, মহারাজ ত্রিলোচনের নামান্তর। রাজমালায় মহাদেব বলিয়াছেন,—

"তিন চক্ষু হইবেক পুরুষ প্রধান।
আমার তনয় আমাহেন কর জ্ঞান।।
সুবড়াই রাজা বলি স্বদেশে বলিব।
বেদমার্গী সাধুজন ত্রিলোচন কহিব।।"

ত্রিপুর খণ্ড---পৃঃ ১৪-১৫।

এই সুবড়াই রাজা সম্বন্ধীয় গল্পের মধ্যে শিল্পোন্নতি বিষয়ক একটী উপাখ্যান শ্রদ্ধাস্পদ কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত "রিয়া" নামক পুস্তিকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমরা তাহার সার মর্ম্ম এস্থলে প্রদান করিতেছি।

সুবড়াই নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি ত্রিপুরার শিল্প সম্বন্ধে বিস্তর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন এবং কার্পাস বপনের প্রথা তিনিই সর্ব্বপ্রথম ত্রিপুরায় প্রবর্ত্তন করিয়াছেন ; এখনও সাধারণের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল রহিয়াছে। ত্রিপুরাবাসিগণ

অদ্যাপি গর্ব্বের সহিত বলিয়া থাকে—“নূতন শিল্পশিক্ষার কোনও প্রয়োজন নাই ; কারণ, যে শিল্প সুবড়াই রাজা শিক্ষা দেন নাই, সেই শিল্প শিল্পমধ্যেই পরিগণিত নহে।” এই একটী কথায় স্পষ্টতররূপে বুঝা যাইতেছে, সুবড়াই রাজা সকল প্রকারের শিল্পই রাজ্যমধ্যে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে প্রবর্ত্তিত হয় নাই, এমন উল্লেখযোগ্য নূতন কোনও শিক্ষণীয় শিল্পকার্য্য ছিল না।

রাজা সুবড়াই রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিলেন যে, যে ত্রিপুর-রমণী শিল্পকলার উৎকৃষ্ট আদর্শ দেখাইতে সমর্থা হইবে, তাহাকে তিনি বিবাহ করিবেন। এই উৎসাহজনক ঘোষণার ফলে নিত্য-নূতন শিল্প প্রণালী উদ্ভাবিত হইতে লাগিল, এবং শিল্প নিপুণা মহিলাগণ রাজমহিষীর সুদুর্ল্লভ আসন লাভ করিতে লাগিলেন। একদা একটী যুবতী সুচারু কারুকার্য্যখচিত একখানা ‘রিয়া’ (কাঁচলি) রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। মাছির পাখায় সূর্য্যরশ্মি পতিত হইলে যে রঙ্ উদ্ভাসিত হয়, রিয়াখানা তাহার অনুকরণে বয়ন করা হইয়াছিল। মহারাজ শিল্প-সৌন্দর্য্য দর্শনে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তিনি যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“মাছি অধিক কাল একস্থানে স্থির থাকে না, এরূপ অবস্থায় তুমি কি প্রকারে তাহার অনুকরণ করিলে?” যুবতী বলিলেন,—“আমাদের বাড়ীর একটী স্থানে সর্ব্বদা মাছি বসিয়া থাকে তাহা দেখিয়া অনুকরণ করিবার সুযোগ পাইয়াছি, এবং মহারাজের প্রাত্যর্থে, তদবলম্বনে এই বস্ত্রবয়ন করিয়াছি।” এই কথা শ্রবণে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, সেই স্থানটী দেখিবার নিমিত্ত রাজা যুবতীর বাড়ীতে গেলেন। দেখিলেন, একটী স্থানে সর্ব্বদাই অসংখ্য মাছি বসিয়া থাকে, তাড়াইলেও যায় না, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আসিয়া বসে। মহারাজ ইহার কারণ স্থির করিতে না পারিয়া সেইস্থানের মৃত্তিকা খনন করাইয়া দেখিলেন, একটী মৃত সর্প প্রোথিত রহিয়াছে। মহারাজের বড়ই আদরের একটী সর্প ছিল, সে সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। অনুসন্ধানে জানা গেল, যুবতীর পিতা সেই সর্পটীকে বধ করিয়া উক্ত স্থানে প্রোথিত করিয়াছে। এই ঘটনা দর্শনে মহারাজ দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—“এই সর্প স্বর্গের গন্ধর্ব্ব, কোন কারণে শাপগ্রস্ত হইয়া সর্পরূপে আমার আশ্রয় লইয়াছিল। সর্পের সহিত আমার কথা ছিল, আমাকে প্রতিদিন এক একটী নূতন শিল্পকার্য্য শিখাইবে এবং আমার রাজ্যের মধ্যে তাহা প্রকাশ করিব। এই উপায়ে এক বৎসরের মধ্যে ক্রমান্বয় ৩৬০টী শিল্পাদর্শ আমার প্রজাগণ শিক্ষা করিবে, এবং আমি ৩৬০টী বিবাহ করিব। তন্মধ্যে মাত্র ২৪০টী আদর্শ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি এবং আমি শিক্ষানিপুণা ২৪০টী রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছি। সর্প যখন স্বর্গগামী হইয়াছে, তখন আর নূতন শিল্পাদর্শ পাইবার আশা নাই, সুতরাং এখন আমার রাজত্ব করা বৃথা। আমি চলিলাম, তোমরা তোমাদের অদৃষ্ট লইয়া থাক।” এই কথা বলিয়া মহারাজ অন্তর্দ্ধান হইলেন।

যে স্থানে সর্পটী প্রোথিত হইয়াছিল, তথায় 'খুমপুই' (Lily of the Valley) নামক ফুলের গাছ জন্মিয়া, ফুটন্ত পুষ্পের সৌরভ বিস্তার করিতে লাগিল।

ইহা Mythological যুগের গল্প হইলেও, এই উপাখ্যান হইতে আমরা পাইতেছি যে, মহারাজ ত্রিলোচন (সুবড়াই) রাজ্যমধ্যে শিল্পকলা প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের নিকট তিনি রাজত্বকেও তুচ্ছজ্ঞান করিতেন। এবং যে রমণী শিল্পনিপুণা হইতেন, তাঁহাকে রাজমহিষীর সুদুর্ল্লভ আসন প্রদান দ্বারা তাঁহার রমণীজীবন ধন্য করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত ছিলেন না।

রাজ অন্তঃপুরে শিল্প চর্চ্চা

ইহার পরেও আমরা দেখিতে পাই, রাজ অন্তঃপুরেই শিল্পের প্রথম উন্নতির বীজ উপ্ত হইয়াছিল। এস্থলে ত্রিপুর সিংহাসনের ১৪১ সংখ্যক ভূপতি রাজসূর্য্যের (নামান্তর আচঙ্গ ফা বা কুঞ্জহোম্ ফা) মহিষীর নাম উল্লেখযোগ্য। যথা ;—

"আচঙ্গ ফা ওরফেতে কুঞ্জাহোম্‌ফা নাম।
বলবীর্য্য পরাক্রমে পিতৃ-গুণধাম।।
বিবাহ করিয়াছিল জয়ন্তা রাজকুমারী।
বিদ্যা বুদ্ধিবতী ছিল যেমত শাশুড়ী।।
স্ত্রী-আচার শিল্পকার্য্য যাবতীয় ছিল।
ত্রিপুর রাজ পরিবারে সব শিক্ষা দিল।।

ত্রিপুর বংশাবলী।

পরলোকগত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ও ঠিক ইহাই বলিয়াছেন ;—

"মহারাজ ছেংথুম্ ফা পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র আচঙ্গ ফা সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি মাতৃগুণ লাভ না করিয়া পিতৃগুণ লাভ করিয়াছিলেন।* কিন্তু তাঁহার পত্নী স্বীয় শ্বশ্রুর ন্যায় তেজস্বিনী, বিদ্যাবতী এবং গুণসম্পন্না ছিলেন। তাঁহার উৎসাহে ত্রিপুরাতে শিল্পকার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।"

কৈলাসবাবুর রাজমালা—২য় ভাঃ, ২য় অঃ, ২৭ পৃঃ।

এই আচঙ্গ ফাএর পুত্র ১৪২ সংখ্যক ভূপতি মহারাজ মোহনের (নামান্তর খিচোঙ্গ ফা) মহিষী কর্ত্তৃক শিল্পকলা অধিকতর পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। এতৎ সম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে,—

"তার পুত্র খিচোঙ্গ রাজা হইল আপন।।
খিচোঙ্গমা নামে ছিল তাহার রমণী।
বিচিত্র বসন শিক্ষা নির্ম্ময় আপনি।।"

* ইঁহার মাতা স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়া, বঙ্গেশ্বরকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ছেংথুম্ ফা খণ্ডে এতদ্বিবরণ দ্রষ্টব্য। অতঃপর সৈনিক বিভাগ সম্বন্ধীয় বিবরণেও এ বিষয়ের উল্লেখ করা হইবে।

এইভাবে রাজা এবং রাজ পরিবারের প্রযত্নে প্রাচীনকাল হইতে ত্রিপুর রাজ্যে বয়নশিল্পের প্রচলন ও উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়াছিল। এই যত্ন ও চেষ্টার ফল ত্রিপুরাবাসিগণ অদ্যাপি ভোগ করিয়া আসিতেছে।

অরণ্যবাসীগণের মধ্যে শিল্পচর্চা

সভ্য সমাজের কথা ত স্বতন্ত্র, গভীর অরণ্যবাসী কুকি ও ত্রিপুরা প্রভৃতি পার্ব্বত্য সমাজে প্রত্যেকের গৃহেই দুই চারিখানা তাঁত চলিতেছে ; বৃদ্ধা হইতে বালিকা পর্য্যন্ত, সকলেই বয়নকার্য্যে সিদ্ধহস্তা। তাহাদের সমাজে অন্যান্য গৃহকার্য্যের ন্যায় বয়ন কার্য্যও অবশ্য শিক্ষণীয় মধ্যে পরিগণিত। বয়ন কার্য্যে অসমর্থা রমণী পার্ব্বত্য পল্লীতে আছে বলিয়া আমরা জানি না। ত্রিপুরার উপনিবেশী মণিপুরী সমাজেও এই শিল্পের প্রচলন খুব বেশী দেখা যায়। ত্রিপুরায় বয়ন শিল্পের প্রচলনাধিক্য একটী মাত্র কথা দ্বারা বুঝান যাইতে পারে। ১৯২০ খ্রীঃ অব্দের আদম সুমারীতে ত্রিপুর রাজ্যে, পার্ব্বত্যপল্লীস্থিত গৃহস্থ বা খানার সংখ্যা ৩৪,৮৫৬ নির্ণীত হইয়াছে। এই সকল গৃহে তাঁতের সংখ্যা ৩১,৪৮৫। সমগ্র ভারতের সভ্যসমাজে চরকা ও তাঁত প্রচলনের নিমিত্ত অনেকে প্রাণ পাত করিয়াও আশানুরূপ ফল লাভ করিতে সমর্থ হইতেছেন না, ত্রিপুরার নিভৃত গিরিকুঞ্জস্থ নগ্ন সমাজে স্মরণাতীত কাল হইতে তাহার প্রচলন চলিয়া আসিতেছি ; ইহা ত্রিপুরার সামান্য গৌরবের কথা নহে। রাজপরিবার ও ঠাকুর পরিবারের মধ্যে এই শিল্প চরম সীমায় উন্নীত হইয়াছে।

কাঁচলির শিল্প নৈপুণ্য

সর্ব্বাপেক্ষা কাঁচলি* বয়ন কার্য্যেই অধিকতর শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থানীয় ভাষায় ইহাকে "রিয়া" বলে। এক কালে সমগ্র ভারতে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে রমণীগণের বক্ষ আবরণের নিমিত্ত কাঁচলি ব্যবহৃত হইত, এবং তাহা নানাবিধ উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যখচিত ছিল। সেমিজ, জ্যাকেট আসিয়া সমাজের বক্ষে বিজয় বৈজয়ন্তী প্রোথিত করিবার অনেক পূর্ব্বেই বাঙ্গালী সমাজ হইতে কাঁচলি বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, এখন প্রাচীন সাহিত্যে তাহার স্মৃতিচিহ্ন মাত্র পাওয়া যায় ; কিছুকাল পরে হয়ত তাহাও থাকিবে না। ত্রিপুরায় অদ্যাপি কাঁচলির প্রচলন আছে, কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, সভ্যসমাজে তাহার আদর ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে।

ত্রিপুর রাজ্যে কাঁচলির আদর

ইহা সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় রিয়ার কি রকম সম্মান আছে, এবং তাহা যে প্রকৃতই আদর ও সম্মানের বস্তু, কর্ণেল মহাশয়ের লিখা হইতে আমরা এস্থলে তদ্বিষয়ক কয়েকটী প্রমাণ প্রদর্শন করিব।

* সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে কাঁচলির উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কৃত "আনন্দলহরীর" ৬৬ ও ৭৫ শ্লোকে কাঁচলির নাম আছে। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে কাঁচলির বর্ণনার অভাব নাই।

বস্ত্রবয়নরতা কুকি বালিকাদ্বয়

(১) ত্রিপুরার প্রত্যেক পরিবারে রিয়ার (কাঁচলির) এক একটী আদর্শ বংশ পরম্পরা প্রচলিত আছে। বিবাহকালে শাশুড়ী, পুত্রবধূকে সেই আদর্শের রিয়া উপহার প্রদান করিবার প্রথা অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে।

(২) কোন মহিলার মৃত্যু হইলে, তাহার ব্যবহৃত রিয়া আসনে রাখিয়া শ্রাদ্ধান্ন উৎসর্গ করিবার প্রথা এখনও বিদ্যমান আছে।

(৩) নববর্ষে ত্রিপুরাজাতীয় ওঝাই কর্ত্তৃক 'গরাই' অর্থাৎ গৌরীর অর্চ্চনা হয়। এই অর্চ্চনা State ভাবে, সিংহাসনের সম্মুখে হইয়া থাকে। এতদুপলেক্ষ মহারাজার ব্যবহৃত দর্পণ এবং মহারাণীর ব্যবহৃত রিয়ার, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে পূজা করা হয়। ইহা রাজভক্তির এক অতুল দৃষ্টান্ত। যে দর্পণ রাজার প্রতিকৃতি বক্ষে ধারণ করে, এবং যে রিয়া মাই দেবতার (মাতৃদেবী অর্থাৎ মহারাণীর) বক্ষ আবরক, সন্তানতুল্য প্রজার পক্ষে তাহা পূজনীয় বস্তু বই কি? অন্য কোন দেশে রাজভক্তি জ্ঞাপনের এমন সুন্দর আদর্শ আছে কিনা, জানি না।

(৪) রাজবাড়ীতে শুভকার্য্য উপলক্ষে এবং মহারাজার যাত্রাকালে, ত্রিপুরাগণ দ্বারা "লাম্প্রা" পূজা হইয়া থাকে, ইহা "বিনাইগর" দেবতার পূজা। বিনাইগর, বিনায়ক (গণেশ) শব্দের অপভ্রংশ। এই পূজায় ঈশ্বরীর (মহারাণীর) রিয়া দেওয়া হয়।

(৫) মহারাণীগণ অথবা বিশিষ্ট পরিবারের মহিলাগণ যাহাকে সম্মান বা স্নেহ করেন, অনেক সময় তাহাকে সম্মান কিম্বা স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ রিয়া শিরোপা বা উপহার প্রদান করিয়া থাকেন। এরূপ উপহার সম্বন্ধীয় দুই একটী কথা এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক।

ত্রিপুররাজ্যের ভূতপূর্ব্ব সহকারী মন্ত্রী, প্রখ্যাতনামা স্বর্গীয় ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় একখানা রিয়া পাগড়ীরূপে ব্যবহার করিতেন এবং বড়লাটের দরবারেও সেই পাগড়ী লইয়া যাইতেন, একদিন সান্ধ্য সম্মিলনীতে, লেডি ডফ্‌রিণ সেই পাগড়ী দেখিয়া বিস্তর প্রশংসা করিয়া, ইহা কোথায় পাওয়া যায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তখন শম্ভু বাবু ত্রিপুরার নামোল্লেখ করেন।

ইহার কিয়ৎকাল পরে, ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারী বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার Mr. C. W. MCminn. I. C. S. বিলাত হইতে একখানা পুরাতন কাগজ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। তাহা ত্রিপুরার বৃটীশ রেসিডেন্ট Mr. Ralph Leake সাহেবের ১৭৮৩ খৃঃ অব্দের ১১ই মার্চ্চ তারিখের লিখিত রিপোর্ট। তৎসঙ্গে The then reigning Queen ত্রিপুরেশ্বরী মহারাণী জাহ্নবীদেবীর বিবরণ এবং তাহার সহিত ceremonial বিদায় সম্বন্ধীয় রিপোর্ট ছিল। তিনি মহারাণী হইতে প্রাপ্ত শিরোপা সম্বন্ধীয় বিবরণে রিয়ার নামোল্লেখ করিয়াছেন। লিক্ সাহেব

তল্লব্ধ রিয়ার কারুকার্য্যের যথার্থ মূল্য বুঝিয়াছিলেন। তাই তাহা নিজে না রাখিয়া, বৃটীশ মিউজিয়মের শিল্প সংগ্রহ বিভাগে প্রদান করিয়াছেন।

স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের শাসনকালে, তাঁহার A.D.C. কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় স্বর্গীয়া মহারাণী তুলসীবতী মহাদেবী হইতে, পোষাকের সহিত ব্যবহারের নিমিত্ত রিয়ার আদর্শে বয়িত একখানা sash পাইয়াছিলেন। লর্ড কার্জ্জন (Lord Curzon) ভারতের রাজপ্রতিনিধি পদে নিযুক্ত থাকা কালে, সেই sash লইয়া কর্ণেল মহাশয় স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুরের অনুচররূপে বড়লাটের দরবারে গমন করেন। তখন বড়লাট বাহাদুরের সেই sash বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “ইহা কোন দেশে প্রস্তুত হয়?” তাহা ত্রিপুরায় বয়ন করা হয় শুনিয়া, তিনি তদ্দেশীয়গণের শিল্পনৈপুণ্যের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন।

স্থূলকথা, বারাণসীধামের উৎকৃষ্ঠ কিংখাপ অপেক্ষাও ত্রিপুররাজ্যের অনেক রিয়া ঊর্দ্ধেস্থান পাইবার যোগ্য। আনন্দের বিষয় এই যে, সেই সকল উৎকৃষ্ট রিয়া রাজপরিবার এবং ঠাকুর পরিবারের মহিলাগণই বয়ন করিয়া থাকেন। এই উচ্চ আদর্শের শিল্প যাহাতে জীবিত থাকে, সাধারণের তৎপক্ষে বিশেষ যত্নবান হওয়া সঙ্গত এবং কর্ত্তব্য।

বয়ন শিল্প ব্যতীত চিত্রশিল্প, তক্ষশিল্প, এবং কাষ্ঠ, বাঁশ, বেত ইত্যাদি দ্বারা রচিত শিল্পের নিমিত্তও ত্রিপুররাজ্য প্রসিদ্ধ। এই সকল শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নতিকল্পে যত্নবান হওয়া একান্ত সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। রাজসরকারের সাহায্য ও চেষ্টা ব্যতীত এ সকল শিল্প রক্ষা পাওয়া ও উন্নত হওয়া অসম্ভব।

উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন পদ্ধতি

বঙ্গদেশে উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন ও তাহাদের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ বিষয়ে দায়ভাগই একমাত্র অবলম্বনীয়। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র গ্রথে এতদ্বিষয়ক বিভিন্ন ব্যবস্থা থাকিলেও তৎসমুদয় আলোচনা করিয়া দায়ভাগ প্রণেতা যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, এতদ্দেশে তাহাই সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এস্থলে একটি কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। মনু বলিয়াছেন ;---

দায়ভাগের বিধান বিষয়ক কথা

"জ্যেষ্ঠ এবতু গৃহ্নীয়াৎ পিত্র্যং ধনমশেষতঃ।

শেষাস্তমুপজীবেয়ুর্য্যথৈব পিতরং তথা।।"

মর্ম্ম ;—পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠই সর্ব্বধনাধিকারী হইবে, অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ পিতৃবৎ সেই জ্যেষ্ঠের অনুজীবী হইবে।

এবম্বিধ স্পষ্ট ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও 'জ্যেষ্ঠ' শব্দের দায়ভাগের ব্যাখ্যানুসারে সকল ভ্রাতাই পৈতিক সম্পত্তিতে সমান অধিকার লাভ করিয়াছে। পুত্র ও পৌত্রাদির অভাবে দৌহিত্র এবং ভাগিনেয় প্রভৃতিও সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকারের দায়াদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে তাহা সম্যক আলোচনা করা অসম্ভব।

ত্রিপুর রাজ্যে প্রকৃতি পুঞ্জের মধ্যে একমাত্র দায়ভাগের ব্যবস্থানুসারেই উত্তরাধিকারী নির্ণীত হইয়া থাকে। কিন্তু রাজ্যের অধিকারী নির্ব্বাচন সম্বন্ধে দায়ভাগের বিধান সম্যক প্রযোজন্য নহে; কারণ, রাজত্ব অবিভার্য্য এবং তাহার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন কৌলিক প্রাচীন প্রথার উপর নির্ভর করে। বিশেষতঃ উক্ত প্রথানুসারে ভিন্নবংশীয় ব্যক্তির (দৌহিত্র প্রভৃতির) রাজ্যের উপর দাবি বর্ত্তাইবার অধিকার কোন কালেই ছিল না, বর্ত্তমান কালেও নাই।

ত্রিপুর রাজ্য ও দায়ভাগ

প্রাচীনকালে (রাজমালা প্রথম লহরের অন্তর্ভুক্ত সময়ে) রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যাধিকারী ছিলেন; জ্যেষ্ঠের অভাবে তৎপরবর্ত্তী পুত্র সিংহাসন লাভ করিতেন। রাজার পুত্র না থাকিলে ভ্রাতার দাবি অগ্রগণ্য হইত। ক্বচিৎ ইহার ব্যত্যয় ঘটিয়া থাকিলেও তাহা কৌলিক প্রথান নহে। কিন্তু রাজা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে প্রকৃতি পুঞ্জের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, এবং সেই অমোঘ ক্ষমতার নিকট অনেকস্থলে

কৌলিক প্রথা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এ বিষয় পূর্ব্বভাষে আলোচিত হওয়ায়, এস্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল না।

পৈতৃকধনের বিভাগ প্রণালী।

সেকালের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যাধিকারী হইলেও রাজকোষের পৈতৃক অর্থের উপর সকল পুত্রেরই অধিকার ছিল। নবীন ভূপতি সেই ধনের দুই ভাগ এবং অপর ভ্রাতাগণ এক এক ভাগ পাইতেন। মহারাজ ত্রিলোচনের সঞ্চিত অর্থরাশি তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে এই নিয়মে বিভক্ত হইয়াছিল।*

রাজ্যাভিষেক পদ্ধতি

চন্দ্র বংশীয়গণের চির প্রথানুসারে ত্রিপুরেশ্বরগণ রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্ব দিবস অধিবাস, সংযম ও ভূমি শয্যায় শয়ন করেন। রাজার দুইটী নাম লক্ষ্য করিয়া দীপাধারে দুইটী দীপ জ্বালান হয়। যে নামের দীপ অধিকতর উজ্জ্বল হয়, সেই নাম গ্রহণ পূর্ব্বক ভূপতি অভিষেক দিনে প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পাদন করেন। স্থাপিত নব ঘটে গণেশ, বিষ্ণু, শিব, পার্ব্বতী এবং ইন্দ্রের অর্চ্চনার পর, হোম সমাপনান্তে সিংহাসনের অর্চ্চনা করা হয়। এতদ্ব্যতীত অভিষেক উপলক্ষে এবং প্রত্যেক শুভ কার্য্যেই বংশের আদি পুরুষ চন্দ্রের অর্চ্চনা হইয়া থাকে। †

---

* দাক্ষিণ খণ্ড ৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† এই সকল কার্য্য ঠিক শাস্ত্র সঙ্গতরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। মহর্ষি নারদের প্রশ্নোত্তরে পিতামহ ব্রহ্মা রাজ্যাভিষেক পদ্ধতি সম্বন্ধীয় যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল;—

"শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি ত্বয়া যৎ পৃচ্ছ্যতেহধুনা।
অত্র যদ্ যদ্ বিধানং তদুচ্যতে সাম্প্রতং ত্বয়ি।।
কৃত্বা পুর্ব্বদিনে ভুমিশয্যাধিবাস সংযমান্।
আধারে জ্বালয়িত্বাতু দীপৌ নাম দ্বিধা লিখেৎ।।
তত্র প্রজ্বলিতং যৎস্যান্নাম্না তেন পরে দিনে।
প্রাতর্বৃদ্ধ্যাদিকং কৃত্বা বিধিবদ্ধাতু নির্ম্মিতান্।।
স্থাপয়িত্বা নব ঘটান্ গণেশাদীন্ প্রপূজয়েৎ।
শক্তিযুক্তং মহেশানং বিষ্ণুং শক্রং তথার্চ্চয়েৎ।।" ইত্যাদি

অতঃপর ভূপতি, পর্ব্বতশিখরস্থ মৃত্তিকা দ্বারা মস্তক, বাল্মীকাগ্রস্থ মৃত্তিকা দ্বারা কর্ণদ্বয়, মনুষ্যালয়ের মৃত্তিকা দ্বারা বদন, ইন্দ্রালয়ের মৃত্তিকা দ্বারা গ্রীবা, নৃপালয়ের মৃত্তিকা দ্বারা হৃদয়, হস্তীদন্তোদ্ধৃত মৃত্তিকা দ্বারা দক্ষিণভূজ, বৃষশৃঙ্গোদ্ধৃত মৃত্তিকা দ্বারা বাম ভুজ, সরোবরের মৃত্তিকা দ্বারা পৃষ্ঠদেশ, বেশ্যাদ্বারের মৃত্তিকা দ্বারা কটিদেশ, যজ্ঞস্থানের মৃত্তিকাদ্বারা উরুদ্বয়, গো-শালার মৃত্তিকা দ্বারা জানুদ্বয়, অশ্বশালার মৃত্তিকা দ্বারা জঙ্ঘাদ্বয়, এবং রথচক্রোত্থিত মৃত্তিকা দ্বারা চরণদ্বয় মার্জ্জন ও শৌচ করিয়া, পঞ্চগব্য দ্বারা মস্তক সিক্ত করেন। তৎপর ঘৃতপূর্ণ স্বর্ণকুম্ভ লইয়া ব্রাহ্মণ পূর্ব্বদিক হইতে, দুগ্ধপূর্ণ রৌপ্য-ঘট লইয়া ক্ষত্রিয় দক্ষিণ দিক হইতে, দধিপূর্ণ তাম্রকুম্ভ লইয়া বৈশ্য উত্তর দিক হইতে এবং জল পূর্ণ মৃন্ময় ঘড়া লইয়া শূদ্র পশ্চিম দিক্ হইতে ঘৃত, দগ্ধ দধি ও বারিদ্বারা রাজাকে অভিষিক্ত করেন।* অতঃপর রাজা গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি সপ্ততীর্থের বারিদ্বারা স্নাত হইয়া নবোপবীত ও রাজপরিচ্ছদ ধারণপূর্বক সপ্তবার সিংহাসন প্রদক্ষিণ করিয়া তদুপরি উপবেশন করেন। তদনন্তর ব্রাহ্মণগণ ঋত্বিক ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক স্বণঘটস্থিত শান্তিবারি সিঞ্চন দ্বারা অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন।

অভিষেক প্রণালী

অভিষেককালে রাজার মস্তকে শ্বেতছত্র ধারণ করা হয়। হনুমানধ্বজ, দণ্ড, চন্দ্রবান্, ত্রিশূলবাণ, ছত্র, আরঙ্গী, মীন-মানব, তাম্বুলপত্র (পান) হস্তচিহ্ন (পাঞ্জা), শ্বেত-চামর ও ময়ূরপুচ্ছ ইত্যাদি ধারণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট বংশসম্ভূত ব্যক্তিগণ সিংহাসনের দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকে এবং সিংহাসনের পুরোভাবে ষট্ত্রিংশৎ শালগ্রাম-চক্র স্থাপন করা হয়। এই সময় রাজা ও রাণীর নামাঙ্কিত সুবর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

রাজচিহ্ন ধারণ ও মুদ্রা প্রস্তুত

---

* এতদ্বিষয়ক শাস্ত্রোক্ত বিধান এই;—

পর্ব্বতাগ্র মৃদাতাবন্মূর্দ্ধানং শোধয়েন্নৃপ।।
বল্মীকাগ্র মৃদাকর্ণৌ বদনং কেশবালয়াৎ।
ইন্দ্রালয় মৃদাগ্রীবাং হৃদয়ন্তু নৃপাজিরাৎ।।
করিদন্তোদ্ধৃত মৃদাদক্ষিণন্তু তথা ভুজম্।
বৃষ শৃঙ্গোদ্ভব মৃদা বামং চৈব তথা ভুজম্।।
সরো মৃদা তথা পৃষ্ঠ মুদরং সঙ্গমান্মৃদা।
নদীতটদ্বয় মৃদা পার্শ্বে সংশোধয়েৎ তথা।।
বেশ্যাদ্বার মৃদারাজ্ঞঃ কটিশৌচং তথা ভবেৎ।
যজ্ঞস্থানাত্তথৈবোরূ গোষ্ঠানাজ্জানুনী তথা।।

পীঠদেবী

শাস্ত্রোক্ত মহাপাঠের বিবরণ হিন্দু সমাজের অবিদিত নহে। বর্ত্তমান কালে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যেও অনেকেই তদ্বিবরণ অবগত আছেন। দক্ষপ্রজাপতির শিবহীন যজ্ঞানুষ্ঠান পীঠ-প্রতিষ্ঠার মূলীভূত কারণ। এই কারণ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। শ্রীমদ্ভাবগত, বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ, নারদ পঞ্চরাত্র, মহাভাগবত পুরাণ, কালিকা পুরাণ ও শিব পুরাণ প্রভৃতি বিবিধ পুরাণ ও তন্ত্রে অল্পাধিক পরিমাণে দক্ষযজ্ঞের উল্লেখ পাওয়া যায়। কোন কোন গ্রন্থের মতে, ভৃগুযজ্ঞে সমবেত দেব সভায় মহেশ্বর, দক্ষ প্রজাপতিকে অভিবাদন না করায়, দক্ষ কুপিত হইয়া, জামাতাকে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।* কোন কোন গ্রন্থের মতে, কপালী ও ভিখারী শঙ্করকে অভিমানী দক্ষ চিরকাল ঘৃণাদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেন, সেই ঘৃণাজনিত বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া শিবহীন যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। † আবার কোন কোন গ্রন্থের মতে, শিব কর্ত্তৃক অত্যাচারিত হইবার আশঙ্কা নিবারণকল্পে প্রজাপতি এই যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন। ‡ যে কারণেই হউক, দক্ষ বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। এই যজ্ঞে শিব ব্যতীত ত্রিভুবনের সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হইল। দাক্ষায়ণী যজ্ঞ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পিতৃভবনে গমনের নিমিত্ত ব্যাকুলভাবে শঙ্করের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সদাশিব এই গ্লানিকর প্রস্তাবে প্রথমতঃ অসম্মত হইয়া থাকিলেও গৌরীর ঐকান্তিক

পীঠ প্রতিষ্ঠার মূলসূত্র

অশ্বস্থানাত্তথা জঙ্ঘে রথচক্র মৃদাঙিঘ্রকে।
মূর্দ্ধানং পঞ্চগব্যেন ভদ্রাসন গতং নৃপং।।
অভিষিঞ্চেদমাত্যানাং চতুষ্টয়মথো ঘটৈঃ।
পূর্ব্বতো হেমকুম্ভেন ঘৃতপূর্ণেন ব্রাহ্মণঃ।
রৌপ্য কুম্ভেন যাম্যেচ ক্ষীর পূর্ণেন ভূমিপঃ।
দধ্নাচ তাম্রকুম্ভেন বৈশ্যঃ পশ্চিমগনে চ।।
মৃণ্ময়েন জলেনোদক শূদ্রশ্চাপ্যভিষেচয়েৎ।
ততোহভিষেকং নৃপতের্ব্বহ্বৃ চ প্রবরো দ্বিজঃ।।" ইত্যাদি।

অগ্নিপুরাণ—২১৮ অঃ ১২-১০ শ্লোক।

রাজ্যাভিষেক সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ এস্থলে প্রদান করিবার সুবিধা নাই অথর্ব্ব বেদের গোপথ ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর, অগ্নিপুরাণ ও দেবীপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে এতদ্বিষয়ক বিবরণ পাওয়া যাইবে।

* শ্রীমদ্ভাগবত—৪র্থ স্কন্ধ, ২য় ও ৩য় অধ্যায়।

† কালিকাপুরাণ,—১৬শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

‡ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ,—মধ্যখণ্ড,—৬ষ্ঠ অধ্যায়।

ব্যাকুলতা সন্দর্শনে পরিশেষে অনুমতি প্রদান করিতে বাধ্য হন।* সতী পিত্রালয়ে গমন করিলেন। তাঁহাকে পাইয়া দক্ষ ভবনে গভীর আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল ; সেই কলরব ক্রমে যজ্ঞ সভা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত এবং প্রজাপতি দক্ষের কর্ণগোচর হইল। তিনি কন্যার আগমনবার্ত্তা শ্রবণে ক্ষোভে ও ক্রোধে অধীর হইয়া, সতীকে যজ্ঞ সভায় আহ্বান করিলেন। ক্রোধান্ধ, হিতাহিত জ্ঞান বিবর্জ্জিত দক্ষ, সতী সমক্ষে, সভামধ্যে কঠোর ভাষায় শঙ্করের নিন্দাকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। পতিপ্রাণা সতীর শিবনিন্দা অসহনীয় হওয়ায়, তিনি শিব নাম স্মরণ করিয়া সভাস্থলে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার পরিত্যক্ত দেহ যজ্ঞকুণ্ডের এক পার্শ্বে পড়িয়া রহিল।

শঙ্করীর দেহ রক্ষার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহারুদ্র ক্রোধভরে প্রলয়ের বিষাণধ্বনি করিলেন। তাঁহার অগ্নিময় পিঙ্গলজটা সমুদ্ভূত বীরভদ্র কর্ত্তৃক দক্ষসহ দক্ষযজ্ঞ বিধ্বস্ত হইল। অতঃপর মহেশ্বর দেবগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া দক্ষকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন বটে, কিন্তু শিবনিন্দক দক্ষ নিজমুণ্ডের বিনিময়ে ছাগমুণ্ড লাভ করিলেন।

ক্রোধ ও শোকাভিভূত শঙ্কর, সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া তাণ্ডবনৃত্যে মত্ত হইলেন। তাঁহার পদভরে ধরা রসাতলে যাইবার উপক্রম দেখিয়া দেবরাজ, সৃষ্টিলোপের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইলেন। বিষ্ণু বুঝিলেন, সতীদেহ স্কন্ধচ্যুত না হইলে এই প্রলয়ঙ্কর নৃত্যের বিরাম ঘটিবে না। তিনি সুদর্শন চক্রদ্বারা অলক্ষিতভাবে সতী-অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সেই পবিত্র অঙ্গের অংশ যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই সকল স্থান মুক্তিপ্রদ মহাপীঠে পরিণত হইল। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ বলেন,---

"যত্র যত্র সতীদেহভাগাও পেতুঃ সুদর্শনাৎ।
তে তে দেশা ধরাভাগা মহাভাগাও কিলাভবন্।
তেতু পুণ্যতমা দেশা নিত্যং দেব্যাহ্যধিষ্ঠিতাঃ।
সিদ্ধপীঠাঃ সমাখ্যতো দেবানামপি দুর্ল্লভাঃ।।
মহাতীর্থানি তান্যাসন্ মুক্তিক্ষেত্রানি ভূতলে।।"

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ,—মধ্যখণ্ড, ১০ম অঃ।

মর্ম্ম—"পৃথিবীর যে সকল স্থানে সতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল পতিত হইয়াছিল, সেই সকল স্থান জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং পুণ্যভূমি; দেবী সেই সকল স্থানে নিত্য

* মহাভাগবত পুরাণের মতে সতী, শিবকে ভয়প্রদর্শন দ্বারা অনুমতি লাভের নিমিত্ত দশমহাবিদ্যারূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য গ্রন্থে দেবীর দশরূপ পরিগ্রহের স্বতন্ত্র কারণ বর্ণিত হইয়াছে। সেই বিষয় এস্থলে আলোচ্য নহে।

অধিষ্ঠিতা বলিয়া তাহাদের নাম সিদ্ধপীঠ। এই সকল স্থান দেবতাগণের পক্ষেও দুর্ল্লভ; ঐ সকল স্থান মহাতীর্থ এবং ভূতলে মুক্তিক্ষেত্র।”

এই রূপে দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা ভারতের নানাস্থানে ৫১টি পীঠের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, * তাহার একটী পীঠ ত্রিপুররাজ্যে অধিষ্ঠিত। পীঠমালা তন্ত্রে, শিব-পার্ব্বতী-সংবাদের এক পঞ্চাশৎ বিদ্যোৎপত্তিতে উক্ত হইয়াছে;—

ত্রিপুরায় পীঠস্থান

“ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী।
ভৈরবর্স্ত্রিপুরেশশ্চ † সর্ব্বাভীষ্ট ফলপ্রদঃ।

মর্ম্ম—“ত্রিপুরা দেশে সতীর দক্ষিণ পদ পতিত হওয়ায়, তথায় পীঠদেবী ত্রিপুরা সুন্দরী এবং ত্রিপুরেশ ভৈরব অবতীর্ণ হইয়াছেন।”

পীঠদেবী, ত্রিপুর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরে প্রতিষ্ঠিতা আছেন। তথাকার বিভাগীয় আফিস হইতে পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে একক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী অল্পোন্নত পর্ব্বতের সানুদেশে দেবালয়ে অবস্থিত।

দেবীর মন্দির কতকটা কালীঘাটের জয়কালীর মন্দিরের ধরনে নির্ম্মিত। ইহার দ্বার পশ্চিম দিকে। উত্তর দিকে ক্ষুদ্র একটী দ্বার আছে, তাহা পরবর্ত্তীকালে খোলা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। মন্দিরের বাহিরের পরিমাপ ২৪ x ২৪ ফুট, এবং অভ্যন্তরের (প্রকোষ্ঠের) পরিসর ১৬ x ১৬ ফুট। চতুর্দ্দিকের দেওয়াল ৮ ফুট চওড়া; উচ্চতা ৭৫ ফুট হইবে। প্রাচীনকালের প্রণালী অনুসারে নাতিস্থূল ইষ্টক ও উৎকৃষ্ট মসলা দ্বারা এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। দেওয়ালগুলি এত মজবুত যে, দূর হইতে আগত কামানের গোলায়ও সহজে এই মন্দিরের অনিষ্ট হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। ইহা মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুতরাং “ধন্যমাণিক্য খণ্ডে” এই মন্দিরের বিশেষ বিবরণ প্রদান করা হইবে।

ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির

মন্দির মধ্যে পাষাণময়ী কালিকামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা। বৃহদাকারের একখণ্ড

* সাধারণত পীঠস্থানের সংখ্যা ৫১টী ধরা হয়। কোন কোন গ্রন্থের মতে ৫০টী পীঠ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দেবীভাগবতে ১০৮টী, তন্ত্র চূড়ামণিতে ৫১টী পীঠস্থানের উল্লেখ আছে। শিবচরিতে ৫১টী মহাপীঠ ও ২৬টী উপপীঠের নাম পাওয়া যায়। কুব্জিকা তন্ত্রের মতে সিদ্ধপীঠের সংখ্যা ১২৭টী। এইরূপ নানা গ্রন্থে নানারূপ মত দৃষ্ট হয়।

† কোন কোন তন্ত্রের মতে ভৈরবের নাম নল বা অনল। এরূপ নামের পার্থক্য ঘটিবার কারণ নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ আবার “ভৈরবস্ত্রিপুরেশ” বাক্যের প্রতি নির্ভর করিয়া বলেন, ত্রিপুরার মহারাজই ভৈরবস্থানীয়, তথায় আর স্বতন্ত্র ভৈরব নাই। এই উক্তি নিতান্তই ভিত্তিহীন। উদয়পুরে নগর উপকণ্ঠে ভৈরবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন।

অত্যুৎকৃষ্ট কষ্টি পাথর কর্ত্তন করিয়া এই মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রতিমার সুডৌল গঠন, কমনীয় কান্তি, এবং অনিন্দ্যসুন্দর মুখাবয়বের প্রতি লক্ষ্য করিলে, প্রাচীনকালের ভাস্কর্য্যনৈপুণ্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এই দেবালয় এবং গাম্ভীর্য্যময়ী দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া যে বিমলানন্দ লাভ করিয়াছিলাম, তদ্রূপ অনাবিল আনন্দ উপভোগ জীবনে অতি অল্পই ঘটিয়াছে।

ত্রিপুরাসুন্দরী মূর্ত্তির বিবরণ

পূর্ব্বে যে মন্দিরের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা মহারাজ ধন্যমাণিক্য কর্ত্তৃক ১৪২৩ শকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; ইহা চারিশত বৎসরেরও কিছু অধিক কালের প্রাচীনকীর্ত্তি। কিন্তু মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবীমূর্ত্তি কত কালের, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। রাজমালায় পাওয়া যায়, উক্ত মন্দির নির্ম্মাণের সমসাময়িক কালে, মহারাজ ধন্যমাণিক্য স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া চট্টগ্রাম হইতে এই মূর্ত্তি আনয়ন করিয়াছিলেন। এতৎ সম্বন্ধীয় রাজমালার উক্ত এই ;---

'আর এক মঠ দিতে আরম্ভ করিল
বাস্তুপূজা সঙ্কল্প বিষ্ণু প্রীতে কৈল।।
ভগবতী রাজাতে স্বপ্ন দেখায় রাত্রিতে।
এই মঠে আমাস্থাপ রাজা মহাসত্বে।।
চাটিগ্রামে চট্টেশ্বরী তাহার নিকট।
প্রস্তরেতে আমি আছি আমার প্রকট।।
তথা হতে আমি আমা এই মঠে পূজ।
পাইবা বহুল বর যেই মতে ভজ।।

* * * * *

রসাঙ্গমর্দ্দন নারায়ণ* পাঠায় চট্টলে।
স্বপ্নে সেই স্থানে দেখে মিলিলেক ভালে।।
উৎসব মঙ্গল বাদ্যে রাজ্যেতে আনিল।
সত্ত্বর গমনে রাজা নমস্কার কৈল।।
কতদিন পরে মঠ প্রস্তুত হইল।
পুণ্যাহ দিনেতে রাজা উৎসর্গিয়া দিল।।'

ধন্যমাণিক্য খণ্ড।

এই মূর্ত্তি চট্টগ্রাম হইতে আনা হইয়াছিল, রাজমালায় ইহাই পাওয়া

---

* রসাঙ্গ (আরাকান) জয় করিয়া 'রসাঙ্গ মর্দ্দন' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে, প্রাচীনকালে এরূপ উপাধি লাভের অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

যাইতেছে। "ত্রিপুর বংশাবলী" পুস্তিকায় এ বিষয় আরও স্পষ্টতর ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা ;---

'রাধাকৃষ্ণ স্থাপিবারে মঠ আরম্ভিল।
চট্টেশ্বরী দেবী আসি স্বপ্ন দেখাইল।।
এমঠে আমাকে রাজা করহ স্থাপন।
নতু অব্যাহতি তোমার নাহি কদাচন।।
এই মঠে যদি আমা স্থাপন না কর।
তবে জান রাজা তোমার নাহিক নিস্তার।।
চট্টগ্রামে সদরঘাটে এক বৃক্ষমূলে।
পূজয়ে আমাকে সদা মগধ সকলে।।
সেই স্থান হৈতে শীঘ্র আনহ আমায়।'

ত্রিপুর বংশাবলী।

ইহা পূর্ব্বোক্ত মন্দিরনির্ম্মাণের সমসাময়িক কথা। সুতরাং এতদ্দারা মূর্ত্তির চারি শতাব্দীর প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। ত্রিপুরায় আনয়নের কতকাল পূর্ব্বে এই বিগ্রহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, মঘগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিতা হইবার পূর্ব্বে, কোথায়, কোন্ বংশ কর্ত্তৃক কতকাল অর্চ্চিতা হইয়াছেন, এবং চট্টগ্রামেই বা কতকাল ছিলেন, সেই সকল অতীতের কুহেলিকাচ্ছন্ন তথ্য জানিবার উপায় নাই। এই কারণে বিগ্রহের প্রাচীনত্ব নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব হইয়াছে। বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ ও মূর্ত্তি স্থাপনের পূর্ব্বে এই মহাপীঠে অন্য মন্দির বা কোন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল কিনা, এবং পীঠদেবীর সেবা পূজার কিরূপ ব্যবস্থা ছিল, বর্ত্তমানকালে তাহা কাহারও জানা নাই। সেকালে মন্দির বা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত না থাকিলেও পীঠস্থান বিনা অর্চ্চনায় ছিল না, এ কথা অতি সহজ বোধ্য। বর্ত্তমান সময়েও কোন কোন পীঠস্থানে, মূর্ত্তি নাই, কিন্তু সেবা পূজার বন্দোবস্ত আছে। এস্থলেও তদ্রূপ ব্যবস্থা ছিল বলিয়া সকলেই মনে করে।

দেবালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পশ্চিম দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, একটি সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর নয়ন গোচর হয়। এই প্রান্তরের নাম "সুখ-সাগর"। পূর্ব্বে ইহা গভীর জলময় বৃহৎ

সুখসাগর

একটী হ্রদ ছিল, গিরি-শৃঙ্গ ধৌত মৃত্তিকাদ্বারা ক্রমশঃ ভরাট হইয়া এখন নয়ন-তৃপ্তিকর শ্যামল শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই নামশেষ 'সুখ-সাগর' জলপূর্ণ থাকা কালে নগরের ও রাজপ্রাসাদের দীপমালার প্রতিবিম্বে ভূষিত হইয়া এবং সৈনিক বিভাগের রণতরী ও ভূপতিবৃন্দের বিলাস তরণীসমূহ বক্ষে ধারণ করিয়া কি যে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইত, তাহা বর্ত্তমানকালের কল্পনার অতীত ঐশ্বর্য্যের কথা।

পীঠ-দেবী শ্রীশ্রীত্রিপুরাসুন্দরী।

মন্দিরের পূর্ব্ব দিকে একটী দীর্ঘিকা আছে, এই দীঘি বহু প্রাচীন হইলেও ইহার গর্ত্ত অদ্যাপি আবর্জ্জনা বিবর্জ্জিত এবং জল অতি পরিষ্কার। এই সরোবর মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের শাসনকালে খনিত, —উহার নাম 'কল্যাণ সাগর'। এই সরোবর ২২৪ গজ দীর্ঘ, প্রস্থের পরিমাণ ১৬০ গজ। কিঞ্চিদধিক এই দ্রোণ ভূমি লইয়া ইহা খনিত হইয়াছে। এই সাগরকে বিশ্বকোষ অভিধানে 'ডিম্বাকৃতি' লিখিত হইয়াছে ; এই উক্তি নিতান্তই ভ্রমাত্মক। এতৎ সম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে ;---

সেইকালে মহারাজার স্বপনে আদেশ।
কালিকা দেবীয়ে স্বপ্ন দেখায় বিশেষ।
আমা সেবা কষ্ট হয় জলের কারণে।
জলাশয় দেও রাজা আমা সন্নিধানে।।
রাত্রিকালে মহারাজা দেখয়ে স্বপন।
প্রভাতে কহিছে রাজা স্বপ্নের কথন।।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্বপ্ন ব্যাখ্যান করিল।
সিদ্ধান্ত বাগীশ আদি যত দ্বিজ ছিল।
হরিষ হইয়া নৃপ কহে সেইক্ষণ।
পুস্কর্ণী খনিতে আজ্ঞা কালীর সদন।।
বাস্তুপূজা পরে পুষ্কর্ণীর আরম্ভন।
উদয়পুর কালিকার সমীপে তখন।।
জলাশয় উৎসর্গিল বিধান তৎপর।
পুষ্কর্ণীর নাম রাখে 'কল্যাণ সাগর।।"

কল্যাণমাণিক্য খণ্ড।

আমরা চতুর্দ্দিক বেড়াইয়া দেবালয় এবং দেবীর অর্চ্চনা দর্শন করিলাম। অর্চ্চনা সমাপনান্তে মোহন্ত কর্ত্তৃক আহূত হইয়া, মৎস্যের খেলা দেখিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলাম। দেবালয়ের পূজারী মহাশয় কতক আতপ তণ্ডুল ও কতিপয় মাংস খণ্ড লইয়া আমাদের অগ্রগামী হইয়াছিলেন, তাহা ঘাটের সন্নিহিত জলের ভিতর ছড়াইয়া দিলেন। দীঘির জল এত স্বচ্ছ যে, আমরা ঘাটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অনেক দূরবর্ত্তী স্থানের জলের নিম্নস্থ মৃত্তিকা পর্য্যন্ত দেখিতে ছিলাম। পূজারী ঠাকুর "আয় আয়" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাক দেওয়া মাত্র ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট বড় নানা জাতীয় মৎস্য ছুটিয়া আসিয়া ঘাটের নিকটবর্ত্তী স্থান ছাইয়া ফেলিল। তন্মধ্যে বৃহদাকারের কয়েকটি শাল মৎস্যের কথা উল্লেখযোগ্য। কিয়ৎকাল পরে দূর হইতে জল আলোড়িত করিয়া বিরাট আকারের একটি প্রাণী আমাদের নিকটবর্ত্তী হইতেছে, দেখা গেল। দেবালয়ের একটি ভৃত্য (টলুয়া)

উল্লাসভরে বলিল—"ঐ কচ্ছপটী আসিতেছে।" ক্ষণকাল মধ্যেই বিশালকায় কূর্ম্ম, ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে, ধীরমন্থর গতিতে ঘাটের নিকট আসিয়া মাংস খণ্ড ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল, পূর্ব্বোক্ত ভৃত্য হাঁটুজলে নামিয়া কচ্ছপটীর পশ্চাৎ ভাগ দুইহাতে ধরিল এবং তাহার বিশাল বপুর প্রায় অর্দ্ধাংশ জলের উপরে উঠাইয়া আমাদিগকে দেখাইল। ইহাতে কচ্ছপটীর বিন্দুমাত্র ভীতি বা চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইল না। নর-কচ্ছপের এবম্বিধ মিশামিশি দর্শন করিয়া প্রাচীনযুগের অহিংস্র ভাবাপন্ন তপোবনের পবিত্র চিত্র যেন হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়াছিল! এরূপ বৃহদাকারের কূর্ম্ম ইতিপূর্ব্বে কখনও দৃষ্টিগোচর হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কূর্ম্মবরের কান্তিপুষ্টি এবং বিশাল-বপু দর্শনে মনে হইয়াছিল, ইনি বুঝি ধরাভার বহী কূর্ম্মরাজের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি!

এই পীঠস্থান (উদয়পুর), কুমিল্লা নগরীর পূর্ব্বদিকে ১৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ত্রিপুর রাজ্যের সোনামুড়া নগরীর উপর দিয়া তথায় যাইবার রাজবর্ত্ম আছে; গোমতী নদীর জলপথেও গমনাগমন করা যাইতে পারে, এই স্থান উক্ত নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত।

পীঠ দেবীর সেবা পূজার বন্দোবস্ত ভাল। মোহান্তের তত্ত্বাবধানে, পূজারীগণ দ্বারা পালাক্রমে অর্চ্চনার কার্য্যসম্পাদিত হয়। রাজ সরকারী চারিজন সিপাহী, জনৈক সেনানীর অধীনে দেবালয়ের প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত আছে। প্রতিদিন অন্নব্যঞ্জন, লুচি, মিষ্টান্ন ইত্যাদি বিবিধ উপচারে দেবীর ভোগ হয়। প্রত্যহ একটী পাঁঠা এবং প্রতি অমাবস্যায় পাঁচটী পাঁঠা ও একটি মহিষ বলির দ্বারা অর্চ্চনা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে নরবলির ব্যবস্থাও ছিল। সেকালে, দেবী সমক্ষে অসংখ্য মনুষ্যজীবন আহুতি প্রদান করা হইয়াছে রাজ সরকারী নির্দ্ধারিত পূজা ব্যতীত সর্ব্বদাই দূরাগত যাত্রিগণ ছাগাদি বিবিধ বলিদ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকে। প্রত্যহ এই দেবালয়ে বহুসংখ্যক নর-নারীর সমাগম হয়। তীর্থ পর্য্যটক সন্ন্যাসীগণ প্রতিনিয়ত আগমন করিতেছেন। আগন্তুকগণের প্রসাদ পাইবার এবং দেবালয়ে অবস্থান করিবার সুবন্দোবস্ত আছে। দেবীর অর্চ্চনার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এবং পূজারী গণের বৃত্তিস্বরূপ রাজ সরকার হইতে বিস্তর ভূমি প্রদান করা হইয়াছে। স্থানীয় কালেক্টর সর্ব্বদা পরিদর্শন করিয়া দেবালয় সম্বন্ধীয় সর্ব্ববিষয়ে সুব্যবস্থা করেন।

সেবাপূজার বন্দোবস্ত

নগরের উপকণ্ঠে ভৈরব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভৈরবের নাম কোন তন্ত্রে 'ত্রিপুরেশ' এবং কোন কোন তন্ত্রে 'নল' বা 'অনল' লিখিত আছে। এরূপ নাম ভেদের কারণ নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য। এই শিবালয়কে

ভৈরব লিঙ্গ

সাধারণতঃ ‘মহাদেব বাড়ী’ বলা হয়, একটী ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। মহারাজ ধন্যমাণিক্য এই মন্দির নির্ম্মাতা ও বিগ্রহ স্থাপয়িতা।* দেবালয়ের চতুর্দ্দিক প্রাচীর বেষ্টিত। সেই প্রাচীর এত প্রশস্ত যে, তাহার উপর দিয়া অনায়াসে গমনাগমন করা যাইতে পারে। ভিতরের দিক হইতে প্রাচীরে উঠিবার সিঁড়ি আছে। সিংহদ্বারের সম্মুখে (দক্ষিণ ভাগে) বিস্তীর্ণ চত্তর, প্রতি বৎসর শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষে এই চত্তরে ১৫ দিবসব্যাপী মেলা বসিয়া থাকে।

চত্তরের অনতিদূর দক্ষিণে, মহারাজ বিজয়মাণিক্যের সময়ে খনিত “বিজয় সাগর”

বিজয় সাগর

অবস্থিত। এই জলাশয় ৩৮২ গজ দীর্ঘ ও ২৩৭ গজ প্রস্থ, ইহার গর্ব্ভে কিঞ্চিদধিক আড়াই দ্রোণ ভূমি পতিত হইয়াছে।

মন্দির মধ্যে কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা মহাশয় “ভৈরব লিঙ্গ শ্বেত প্রস্তরোদ্ভুত” বলিয়া আর একটী ভুল করিয়াছেন।

এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্র দ্বারা ত্রিপুর রাজ্য, বিশেষতঃ উদয়পুর ভারতবিখ্যাত এবং হিন্দু জগতে বিশেষ গৌরবান্বিত। বিশ্বাসী হিন্দুগণ মনে করেন, একমাত্র ত্রিপুরাসুন্দরীর কৃপায়, এই হিন্দু রাজ্য অনন্ত ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছে।

কুল-দেবতা

রাজমালার প্রস্তাবনায় লিখিত আছে।

“দুর্ল্লভেন্দ্র নাম ছিল চন্তাই প্রধান।
চতুর্দ্দশ দেবতা-পূজাতে দিব্যজ্ঞান।”

রাজমালা,—৩ পৃঃ

এই চতুর্দ্দশ দেবতাই ত্রিপুর রাজবংশের কুলদেবতা। এই দেবতা সম্বন্ধয়ী ইতিবৃত্ত আলোচনা-যোগ্য, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

মহারাজ দৈত্যের পুত্র ত্রিপুর, নিতান্ত ক্রূরকর্ম্মা, অনাচারী এবং উদ্ধত

---

* আর এক মঠ তবে অপূর্ব্ব গঠিল।
সেই মঠে মহাদেব স্থাপন করিল।।

ত্রিপুর বংশাবলী।

স্বভাব ছিলেন। দৈত্য পুত্রের দুশ্চরিত্রতার নিমিত্ত নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াও কোনরূপ প্রতিকারে সমর্থ হইলেন না। কালক্রমে তিনি বার্দ্ধক্যে পুত্রহস্তে রাজ্য ভার অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন।

মহারাজ ত্রিপুরের অত্যাচার ও নিধন

গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ রাজ্যভার প্রাপ্তির পরেও ত্রিপুরের চরিত্রগত কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল না। দুর্দ্দমনীয় রণ-স্পৃহা, প্রজাপীড়ন, লঘুদোষে প্রাণ দণ্ড, অবিচার, পররাজ্য ও পরস্ত্রীহরণ ইত্যাদি অনাচারে প্রকৃতিপুঞ্জ এবং পার্শ্ববর্ত্তী ভূপালগণ বিষম বিপন্ন ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, সর্ব্ব মঙ্গলাকর মহেশ্বর, উৎপীড়িত প্রজাবৃন্দের দুর্গতি দর্শনে ব্যথিত হইয়া, উপদ্রব শান্তির নিমিত্ত দ্বাপরের শেষ ভাগে সংহারক মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন এবং স্বহস্তে ত্রিপুরকে সংহার করিলেন।*

রাজরত্নাকর গ্রন্থে মহাদেব কর্ত্তৃক ত্রিপুর নিহত হইবার বিবরণ যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে এরূপ আভাস পাওয়া যায় যে, শিবদ্বেষী ও অত্যাচারী ত্রিপুরের প্রতি রাজমন্ত্রী প্রমুখ প্রকৃতিপুঞ্জ অতিশয় উত্ত্যক্ত হইয়াছিল। এমনকি রাজাকে সংহার করিবার মানসে তাঁহার চিরশত্রু হেড়ম্বপতির শরণাপন্ন হইবার কথাও পাওয়া যায়। হেড়ম্বেশ্বর মনে করিলেন, "ইহারা মহারাজ ত্রিপুরের বিরুদ্ধবাদীর ভাণ করিয়া আমার মনোগত ভাব জানিতে আসিয়াছে। আমি যদি ইহাদের নিকট মনের কথা প্রকাশ করি, তবে বিপদের আশঙ্কা আছে।" ইহা ভাবিয়া হেড়ম্বেশ্বর কোপান্বিত হইয়া তাহাদিগকে আপন রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

মহারাজ ত্রিপুরের নিধন সম্বন্ধে রাজরত্নাকরের মত।

অতঃপর প্রজাবর্গ ত্রিপুর-রাজমন্ত্রী নরসিংহের নিকট আগমন করিল। মন্ত্রী বলিলেন, --"মহাদেবের কৃপালাভ ব্যতীত এই বিপদ হইতে পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই। রাজা রাজধানীতে অবস্থান কালে আমরা এই কার্য্যে লিপ্ত হইব না ; কারণ, আমরা তাঁহার অকল্যাণ কামনা করিতেছি, ইহা যদি কর্ণগোচর হয়, তবে আমাদের বিপদ আরও ঘনীভূত হইবে। রাজা মৃগয়া-প্রিয়, তিনি তখন মৃগয়া ব্যপদেশে বনে গমন করিবেন, তখন আমরা মহাদেবের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইব।"

অতঃপর সেই উপায়ই অবলম্বিত হইল। আশুতোষ, প্রজাগণের অর্চ্চনায় সন্তুষ্ট হইয়া, অনাচারী ত্রিপুরের সংহার সাধান দ্বারা তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। †

রাজরত্নাকরের এই বর্ণনাদ্বারা অনেকে অনুমান করেন, বিদ্রোহী প্রজাগণ মহারাজ

---

* "মারিলেক শূল অস্ত্র হৃদয় উপর।
শিব মুখ হেরি রাজা ত্যজে কলেবর।।"
রাজমালা—১১ পৃঃ।

† রাজরত্নাকর—দক্ষিণবিভাগ, ২য় সর্গ।

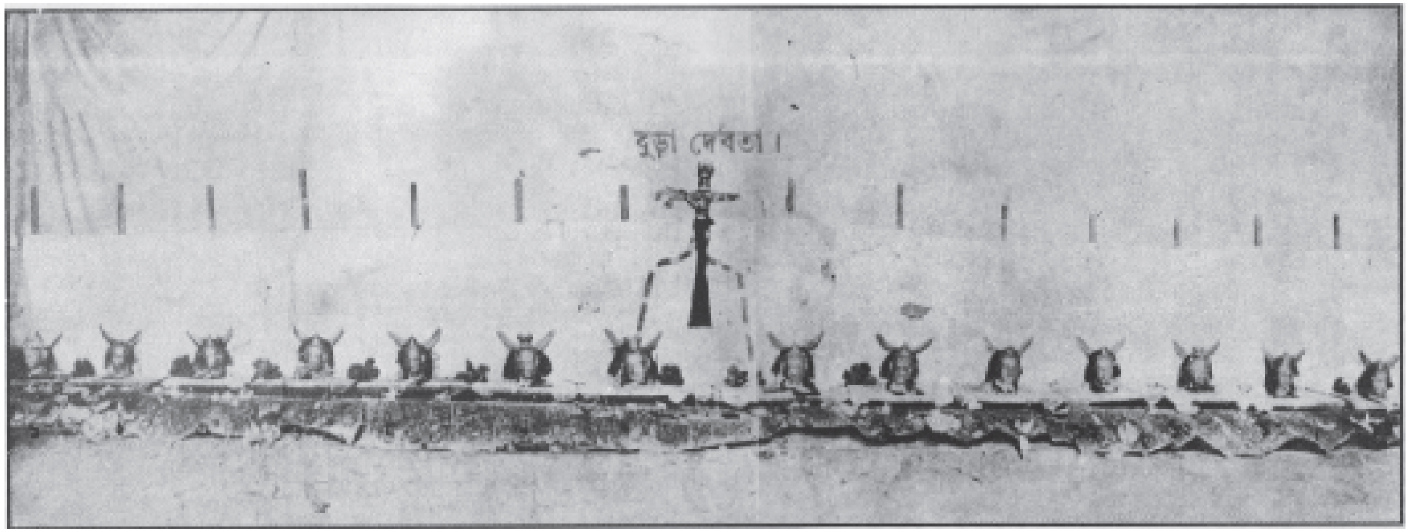

শ্রী শ্রী চতুর্দ্দশ দেবতা

নিগ্রহ পরিচয় ঃ ১। হর (শিব), ২। উমা (দুর্গা), ৩। হরি (বিষ্ণু), ৪। মা (লক্ষ্মী), ৫। বাণী (সরস্বতী), ৬। কুমার (কার্ত্তিক), ৭। গণপা (গণেশ), ৮। বিধি (ব্রহ্মা), ৯। ক্ষ্মা (পৃথিবী), ১০। অব্ধি (সমুদ্র), ১১। গঙ্গা (ভাগীরথী), ১২। শিখী (অগ্নি), ১৩। কাম (প্রদ্যুম্ন), ১৪। হিমাদ্রি (হিমালয় পর্বত)।

ত্রিপুরকে অরণ্যমধ্যে বধ করিয়া, তিনি মহাদেব কর্ত্তৃক নিহত হইবার কথা প্রচার করিয়াছিল। এবিষয় পূর্ব্বভাষে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

অতঃপর রাজবংশে রাজ্যভার গ্রহণের যোগ্য ব্যক্তি বিদ্যমান না থাকায়, সিংহাসন শূন্য পড়িয়া রহিল।* মহামারী, দুর্ভিক্ষ, লুণ্ঠন ইত্যাদি বিবিধ উপদ্রবে অল্পকাল মধ্যেই রাজ্য অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতে চলিল। প্রজাগণ নিঃসম্বল হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিল ; তাহারা দেখিল, অত্যাচারী রাজার রাজ্য অপেক্ষা অরাজক দেশ অধিকতর ভয়ঙ্কর। উপায়ান্তর না পাইয়া জনৈক প্রজারঞ্জক রাজা প্রাপ্তির আশায় রাজমন্ত্রী প্রমুখ প্রজাবর্গ শূলপাণির অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইল। আশুতোষ বিপন্ন প্রকৃতিপুঞ্জের অর্চ্চনায় পরিতুষ্ট হইয়া পূজাস্থানে আবির্ভূত হইলেন ; এবং তাঁহার বর প্রভাবে মহারাজ ত্রিপুরের ত্রিলোচন নামক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া ত্রিপুরার শাসনদণ্ড ধারণ করিলেন। এই বর প্রদান কালে মহাদেব আদেশ করিয়াছিলেন,—

"চতুর্দ্দশ দেব পূজা করিব সকলে।
আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী হইলে।"

রাজমালা---ত্রিপুর খণ্ড,—১৫ পৃঃ।

এই দৈববাণী অনুসারে মহারাজ ত্রিলোচনের শাসনকালে চতুর্দ্দশ দেবতার প্রতিষ্ঠা হয়। চতুর্দ্দশ দেবতার অন্তর্ভূক্ত দেব দেবীগণের নাম এই,—

চতুর্দ্দশ দেবতার বিবরণ

"হরোমা হরি মা বাণী কুমারো গণপা বিধিঃ।
ক্ষ্মাব্ধির্গঙ্গা শিখী কামো হিমাদ্রিশ্চ চতুর্দ্দশ।।"

---রাজমালিকা

অন্যত্র লিখিত আছে,—

"শঙ্করঞ্চ শিবানীঞ্চ মুরারিং কমলাং তথা
ভারতীঞ্চ কুমারঞ্চ গণেশং মেধসং তথা।।

---

* পরলোকগত কৈলাশচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন,—

"মহাদেব কর্ত্তৃক ত্রিপুর হত হইলে, বিধবা রাজ্ঞী হীরাবতী সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক যথা নিয়মে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।"

কৈলাস বাবুর রাজমালা—২য় ভাগ, ২য় অঃ, ১৬ পৃঃ।

ইহা আনুমানিক কথা। রাজমালায় এ বিষয়ের উল্লেখ নাই, এবং কৈলাস বাবুও কোনরূপ প্রমাণ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

"ধরণীং জাহ্নবীং দেবীং পয়োধিং মদনং তথা।
হুতাশঞ্চ নগেশঞ্চ দেবতাস্তাঃ শুভাবহাঃ।।"
—সংস্কৃত রাজমালা।

"হর উমা হরি মা বাণী কুমার গণেশ।
ব্রহ্মা পৃথ্বী গঙ্গা অব্ধি অগ্নি সে কামেশ।।
হিমালয় অন্ত করি চতুর্দ্দশ দেবা।
অগ্রেতে পুজিব সূর্য্য পাছে চন্দ্র সেবা।।"
---রাজমালা

উদ্ধৃত শ্লোক-সমূহ আলোচনায় জানা যায়, শিব, দুর্গা, হরি, লক্ষ্মী, বাগ্দেবী, কার্ত্তিকেয়, গণেশ, ব্রহ্মা, পৃথিবী, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, কামদেব ও হিমাদ্রি, এই চৌদ্দটি দেবতা সমষ্টিকে 'চতুর্দ্দশ' বলা হয়। এই সকল দেব দেবীর চৌদ্দটী মুণ্ড অর্চ্চিত হইয়া থাকে; মুণ্ড-সমূহ অষ্টধাতু নির্ম্মিত। তন্মধ্যে মহাদেবের মুণ্ডটী রজতময়, অন্য সমস্ত মুণ্ড সুবর্ণ-মণ্ডিত। এই দেবতা স্থাপন সম্বন্ধে শ্রেণীমালা গ্রন্থে লিখিত আছে,---

"ত্রিলোচন মহারাজ শিবের আজ্ঞাতে।
চতুর্দ্দশ দেবতা স্থাপিল একত্রেতে।"*

চতুর্দ্দশ দেবতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত

এই বিগ্রহ সম্বন্ধে কৈলাসবাবু এক নূতন কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—

"প্রবাদ অনুসারে মহারাজ দাক্ষিণ ত্রিবেগ হইতে পলায়নকালে চতুর্দ্দশ দেবতার মুণ্ড লইয়া আসিয়াছিলেন। তদবধি দক্ষিণের সন্তানগণ সেই চতুর্দ্দশ দেবমুণ্ডের পূজা করিয়া আসিতেছেন। দৃক্পতির দীর্ঘকাল সেই ছিন্নশীর্ষ চতুর্দ্দশ দেবতার আরাধনা করিয়াছিলেন;"

কৈলাস বাবুর রাজমালা---২য় ভাগ, ২য় অধ্যায়, ১৯ পৃঃ।

প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া কৈলাসবাবু এই কথা লিখিয়াছেন। আমরা কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও এই প্রবাদের কোনরূপ আভাস পাইতেছি না

* রাজরত্নাকরের মতে মহারাজ ত্রিপুরের সময়েও চতুর্দ্দশ দেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অনাচারী ও দেবদ্বেষী ত্রিপুরের অত্যাচারে উক্ত দেবতার পূজক দেওরাইগণ উৎপীড়িত হইয়া, তাঁহাদের পূর্ব্ব আবাসস্থানে সগরদ্বীপে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন এবং তদবধি চতুর্দ্দশ দেবতার পূজা বন্ধ হয়। মহারাজ ত্রিলোচন, পুনর্ব্বার উক্ত পূজকদিগকে আনিয়া, অর্চ্চনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কৈলাস বাবু, ত্রিলোচনর জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম 'দৃকপতি' বলিয়াছেন, রাজরত্নাকরের মতে তাঁহার নাম ছিল বীররাজ। ইনি কাছাড়ের অধিপতি (মাতামহ) কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া তাঁহার রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। ত্রিপুরেশ্বর ত্রিলোচন পরলোক গমন করিবার পর, দৃকপতি (বীররাজ) যুদ্ধ করিয়া পৈত্রিক রাজ্য অধিকার করেন। এতদুপলক্ষে মহারাজ দাক্ষিণকে ত্রিবেগের রাজধানী পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ত্রিলোচন খণ্ডে ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

কথাটা কল্পনাপ্রসূত বলিয়াই মনে হয়। কারণ, যে বিগ্রহকে কুলদেবতা বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চনা করা হইতেছে,---সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি সত্ত্বেও যে বিগ্রহ আপন প্রাণের ন্যায় সযত্নে রক্ষা করা হইয়াছে, সেই বিগ্রহের মস্তক ছেদন করিতে কোন্ হিন্দুর সাহস বা প্রবৃত্তি হয়? বিশেষতঃ ভগ্নবিগ্রহের অর্চ্চনা করা হিন্দুশাস্ত্রে একান্ত নিষিদ্ধ; এরূপ শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য্য করা ধর্ম্মপ্রাণ ত্রিপুর-রাজ-পরিবারে-পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না।* পরন্তু দৃকপতির বংশধরগণের ছিন্নশীর্ষ চতুর্দ্দশ দেবতার অর্চ্চনা করিবার কথাই যদি সত্য বলিয়া ধরা যায়, তবে সেই সকল ভগ্ন বিগ্রহের অস্তিত্ব অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিত ; তাহা নাই---এবং এরূপ ঘটনা কখনও ঘটিয়াছিল, এমন কথা ত্রিপুরায় বা কাছাড়ে কোন ব্যক্তি বলে না। বরং রাজমালার উক্তি আলোচনা করিলে, কৈলাস বাবুর কথা ভিত্তিহীন বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। রাজমালা বলেন;---

"চতুর্দ্দশ দেবতার চতুর্দ্দশ মুখ।
নির্ম্মাইয়া দিল শিবে আপনা সম্মুখ।।

রাজমালা---ত্রিপুরখণ্ড, ১৬ পৃঃ।

মহাদেব স্বয়ং দেবতার মুখ (মুণ্ড) নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এই উক্তি বর্ত্তমান কালে সকলের নিকট ভাল লাগিতে না পারে, কিন্তু বিগ্রহ নির্ম্মাণকালে, কেবল যে মুণ্ড গঠিত হইয়াছিল---অন্য অবয়ব নির্ম্মাণ করা হয় নাই, উদ্ধৃত বাক্য দ্বারা একথা স্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং কৈলাস বাবুর উক্তি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

---

* শাস্ত্রানুসারে, ভগ্নবিগ্রহের অর্চ্চনা করা নিষিদ্ধ। একটীমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল;---

"জীর্ণোদ্ধার বিধিং বক্ষ্যে ভূষিতাং স্নপয়েদ্ গুরুঃ।
অচলাং বিন্যসেদ্গেহে অতিজীর্ণাং পরিত্যজেৎ।।
ব্যঙ্গাং ভগ্নাঞ্চ শৈলাচ্যাং ন্যসেদন্যাঞ্চ পূর্ব্ববৎ।
সংহার বিধিনাতত্র তত্ত্বান্ সংহত্য দেশিকাঃ।।
সহস্রং নারসিংহেন হুত্ব তামুদ্ধরেদ্ গুরুঃ।
দারবীর দারয়েদ্বহ্নৌ শৈলজাং প্রক্ষিপেজ্জলে।।
ধাতুজাং রত্নজাং বাপি অগাধে বা জলেহম্বুধৌ।
যানমারোপ্য জীর্ণাঙ্গাং ছাদ্য বস্ত্রাদিনানয়েৎ।।"

অগ্নিপুরাণ—৬৭ অঃ, ১—৪ শ্লোক।

মর্ম্ম;—(ভগবান বলিলেন,)---জীর্ণোদ্ধার বিধি বলিতেছি। গুরু, ব্যঙ্গ, ভগ্ন ও অতিজীর্ণ প্রতিমা পরিত্যাগ করিয়া, পূর্ব্বৎ গৃহমধ্যে বিবিধ অলঙ্কার সম্পন্ন প্রতিমা ন্যাস করিবে। সংহার বিধির অনুকরণ করতঃ তত্ত্ব সকল সংহার করিয়া নরসিংহ মন্ত্রে সহস্র হোম করিবার পর তাহার উদ্ধার করিবে। দারুময়ী প্রতিমাকে অগ্নিতে বিদারিত, শৈলময়ীকে সলিলে প্রক্ষিপ্ত এবং ধাতুময়ী ও রত্নময়ী প্রতিমাকেও অগাধ জলে বা সাগরে নিক্ষেপ করিবে।

চতুর্দ্দশ দেবতার প্রাচীনত্ব নির্ণয় করা বর্ত্তমান কালে কঠিন হইলেও নিতান্ত অসম্ভব নহে. আমরা এই টীকার পরবর্ত্তী অংশে ভারত সম্রাট যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সম্বন্ধীয় যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা আলোচনা করিলে জানা যাইবে, চতুর্দ্দশ দেবতার স্থাপয়িতা মহারাজ ত্রিলোচন ও তাঁহার পিতা ত্রিপুর, যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক রাজা। সুতরাং যুধিষ্ঠিরের কালনির্ণয় করা যাইতে পারিলে, চতুর্দ্দশ দেবতার প্রাচীনত্ব নির্ণয় করা সহজ সাধ্য হইবে।

যুধিষ্ঠিরের সময় নির্ণয় লইয়া দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলন চলিতেছে। অদ্যাপি তদ্বিষয়ে স্থির মীমাংসা না হইয়া থাকিলেও আন্দোলনের ফলে মোটামুটিভাবে একটা সময় নির্দ্ধারণ করিবার সুবিধা ঘটিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে যুধিষ্ঠির ১৫১৭ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।* রাজ-তরঙ্গিণীর মতে তিনি কলির ৬৫৩ বৎসর অতীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। † বরাহমিহিরের মতে শালিবাহনের সালে ২৫২৬ যোগ করিলেই যুধিষ্ঠিরের কাল নির্ণয় হইবে। ‡ এই সমস্ত মতের পরস্পর অসামঞ্জস্য থাকিলেও সকল মতেই যুধিষ্ঠিরের প্রাচীনত্ব কিঞ্চিন্ন্যূন সার্দ্ধ চারিসহস্র বৎসর নির্ণীত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে ইহার প্রাচীনত্ব আরও বেশী বলিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান আছে। বিশেষতঃ মহারাজ ত্রিপুর দ্বাপরের শেষভাগের রাজা। এখন কলির পাঁচ হাজার বৎসর অতীত হইয়াছে। সুতরাং ত্রিপুর ও ত্রিলোচনের সমসাময়িক যুধিষ্ঠির পাঁচহাজার বৎসরের অধিক প্রাচীন ছিলেন, এবং মহারাজ ত্রিলোচন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত চতুর্দ্দশ দেবতা পাঁচ সহস্র বৎসরের অধিক প্রাচীন, এরূপ নির্দ্ধারণ করিতে কোনরূপ বাধা দৃষ্ট হয় না।

এই বিগ্রহ ত্রিপুরার রাজধানী ত্রিবেগ নগরে স্থাপিত হইয়াছিল। ক্রমে রাজধানী পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্থানান্তরিত হইয়া, রাঙ্গামাটিতে (উদয়পুরে) নীত হয়; এবং উদয়পুর হইতে রাজপাট উঠাইয়া লইবার সময়, তাহা বর্ত্তমান রাজধানী আগরতলায় নেওয়া হইয়াছে। উদয়পুরস্থ চতুর্দ্দশ দেবতার প্রাচীন মন্দির এখনও জীর্ণ দেহ লইয়া অতীতের সাক্ষীস্বরূপ বিরাজমান রহিয়াছে।

---

* ১২৯৯। ১৩০০ সালের নব্যভারত ও জন্মভূমি সাময়িক পত্র।

†শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেসু ত্রয়োধিকেষু ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণাম ভবন্ কুরু পাণ্ডবাঃ।
রাজতরঙ্গিণী—১ম তরঙ্গ।

‡ আসনমঘাযু মুনয়ঃ শাসিন্তি পৃথিবীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়াদ্বিক পঞ্চদ্বিযুতঃ শক কালস্তস্য রাজ্যশ্চ।।
বারাহী সংহিতা—১৩শ অঃ।।

চতুর্দশ দেবতার প্রাচীন মন্দির—উদয়পুর।
[illegible]

চতুর্দ্দশ দেবাতার মন্দির
(আগরতলা)

এই বিগ্রহ সম্বন্ধে বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে---"পুরাতন রাজ বাড়ীর নিকটে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে পাহাড়ীদিগের চতুর্দ্দশ দেবতার প্রতিমা (পিত্তল নির্ম্মিত মুণ্ডমাত্র) আছে। এই মন্দিরের নিকট দিয়া যাইবার সময়ে সকলেই--এমন কি, মুসলমানেরাও প্রতিমাকে প্রণাম করিয়া থাকে।" "আবার অন্যত্র লিখিত হইয়াছে,---"মহারাজ ত্রিলোচন শিবভক্ত ছিলেন, এবং শিবাদেশে চতুর্দ্দশটী দেব প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন। এই চতুর্দ্দশ দেবতাই ত্রিপুরাপতিগণের কুলদেবতা রূপে আজিও পূজিত হইতেছেন।"

চতুর্দ্দশ দেবতা 'পিত্তল নির্ম্মিত' নহে--অষ্টধাতু নির্ম্মিত, ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত দেবতা 'পাহাড়ীদিগের'---এই উক্তি নিতান্তই ভ্রমাত্মক। অন্য দিকে লক্ষ্য না করিয়া, একমাত্র দেবতাসমূহের নাম আলোচনা দ্বারাই এই ভ্রম নিরাকৃত হইতে পারে। বিশেষতঃ এই বিগ্রহ মহারাজ ত্রিলোচন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং ত্রিপুরাপতিগণের কুলদেবতা,---বিশ্বকোষ সম্পাদক এই সকল কথা স্বীকার করিয়াও তাহাকে 'পাহাড়ীদিগের' দেবতা বলিয়া উল্লেখ করায়, তাঁহার বাক্য অপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছে।

চতুর্দ্দশ দেবতা পাহাড়ী দিগের দেবতা নহে।

ত্রিপুরেশ্বরগণের প্রতিষ্ঠিত কোন কোন বিগ্রহ উৎকলদেশীয় ব্রাহ্মণ দ্বারা, কোন বিগ্রহ মণিপুরী ব্রাহ্মণ দ্বারা এবং কতিপয় বিগ্রহ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ দ্বারা অর্চ্চিত হইতেছে। আবার, কোন কোন বিগ্রহ অর্চ্চনার ভার হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের হস্তেও অর্পিত হইয়াছে। কিন্তু চতুর্দ্দশ দেবতা অর্চ্চনার ব্যবস্থা বিষয়ে বিশেষত্ব এই যে, উক্ত দেবতার পূজারিগণ সংসার বিরাগী যতি-পুরুষ। এই শ্রেণীর মহাপুরুষগণের জাতি নির্ণয় করা বর্ত্তমান কালের অসাধ্য—সেকালেও দুঃসাধ্য ছিল বলা যাইতে পারে ; তবে, তাঁহারা যে ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণসদৃশ সম্মানার্হ ছিলেন, ইঁহাদের উপাধি এবং রাজমালার বর্ণনা আলোচনা করিলে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না।* এ বিষয়ে মোটামুটিভাবে দুই একটী কথা নিম্নে বলা যাইতেছে।

---

* চন্তাইগণের প্রাচীনকালের সম্মান ও প্রভাবের কথা আলোচনা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। পরবর্ত্তীকালেও তাঁহারা কম সম্মানার্হ ছিলেন না। রাজমালা হইতে এস্থলে কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করা যাইতেছে, তাহা আলোচনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, চন্তাই ব্রাহ্মণ কিম্বা ব্রাহ্মণের সমকক্ষ ছিলেন। রাজধর মাণিক্যখণ্ডে, রাজার দৈনন্দিন ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান বর্ণপোলক্ষে লিখিত হইয়াছে,---

"পঞ্চপাত্র অন্নদান করে সদাকাল।।
* * * * *
একপাত্র চন্তাইয়ে পায় অন্ন দান।
দুই পুরোহিত পায় দুই অন্ন স্থান।।
আর দুই পাত্র অন্ন অন্যদ্বিজে পাইছে।
কপিলার গ্রাস রাজা প্রতিদিন দিচে।।"

চতুর্দ্দশ দেবতার প্রধান পূজকের উপাধি 'চন্তাই'। হালাম জাতির (কুকির শাখাবিশেষ) ভাষায় ব্রাহ্মণকে 'চুয়ান্তাই' বলে। 'চন্তাই' শব্দ যে চুয়ান্তাই শব্দেরই রূপান্তর, ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।* এই উপাধি দ্বারাও চন্তাইর গৌরব ও প্রাধান্য প্রমাণিত হইতেছে, ইঁহাদের ব্যবহারের দ্বারা এই প্রমাণ আরও দৃঢ়ীভূত হইবে। চন্তাই দেবালয়ের মোহান্ত স্থানীয় ব্যক্তি, এবং ত্রিপুররাজ্যে এইপদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির সম্মান ও প্রতিপত্তি বর্ত্তমানকালেও লর্ড বিশপের অপেক্ষা অধিক বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ রাজমালা আলোচনায় ইঁহাদের সদাচার, ধর্ম্মাচরণ, ত্যাগস্বীকার, এবং অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধীয় যে সকল নির্দশন পাওয়া যায়, তদ্দারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ইঁহারা ঋষিকল্প যোগীপুরুষ ছিলেন। এই শ্রেণীর সংসারত্যাগী তপস্বিগণের জাতি বিচার করিতে যাওয়া সকল কালেই অসম্ভব। দীর্ঘকাল ত্রিপুরায় অবস্থান হেতু বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের উত্তর পুরুষগণ স্থানীয় সমাজের সহিত বিবাহাদি সম্বান্ধান্বিত হইয়া থাকিলেও, অদ্যাপি তাঁহাদের আচার-ব্যবহার ও পবিত্রতা সম্বন্ধে যে বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তদ্বারা তাঁহাদের পূর্ব্ব সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়।

চন্তাইর বিবরণ

চতুর্দ্দশ দেবতার পূজকগণের অন্য উপাধি 'দেওড়াই'। ইহাঁরাও যতিপুরুষ ছিলেন, রাজমালা আলোচনা করিলেই তাহা জানা যাইবে। বেহারের ইতিবৃত্ত 'রাজাবলী' নামক হস্তলিখিত গ্রন্থ আলোচনায় পাওয়া যাইতেছে, কামাখ্যা দেবীর পূজকগণের উপাধি 'দেওড়ি'। দেওড়াই ও দেওড়ি একার্থবাচক বলিয়া বুঝা যায়, বিশেষতঃ উক্ত উভয় সম্প্রদায় দেবতার পূজারি; সুতরাং এই শব্দদ্বয় 'দেবল' শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ বলেন, 'দেবরায়' শব্দ হইতেও দেওড়াই ও দেওড়ি শব্দের উদ্ভব হইতে পারে। এ বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচারের ভার ভাষাতত্ত্ববিদ্ সুধীবর্গের হস্তে রহিল। দেওড়াইগণ সংসারত্যাগী দণ্ডি ছিলেন এবং চন্তাইর সহিত ইঁহারা একসঙ্গে ত্রিপুরায় আসিয়াছেন; সুতরাং চন্তাইয়ের ন্যায় তাঁহাদের জাতি নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য। ইঁহারা চন্তাইয়ের ন্যায় সম্মানার্হ এবং শুদ্ধাচারী, এস্থলে এইমাত্র বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে।

দেওড়াইগণের বিবরণ

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের অভিষেক মণ্ডপে, দুই ব্যক্তিমাত্র বসিবার আসন পাইয়াছিলেন। এ স্থলে ব্রাহ্মণের পার্শ্বে চন্তাইকে উপবিষ্ট দেখা যায়,—

"বনমালী সিদ্ধান্ত আর জয়ন্ত চন্তায়ে।
তারা দুই বস্ত্রাসনে বসে সে সভায়ে।।"

* ত্রিপুরায় হালাম ভাষা গ্রহণের বিবরণ পূর্ব্বভাষে দ্রষ্টব্য।

রাজাবলী,—৯ম খণ্ড, ৩য় অধ্যায়।

শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চন্তাই,
(বর্ত্তমান)

চন্তাই ও দেওড়াই প্রভৃতির বর্ত্তমান অবস্থা দর্শন করিয়া অনেকে তাহাদিগকে পার্ব্বত্য জাতীয় বলিয়া মনে করেন, এই ধারণা অভ্রান্ত নহে; তবে, ইঁহারা যে স্থানীয় সমাজের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। এই কারণে তাঁহাদিগকে পার্ব্বত্য জাতি বলা সঙ্গত হইবে না।

চন্তাই ও দেওড়াই পার্ব্বত্য জাতি নহে

ইঁহাদিগকে ব্রাহ্মণেতর জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে গেলেও কোন ক্ষতি আছে বলিয়া মনে হয় না। সকলেই জানেন, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনার ভার সবর জাতীয় লোকে প্রাপ্ত হইয়াছে ; অথচ সমগ্র ভারতের সর্ব্বজাতির নিকট এই পুণ্যক্ষেত্র হিন্দুর প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রসাদ গ্রহণ সম্বন্ধে যে উদার মত পোষিত হইতেছে, হিন্দুর অন্য কোন তীর্থে তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। এই অবস্থায় ব্রাহ্মণেতর সাধু মহাজন দ্বারা পূজিত হইলেই চতুর্দ্দশ দেবতাকে "পাহাড়ীদিগের দেবতা" বলা সঙ্গত হইবে কি?

শ্রীক্ষেত্রের পূজকগণ

চতুর্দ্দশ দেবতার সেবা পূজার ভার উপরি উক্তি সম্প্রদায়ের হস্তে বিনা কারণে প্রদান করা হয় নাই,—শিবাজ্ঞাই এবম্বিধ ব্যবস্থার মূলীভূত কারণ। চতুর্দ্দশ দেবতা প্রতিষ্ঠার সূচনাকালেই মহাদেব বলিয়াছেন;—

"পূজার যে পূর্ব্ব দিন প্রাতঃকাল লাভে।
সংযম করিবে চন্তাই দেওড়াই সবে।।
পূজাবিধি দেওড়াই সবে তাকে জানে।
সমুদ্রের দ্বীপে তারা রহিছে নির্জ্জনে।।
তাহাকে আনিবা যাইয়া রাজার সহিতে।
যেখানে পুজিবা আমি আসিব সাক্ষাতে।।"

রাজমালা,—ত্রিলোচন খণ্ড।

অন্যত্র লিখিত আছে;—

"শুভদিনে দেওড়াই রাজার সহিতে।
রাজধানী আসিলেন মন হরষিতে।।
চতুর্দ্দশ দেবতাকে সমর্পিল রাজা।
তদবধি দেওড়াই নিত্য করে পূজা।"

রাজমালা—ত্রিলোচন খণ্ড।

সে কালে দেওড়াইগণ বিশেষ ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান ছিলেন, একথা বারম্বার বলা হইয়াছে। তাঁহাদের আচার সম্বন্ধে রাজমালা বলেন;—

"নারীর রন্ধন তারা নাহি করে ভক্ষ্য।।
নিত্য স্নান ধৌত-বস্ত্র আকাশে শুকায়।
আকাশে শুকাইয়া বস্ত্র পবিত্রে পৈরয়।।

স্বহস্তে রন্ধন করি ভোজন করয়।
দেবতা পূজিতে ভক্তি তারা অতিশয়।।”

এবম্বিধ শুদ্ধাচারী, সংস্যারত্যাগী যতিদিগকে সমুদ্রের দ্বীপ হইতে আনিয়া চতুর্দ্দশ দেবতার পূজক করা হইয়াছিল। তাঁহারা কোন্ দ্বীপে ছিলেন, বর্ত্তমান কালে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। জনপ্রবাদে জানা যায়, বঙ্গোপসাগরের অঙ্কস্থিত আদিনাথ তীর্থ হইতে ইঁহাদিগকে আনা হইয়াছে; এ কথা প্রকৃত কিনা, বর্ত্তমান পূজকগণ তাহা বলিতে চায় না। লঙ্ সাহেবের মতে, এই সকল বিষয়-বিরত দণ্ডিদিগকে সগরদ্বীপ হইতে আনা হইয়াছিল।* সুন্দরবনের সন্নিহিত দ্বীপে কপিলাশ্রম থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। লঙ্ সাহেব সম্ভবতঃ সেই দ্বীপকেই লক্ষ্য করিয়াছেন এবং ইহা সত্য হইবার সম্ভাবনাই অধিক। সগরদ্বীপের সহিত ত্রিপুরার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিবার কথা পূর্ব্বভাষে বলা হইয়াছে।

দেওড়াই ব্যতীত, গালিম বা ঘালিম প্রভৃতি কতিপয় সম্প্রদায়ের লোক পুরুষানুক্রমে দেবালয়ের কার্য্যে নিযুক্ত আছে, ইঁহারাও পূর্বোক্ত শ্রেণীর বংশধর। ইঁহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। ইঁহারা সকলেই রাজসরকারী বৃত্তিভোগী কর্ম্মচারী বা সেবাইত। ইঁহাদের বংশধর ব্যতীত অন্য কোন বংশীয় লোকের এই সকল কার্য্য করিবার অধিকার নাই। তাঁহাদের বংশ হইতে যোগ্যতানুসারে লোক নির্ব্বাচিত হয় এবং সাধুতা ও যোগ্যতা বলে ক্রমশঃ চন্তাইর পদও লাভ করিয়া থাকে।

চতুর্দ্দশ দেবতা যে আর্য্যগণের পূজিত বিগ্রহ, এবং এই বিগ্রহের পূজকগণ মূলতঃ যে পার্ব্বত্য জাতি নহে, পূর্ব্ব আলোচনা দ্বারা বোধ হয় তাহা নিরাকৃত হইয়াছে। এই বিগ্রহের পূজাপদ্ধতিও এস্থলে আলোচ্য, কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, চন্তাইগণ পূজার মূল প্রণালী এবং মন্ত্রাদি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না; সুতরাং তাহা সম্যক সংগ্রহ করা অসাধ্য। আগরতলা মহাফেজখানায় রক্ষিত একখানা হস্তলিখিত পুরাতন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেবতাসমূহের ধ্যানের মর্ম্ম বঙ্গভাষায় লিখিত আছে; তাহা আলোচনা করিলে, এই দেবতার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে। উক্ত পুথিতে লিখিত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

ধর্ম্মমাণিক্য বলিলেন---“যে কুলোচিত খার্চ্চি পূজার বিষয় কথিত হইল, তাহাতে মন্ত্র, অঙ্গন্যাস, করন্যাস এবং ধ্যান কিরূপ? বৈদিক, তান্ত্রিক, পৌরাণিক,

---

* Trilochan sent a messenger Dandi's to the or priests of the famous College of Mahadeva in Sagar island.

J.A.S.B.--Vol. XIX

রাজমালা — ১৬

প্রথম লহর — ১৩৮ পৃষ্ঠা।

হর (শঙ্কর)।

উমা (শঙ্করী)।

ইহার কোন্ মহানুসারে তৎসমুদয় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে? সমুদয় বিস্তারিত-রূপে বর্ণন কর, শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে।"

চন্তায়ি বলিল---"মহারাজ! যাহা জিজ্ঞাসা করা হইল, তৎসমুদয় অতি গোপনীয়, কখনও প্রকাশযোগ্য নহে, প্রকাশ করিলে ইষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাৎ ঘটে। বিশেষতঃ তাহাতে পাপ জন্মে। সেই সমুদয় প্রায়ই বেদ তন্ত্রোক্ত, কোন কোন অংশ পুরাণোক্তও আছে। গুপ্তার্চ্চন-চন্দ্রিকায় বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ দেবতার অর্চ্চনা গোপনীয় হইলেও, ভবদীয় কুলদেবতা হেতুক সংক্ষেপে তৎমন্ত্র ধ্যানাদি আপনকার সমীপে বলিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন। গুপ্তার্চ্চনচন্দ্রিকাতে অপরাপর জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে। মহারাজ! সেই গ্রন্থ দেবালয়ে আছে, আমাদিগের সম্মুখে পূজাদি বিষয় দৃষ্ট হইয়া থাকে।"

ইহার পরে ধ্যানগুলি লিখিত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ দেবতার অর্চ্চনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সূর্য্য ও চন্দ্রের অর্চ্চনা করা হয়, সুতরাং উক্ত দেবতাদ্বয়ের ধ্যান সর্ব্বাগ্রে লিখিত হইয়াছে। সূর্য্য এবং চন্দ্র চতুর্দ্দশ দেবতার অন্তর্ভুক্ত নহেন, এজন্য সেই দুইটী ধ্যান এস্থলে উদ্ধৃত হইল না। চতুর্দ্দশ দেবতার—অর্থাৎ শিব, উমা, হরি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিকেয়, গণেশ, ব্রহ্মা, পৃথিবী, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, মদন ও হিমালয়ের ধ্যান এই;—

(১) শিবের ধ্যান

যাঁহার শরীর রজত গিরি সদৃশ শুভ্র এবং রত্ন সদৃশ উজ্জ্বল, চন্দ্র যাঁহার মনোহর শিরোভূষণ, যাঁহার চারিহস্তে কুঠার, মৃগশিশু, বর এবং অভয় সুশোভিত, চতুর্দ্দিগ বেষ্টন করিয়া দেবগণ যাঁহার স্তুতি করিতেছে, যিনি ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক পদ্মাসনে উপবিষ্ট আছেন, যিনি বিশ্বের আদি, বিশ্বের বীজ, নিখিল জগতের ভয়হর্ত্তা, পঞ্চবদন, ত্রিনয়ন, সেই প্রসন্নমূর্ত্তি মহেশকে ধ্যান করিবে।*

(২) উমার ধ্যান

"যিনি সিংহোপরি উপবিষ্ট হইয়া চারি করে শঙ্খ, চক্র, ধনুঃশর ধারণ করিয়াছেন, মরকত সদৃশ যাঁহার দীপ্তি, চন্দ্র যাঁহার শিরোভূষণ, যাঁহার অঙ্গে মুক্তাহার এবং মুক্তাঙ্গদ শোভা পাইতেছে, কাঞ্চী ও নূপুর রণ রণ শব্দে বাজিতেছে,

* ধ্যানগুলি, শাস্ত্রোক্ত ধ্যানের সহিত অভেদ দৃষ্ট হয়। তুলনার নিমিত্ত সংস্কৃত ধ্যানগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে। শিবের ধ্যান,—

"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত গিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্না কল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগঃবরাভীতি হস্তং প্রসন্নং।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎস্তুমমরগনৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয় হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং।।"

যাঁহার কর্ণে রত্ন কুণ্ডল বিরাজ করিতেছে, সেই ত্রিনয়না দুর্গা তোমাদিগের দুর্গতি হরণ করুণ।''*

(৩) হরির ধ্যান

''যিনি পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া সূর্য্য মণ্ডলের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি কেয়ূর কনককুণ্ডল এবং কিরীটভূষিত, যাঁহার করে শঙ্খ, চক্র সুশোভিত, সেই চিত্তবিনোদন নারায়ণকে ধ্যান করিবেক।'' †

(৪) লক্ষ্মীর ধ্যান

''যিনি পদ্মাসনে অবস্থিত হইয়া বাম করে পদ্মকলিকা, দক্ষিণ করে বরমুদ্রা ধারণ করিয়াছেন, বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে পাশ, অক্ষমালা এবং পদ্মশ্রেণী শোভা পাইতেছে, যিনি সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিতা, গৌরাঙ্গী, অসামান্য রূপবতী এবং যিনি ত্রিলোকের জননী, সেই লক্ষ্মীদেবীকে ধ্যান করিবেক। ‡

(৫) সরস্বতীর ধ্যান

''যাঁহার মুক্তা সদৃশ কান্তিনিভা হইতে জ্যোৎস্নাজাল বিকাশ পাইতেছে, যাঁহার মস্তকে শশিকলা বিরাজিত, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে ব্যাখ্যা ও বর্ণমালিকা, বাম হস্তদ্বয়ে অমৃতপূর্ণ দিব্য ঘট এবং পুস্তক সুশোভিত, যিনি পীনপয়োধরা, ক্ষীণ মধ্যা, এবং যিনি মুক্তাহার প্রভৃতি বিবিধ আভরণে ভূষিতা, সেই শ্বেতবর্ণা সরস্বতীদেবীকে ধ্যান করিবেক। ¶

---

* ''সিংহস্থাং শশিশেখরা মরকতপ্রেক্ষা চতুর্ভির্ভুজৈঃ
শঙ্খং চক্রং ধনুঃশরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা।
আমুক্তাঙ্গদহার কঙ্কণ রণৎকাঞ্চী ক্বণন্নূপুরা পুরা
দুর্গা দুর্গতি হারিণী ভবতু বো রত্নোল্লসৎ কুণ্ডলা।।''

† ''ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী, নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টি।
কেয়ুরবান্ কনক কুণ্ডলবান্ কিরিটী, হারী হিরন্ময়বপুর্দ্ধৃত শঙ্খ চক্রঃ।।''

‡ ''পাশাক্ষ মালিকাম্ভোজ সৃণিভির্যাম্য সৌম্যয়োঃ
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ংত্রৈলোক্য মাতরং।
গৌরবর্ণাং সুরূপঞ্চ সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতাং
রৌক্ম পদ্ম ব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণে নতু।।

¶ ''মুক্তাকান্তিনিভাং দেবীং জ্যোৎস্নাজাল বিকাশিনীম
মুক্তাহার যুতাংশুভ্রাং শশিখণ্ড রিমণ্ডিতাম্।।
বিভ্রতীং দক্ষ হস্তাভ্যাং ব্যাখ্যাং বর্ণস্য মালিকাম্।।
অমৃতেন তথাপূর্ণং ঘটং ব্যাখ্যাং বর্ণস্য মালিকাম্।।
অমৃতেন তথাপূর্ণং ঘটং দিব্যঞ্চ পুস্তকম্।।
দধীতাং বাম হস্তাভ্যাং পীনস্তনভরান্বিতাম্।
মধ্যে ক্ষীণাং তথা স্বচ্ছাং নানারত্নাদিভূষিতাম্।।''

ক্ষমা (পৃথিবী)। অব্ধি (সমুদ্র)। গঙ্গা (ভাগীরথী)। শিখী (অগ্নি)। কাম (কন্দর্প)। হিমাদ্রি (হিমালয়)।

(৬) কার্ত্তিকেয়ের ধ্যান

"যিনি গৌরবর্ণ, দ্বিভুজ, শক্তিধারী, ময়ূরবাহন, যজ্ঞোপবীতে সুশোভিত, সেই বরদাতা কুমারকে ধ্যান করিবেক।"*

(৭) গণেশের ধ্যান

"যাঁহার শূর্পের ন্যায় কর্ণ, বৃহৎশুণ্ড, সর্পের যজ্ঞোপবীত শোভিত, যিনি রক্তবর্ণ খর্ব্বাকৃতি, স্থূলা, ত্রিলোচন মূষিক বাহন, সেই সুন্দর বিনায়ককে চিন্তা করি।" **

(৮) ব্রহ্মার ধ্যান

"যিনি চতুর্ভুজ, চতুর্ম্মুখ স্বর্ণবর্ণ, অগ্নিশিখা সদৃশ মহাদ্যুতি মান, স্থূলাঙ্গ, নবযুবা, যাঁহার পিঙ্গল জটাজাল এবং পিঙ্গললোচন সকল শোভিত, যাঁহার পরিধান মৃগচর্ম্ম, গ্রীবাদেশে কৃষ্ণাজিন রচিত উত্তরীয় এবং উপবীত, গলে শ্বেতমালা, কটিদেশে মৌঞ্জীয় মেখলা, জটান্তে অক্ষ ও অক্ষমালিকা, দক্ষিণ বাহুমূলে অক্ষসূত্র ও বাম বাহুদেশে কঙ্কণ, দক্ষিণ হস্তে স্রুক্ ও স্রব, বাম হস্তে ঘৃতস্থলী ও কুশ শোভা পায়, যিনি হংসোপরি পদ্মাসনে উপবিষ্ট, সেই পিতামহ ব্রহ্মাকে ধ্যান করি।" ‡

---

* "কার্ত্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরি সংস্থিতম্।
তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদম্
দ্বিভুজং শত্রুহন্তারং নানালঙ্কার ভূষিতম্।
প্রসন্ন বদনং দেবং কুমারং পুত্রদায়কম্।।"

** "খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং
প্রস্যন্দন্মদগন্ধ লুব্ধ-মধুপ-ব্যালোল গণ্ডস্থলং।
দন্তাঘাত-বিদারিতারি রুধিরৈঃ সিন্দুর-শোভাকরং
বন্দে শৈল সুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদং।।

‡ ওঁ ব্রহ্মা কমণ্ডলুধরশ্চতুর্বক্ত্রশ্চতুর্ভুজঃ।
কদাচিৎ রক্তকমলে হংসারূঢ়ঃ কদাচন।।
বর্ণেন রক্ত গৌরাঙ্গঃ প্রাংশুস্তুঙ্গাঙ্গ উন্নতঃ।
কমণ্ডলুর্ব্বামকরে স্রবো হস্তেতু দক্ষিণে।।
দক্ষিণাধস্তথামলা বামধশ্চ তথাস্রুবঃ।
আজ্যাস্থলী বামপার্শ্বে বেদাঃ সর্ব্বহগ্রস্থিতাঃ।।
সাবিত্রী বামপার্শস্থা দক্ষিণস্থা সরস্বতী।
সর্ব্বেচ ঋষয়োহ্যগ্রে কূর্য্যাদেভিশ্চ চিন্তনং।।"

(৯) পৃথিবীর ধ্যান

“যাঁহার শত চন্দ্রতুল্য প্রভা, চম্পক সদৃশ বর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ চন্দনেচর্চ্চিত এবং রত্নভূষণে শোভিত, যাঁহার রক্তবর্ণ শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান, যিনি রত্নগর্ভা, রত্নাকরসমন্বিতা, অশেষ রত্নের আধার এবং সর্ব্বদা হাস্য বদনা, সেই বন্দনীয় পৃথিবীকে ভজনা করি।”*

(১০) সমুদ্রের ধ্যান

“বিধি মণিমাণিক্য সমাকীর্ণ, ক্ষৌম বস্ত্রধারী, বিপুলদেহ, দ্বিভুজ, মকরবাহন সিন্ধুকে ভজনা করি।”

(১১) গঙ্গার ধ্যান

“যিনি সুরূপা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেতা, সর্ব্বাবয়ব ভূষিতা, যাঁহার চন্দ্রায়ুধ সদৃশ প্রভা, যাঁহাকে শ্বেত চামরে ব্যঞ্জন করিতেছে, যাঁহার মস্তকোপরি শ্বেতছত্রশোভিত, সর্ব্বাঙ্গ চন্দনেচর্চ্চিত, যাঁহার মূর্ত্তি সুপ্রসন্ন, বদন শোভাময়, হৃদয় করুণাপ্রবণ, যিনি দেবগণ কর্ত্তৃক বন্দনীয়া এবং যিনি ভূ-পৃষ্ঠ সর্ব্বদা সুধা-প্লাবিত করিতেছেন, সেই ত্রিলোক মাতা গঙ্গাকে ধ্যান করি। †

(১২) অগ্নির ধ্যান

“যিনি দধিচিবংশজাত, ঘৃত-কৌশিক-প্রবর, লম্বোদর, স্থূলকায়, ত্রিনেত্র, চতুর্ভুজ যাহার দক্ষিণ হস্তদ্বয় স্রুক এবং অজশুদ্ধি, বাম ঊর্দ্ধহস্তে শক্তি এবং অধো হস্তে যজ্ঞীয় পাত্র বিশেষ। যিনি যোগাভ্যাসে রত হইয়া রক্তবস্ত্র দ্বারা বদন আবৃত করিয়াছেন এবং যিনি অসংখ্য শিখা ও সপ্তজিহ্বাসমন্বিত হইয়া মহাদীপ্তি সহকারে প্রস্ফুরিত প্রজ্জ্বলিত হইতেছেন, সেই অগ্নিদেবকে ধ্যান করিবেক।” ‡

---

* “ওঁ সর্ব্বলোক ধরাং প্রমদা রূপাং।
দিব্যাভরণভূষিতাং ধরাং পৃথিবীম্।।”

† স্বরূপাং চারুনেত্রাঞ্চ চন্দ্রাযুত সম প্রভাম্।
চামরৈর্বীজ্যমানাঞ্চ শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতম্।।
সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্রনিজান্তরাম্।
সুধাপ্লাবিতভূপৃষ্ঠাং মার্দ্রগন্দানুলেপনাম্।।
ত্রৈলক্য নমিতাং গঙ্গাং বেদাদিভিরভিষ্টুতাম্।।

‡ ‘পিঙ্গভ্রূ-শ্মশ্রু কেশাক্ষাঃ পানাঙ্গ জঠরোহরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোহগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিশক্তিধারকঃ।।”

(১৩) কন্দর্পের ধ্যান

"যিনি ধনুর্ব্বাণধারী, রূপবান, বিশ্বমোহন, শ্যামল পদ্মের ন্যায় যাঁরা বর্ণ দীপ্তি, পঙ্কজ সদৃশ যাঁহার লোচন, সেই কামদেবকে ধ্যান করিবে।"*

(১৪) হিমালয়ের ধ্যান

"যিনি দ্বিনেত্র, দ্বিভূজ গৌরবর্ণ, দেবমণ্ডলীর দ্বারা সমাবৃত, রক্তবস্ত্রধারী, পর্ব্বতগণের অধিপতি, সেই হিমাদ্রিদেবকে ধ্যান করিবেক।"

আষাঢ় মাসের শুক্লাষ্টমী চতুর্দ্দশ দেবতার বিশেষ-অর্চ্চনার নির্দ্ধারিত দিন, একথা পূর্ব্বেও একবার বলা হইয়াছে। † এই দেবতা প্রতিষ্ঠার সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত উক্ত তিথিতে বিপুল সমারোহের সহিত দেবতার বার্ষিক অর্চ্চনা চলিয়া আসিতেছে। এই উৎসবকে "খার্চ্চি পূজা" বলে। ইহা চতুর্দ্দশ দেবতার একটী প্রধান উৎসব বলিয়া পরিগণিত; এই তিথিতেই দেবতাসমূহ প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল। খার্চ্চি পূজার পূর্ব্বদিবস অপরাহ্নে চতুর্দ্দশ দেবতা নদীতে নিয়া স্নান করান হয়। এই সময়ের দৃশ্য এবং ক্রিয়াকলাপ সকল সম্প্রদায়েরই দর্শনীয়।

খার্চ্চিপূজা

খার্চ্চিপূজার চৌদ্দ দিবসের অব্যবহিত পরবর্ত্তী শনি কিম্বা মঙ্গল বারে, আর একটী বিশেষ অর্চ্চনা হয়, তাহাকে "কের পূজা" বলে। এই পূজা চতুর্দ্দশ দেবতার অর্চ্চনা না হইলেও তৎসহ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। চন্তাই এই পূজার প্রধান কর্ত্তা, পূজা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, একটী এলাকা নির্দ্ধারণ করা হয়। সেই এলাকার মধ্যে, অর্চ্চনা কালে কাহারও জন্ম বা মৃত্যু হইলে, পূজা পণ্ড হইয়া থাকে এবং তাহা অমঙ্গলসূচক ঘটনা বলিয়া ধরা হয়। এজন্য পূজা আরম্ভের পূর্ব্বেই বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া আসন্নপ্রসবা রমণী ও মৃত্যু আশঙ্কিত নরনারীদিগকে পূর্বোক্ত সীমানার বাহিরে নেওয়া হয়। অর্চ্চনাকালে মনুষ্য ও গৃহপালিত পশু ইত্যাদি বাড়ীর বাহির হওয়া নিষিদ্ধ। এই সময়ের জন্য কেহই জামা, জুতা, খড়ম, পাগড়ী ও ছাতা ব্যবহার করিতে পারে না এবং গীতবাদ্য, কোলাহল, এমন কি উচ্চরবে কথা বলা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। স্বয়ং মহারাজও বিশেষ দৃঢ়তার সহিত এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ‡ এই

কের পূজা

---

* ওঁ চপেষুধৃক্ কামদেবো রূপবান্ বিশ্বমোহনঃ।
ধ্যেয়ো বসন্ত সহিতো রত্যালিঙ্গিত বিগ্রহঃ।।"

† চতুর্দ্দশ দেব পূজা করিব সকলে।
আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী হইলে।। ত্রিপুরখণ্ড,—১৫ পৃষ্ঠা।

‡ দ্বিজ বঙ্গচন্দ্রে রচিত 'ত্রিপুর বংশাবলী' নামক হস্তলিখিত কবিতা পুস্তকে এই অনুষ্ঠানকে 'মহামুদ্রা' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। যথা :—

সময় এক দিন দুই রাত্রি লোকদিগকে পূর্ব্বোক্তরূপে অবরুদ্ধ থাকিতে হয়। বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদনার্থ কিয়ৎ কালের নিমিত্ত নাগরিকগণ বাহির হইবার অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহা তোপ-ধ্বনি দ্বারা ঘোষিত হইয়া থাকে। পুনর্ব্বার তোপধ্বনি হইলে, সকলকেই গৃহে প্রবেশ করিতে হয়, আবার তোপ-ধ্বনি না হওয়া পর্যন্ত বাহিরে যাওয়া এবং গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটন করা নিষিদ্ধ। এই অর্চ্চনা দ্বারা দেশ নিরাপদ হইয়া থাকে এবং এই পূজার সাফল্যের উপর এক বৎসরের নিমিত্ত রাজ্যের শুভাশুভ নির্ভর করে, ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। প্রথম বারের পূজায় কোনরূপ বাধা বিঘ্ন সঙ্ঘটিত হইলে, পুনর্ব্বার সপ্তাহ মধ্যে শনি কিম্বা মঙ্গল বারে বিশেষ সতর্কতার সহিত পূজা সম্পাদন করা হয়। রাজধানীর পূজা নিরাপদে নির্ব্বাহ হইবার পরে, প্রত্যেক পার্ব্বত্য পল্লীতে পূর্বোক্ত নিয়মে "কের-পূজা" হয়। তৎকালে বাহিরের লোক পল্লীতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ।

প্রথম লহরের ৩৩ পৃষ্ঠায়, ত্রিলোচন খণ্ডে পাওয়া যাইতেছে,—"গ্রামমুদ্রা করিছিল যেন রাজনীতি।" গ্রাম নিরাপদে রাখিবার অভিপ্রায়ে দেবতার অর্চ্চনা করাকে 'গ্রামমুদ্রা' বলে। কেরপূজা রাজ্যের ও প্রকৃতিপুঞ্জের কল্যাণ কামনায় সম্পাদিত হয়, সুতরাং ইহা গ্রামমুদ্রা অপেক্ষাও গুরুতর। নগরের অর্চ্চনাই এই পূজার প্রধান অঙ্গ, সেই অঙ্গকে সাধারণতঃ 'নাগরাই' বা (নগর) পূজা বলা হয়।

কের পূজার নীরবতায় ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। এই পূজার আনুষ্ঠানিক কার্য্যকলাপ যিনি না দেখিয়াছেন, ইহার গাম্ভীর্য্য তাঁহার ধারণার অতীত। এই সময় সমগ্র নগরকে জন প্রাণীর সম্বন্ধ বিবর্জ্জিত বলিয়া মনে হয়। গৃহপালিত পশ্বাদি পর্য্যন্ত বাহির করা নিষিদ্ধ। চতুর্দ্দিকে নীরব নিস্তব্ধ রুদ্ধ দ্বার গৃহগুরি প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, যেন রূপকথায় বর্ণিত জন-প্রাণী-হীন কোন মায়াপুরে উপস্থিত হইয়াছি! কের পূজার কালে নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাহারও জন্ম বা মৃত্যু হইলে এবং গান, বাদ্য কোন প্রকারের শব্দ, জনতা, কোলাহল, এমন কি উচ্চরবে কথা বলিলে পূজার বিঘ্ন ঘটে। এই সময় কাহারও গৃহে অগ্নি রাখিবার অধিকার পর্য্যন্ত নাই।

কের পূজার মূল তত্ত্বানুসন্ধান

এই সকল কার্য্য স্থিরচিত্তে আলোচনা করিলে, কেরপূজার উদ্দেশ্যে যে কত ঊর্দ্ধে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। ইহা সৃষ্টির প্রাক্‌কালের পরিকল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

"কেরনামে মহামুদ্র থাকে আড়াই দিন।
গালিম মন্ত্রে সেই মুদ্র চন্তাই অধীন।।
সেই আড়াই দিন যদি জন্ম মৃত্যু হয়।
তবে জান কের-মুদ্রা মূলে নষ্ট হয়।" ইত্যাদি।

যে কালে আলোক ছিল না—নাদ ছিল না—প্রাণী ছিল না—জন্ম মৃত্যু ছিল না, অন্ধকারময় নীরবতাই যে কালের একমাত্র সম্বল ছিল, ইহা সেই কালের চিত্র। রাজমালায় পাওয়া যায়, চতুর্দ্দশ দেবতা প্রতিষ্ঠার দিনে অন্য দেবতাগণ পূজার মন্দিরে আগমন করিলেন, কিন্তু বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইল না। তাঁহাদিগকে আনিবার নিমিত্ত রাজাসহ চন্তাই ক্ষীরোদ সাগরের তীরে গমন করিয়াছিলেন।* এতদ্বারাও সৃষ্টির প্রারম্ভের আভাসই পাওয়া যাইতেছে। আরও দেখা যায়, সৃষ্টির সূচনায় গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া নাদের উদ্ভাবের ন্যায়, কেরপূজার নীরবতার মধ্যে, 'ভেমরাই' বা 'ভোমরার' ভোঁ ভোঁ শব্দ মাঝে মাঝে যেন সাড়াহীন বিশ্বে নাদের সৃষ্টি করিতেছে। † প্রদোষকালে 'নাগরাই' পূজার সময় বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণ দ্বারা নূতন অগ্নি উৎপাদন করিয়া তদ্বারা পূজার কার্য্য নির্ব্বাহ করা হয় এবং নাগরিকগণ সেই কল্যাণকর অগ্নি লইয়া, ঘরে ঘরে নূতন বহ্নির স্থাপনা করে। এই অগ্নি গ্রহণের দৃশ্যও অদ্ভূত। অন্ধকারাবৃত নগরময় অসংখ্য উল্কা প্রবাহের ছুটাছুটি দর্শন করিলে, সৃষ্টির প্রথম জ্যোতিঃ স্ফুরণের কথা স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, কের পূজার প্রধান উদ্দেশ্য, বৎসরে একবার প্রকৃতিপুঞ্জকে নব সৃষ্টির কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া। একটী বৎসরের সঞ্চিত পাপতাপাদি ঝাড়িয়া ফেলিয়া সকলেই সুপবিত্র নব-উজ্জীবিত জীবনে সংসারক্ষেত্রে অগ্রসর হউক, ইহা জানাইয়া দেওয়াই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ধর্ম্মাচরণের সহিত তত্ত্ব-উপদেশের এবম্বিধ উচ্চ আদর্শ অন্য কোথাও আছে বলিয়া জানি না।

চতুর্দ্দশ দেবতার প্রভাব

ত্রিপুরেশ্বরগণ বংশপরম্পরা-ক্রমে চতুর্দ্দশ দেবতার প্রতি বিশেষ আস্থাবান; ত্রিপুরার ইতিহাসে ইহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন নৃপতিবৃন্দ অনেক সময় চন্তাইর মুখে চতুর্দ্দশ দেবতার প্রত্যাদেশ অবগত হইয়া অনেক কার্য্য করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ দেবতা, সেনাপতিরূপে, সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধ জয় করিয়াছেন, এরূপ বিশ্বাসের দৃষ্টান্তও ইতিহাসে বিরল নহে। এই সকল দৃষ্টান্ত নৃপতিগণের কুলদেবতার প্রতি অচলা ভক্তি ও দৃঢ়-নির্ভরতার পরিচায়ক। কালক্রমে কূটচক্রী লোকের হস্তেও এহেন পবিত্র ও দায়িত্বপূর্ণ চন্তাইয়ের কার্য্যভার পতিত হইয়াছে। কোন কোন দুষ্টবুদ্ধি চন্তাই, স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে বা দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে,

* রাজমালা—ত্রিলোচন খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা।

† কেরপূজার সময় বাঁশের প্রশস্ত চটার এক মাথায় ছিদ্র করিয়া তাহাতে দড়ি বাঁধা হয়। সেই দড়ির অপর মাথা ধরিয়া সবেগে ঘুরাইলে, চটায় বাতাসের আঘাত লাগিয়া ভোঁ ভোঁ শব্দ হয়। সেই শব্দ অতি উচ্চ, গম্ভীর এবং দূরগামী।

অথবা রাজদ্রোহীদলের বশবর্ত্তী হইয়া, চতুর্দশ দেবতার প্রত্যাদেশের ভাণ করিয়া, নানাবিধ অনর্থ ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্তও ত্রিপুরার ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়। এস্থলে তদ্রূপ একটীমাত্র ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

মহারাজ বিজয় মাণিক্য দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী এবং রাজনীতিকুশল ভূপতি ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে (খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে) চট্টগ্রামে পাঠানবাহিনীর সহিত আট মাস কাল ত্রিপুরার ভীষণ সংগ্রাম হয়। এই যুদ্ধে পরাজিত পাঠান সেনাপতি মোমারক খাঁ (মতান্তরে মহাম্মদ খাঁ) ধৃত ও লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ অবস্থায় রাজদরবারে নীত হইলেন। এই মোমারক গৌড়েশ্বর দাউদশাহের শ্যালক ছিলেন।* ধৃত শত্রুকে দেবতা সমক্ষে বলি প্রদান করা ত্রিপুরার তদানীন্তন প্রথা থাকিলেও মমারক খাঁকে বধ করিতে মহারাজ অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু চন্তাইর ইচ্ছা অন্যরূপ। খাঁ সাহেবকে দরবারে উপস্থিত করা মাত্রই,—

চন্তাইগণের প্রাধান্য

"দুর্ল্লভ চন্তাই নাম রাজাতে যে কহে।
চতুর্দ্দশ দেবে বলি খাঁকে দিব তাহে।।
নৃপতিয়ে বলে চন্তাই উচিত না হয়।
মমারক খাঁ বড়লোক সর্ব্বলোকে কয়।।

রাজমালা—বিজয়মাণিক্য খণ্ড।

চন্তাই বুঝিলেন, দেবতার দোহাই না দিলে এই কার্য্যে রাজার সম্মতি লাভ করা কঠিন হইবে। তাই;—

"চন্তাই বলে খাঁকে বলি দিবার তরে।
দেবতার আজ্ঞা হৈছে বলিল রাজারে।।"—রাজমালা

দেবতার প্রত্যাদেশ শুনিয়া ধর্ম্মপ্রাণ রাজা বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন, ইতি কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া,—

"নিঃশব্দে রহিল রাজা, অনুমতিজ্ঞানে।
চন্তাইয়ে খাঁকে নিল রত্নপুর স্থানে †।।"—রাজমালা।

পর দিবস মমারক খাঁকে চতুর্দ্দশ দেবতার সম্মুখে বলি প্রদান করা হইল। এই সূত্রে গৌড়ের সহিত ত্রিপুরার মনোমালিন্য বদ্ধমূল হইয়াছিল। চন্তাইগণের এবম্বিধ কার্য্যের দৃষ্টান্ত রাজমালায় বিস্তর পাওয়া যাইবে।

---

* মমারক খাঁ নামেত গৌরেশ্বরের শালা।
মহাবীর পরাক্রম যুদ্ধে অতি ভালা।" রাজমালা, বিজয়মাণিক্যখণ্ড।

† উদয়পুরের যে স্থানে চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দির ছিল, সেস্থানের নাম রত্নপুর। এই স্থানে মহারাজ রত্নমাণিক্যের বাড়ী ছিল।

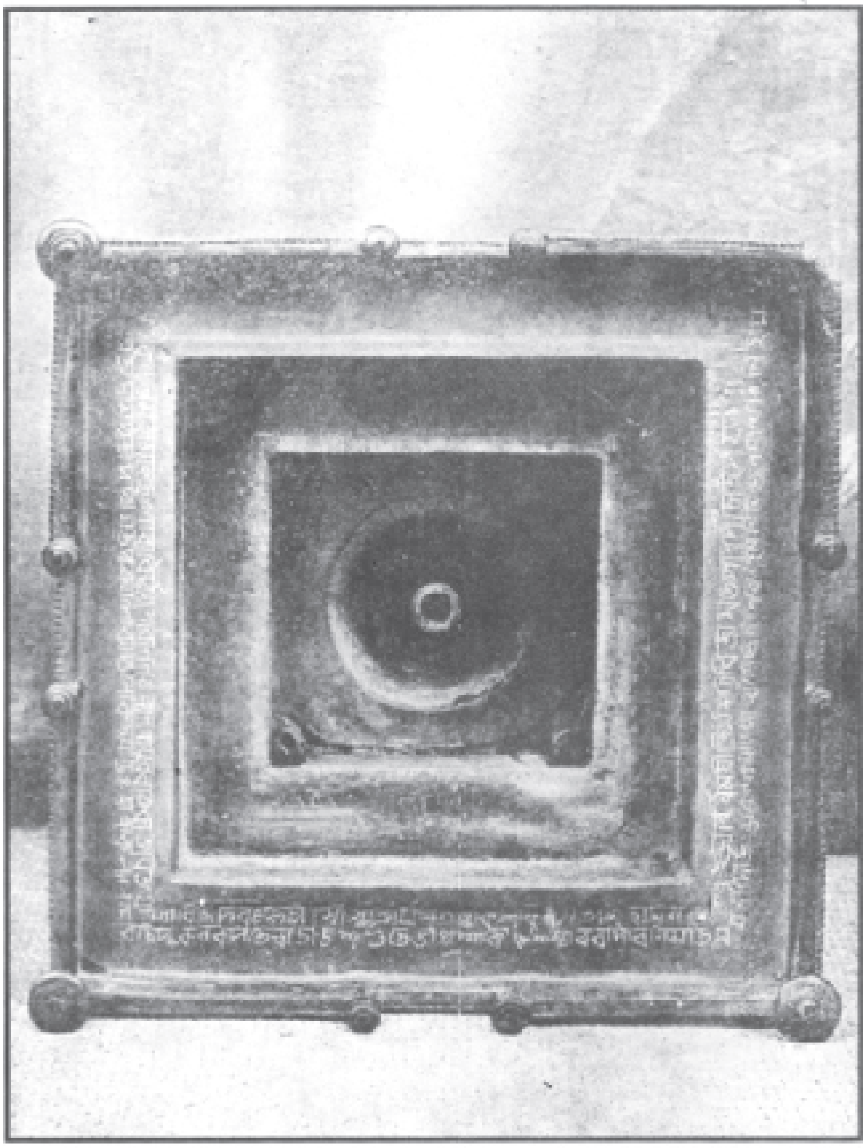

চতুর্দ্দশ দেবতার সিংহাসনস্থিত তাম্র ফলক।

চতুৰ্দ্দশ দেবতার বর্ত্তমান সিংহাসন মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের প্রদত্ত। উক্ত সিংহাসনের উপরিভাগে সংস্থাপিত তাম্রফলকে যে শ্লোক লিখিত আছে, তদ্দ্বারা জানা যায়, উক্ত সিংহাসন 'স্বর্ণময়ী' নাম্নী গিরিজাকে অর্পণ করা হইয়াছিল।* তৎপর কোন্ সময়ে কি কারণে তাহা চতুৰ্দ্দশ দেবতার ব্যবহারে আসিয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। তাম্রপাত্রে খোদিত শ্লোক নিম্নে দেওয়া গেল,—

চতুৰ্দ্দশ দেবতার সিংহাসন

'শ্রীকল্যাণমহীমহেন্দ্রতনয়ো বৈর্য্যুগ্র দাবানলঃ
শ্রীলশ্রীযুবরাজ রাজবিজয়ী গোবিন্দ দেবঃ কৃতী।
দীপ্যদ্দীর্ঘ শটাপ্তকেশরিলসৎসিংহাসনং শোভনং
ভক্ত্যা স্বর্ণময়ীতি সংজ্ঞগিরিজা সৎপাদপদ্মেহর্পয়ৎ। (১)
অত্যুদ্দাম প্রতাপপ্রথিত পুরুযশা (২) ব্যাপ্ত লোকত্রয়াস্তঃ
শ্রীশ্রীকল্যাণদেব ত্রিপুর নরপতেরাত্মজশ্চণ্ডতেজাঃ।
শাকেহঙ্গ গ্রাববাণাবণিমতি সমদাদৌৰ্জ্জশুক্লে (৩) নবম্যাং
শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবো হিমগিরিতনয়ায়ৈ হি সিংহাসনা গ্র্যং।

(অনুবাদ)

"ভূমণ্ডলে ইন্দ্রতুল্য শ্রীকল্যাণ মাণিক্যের পুত্র, শত্রুদিগের সম্বন্ধে ভীষণ দাবানল, রাজগণের বিজেতা কৃতী যুবরাজ গোবিন্দদেব দীপ্তিশালী ও দীঘকেশরযুক্ত কেশরীসমূহে শোভমান মনোহর সিংহাসন ভক্তিসহকারে 'স্বর্ণময়ী' নাম্নী দেবী পাৰ্ব্বতীর চরণে অর্পণ করিলেন।"

"নরপতি কল্যাণদেবের পুত্র, অত্যুগ্র প্রতাপ দ্বারা যাঁহার যশ ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত হইয়াছে, সেই প্রচণ্ডতেজা শ্রীগোবিন্দদেব ১৫৭১ শকে কার্ত্তিক মাসের শুক্ল নবমী তিথিতে এই উৎকৃষ্ঠ সিংহাসন হিমগিরি তনয়াকে সম্প্রদান করিলেন।"

---

* মহারাজ ধন্যমাণিক্য এক মণ সুবর্ণ দ্বারা ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি নিৰ্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। তদ্ভিন্ন স্বর্ণময়ী প্রতিমা স্থাপনের কথা জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ উক্ত সিংহাসন এই দেবীর ব্যবহারে ছিল। দেবীমূর্ত্তি অপহৃত হইবার পরে, তাহা চতুৰ্দ্দশ দেবতার ব্যবহারে আসিয়াছে।

(১) 'অর্পয়ৎ' ব্যাকরণ দুষ্ট। 'আর্পয়েৎ' হওয়া সঙ্গত ছিল।

(২) 'যশা' স্থলে 'যশো' হওয়া সঙ্গত।

(৩) 'শুক্লে নবম্যাং' ব্যাকরণ দুষ্ট।

এই সিংহাসনের কথা আলোচনা করিতে যাইয়া আমাদের আর একটী কথা মনে পড়িতেছে। সিংহাসন-দাতা মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য রাজ্যভ্রষ্ট অবস্থায় কিয়ৎকাল আরাকান রাজের আশ্রয়ে ছিলেন। সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে, আরাকানের মঘনৃপতি, গোবিন্দ মাণিক্যকে যে সকল বিদায় উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে পাওয়া যায়,—

আরাকান রাজের প্রদত্ত সিংহাসন

"কতঘর মঘ, অষ্টধাতু সিংহাসন!
দেবজন্যে মঘরাজা করিল অর্পণ।।"

রাজমালা—গোবিন্দ মাণিক্য খণ্ড।

আরাকান রাজের প্রদত্ত সিংহাসন কোথায় কি অবস্থায় আছে, বর্ত্তমানকালে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ত্রিপুরার অন্য কোন দেবালয়ে আরাকানপতি দত্ত সিংহাসন অথবা অষ্টধাতু নির্ম্মিত সিংহাসন আছে, এমন জানা যায় না।

চতুর্দ্দশ দেবতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অতীত ঘটনাবলী স্মরণ করিলে হৃদয়ে স্বতঃই যেন কি এক বিভীষিকা মিশ্রিত ভক্তি-রসের সঞ্চার হয়। যে বিগ্রহকে পঞ্চ সহস্র বর্ষকাল যাবত হিন্দু, মুসলমান ও কিরাত প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর কোটী কোটী আর্য্য ও অনার্য্য ধর্ম্মপ্রাণ ভক্ত অর্চ্চনা ও ভক্তি করিয়া আসিতেছে, সেই বিগ্রহের গৌরব বা গাম্ভীর্য্য কম নহে, একথা অতি সহজবোধ্য।

ত্রিপুর রাজবংশের অন্যান্য কুলদেবতা (ঁবৃন্দাবনচন্দ্র, ভুবনমোহন, লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রভৃতি বিগ্রহ) সম্প্রদায় বিশেষের উপাস্য। চতুর্দ্দশ দেবতা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাস্য চৌদ্দটী দেবতার সমষ্টি বিধায়, তৎপ্রতি সকল সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকৃষ্ট হইয়াছে।

কত পরাক্রমশালী বীরের উত্তপ্ত শোণিতে দেব-মন্দির প্রক্ষালিত হইয়াছে, কতকোটী নর ও পশ্বাদির জীবন এই দেবদ্বারে আহুতি প্রদান করা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে? এই সকল কথা ভাবিতে গেলে, হৃদয়ে বিষম বিভীষিকার ছায়াপাত হয়। বর্ত্তমানকালে নরবলি বাদ পড়িয়া থাকিলেও প্রতিবৎসর অসংখ্য পশু-বলি দ্বারা দেবতার অর্চ্চনা চলিতেছে। অসংখ্য হংস এবং পারবতও বলি দেওয়া হয়। এই সকল বলি কামরূপ প্রদেশে যে ব্যবস্থেয়, পূর্ব্ববর্ত্তী ২৯ পৃষ্ঠার পাদটীকায় তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে; এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কালিকাপুরাণের ৫৫ অধ্যায়েও পক্ষী বলিদানের ব্যবস্থা পাওয়া যায়।

চতুর্দ্দশ দেবতার সিংহাসন।

রাজ-চিহ্ন

মহারাজ ত্রিলোচনের রাজ্যাভিষেক উৎসবের বর্ণন উপলক্ষে রাজমালায় লিখিত হইয়াছে ;—

রাজলাঞ্ছনা

"বসাইল সিংহাসনে মোহর মারিল।
শিব আজ্ঞা অনুসারে দ্বি-ধ্বজ করিল।।
চন্দ্রের বংশেতে জন্ম চন্দ্রের নিশান।
শিব বরে ত্রিলোচন ত্রিশূল-ধ্বজ তান।।

ত্রিলোচন খণ্ড,—১৭ পৃঃ।

এতদ্ব্যতীত আরও কতিপয় বস্তু ও উপাধি ত্রিপুরার রাজচিহ্ন মধ্যে পরিগণিত। যথাস্থানে তাহারও নাম এবং বিবরণ উল্লেখ করা হইবে।

রাজলাঞ্ছন আধুনিক বস্তু নহে। প্রাচ্য প্রদেশ হইতে প্রতীচ্যগণ ইহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহাভারতে পাওয়া যায়, অর্জ্জুনের পতাকা হনুমানলাঞ্ছিত ছিল, তাহা 'কপিধ্বজ' নামে অভিহিত হইত। প্রাচীনকালে, রাজপুতগণের মধ্যে রাজ-লাঞ্ছন ব্যবহৃত হইত। মেবারের রাজ-পাতাকা রক্তবর্ণ, তাহার মধ্যস্থলে সুবর্ণমণ্ডিত সূর্য্যমূর্ত্তি অঙ্কিত হইত। অম্বরের পতাকা পঞ্চরঙ্গবিশিষ্ট। চন্দেরি রাজ্যে সিংহ-লাঞ্ছিত পতাকার প্রচলন ছিল। ইয়ুরোপের সমস্ত রাজগণই বর্ত্তমানকালে রাজচিহ্ন ব্যবহার করিয়া থাকেন।

রাজলাঞ্ছনের প্রাচীনত্ব

ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দ বহু প্রাচীনকাল হইতে রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া আসিতেছেন। ত্রিপুরার রাজ-লাঞ্ছন মধ্যে নিম্নলিখিত নয়টী চিহ্নের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।*

রাজচিহ্নের বিবরণ

১। চন্দ্রবাণ বা চন্দ্রধ্বজ।
২। ত্রিশূল ধ্বজ বা সূর্য্যবাণ।
৩। মীন-মানব। (মাইমূরত)।

* ত্রিপুরায় তদানীন্তন পররাষ্ট্র-সচিব, শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের বর্ত্তমান চিফ্ সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত দেওয়ান বিজয়কুমার সেন, এম, এ, বি, এল, মহাশয় এতদ্বিষয়ক যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত বিবরণ ও উল্লিখিত "ত্রিপুরার রাজ-চিহ্ন" শীর্ষ প্রবন্ধ (ভারতবর্ষ—১৩২৩, প্রথম সংখ্যা) অবলম্বনে ইহা লিখিত হইল।

৪। শ্বেতছত্র।

৫। আরঙ্গী।

৬। তাম্বুল পত্র (পান)।

৭। হস্ত চিহ্ন (পাঞ্জা)।

৮। রাজ-লাঞ্ছন (Coat of Arms)

৯। সিংহাসন।

এই সকল চিহ্নের মধ্যে কোন্‌টী কি অর্থে বা কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এস্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে।

১। চন্দ্রবাণ বা চন্দ্র-ধ্বজ

ইহা সুবর্ণ নির্ম্মিত অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি চিহ্ন, সুদীর্ঘ রৌপ্য দণ্ডের উপর অবস্থিত। ত্রিপুর রাজবংশ চন্দ্র হইতে সমুদ্ভূত, তাহার নির্দর্শন স্বরূপ স্মরণাতীত কাল হইতে ভূপতিগণ এই চিহ্ন ধারণ করিয়া আসিতেছেন। রাজ দরবারে যে সম্প্রদায়ের লোক এই চিহ্ন ধারণ করে, তাহাদের উপাধি 'ছত্রতুইয়া'।* ইহা সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে ধারণ করা হয়।

২। ত্রিশূল ধ্বজ বা সূর্য্যবাণ

ইহাও সুবর্ণ নির্ম্মিত ত্রিশূলাকারের চিহ্ন। এই চিহ্ন রৌপ্য দণ্ডের উপর সংস্থাপিত। ইহার মূলে একটী ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত রহিয়াছে। মহারাজ যযাতির পুত্র দ্রুহ্য হইতে গণনায় অধস্তন ৩৯শ স্থানীয় মহারাজ ত্রিপুর, প্রজাপীড়ক ও বিবিধ দুষ্কর্ম্মান্বিত হওয়ায়, প্রকৃতিপুঞ্জের আর্ত্তনাদে ব্যথিতহৃদয় শূলপাণি কোপাবিষ্ট হইয়া, ত্রিপুরের বিনাশ সাধন করেন। অতঃপর সম্ভাবিত-সন্ততি রাজমহিষী হীরাবতী পুত্রকামনায় ভূতভাবন ভবানীপতির আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার উগ্রতপস্যার ফলে আশুতোষ পরিতুষ্ট হইয়া প্রত্যাদেশ করিলেন,---"তোমার গর্ভে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন এক পুত্ররত্ন জন্মগ্রহণ করিবে। সেই পুত্র ত্রিলোচন নামে অভিহিত হইয়া রাজকুল গৌরবান্বিত করিবে।" মহাদেব আরও বলিলেন,---

"দুই ধ্বজ করিবা যে তার আগে চিহ্ন।
চন্দ্রবংশে চন্দ্রধ্বজ, ত্রিশূল ধ্বজ ভিন্ন।।"

ত্রিপুরা ভাষায় 'তুই' শব্দের অর্থ ধারণ করা। এই কারণে ছত্রবাহক শ্রেণীকে উক্ত উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। 'তুই' শব্দের অন্যতর অর্থ জল। এতদ্ব্যতীত বাহককে 'তুই নাই' বলা হয়, এই শব্দ হইতেও "ছত্রতুইয়া" নাম হওয়া বিচিত্র নহে।

চন্দ্রধ্বজ ও ত্রিশূলধ্বজধারী দ্বয়।

কথিত চন্দ্রধ্বজ ও ত্রিশূল ধ্বজ সম্বন্ধে সংস্কৃত রাজমালায় লিখিত আছে; —

"ত্রিলোচনোতি ধর্ম্মজ্ঞঃ শিবভক্তি পরায়ণঃ।
শিবাংশ জাতো নৃপতিশ্চন্দ্রশূল ধ্বজোহভবৎ।।"

শিবের কৃপা সঞ্জাত ত্রিলোচনকে প্রকৃতিপুঞ্জ শিবাংশ জাত বা শঙ্করের পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিল। তিনি চন্দ্রবংশসম্ভূত বলিয়া চন্দ্রধ্বজ ও শিবাংশজাত বলিয়া ত্রিশূলধ্বজ ধারণ করিলেন। রাজমালায় আছে; —

"শিব আজ্ঞা অনুসারে দ্বি-ধ্বজ করিল।।
চন্দ্রে বংশেতে জন্ম চন্দ্রের নিশান।
শিববরে ত্রিলোচন ত্রিশূল ধ্বজ তান।।
সেই হেতু ত্রিপুর রাজার হয় দুই ধ্বজ।"

ত্রিলোচন খণ্ড—১৮ পৃঃ

এই দুইটী লাঞ্ছন ত্রিপুর রাজবংশের প্রধান রাজ-চিহ্ন মধ্যে পরিগণিত। ত্রিলোচনের বিবাহ যাত্রাকালেও এতদুভয় চিহ্ন ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়; —

"চন্দ্রধ্বজ ত্রিশূলধ্বজ অগ্রেতে নিশানা।
সঙ্গে যত লোক চলে নাহিক গণনা।।"

ত্রিলোচনের সময় হইতে দরবারে, অভিযানকালে এবং সর্ব্ববিধ রাজকার্য্যে ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দ চন্দ্রধ্বজের সহিত ত্রিশূলধ্বজ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। চন্দ্রধ্বজের ন্যায় ত্রিশূলধ্বজও ছত্র তুইয়া সম্প্রদায়ের রাজভৃত্যকর্ত্তৃক সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে ধৃত হইয়া থাকে।

ত্রিপুরবাহিনী উক্ত ধ্বজদ্বয় ধারণ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অনেক রাজ্য জয় করিবার নিদর্শন ইতিহাসে পাওয়া যায়। মহারাজ যুঝার ফা রাঙ্গামাটি প্রদেশের অধিপতি লিকা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কালে; —

"আদৌ বিনির্গতস্তস্য চন্দ্রাঙ্কিত মহাধ্বজঃ।
তৎ পশ্চান্নির্গতস্তস্য ত্রিশূলাকারক ধ্বজঃ।।"

সংস্কৃত রাজমালা।

প্রাচীন কালে ধ্বজ (পতাকাকে) 'বাণা' বলা হইত, সেই 'বাণা' শব্দ হইতে

---

* পতাকাকে বাণা কিম্বা বাণ বলিবার দৃষ্টান্ত অন্যত্রও বিরল নহে। কৃষ্ণমালায় লিখিত আছে ;—

"দেখে বহু সৈন্য সঙ্গে শ্বেত রক্ত বাণ।
যুদ্ধ সজ্জে গতি যেন আগেতে নিশান।।"

প্রাচীন রাজমালায় পাওয়া যায়; —

"চন্দ্রধ্বজ ত্রিশূলধ্বজ চলিছে আগে বাণা।
শ্বেত ছত্র আরঙ্গি গাওল যেবা সোনা।।"

'চন্দ্রবাণ', 'ত্রিশূল বাণ' ইত্যাদি কথিত হইয়া থাকে।* চন্দ্র ও ত্রিশূল ধ্বজ ব্যতীত হনুমান লাঞ্ছিত পতাকাও ত্রিপুর রাজচিহ্নের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। ইহা চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের একটী কৌলিক চিহ্ন। অর্জ্জুনের হনুমান ধ্বজের কথা স্থানান্তরে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৩। মীন-মানব (মাইমূরত)

ইহাকে সাধারণতঃ 'মাইমূরত' বলা হয়। মাই—মৎস্য, এবং মূরত---মূর্ত্তি বা মানব। ইহার ঊর্দ্ধভাগ (কটিদেশ পর্য্যন্ত) নারীমূর্ত্তি, এবং কটির নিম্নভাগ মীনাকৃতি। মানবাংশ সুবর্ণ ও মীনাংশ রজত নির্ম্মিত। ইহাও রৌপ্য-দণ্ডের উপর স্থাপিত।

এই চিহ্ন মুসলমানগণের সময়ও (মোগল শাসন কালে) ব্যবহৃত হইত; সয়ের-উল্-মুতাক্খরিনে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। মুসলমানগণ এতজ্জাতীয় চিহ্নকে 'মাহীমারিতিব্' বলিত।

অন্য কোন কোন জাতির মধ্যেও ইহার ব্যবহারের নিদর্শন বিরল নহে। তাঁহাদের মধ্যে এই চিহ্ন বিশেষ সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ ব্যবহৃত হইত।

ত্রিপুর রাজ্যে এই চিহ্ন জল দেবীর (গঙ্গার) প্রতিমূর্ত্তি রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্ত একটী পতাকা সমন্বিত। প্রকৃতিপুঞ্জের নিকট রাজধর্ম্মের পবিত্রতা ঘোষণা করাই এই পবিত্রতাময়ী গঙ্গামূর্ত্তি ধারণের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই চিহ্ন ছত্রতুইয়া সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে ধৃত হয়।

অধ্যাপক শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ত্রিপুরার রাজ চিহ্নের বিবরণে, মুসলমানদিগের প্রদত্ত নামানুসারে অথবা এর উক্তিমতে এই চিহ্নের নাম 'মাহীমারতিব্' করিয়াছেন। এবং এতদুপলক্ষে তিনি বলিয়াছেন,---

"অশিক্ষিত লোকেরা ইহাকে 'মাহীমরাত' বা 'মাই মরাত' অথবা এমনকি 'মাইমুরত' পর্য্যন্ত বলিয়া থাকে।"

প্রকৃতপক্ষে 'মাহীমরাত' বা 'মাইমরাত' কেহ বলে না, এই নাম অমূল্য বাবু কোথায় পাইয়াছেন, অবগত নহি। এই চিহ্ন ত্রিপুরায় "মাহীমূরত" বা "মাইমূরত" নামে পরিচিত, এবং শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই তাহা বলিয়া থাকে। 'মাহী' বা 'মাই'---শব্দ দ্বারা মৎস্যকে বুঝায়। বিদ্যাভূষণ মহাশয়, মৎস্যজীবী সম্প্রদায় বিশেষের 'মাইফরাস' বা 'মাহীমাল' ইত্যাদি কৌলিক উপাধির কথা, অথবা মৎস্য ধৃত বিষয়ক মহালের "মাইমহাল" নামের কথা বিস্মৃত হইতে পারেন, কিন্তু ব্যক্তি বা মনুষ্যকে যে 'মূরত' বলা হয়, তাহা না জানিবার বিষয় নহে। এরূপ অবস্থায় অর্দ্ধনারী ও অর্দ্ধ মীনাকৃতি চিহ্নকে 'মাইমূরত' বা 'মাহীমূরত' বলিলেই লোককে

মাই মূরতধারী ছত্র তুইয়া।

শ্বেতছত্রধারী ছত্র তুইয়া।

অশিক্ষিত হইতে হইবে কেন, এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা কিছু দুষ্কর। এই চিহ্ন ত্রিপুর রাজ্যে প্রাচীনকালে হইতে যে নামে অভিহিত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানগণের অথবা ইংরেজের প্রদত্ত নাম গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাহা না করিলেই লোক অশিক্ষিত হইবে, অমূল্য বাবুর এই তীব্র বাক্যের কিছু মূল্য আছে কি?

চন্দ্রবাণ, ত্রিশূল বাণ, ছত্র, আরঙ্গী ও গাওল, রাজমালায় এই কয়টী চিহ্নের উল্লেখ পাওয়া যায়; মাইমূরতের উল্লেখ নাই। তাহা না থাকিলেও চিহ্নটী যে বিশেষ প্রাচীন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই চিহ্ন সম্বন্ধে সার রোপার লেথব্রীজ সাহেব (Sir Roper Lethbridge) স্বরচিত নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;---

"The family cognisanse is the device of a figure half man, half fish, said to be derived from the figure of a fish very widely borne on their flags by ancient Rajput chiefs."

লেথ্ব্রীজ এই চিহ্নটীকে ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দের বংশগত বিশেষ চিহ্ন বলিয়াও স্বীকার করিয়াছেন এবং রাজপুতগণের মধ্যে ইহা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। রাজপুতগণের ব্যবহৃত চিহ্নের বর্ণন স্থলে তিনি শিশু মৎস্যের, উল্লেখ করিয়াছেন, ত্রিপুরার চিহ্নে যে মৎস্য সংযোজিত হইয়াছে, তাহা শিশুমৎস্য বাচক নহে,—মকর বাচক। মকর গঙ্গার বাহন। মকর, মীন বা মৎস্য, সংজ্ঞক, এ কথার প্রমাণ অনেক আছে। প্রদ্যুম্নের মকরধ্বজকে 'মীনকেতন' বলা হয়; এই ধ্বজ ধারণের নিমিত্ত কামদেবের এক নাম 'মীন কেতন' হইয়াছে। গঙ্গার সহিত মীনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই, নারী মূর্ত্তির (গঙ্গামূর্ত্তির) নিম্নভাগে মীনাকৃতি সংযুক্ত হইয়াছে।

এই মূর্ত্তির দক্ষিণহস্ত পবিত্রতার ধ্বজাসমন্বিত, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বাম হস্তে একটী পদ্ম শোভা পাইতেছে। গঙ্গাদেবীর ধ্যানে তাঁহাকে 'কমল-করধৃতা' বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারাও এই চিহ্ন গঙ্গাদেবরী মূর্ত্তি বলিয়া গৃহীত হইবার পরিচয় পাওয়া যায়।

৪। শ্বেত-ছত্র

ইহা চন্দ্রবংশীয় নৃপতি ও প্রধান ব্যক্তিবৃন্দের একটী বিশেষ চিহ্ন। উত্তর গো-গৃহ সমরে সমবেত কৌরব বাহিনীর সম্মুখীন হইয়া বৃহন্নলারূপী অর্জ্জুন, উত্তরকে বলিয়াছিলেন;---

"যস্যৈতৎ পাণ্ডুরং ছত্রং বিমলং মূর্দ্ধ্নি তিষ্ঠতি।

* * * * *

এষ শান্তনবো ভীষ্মঃ সর্ব্বেষাং নঃ পিতামহঃ।
রাজশ্রিয়াভিবৃদ্ধশ্চ সুযোধনবশানুগঃ।

মহাভারত, বিরাটপর্ব্ব—৫৫ অঃ, ৫৫-৫৮ শ্লোক।

মর্ম্ম;---'যাঁহার মস্তকে পাণ্ডুরবর্ণ (শ্বেত) সুবিমল ছত্র শোভা পাইতেছে, তিনি আমাদের পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম।' মহাভারতের অন্যত্র পাওয়া যাইতেছে, দুর্য্যোধনের বিপুলবাহিনী নগর গমনকালে;---

শ্বেতচ্ছত্রৈঃ পতাকাভিশ্চামরৈশ্চ সুপাণ্ডুরৈঃ।
রথৈর্ণাগৈঃ পদাতৈশ্চ শুশুভেহতীব সঙ্কুলা।।

মহাভারত, বনপর্ব্ব—২৫১ অঃ, ৪৭ শ্লোক।

মর্ম্ম;---'শ্বেতছত্র, শ্বেত পতাকা ও শ্বেত চামরে শারদীয় সুবিমল নভোমণ্ডলের ন্যায়, সৈন্যমণ্ডলী সুশোভিত হইয়া উঠিল।'

কবি শ্রীহর্ষ বলিয়াছেন;—
'নলঃ সিতচ্ছত্রিত কীর্ত্তি-মণ্ডলঃ
স রাশি বাসীন্মহসাং মহোজ্জ্বলঃ।"

নৈষধিয় চরিতম্---১ম সঃ, ১ শ্লোকার্দ্ধ।

মহারাজ নলের মস্তকে ধৃত শুভ্র আতপত্রকে তাঁহার সুবিমল কীর্ত্তিমণ্ডলরূপে কবি বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীহর্ষ খৃষ্টীয় দশম শতকের প্রথমভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

উদ্ধৃত বাক্যাবলী আলোচনায় জানা যায়, চন্দ্রবংশীয় ভূপতি ও প্রধান ব্যক্তিগত স্মরণাতীত কাল হইতে শ্বেতছত্র ধারণ করিয়া আসিতেছেন। ত্রিপুর-নৃপতিবৃন্দও কৌলিক প্রথানুসারে এই ছত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। দ্রুহ্যুর অধস্তন ২৫শ স্থানীয় মহারাজ প্রতর্দ্দন প্রাচীন রাজধানী হইতে শ্বেতছত্র সঙ্গে নিয়াছিলেন; রাজরত্নাকরের ১২শ সর্গ, ৮৯ শ্লোকে এ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ছত্রতুইয়া সম্প্রদায়ের রাজভৃত্য, সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে এই চিহ্ন ধারণ করে।

৫। আরঙ্গী

ইহা শ্বেতবস্ত্র বিনির্ম্মিত ব্যজনী বিশেষ। প্রাচীন গ্রন্থনিচয়ে ইহাকে আতপত্র রূপে ব্যবহার করিবারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এই চিহ্নও প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত হইতেছে। মহারাজ ত্রিলোচনের বিবাহ যাত্রাকালেও শ্বেতছত্রের সহিত এই চিহ্ন সঙ্গে ছিল;—

"নবদণ্ড শ্বেতছত্র আরঙ্গী গাওল।
পাত্রমিত্র সঙ্গে গেল আনন্দ বহুল।।"

ত্রিলোচনখণ্ড---২২ পৃঃ

এই চিহ্নও পূর্ব্বোক্ত চিহ্নগুলির ন্যায় ছত্রতুইয়া সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে ধৃত হইয়া থাকে। ইহাও বৃহৎ রৌপ্যদণ্ডের উপর সংস্থাপিত।

তাম্বুলপত্রধারী (বর্ত্তমান) আরঙ্গীধারী ছত্র তুইয়া হস্তচিহ্ন (পাঞ্জা) ধারী (বাছাল)

৬। তাম্বুল পত্র (পান)

এই চিহ্ন রৌপ্য নির্ম্মিত। বাছাল* সম্প্রদায়ের লোক এই চিহ্ন ধারণের অধিকার পাইয়াছে। ইহা সিংহাসনের বামপার্শ্বে ধারণ করা হয়।

হিন্দুগণ শান্তি ও মঙ্গলের চিহ্নস্বরূপ তাম্বুল ব্যবহার করিয়া থাকেন। রাজা, প্রকৃতিপুঞ্জের শান্তি ও মঙ্গল দাতা। ত্রিপুর ভূপতি এই অবশ্য পালনীয় রাজধর্ম্ম প্রতিপালনার্থ সতত তৎপর, এই চিহ্ন ধারণ করিয়া তাহাই সকলকে জানাইতেছেন।

৭। হস্তচিহ্ন (পাঞ্জা)

এই চিহ্নটীও রৌপ্যনির্ম্মিত। এই চিহ্নধারীগণ বাছাল সম্প্রদায় ভুক্ত। ইহা সিংহাসনের বাম পার্শ্বে ধারণ করা হয়।

জগন্মাতা আদ্যাশক্তির 'অভয়মুদ্রা' হইতে এই চিহ্ন গৃহীত হইয়াছে। রাজশক্তি প্রকৃতিপুঞ্জের একমাত্র ভরসাস্থল। রাজা সর্ব্বদা তাহাদিগকে অভয়দানে তৎপর, এই চিহ্ন দ্বারা তাহাই জ্ঞাপন করা হইতেছে। মুসলমানগণের সময়ে, এবং তৎপূর্ব্বে হিন্দু রাজত্ব কালেও ইহার ব্যবহার ছিল। তাঁহারা ইহা অন্য অর্থে ব্যবহার করিতেন।

৮। রাজলাঞ্ছন (Coat of Arms)

এই চিহ্নের সর্ব্বোপরি ত্রিশূল ধ্বজ, তন্নিম্নে চন্দ্রধ্বজ, তাহার দুইপার্শ্বে চারিটী পতাকা ও দুইটী সিংহ মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। মধ্যস্থলে একটী ঢাল বিরাজমান। অঙ্কিত চিহ্নগুলির মধ্যে ত্রিশূলধ্বজ ও চন্দ্রধ্বজের কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উভয় পার্শ্বে অঙ্কিত সিংহদ্বয় ক্ষাত্রবীর্য্যের বা রাজশক্তির পরিচয় জ্ঞাপক। এবং পতাকা চতুষ্টয় হস্তী ও আরোহী, ঢালী, তীরন্দাজ এবং গোলন্দাজ---এই চতুরঙ্গ বাহিনীর নিদর্শন স্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে।† মধ্যস্থলে অঙ্কিত ঢালকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, এক এক ভাগে নিম্নোক্ত এক একটী চিহ্ন অঙ্কন করা হইয়াছে, যথা;—

রাজলাঞ্ছনের ব্যবহৃত চিহ্ন সমূহের বিবরণ

১। মীন-মানব চিহ্ন।

---

* মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে, সেনাপতি রায় চয়চাগ থানাংচি জয় করিয়া, যে সকল কুকি রমণীকে আনিয়াছিলেন, বাছালগণ তাহাদের গর্ব্ভজাত সন্তান, যথা;—

"বহুতর স্ত্রীলোক দাসী আনিছিল।
সেই স্ত্রীর গর্ব্ভজাত বাছাল জন্মিল।" ত্রিপুর বংশাবলী।

† প্রাচীনকালে সৈন্যদলের শ্রেণী-ভেদে পতাকার পার্থক্য ছিল। প্রাচীন রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে,—

"পতাকা অনেক শোভে প্রতি ফৌজে ফৌজে।
শুভ্রবর্ণ ঢালিতে, রক্ত তীরন্দাজে।।

২। তাম্বুল পত্র (পান)।

৩। হস্তচিহ্ন (পাঞ্জা)।

৪। পাঁচটী তারা।

ইহার মধ্যে (১) মীন-মানব, (২) পান, ও (৩) পাঞ্জার বিবরণ ইতিপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। তারা পাঁচটী পঞ্চ-শ্রী সমন্বিত রাজ-শ্রীর পরিচায়ক।

পঞ্চশ্রী ব্যবহারের তাৎপর্য্য

ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দের নামের পূর্ব্বে পাঁচটী 'শ্রী' ব্যবহৃত হয়। রাজার পূর্ণ নাম লিখিতে হইলে---বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয় শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর' এই রূপ লিখিত হয়। লিপি-সংক্ষেপার্থ সচরাচর শ্রেণীবদ্ধরূপ পাঁচটী শ্রী না লিখিয়া 'পঞ্চ-শ্রী' লিখিত হইয়া থাকে। ইহা অশাস্ত্রীয় বা নিরর্থক লিপি নহে, রাজার নাম পাঁচটী শ্রী ব্যবহারের প্রথা অতি প্রাচীন। বররুচির রচিত পত্র কৌমুদীতে পাওয়া যায়,—

"ষড়্গুরোঃ স্বামীনঃ পঞ্চদ্বেভৃত্যে চতুরোরিপৌ।
শ্রীশব্দানাং ত্রয় মিত্রে একৈকং পুত্র ভার্য্যয়োঃ।।"

পত্র কৌমুদী।

স্বামীর (রাজা) নামে যে পাঁচটী শ্রী ব্যবহৃত হয়, তাহারও অর্থ আছে, যথা,—

আদ্যাকীর্ত্তি দ্বিতীয়া প্রকৃতিযু করুণা দান্ততাসাম্ তৃতীয়া।
তূর্য্যাস্যাৎ দান-শৌণ্ড্যং নৃপকুল মহিতা পঞ্চমী রাজলক্ষ্মী।।"

উদ্ভট্।

কৃষ্ণবর্ণ হৈছে সব অগ্নি অস্ত্র বাণা।
হস্তীবর'পরে যত লোহার বীর বাণা।

সেকালে পতাকাকে 'বাণা' বলা হইত। উদ্ধৃত বাক্য আলোচনায় জানা যাইতেছে, খড়্গ চর্ম্ম ধারী সৈন্যদল শুভ্রবর্ণ, তীরন্দাজগণ রক্তবর্ণ, এবং গোলন্দাজগণ কৃষ্ণবর্ণ পতাকা ব্যবহার করিত। লৌহবিনির্মিত বীরবাণা (হনুমান লাঞ্ছিত ধ্বজ) গজারোহী সৈন্যদলের ব্যবহার্য ছিল।

ত্রিপুর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব পলিটিক্যাল এজেন্ট বোল্টন সাহেব অনেককাল পূর্ব্বে ত্রিপুরার -এর বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনিও পতাকাচতুষ্টয় চতুরঙ্গ বাহিনীর ব্যবহার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

রাজমালা—২৪ প্রথম লহর—-১৫৬ পৃষ্ঠা।

রাজ-লাঞ্ছন (Coat of Arms)

উক্ত চিহ্নের নিম্নভাগে দেবনাগর অক্ষরে একটী প্রবচন (motto) অঙ্কিত আছে---কিলিবিদুর্বীরতাং সারমেকং (কিলুবিদুর্বীরতাং সারমেকং) ইহার তাৎপর্য্য,---'বীর্য্যই একমাত্র সার।' এই সুদৃঢ় নীতি বাক্যের উপর ত্রিপুর রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত। ১৩১৫ ত্রিপুরাব্দের (১৩১২ সাল) ১৭ আষাঢ়, রাজধানী আগরতলায় 'ত্রিপুরা সাহিত্য সম্মিলনীর' প্রতিষ্ঠাসভার সভাপতি কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, এই সার গর্ভ motto অবলম্বনে গভীর গবেষণাপূর্ণ 'দেশীয় রাজ্য' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে এই অমূল্য প্রবচনের তাৎপর্য্য কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে।*

প্রবচন বা motto

ভারত সম্রাজ্ঞীর দিল্লীর দরবারের সময় বৃটীশ গভর্ণমেন্ট হইতে ত্রিপুরেশ্বর স্বর্গীয় বীরচন্দ্র মাণিক্যকে একটী পতাকা প্রদান করা হইয়াছিল, তাহাতেও এই সকল চিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে।

৯। সিংহাসন

ইহা ষোলটী সিংহধৃত অষ্টকোণ বিশিষ্ট আসন। এই সিংহাসন আবহমান কাল ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মহারাজ ত্রিলোচনের রাজ্যাভিষেক কালেও সিংহাসন ছিল, রাজমালায়ই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। † ষোলটী সিংহের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে অষ্টকোণে সংস্থাপিত আটটী সিংহ কর্ত্তৃক উক্ত সিংহাসন ধৃত হইয়াছে,---ক্ষুদ্রাকারের অপর আটটী সিংহ উপলক্ষ মাত্র। ‡

সিংহাসনের আকার ও প্রাচীনত্ব

---

* এই প্রবন্ধ ১৩১২ সালের শ্রাবণ মাসের "বঙ্গদর্শন" (নবপর্য্যায়) পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

† ত্রিপুরখণ্ড,--১৭ পৃষ্ঠা।

‡ ত্রিপুরেশ্বরের গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'রাজ্যভিষেক পদ্ধতি' নামক হস্ত লিখিত প্রাচীন গ্রন্থে সিংহাসন-অর্চ্চনার যে মন্ত্র লিখিত আছে, তাহার সহিত এই সিংহাসনের গঠনের ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। উক্ত মন্ত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;--

"ওঁ সিংহাসনং বিরচিং গজদন্তাদি নির্ম্মিতং।
ষোড়শ প্রতিমা যুক্তং সিংহৈঃ ষোড়শভির্যুতং।।
চতুর্হস্ত প্রমাণন্ত নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
ভূপতেরাসনার্থায় তব পূজাং করোম্যহং।।" ইত্যাদি

এই সিংহাসন অনেকবার সংস্কৃত হইয়া থাকিলেও তাহার মৌলিকতা নষ্ট করা হয় নাই, এবং প্রাচীন উপকরণ যতদূর সম্ভব স্থিরতর রাখা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে সিংহাসন চতুষ্কোণ ছিল, আকার পরিবর্ত্তন করিয়া অষ্টকোণ করা হইয়াছে। আবার, কেহ কেহ মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্যকে নূতন সিংহাসনের নির্ম্মাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না। ত্রিপুরেশ্বরগণ রাষ্ট্রবিপ্লবে বিধ্বস্ত হইয়া সময় সময় রাজপাট পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া থাকিলেও, সিংহাসন এবং চতুর্দ্দশ দেবতা কোন কালেই পরিত্যাগ করেন নাই ; তাহা সর্ব্বদাই সঙ্গে রাখিতেন, এবং তাহা অসম্ভব হইলে বিশ্বস্ত পাবর্বত্য প্রজার আলয়ে গচ্ছিত রাখিতেন। কোন কোন সময় সিংহাসন, নিভৃত গিরি নির্ঝরিণীতে নিমজ্জিত করিয়া রাখিবার কথাও শুনা যায়। এই কারণে সমসের গাজী উদয়পুরের রাজধানী অধিকার করিয়াও সিংহাসন না পাওয়ায়, পার্ব্বত্যজাতি দিগকে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে বাঁশের সিংহাসন নির্ম্মাণ করাইয়া গদাধর ঠাকুরের পুত্র এবং মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের পৌত্র লবঙ্গ ঠাকুর নামক ব্যক্তিকে 'লক্ষ্মণ মাণিক্য' আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক সেই সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা প্রাচীন সিংহাসন বিনষ্ট এবং নূতন সিংহাসন নির্ম্মিত হইবার কল্পনা করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃষ্ট প্রমাণাভাবে তাহা বিচার-সহ কিনা, বিবেচনার বিষয়।

সিংহাসনের মৌলিকতা নষ্ট হয় নাই

সম্রাট যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞকালে ত্রিপুরেশ্বরকে বর্ত্তমান সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন, এবং ইহা রাজচক্রবর্ত্তীর সিংহাসন, ত্রিপুররাজ্যে এই সুদৃঢ় প্রবাদ প্রচলিত আছে।

সিংহাসন-সম্মুখে প্রতিদিন চণ্ডী পাঠ এবং যথানিয়মে উক্ত আসনের অর্চ্চনা হয়। তৎসহ কতিপয় শালগ্রামে চক্রও অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। সিংহাসনের ন্যায় প্রথমোক্ত পাঁচটী চিহ্ন (চন্দ্রবাণ্, ত্রিশূলবাণ, মীন-মানব, শ্বেতছত্র ও আরঙ্গী) প্রতিদিন অন্ন ব্যঞ্জনাদির ভোগ দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া থাকে. দুর্গোৎসব, খার্চ্চিপূজা, কের পূজা এবং গঙ্গাপূজা প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে দুইটী করিয়া পাঁঠা বলি দ্বারা অর্চ্চনা করা হয়।

সিংহাসনের অর্চ্চনা বিধি

বিজয়া দশমীতে প্রশস্তি বন্ধনকালে ত্রিপুরেশ্বর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎকালে সকলেই রাজদর্শন এবং যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ ও অভিবাদন করিয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত আরও কতিপয় রাজচিহ্ন আছে, তন্মধ্যে গাওল (বৃহদাকারের শ্বেত পতাকা), শ্বেত চামর এবং ময়ূরপুচ্ছের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্বেতছত্রের ন্যায় শ্বেত পতাকা ও শ্বেত চামর চন্দ্রবংশীয় রাজগণের রাজচিহ্ন মধ্যে স্থান পাইবার কথা মহাভারত, বনপর্ব্বের ২৫১ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করা গিয়াছে। ময়ূরপুচ্ছ ও চন্দ্রবংশের প্রাচীন রাজচিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। রাজ

গাওল (শ্বেত পতাকা) ধারীদ্বয়।

রত্নাকরে এই সকল চিহ্নের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজমালায় ত্রিপুরের বিবাহযাত্রাকালে অন্যান্য চিহ্নের সহিত 'গাওল' ব্যবহৃত হইবার প্রমাণ আছে। গাওল রাজদ্বারের দুই পার্শ্বে এবং চামর ও ময়ূরপুচ্ছ সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে ধারণ করা হয়।

'মাণিক্য' উপাধি

'মাণিক্য' কৌলিক-উপাধি হইলেও তাহা ত্রিপুরার রাজচিহ্নমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। 'মাণিক্য বাহাদুর' বলিলেই ত্রিপুরেশ্বরকে বুঝায়। মহারাজ রত্নফা-এর সময় হইতে এই উপাধি আরম্ভ হইয়াছে।

মহারাজ রত্নফা মৃগয়া উপলক্ষে পর্ব্বতে যাইয়া, একটী সমুজ্জ্বল ভেক-মণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, ত্রিপুর রাজ্যে, কৈলাসহর বিভাগের অন্তর্গত একটী স্থানে এই মাণিক্য পাওয়া গিয়াছিল, তদবধি উক্ত স্থানের নাম 'মাণিক্য-ভাণ্ডার' হইয়াছে। এই নাম বর্ত্তমান কালেও প্রচলিত আছে।

মাণিক্য উপাধি লাভ

ত্রিপুরেশ্বর এই মণি ও কতিপয় হস্তী দিল্লীশ্বরকে উপঢৌকন প্রদান করেন। সম্রাট সেই দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ মাণিক্য সন্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, ত্রিপুরেশ্বরকে বংশানুক্রমে 'মাণিক্য' উপাধিতে ভূষিত করিলেন। তদবধি ত্রিপুরেশ্বরগণ এই উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন।

এতৎসম্বন্ধে সংস্কৃত রাজমালায় লিখিত আছে;---

"ততঃ স মণিমাদায় রাজা দিল্লীমুপাগতঃ।
দিল্লীশায় মণিং দত্বা নত্বাস্তত্রা পুরঃস্থিতঃ।।
দিল্লীশস্তং মণিং প্রাপ্য দৃষ্টা বিস্ময় মানবঃ।
প্রশস্য চ মহীপালং চিন্তয়ামাস বিস্তরং।।
অমুষ্মৈকং প্রদাস্যামি প্রতিরূপং ধরাতলে।
মাণিক্য ইতি বিখ্যাতিং দত্বোবাচ নৃপং প্রতি।।
সর্ব্বে মাণিক্য নামানস্তব বংশোদ্ভবা ইতি।
ততঃ প্রভৃতিখ্যাতো সৌ রত্ন মাণিক্য নামকঃ।।" সংস্কৃত রাজমালা।

বাঙ্গালা রাজমালার মত অন্যবিধ। তাহাতে লিখিত আছে;---

"রত্ন ফা নাম তার পিতায়ে রাখিছিল।
রত্নমাণিক্য খ্যাতি গৌড়েশ্বরে দিল।।"*

রাজমালা---রত্নমাণিক্যখণ্ড, ৬৭ পৃঃ।

---

* রাজমালার সংগ্রাহক কৈলাসবাবু বলিয়াছেন, এই মণি গৌড়েশ্বর তুগরল খাঁকে উপঢৌকন দেওয়া হইয়াছিল। বিশ্বকোষ সঙ্কলিতাও উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন। রত্নমাণিক্যের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত হওয়ায় ইঁহারা তুগ্রলের নামোল্লেখ করিয়াছেন, আমরাও এই সময় এই ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম। প্রকৃতপক্ষে রত্নমাণিক্য তুগ্রল খাঁ এর অনেক পরবর্ত্তী রাজা।

স্থানান্তরের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই সময় গৌড়ের সিংহাসনে সুলতান সাম্‌সুদ্দিন অধিষ্ঠিত ছিলেন (১৩৪৭-৫৮ খৃঃ) ; এবং সম্রাট ফিরোজ তোগলক দিল্লীর মসনদ অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। সামসুদ্দিন, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করিয়া স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়, সুতরাং তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় রত্নফা পূর্ব্বোক্ত ভেক মণি দিল্লীশ্বর কি গৌড়েশ্বরকে উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। মুসলমান-ইতিহাস এ বিষয়ে নীরব থাকায়, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা রাজমালার মতদ্বৈধ নিরসন করা অধিকতর দুঃসাধ্য হইয়াছে। স্থূলকথা, উপাহার দিল্লীশ্বরকে দেওয়া হউক---বা গৌড়েশ্বরকে দেওয়া হউক ইহা যে মুসলমান রাজাকে দেওয়া হইয়াছিল, এবং মুসলমান হইতে মাণিক্য উপাধি লাভ করা হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গৌড়েশ্বরের সাহায্যে রত্নমাণিক্য রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত উপহার প্রদান করা বিচিত্র নহে। এতদ্বারা ত্রিপুর-ভূপতিবৃন্দের অন্য শক্তির নিকট উপাধি গ্রহণ করিবার প্রথম সূত্রপাত হইয়াছে।

ত্রিপুরা ব্যতীত অন্যকোন স্থানে রাজগণের 'মাণিক্য' উপাধি থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায় না। জয়ন্তিয়ার রাজবংশে তিনটী রাজার নামের সঙ্গে 'মাণিক্‌' উপাধি সংযোজিত হইয়াছিল।* এবং ভুলুয়ার একমাত্র লক্ষ্মণরায় 'মাণিক্য' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদের কৌলিক উপাধি নহে। উক্ত উভয় রাজ্যই এককালে ত্রিপুরার অধীন ছিল, তৎকালে কোন কোন রাজা ত্রিপুরেশ্বরগণের অনুকরণে 'মাণিক্য' উপাধি ধারণ করিয়া নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছেন, অবস্থা আলোচনা করিলে ইহাই উপলব্ধি হয়।

প্রাচীন মুসলমান ইতিহাসে 'মাণিক্য' উপাধির উল্লেখ না থাকিলেও পরবর্ত্তী কালের আইন-ই-আকবরী, রিয়াজুস সলাতনী্‌ এবং জামিউত্তারিখ প্রভৃতি গ্রন্থে, ত্রিপুরেশ্বরগণের 'মাণিক্‌' উপাধির উল্লেখ পাওয়া যায়। রত্নমাণিক্যের সময়াবধি আরম্ভ করিয়া, পরবর্ত্তী রাজগণের মুদ্রায় ও শিলালিপি ইত্যাদিতে 'মাণিক্য' উপাধির উল্লেখ আছে। এই উপাধি বর্ত্তমানকালে, রাজকীয় সমস্ত কাগজপত্রে, দলিল ও সনন্দ ইত্যাদিতে এবং শিলালিপি প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইতেছে।

---

* (১) বিজয়মাণিক—(১৫৬৪-১৫৮০ খৃঃ)। (২) ধনমাণিক—(১৫৯৬—১৬১২ খৃঃ)।

(৩) যশমাণিক—(১৬১২-১৬২৫ খৃঃ)। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জয়ন্তিয়া ও ভুলুয়ার রাজগণের মধ্যে যাঁহারা 'মাণিক্য' বা 'মাণিক্‌' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামের সহিত ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দের নামেরও বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ইহার দ্বারা অনুকরণপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

আসা ও সোটা বরদার।

পূর্ব্বোক্ত উপাধি ও চিহ্ন ব্যতীত আসা ও সোঁটা, এই দুইটী চিহ্নও রাজচিহ্ন মধ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কথিত আছে, এই দুইটী চিহ্ন মুসলমান বাদশাহের প্রদত্ত উপহার। কিন্তু কোন গ্রন্থাদিতে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এদৎ সম্বন্ধে দুইটী বিষয় লক্ষ্যযোগ্য; (১) রাজদরবারে অন্যান্য রাজচিহ্ন হিন্দুগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইবার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, এতদুভয় চিহ্ন মুসলমান কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া থাকে; তাহাদের উপাধি 'চোপদার' ও 'সোটাবরদার'। (২) অভিষেকমণ্ডপে এই চিহ্নদ্বয় ব্যবহৃত হয় না। এতদ্বারা চিহ্ন দুইটী মুসলমানের প্রদত্ত বলিয়া আভাস পাওয়া যায়।

মুসলমান হইতে প্রাপ্ত রাজচিহ্ন

রাজচিহ্ন সম্বন্ধীয় এতদতিরিক্ত কোন বিবরণ বর্ত্তমানকালে সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। অনেকে অনেক কথা বলিলেও প্রকৃষ্টযুক্তি এবং প্রমাণের অভাবে আমরা তাহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ।

রাজসূয়-যজ্ঞে ত্রিপুরেশ্বর

সম্রাট যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ত্রিপুরেশ্বর উপস্থিত ছিলেন—এ কথা সকলে স্বীকার করিতে চাহেন না; এমন কি, সহদেব দিগ্বিজয়োপলক্ষে ত্রিপুরায় আগমন করিবার কথাও অনেকে অস্বীকার করিয়াছেন। এই সকল মতান্তরবাদীর মতামত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে এতদ্বিষয়ে রাজামালা কি বলেন দেখা আবশ্যক।

ত্রিপুরেশ্বরের রাজসূয় যজ্ঞে গমনের কথা

রাজমালার ত্রিলোচন খণ্ডে পাওয়া যাইতেছে,---

"এই মতে ত্রিলোচন গেল অগ্নিকোণে।
রাজা যুধিষ্ঠির দেখা করায় ভীমসেনে।।
ত্রিলোচন দেখিয়া বিস্তর কৈল মান।
রাখিলেন রাজা যত্নে দিয়া দিব্য স্থান।।
তৃণময় ঘরে থাকে ত্রিলোচন রাজা।
অগ্নিকোণ হইতে আইসে লৈয়া সব প্রজা।।"

উদ্ধৃত অংশের 'গেল অগ্নিকোণে' বাক্য ভ্রমসঙ্কুল। হস্তিনাপুর হইতে ত্রিপুররাজ্য অগ্নিকোণে অবস্থিত, সুতরাং ত্রিপুরা হইতে হস্তিনাযাত্রীর প্রতি 'গেল অগ্নিকোণে' বাক্য প্রয়োগ হইতে পারে না ; 'অগ্নিকোণ হইতে গেল' এইরূপ বলা সঙ্গত ছিল। উদ্ধৃত শেষ পংক্তিতে সন্নিবিষ্ট 'অগ্নিকোণ হইতে আইসে' ইত্যাদি বাক্য আলোচনা করিলেই পূর্ব্বোক্ত ভ্রম স্পষ্টতঃ ধরা পড়িবে। লিপি-

কার প্রমাদে এরূপ ঘটিয়াছে ; প্রাচীন রাজমালার উক্তি দ্বারা ইহা সহজেই বুঝা যাইবে। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে,

"এহিমতে মহারাজা হৈল অগ্নিকোণে।
রাজা যুধিষ্ঠির দেখা করায় ভীমসেনে।।"

রাজমালার বাক্য দ্বারা মহারাজ ত্রিলোচনের হস্তিনা গমনের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু তিনি রাজসূয় যজ্ঞের পরে গিয়াছিলেন। সংস্কৃত রাজমালা আলোচনা করিলে এ বিষয়ের পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যাইবে ; উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে ;---

"দ্রুহ্যুরাজসুতোজাতস্ত্রিপুরাখ্যো মহাবলঃ।*
তমোগুণসমাযুক্তঃ সর্ব্বদেবাতি গর্ব্বিতঃ।।
যুধিষ্ঠিরস্য যজ্ঞার্থে সহদেবেন নির্জিতঃ।
রাজসূয়ে স গতবান্ যুধিষ্ঠির সমাদৃতঃ।।"

এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, মহারাজ ত্রিপুর রাজসূয় যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন।

মহারাজ ত্রিলোচনের হস্তিনায় গমন

অতঃপর ত্রিপুরনন্দন ত্রিলোচনের অলৌকিক সুখ্যাতি শ্রবণ করিয়া সম্রাট যুধিষ্ঠির তাঁহাকে হস্তিনায় নিয়াছিলেন, যথা; —

"ত্রিলোচনস্য সুখ্যাতিং শ্রুত্বা রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
ইন্দ্রপ্রস্থং নিনায়ৈনং তৎ সৌন্দর্য্য দিদৃক্ষয়া।।
শিবরূপঞ্চ তং দৃষ্টা বহু সম্মানমাচরৎ।"

সংস্কৃত রাজমালা।

রাজরত্নাকরের মত অন্যরূপ। এই গ্রন্থে, মহারাজ চিত্ররথকে রাজসূয় যজ্ঞের যাত্রী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা; —

"মহারাজশ্চিত্ররথো রাজসূয়ে মহাক্রতৌ
বহুসম্মানিত স্তত্র নিজ রাজ্যমুপাগমৎ।

রাজরত্নাকরের এই উক্তি উভয় বংশের (পুরু ও ত্রিপুর বংশের) পুরুষ সংখ্যার সমতার উপর নির্ভর করিতেছে বলিয়া মনে হয়। বংশলতা আলোচনা করিলে জানা যায়, সম্রাট যুধিষ্ঠির ও ত্রিপুরেশ্বর চিত্ররথ সমপর্য্যায়ের ব্যক্তি, অর্থাৎ উভয়েই চন্দ্র হইতে ৪৩শ স্থানীয়। নিচে তাহা প্রদর্শিত হইল।

পুরু ও ত্রিপুর বংশ-তালিকার তুলনা

* এই বাক্যদ্বারা অনেক মনে করেন, ত্রিপুর দ্রুহ্যুর পুত্র। এই ধারণা অভ্রান্ত নহে। ত্রিপুর, দ্রুহ্যুর অধস্তন ৪৯ স্থানীয়। 'দ্রুহ্যুরাজ সুতোজাত' এই বাক্যদ্বারা দ্রুহ্যুর বংশজাত বুঝাইতেছে।

পুরুবংশ-লতা

(মহাভারত মতে)

১। চন্দ্র।
২। বুধ।
৩। পুরূরবা।
৪। আয়ু।
৫। নহুষ।
৬। যযাতি।
৭। পুরু।
৮। জন্মেজয়।
৯। প্রতিন্বান।
১০। সংযাতি।
১১। অহংযাতি।
১২। সার্ব্বভৌম।
১৩। জয়ৎসেন।
১৪। অবাচীন।
১৫। অরিহ।
১৬। মহাভৌম।
১৭। অযুতনায়ী।
১৮। অক্রোধন।
১৯। দেবাতিথি।
২০। অরিহ (২য়)।
২১। ঋক্ষ।
২২। মতিনার।
২৩। তংসু।
২৪। ইলিন।
২৫। দুষ্মন্ত।
২৬। ভরত।
২৭। ভূমন্যু।

ত্রিপুরবংশ-লতা

(বিষ্ণুপুরাণ ও রাজমালা মতে)

১। চন্দ্র।
২। বুধ।
৩। পুরূরবা।
৪। আয়ু।
৫। নহুষ।
৬। যযাতি।
৭। দ্রুহ্যু।
৮। বভ্রু।
৯। সেতু।
১০। আনর্ত্ত।
১১। গান্ধার।
১২। ধর্ম্ম (ঘর্ম্ম*)।
১৩। ধৃত (ঘৃত*)।
১৪। দুর্ম্মদ।
১৫। প্রচেতা।
১৬। পরাচি।
১৭। পরাবসু।
১৮। পারিষদ।
১৯। অরিজিৎ।
২০। সুজিৎ।
২১। পুরূরবা (২য়)।
২২। বিবর্ণ।
২৩। পুরুসেন।
২৪। মেঘবর্ণ।
২৫। বিকর্ণ।
২৬। বসুমান।
২৭। কীর্ত্তি।

---

* সম্ভবতঃ লিপিকার প্রমাদে নামের এবম্বিধ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কোন কোন পুরাণেও এই নাম পাওয়া যায়।

পুরুবংশ-লতা (মহাভারত মতে)	**ত্রিপুরবংশ-লতা** (বিষ্ণুপুরাণ ও রাজমালা মতে)
২৮। সুহোত্র।	২৮। কনীয়ান্।
২৯। হস্তী।	২৯। প্রতিশ্রবা।
৩০। বিকুণ্ঠন।	৩০। প্রতিষ্ঠ।
৩১। অজমীঢ়।	৩১। শক্রজিৎ।
৩২। সম্বরণ।	৩২। প্রতর্দ্দন।
৩৩। কুরু।	৩৩। প্রমথ।
৩৪। বিদুরথ।	৩৪। কলিন্দ।
৩৫। অনশ্বা।	৩৫। ক্রম।
৩৬। পরীক্ষিৎ।	৩৬। মিত্রারি।
৩৭। ভীমসেন।	৩৭। বারিবর্হ।
৩৮। প্রতিশ্রবা।	৩৮। কার্ম্মুক।
৩৯। প্রতিপ।	৩৯। কলিঙ্গ।
৪০। শান্তনু।	৪০। ভীষণ।
৪১। চিত্রবীর্য্য।	৪১। ভানুমিত্র।
৪২। পাণ্ডু।	৪২। চিত্রসেন।
৪৩। যুধিষ্ঠির*।	৪৩। চিত্ররথ।
	৪৪। চিত্রায়ুধ।
	৪৫। দৈত্য।
	৪৬। ত্রিপুর।
	৪৭। ত্রিলোচন।

এই বংশতালিকা অনুসারে যুধিষ্ঠির ও চিত্ররথকে সমপর্য্যায়ে দেখিয়া, রাজরত্নাকর রচয়িতা রাজসূয় যজ্ঞে চিত্রথের উপস্থিতি কল্পনা করিয়াছেন ; এতদ্ভিন্ন এই মত সমর্থন করিবার অন্য কোন প্রমাণ বিদ্যমান নাই। পূর্ব্বোক্ত তালিকায় যুধিষ্ঠির ও ত্রিপুরের মধ্যে দুই পুরুষ ব্যবধান পরিলক্ষিত হইলেও তাহা কর্ত্তব্য নহে ; উভয় বংশের মধ্যে দীর্ঘকালে এবম্বিধ সামান্য পার্থক্য সঙ্ঘটন অস্বাভাবিক বলা যাইতে পারে না।

আর একটী কথাও আলোচনা যোগ্য। মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্বাপরের শেষভাগে

* যুধিষ্ঠির, মহাভারত মতে চন্দ্র হইতে ৪৩শ স্থানীয় ও বিষ্ণুপুরাণ মতে ৪৯শ স্থানীয় স্থিরীকৃত হইতেছেন। এস্থলে মহাভারতের মতই অবলম্বন কর হইল।

সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন ; মহারাজ ত্রিপুরও দ্বাপরের শেষভাগের রাজা।* এতদ্দ্বারাও উভয়ে সমসাময়িক নির্ণীত হইতেছেন। এই সকল কারণে মহারাজ ত্রিপুরকেই রাজসূয়যজ্ঞের যাত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মহারাজ ত্রিলোচন তাঁহার কিয়ৎকাল পরে সম্রাট কর্ত্তৃক আহূত হইয়া হস্তিনায় গমন করিয়া ছিলেন, একথাও অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই।

বিরুদ্ধবাদিগণের মত খণ্ডন

এই মতের বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন, ত্রিপুরেশ্বরের যজ্ঞ-যাত্রা সম্বন্ধে পুরাণাদি গ্রন্থে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মহাভারতে যে 'ত্রিপুর' নামের উল্লেখ আছে, তাহা বর্ত্তমান ত্রিপুররাজ্য বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন না। এ বিষয়ে রাজমালার সংগ্রাহক কৈলাস বাবু বলিয়াছেন,---

"মহাভারতে লিখিত আছে, 'সহদেব ত্রৈপুররাজ ও পৌরবেশ্বরকে জয় করিয়া, তৎপর সৌরাষ্ট্রাধিপতির প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন।' সহদেব কিরূপে ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত ত্রিপুরা হইতে একলম্ফে পশ্চিম সাগরের তীরস্থিত সৌরাষ্ট্রে উপনীত হইলেন? *** বিশেষতঃ, মহাভারতের সভাপর্ব্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে—'অর্জুন উত্তর দিক, ভীম পূর্ব্ব দিক, সহদেব দক্ষিণ দিক এবং নকুল পশ্চিম দিক জয় করিলেন'। সহদেব যে পূর্ব্বভারতে গমন করিয়াছিলেন, মহাভারতে তাহার কোন উল্লেখ নাই।"

তিনি আরও বলিয়াছেন,---

"দক্ষিণ দিগ্বিজয়ী সহদেবের বিজয় বৃত্তান্তে যে ত্রিপুরার উল্লেখ আছে, আধুনিক জবলপুরের নিকটবর্ত্তী পরিত্যক্ত নগরী 'তিত্তর' বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে হৈহয় বংশীয়দিগের রাজধানী ত্রিপুরীকে ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত ত্রিপুরা অবধারণ করিতে যত্নবান্ হওয়া নিতান্ত ভ্রমাত্মক কার্য্য।

কৈলাসবাবুর রাজমালা—২য় ভাঃ, ১ম অঃ, ২, ৩ পৃঃ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই মতের পক্ষপাতী নহেন। তিনি সহদেবের দিগ্বিজয় উপলক্ষ করিয়া বলেন,—

"তারপর তিনি মাহিষ্মতী রাজকে পরাজিত করেন। অতঃপর সহদেব দক্ষিণ দিকে গমন করেন এবং ত্রৈপুরকে বশীভূত করেন। মাহিষ্মতী দক্ষিভারতের প্রায় নিম্নদেশে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে মহাভারতের ত্রৈপুরদেশ। ত্রৈপুরের পর সহদেব পৌরবেশ্বরকে জয় করেন। অতএব সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মহাভারতের ত্রৈপুরদেশ মাহিষ্মতী ও সুরাষ্ট্রের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে অবস্থিত ছিল। ইহা কখনই ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলবর্ত্তী বর্ত্তমান ত্রিপুররাজ্য হইতে পারে না।*** সহদেব দক্ষিণদিকে বিজয় করিবার জন্য যাত্রা করেন। তিনি আদৌ পূর্ব্বাঞ্চলে গমন করেন নাই।"

---

* রাজমালায় মহারাজ ত্রিপুর সম্বন্ধে লিখিত আছে;—

"অনেক বৎসর সে ছিল এই মতে।
দ্বাপর শেষেতে শিব আসিল দেখিতে।।"

রাজমালা,—ত্রিপুরখণ্ড, ১১ পৃঃ।

সহদেব ভারতের পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী ত্রিপুরা হইতে 'একলম্ফে' পশ্চিম সাগরের তীরবর্ত্তী সৌরাষ্ট্রে যাওয়া কৈলাসবাবু অসম্ভব মনে করিয়াছেন; এবং তিনি জব্বলপুরের সন্নিহিত তিওরকেই মহাভারতোক্ত ত্রিপুরা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাভারতের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন, দিগ্বিজয় বিবরণ লিপি উপলক্ষে কোন স্থলেই ভৌগোলিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা হয় নাই। অভিনিবেশ সহকারে মহাভারত আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, ক্ষত্রিয় রাজগণের পরাজয় বৃত্তান্ত---পার্ব্বত্য, বন্য ও দ্বীপবাসিগণের বিবরণ হইতে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণেই ভারতের সুদূরস্থিত দুই প্রান্তবর্ত্তী স্থানের নাম একত্রে উল্লেখ করিবার কারণ ঘটিয়াছিল। ভীম, অর্জ্জুন, এবং নকুলের দিগ্বিজয়ের বিবরণ আলোচনা করিলেও এই প্রকারের বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হইবে।* এবম্বিধ বিশৃঙ্খলার আর একটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মহাভারতে পাওয়া যায়, দিগ্বিজয় উপলক্ষে অনেক স্থলে এক রাজাকে জয় করিয়া, সেই বিজিত রাজার সাহায্য গ্রহণে অন্য রাজাকে আক্রমণ করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা বুঝা যায়, যাঁহাকে জয় করা অপেক্ষাকৃত সহজ, তাঁহাকে অগ্রে আক্রমণ করা হইয়াছে, এবং যে সকল রাজাকে জয় করা কষ্টসাধ্য, বিজিত রাজাদিগকে লইয়া তাঁহাদিগকে জয় করা হইয়াছে। যুদ্ধের এই সুবিধা অবলম্বনে নিমিত্তও ভৌগোলিকপর্য্যায় রক্ষা করিবার অন্তরায় ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

মহাভারতে, সহদেবের দিগ্বিজয় বিবরণে নিম্নলিখিত স্থানগুলির নাম ক্রমান্বয়ে লিখিত আছে,—কিষ্কিন্ধ্যা, মাহিষ্মতী, ত্রৈপুর, পৌরব, সৌরাষ্ট্র ইত্যাদি। †

---

* শ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ; সি, আই. ই. মহাশয় আমাদের এক পত্রের উত্তরে যাহা জানাইয়াছেন, তাহা ত্রিপুরার অবস্থান বিষয়ে কৈলাসবাবুর মতের সমর্থক। পরিশেষে লিখিয়াছেন,—"আমার যতদূর জানা আছে, সহদেব পশ্চিম অঞ্চলেই দিগ্বিজয় করিতে গিয়াছিলেন।"

সহদেবের বিজিত ত্রিপুরা সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তদতিরিক্ত এস্থলে বলিবার কোন কথা নাই। 'সহদেব পশ্চিম অঞ্চলে গিয়াছিলেন' এই মহাভারত দ্বারা সমর্থিত হইতেছে না।

† সহদেবের দিগ্বিজয় সম্বন্ধে মহাভারতে পাওয়া যায়,—

"তং জিত্বা স মহাবাহুঃ প্রযযৌ দক্ষিণা পতম্।
গুহামাসাদয়ামাস কিষ্কিন্ধ্যাং লোক বিশ্রুতাম্।।
* * * * *
গচ্ছ পাণ্ডবশার্দ্দূল রত্নান্যাদায় সর্ব্বশঃ।
অবিঘ্নমস্তু কার্য্যায় ধর্ম্মরাজায় ধীমতে।।

কৈলাসবাবু, ভারতের পূর্ব্ব দিগ্বর্ত্তী ত্রিপুরা হইতে ‘একলম্ফে’ পশ্চিম সাগরের তীরবর্ত্তী সৌরাষ্ট্রে যাওয়া অসম্ভব মনে করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতের লিখিত পর্য্যায়নুসারে ক্রমান্বয়ে স্থানগুলি জয় করিতে হইলে, দাক্ষিণাত্যের নিম্নভাগস্থিত কিষ্কিন্ধ্যা ও মাহীষ্মতী জয় করিয়া, তৎপর কৈলাসবাবুর কথিত জব্বলপুরের সন্নিহিত তিওর বা ত্রিপুরায় আসিতে হয়। এবং ইহার পরেই সহদেব আবার পৌরবের দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এরূপ গমনাগমনও যে ছোটখাটো লম্ফের কার্য্য নহে, এ কথা বোধ হয় কৈলাস বাবু ভাবিয়া দেখেন নাই। বিশেষতঃ সহদেব, মাহীষ্মতী জয়ের পর দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় কৈলাস বাবুর কথিত জব্বলপুরের সন্নিহিত ত্রিপুরায় গমন করিবার সম্ভাবনা কোথায়? বরং সহদেব দক্ষিণ-সমুদ্রের উপকূল ধরিয়া, ত্রিপুরায় উপনীত হওয়া সম্ভবপর বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ভারতের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, ত্রিপুর রাজ্য হস্তিনাপুর হইতে পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে অবস্থিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণাংশেই পতিত হইয়াছে, সুতরাং তাহা দক্ষিণ-দিগ্বিজয়ীর ভাগেই পড়িবার কথা। সহদেব হস্তিনাপুর হইতে সরল রেখা ধরিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিয়াছিলেন, এখন কথা মনে করিবার কারণ দেখা যায় না। যাহা হইক, কৈলাসবাবু এখন পরলোকে, সুতরাং এ বিষয়ে অধিক কথা বলিতে যাওয়া অসঙ্গত হইবে। অমূল্য বাবু দক্ষিণাপথে---মাহীষ্মতী ও সুরাষ্ট্রের মধ্যবর্ত্তীস্থানে ত্রিপুরার অবস্থান কল্পনা করিয়াছেন মাত্র, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বোধ হয় কিছু অবগত নহেন,---অবগত থাকিলেও প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই।

কৈলাসবাবু এবং অমূল্যবাবুর মধ্যে ত্রিপুরার অবস্থান বিষয়ে মতবৈষম্য থাকিলেও সহদেবের বিজিত ত্রিপুরা যে বর্ত্তমান রাজ্য নহে এ বিষয়ে

ততো রত্নান্যুপাদায় পুরীং মাহীষ্মতীং যযৌ
তত্র নীলেন রাজ্ঞা স চক্রে যুদ্ধং নরর্ষভঃ।।

* * * * *

মাদ্রীসুত স্ততঃ প্রায়াদ্বিজয়ী দক্ষিণাং দিশম্।
ত্রৈপুরং স্ববশেকৃত্বা রাজানমিতৌজসম্।।
নিজগ্রাহ মহাবাহুস্তরস্য পৌরবেশ্বরম।
আকৃতিং কৌশিকা চর্য্যেং যত্নেন মহতা ততঃ।।
বশে চক্রে মহাবাহুং সুরাষ্ট্রাধিপতিং তদা।
সুরাষ্ট্র বিষয়স্থশ্চ প্রেরয়ামাস রুক্মিণে।।” ইত্যাদি
সভাপর্ব্ব---৩০শ অধ্যায়।

উভয়েই একমত। আমরা দেখিতেছি অর্জ্জুন দিগ্বিজয়ের নিমিত্ত উত্তর দিকে গিয়াছিলেন, অথচ ভারতের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি ভগদত্তকে তিনি জয় করিয়াছেন। অন্যত্র যেমন ত্রিপুরা নাম পাওয়া যাইতেছে, তদ্রূপ ভারতের উত্তর প্রান্তে যদি প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামক অন্যস্থান পাওয়া যাইত, তবে বোধ হয় কৈলাস বাবু ও অমূল্যবাবু ভারতের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত প্রাগজ্যোতিষকে মহাভারতের পৃষ্ঠা হইতে পুছিয়া ফেলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।* যেভাবে উত্তর দিগ্বিজয়ী অর্জ্জুন উত্তর পূর্ব্ব কোণ (ঈশান কোণ) স্থিত প্রাক্‌জ্যোতিষ রাজ্য জয় করিয়াছেন, সেই ভাবে দক্ষিণ দিক বিজেতা সহদেব দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে (অগ্নিকোণে) অবস্থিত ত্রিপুরা জয় করিবেন, ইহা বিচিত্র মনে করিবার কারণ নাই। সহদেব সমুদ্রের তীর ধরিয়া পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া তীরবর্ত্তী রাজাদিগকে জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। প্রাচীন কালে ত্রিপুরার সীমা সমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ; সে কালে সমুদ্র এত দূরেও ছিল না। এই সর্ব্বজনবিদিত কথার প্রমাণ প্রয়োগ করিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। রঘুবংশে, এই স্থান 'তালীবন শ্যাম উপকণ্ঠ' বলিয়া বর্ণীত হইয়াছে। সূক্ষ্ম (কিরাত দেশ) সমুদ্র উপকণ্ঠে অবস্থানের ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলা যাইতে পারে। সহদেব সমুদ্রের তীরবর্ত্তী পথে এই স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না, ইহা পূর্ব্বেও একবার বলা হইয়াছে।

সকলেই কেবল সহদেবের দিগ্বিজয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ত্রিপুরার কথা আলোচনা করিয়াছেন। মহাভারতের অন্যত্র যে ত্রিপুরার নাম আছে, তৎপ্রতি তাঁহারা দৃষ্টিপাত করেন নাই। ভীষ্মপর্ব্বে পাওয়া যায়,—

"দ্রোণাদনন্তরং যত্তো ভগদত্তঃ প্রতাপবান।

মাগধৈশ্চ কলিঙ্গৈশ্চ পিশাচৈশ্চ বিশাম্পতে।।

প্রাগ্‌জ্যোতিষাদনু নৃপঃ কৌশল্যোহয় বৃহদ্বলঃ।

মেকলৈঃ করুবিন্দৈশ্চ ত্রৈপুরৈশ্চ সমন্বিতঃ।।"

ভীষ্মপর্ব্ব---৮৭ অঃ, ৮।৯ শ্লোক।

---

* একাধিকরাজ্যের এক নামের দ্বারা মনে একটী প্রশ্নের উদয় হইতেছে। এক বংশের রক্ষিত রাজ্যের নাম বিশেষ কারণ ব্যতীত অন্য বংশ কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়া কতকটা অস্বাভাকি। বিভিন্ন রাজ্যের নামের একত্ব দ্বারা মনে হয়, উভয় রাজ্যের মধ্যে এককালে কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল, ইতিহাস হয় ত সেই প্রাচীন সম্বন্ধের কথা বিস্মৃত হইয়াছে।

মর্ম্ম—"দ্রোণের পশ্চাতে প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধীশ্বর প্রবল প্রতাপ ভগদত্ত মগধ, কলিঙ্গ ও পিশাচগণ সমভিব্যহারে, তৎপশ্চাৎ কোশলাধিপতি বৃহদ্বল—মেকল, কুরুবিন্দ ও ত্রিপুর সমভিব্যহারে ছিলেন।"

এই স্থলে প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও মেকল নাম পাওয়া যাইতেছে। প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য ত্রিপুর রাজ্যের পাশ্ববর্ত্তী ছিল, পরবর্ত্তীকালে সেই প্রদেশ 'আসাম' আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে। মেকল—মেখলী প্রদেশ (মণিপুর রাজ্য)। এই রাজ্য বর্ত্তমান কালেও ত্রিপুরার এক প্রান্তে, হিন্দু গৌরব ঘোষণা করিতেছে। এরূপ অবস্থায় উদ্ধৃত শ্লোকের ত্রিপুরা শব্দ দ্বারা প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও মণিপুরের সন্নিহিত ত্রিপুরাকে লক্ষ্য না করিয়া, জব্বলপুরের সমীপবর্ত্তী ত্রিপুরা, কিম্বা দাক্ষিণাত্যের কল্পিত ত্রিপুরাকে লক্ষ্য করা সঙ্গত হইতে পারে না। প্রাচীন গ্রন্থে হেড়ম্ব (প্রাগ্‌জ্যোতিষ) ও মণিপুরের সঙ্গে ত্রিপুরার নামোল্লেখের আরও প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা—,

"বরেন্দ্র তাম্রলিপ্তঞ্চ হেড়ম্ব মণিপুরকম্।
লৌহিত্য স্ত্রৈপুরং চৈব জয়ন্তাখ্যং সুসঙ্গকম্।।"

ভবিষ্য পুরাণ—ব্রহ্মখণ্ড।

হেড়ম্ব (প্রাগজ্যোতিষ), লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র), জয়ন্তা ও মণিপুর প্রভৃতির সহিত ত্রিপুরার নামোল্লেখ দ্বারা ত্রিপুরাকে ঐ সকল স্থানের সন্নিহিত বুঝাইতেছে, এবং ইহাই যে বর্ত্তমান ত্রিপুরা রাজ্য, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইবে।

এই সকল তর্কিত বাক্য পরিত্যাগ করিলেও ত্রিপুরেশ্বরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিতির আরও প্রমাণ মহাভারতেই পাওয়া যাইতেছে। দুর্য্যোধন, ধৃতরাষ্ট্র সকাশে যজ্ঞে সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের বিবরণ বলিয়াছিলেন ; তাহাতে পাওয়া যায়,—

"যে পরার্দ্ধে হিমবতঃ সূর্য্যোদয় গিরৌনৃপাঃ।
কারুষেচ সমুদ্রান্তে লৌহিত্যমভিতশ্চ যে।।
ফলমুলাশশা যে চ কিরাতাশ্চর্ম্ম বাস সঃ।
ক্রূরশস্ত্রাঃ ক্রূরকৃতস্তাংশ্চ শশ্যামহং প্রভো।।
চন্দনাগুরু কাষ্ঠানাং ভারাণ কালীয় কস্য চ।
চর্ম্মরত্ন সুবর্ণনাং, গন্ধানাঞ্চৈব রাশয়ঃ।।"

সভাপর্ব্ব—৫২ অঃ, ৮-১০ শ্লোক।

মর্ম্ম—উদয়াচলবাসী রাজাগণ, কারুষ দেশীয় ভূপালগণ, সমুদ্রান্ত নিবাসা ভূপতিবর্গ, ব্রহ্মপুত্রের উভয়কুলস্থিত রাজ সমূহ এবং ক্রূরকর্ম্মা, ক্রূরশস্ত্র,

চর্ম্মবসন ও ফলমূলোজীবী কিরাতবৃন্দকে দেখিলাম। তাহারা চন্দন ও অগুরু কাষ্ঠের ভার, চর্ম্ম, রত্ন, সুবর্ণ এবং নানাপ্রকার গন্ধ দ্রব্য লইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিল।''

এস্থলে, ব্রহ্মপুত্র নদের উভয় তীরবর্ত্তী সকল রাজাই যজ্ঞে উপস্থিত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ত্রিপুরার রাজধানী সে কালে ব্রহ্মপুত্র তীরে, ত্রিবেগ নামক স্থানে অবস্থিত ছিল, সুতরাং ত্রিপুরেশ্বরও ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী রাজগণের মধ্যে ছিলেন, এ কথা অস্বীকার করিবার কারণ নাই। কিরাতগণ ত্রিপুরেশ্বরের প্রজা, রাজসূয় যজ্ঞের বহু পূর্ব্বে কিরাত দেশ দয় করিয়া ত্রিপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিরাতগণের সংগৃহীত অগুরুকাষ্ঠ ও সুবর্ণ ইত্যাদি ত্রিপুর রাজ্যের বিপুল ঐশ্বর্য্য। যে স্থলে ত্রিপুরেশ্বরের অনুপস্থিত কল্পনা করা যায়, সেই স্থলে অগুরু ইত্যাদি উপঢৌকন লইয়া কিরাতগণের উপস্থিতি সম্ভব হইতে পারে না। ইহাদের উপস্থিতি দ্বারা, ত্রিপুরেশ্বরের উপস্থিত থাকাই প্রমাণিত হইতেছে।

রাজমালায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, ত্রিপুরেশ্বর রাজসূয় যজ্ঞে গমন করিয়া বিস্তর সম্মান পাইয়াছিলেন। রাজমালা সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রামাণিক গ্রন্থ, সুতরাং এই গ্রন্থের উক্তি উপেক্ষনীয় নহে। বিশেষতঃ মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থের প্রমাণ যে এই উক্তির পরিপোষক, তাহাও প্রদর্শিত হইল।

সামরিক বল ও সমর ইত্যাদি বিষয়ক বিবরণ

সামরিক বল

প্রাচীনকালে ত্রিপুরার সৈন্যবল কম ছিল না ; ত্রিলোচনের পুত্র মহারাজ দাক্ষিণের সৈন্য সংখ্যার বিষয় আলোচনা করিলে ইহার আভাস পাওয়া যায় ; যথা---

সৈন্যসংখ্যার আভাস

''রাজার অনুজ দশ হৈল সেনাপতি।
সর্ব্ব সেনা ভাগ করি দিল ভ্রাতৃ প্রতি।।
পঞ্চ পঞ্চ সহস্র সেনা এক অংশে পায়।'' ইত্যাদি

দাক্ষিণ খণ্ড,---৩৪ পৃষ্ঠা।

এস্থলে পঞ্চাশ সহস্র সৈন্যের হিসাব পাওয়া যাইতেছে। এতদ্ভিন্ন, কিরাত সৈন্যদিগকে, এবং মহারাজ দ্রুহ্যুর সঙ্গে যে সকল ক্ষত্রিয় সৈন্য আগমন করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে ভ্রাতাগণের অধিনায়কত্বে প্রদান না করিয়া রাজা নিজ হস্তে রাখিয়াছিলেন, যথা ;—

"রাজার নিজের সেনা কিরাত সকল।
পূর্ব্বে দ্রুহ্যু সঙ্গে আইসে ক্ষত্রিয়ের বল।।"

কিরাত সৈন্যের সংখ্যাও সেকালে কম ছিল না। তদ্ভিন্ন যে সকল রাজ্য যুদ্ধে জয় করা হইত, সেই সকল রাজ্যের সৈন্যদিগকেও নিজ সৈনিক দলে ভুক্ত করিবার নিয়ম ছিল।

ছেংথুম্ফা খণ্ডে পাওয়া যায়, তাঁহার মহিষী গৌড়ের দুই তিন লক্ষ সৈন্যের সহিত আহবে জয় লাভ করিয়াছিলেন। * ইহা অল্প সৈন্যবলের পরিচায়ক নহে। রাজমালার প্রথম লহরে স্থানে স্থানে এইরূপ সৈন্য সংখ্যার ইঙ্গিত পাওয়া যায় মাত্র, স্পষ্টতররূপে কোন কথা লিখিত হয় নাই। এই লহরে গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনার অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় প্রমাণ পাওয়া যায় ; তৎকালে নৌ-যুদ্ধের প্রথা প্রচলিত ছিল কি না, জানিবার উপায় নাই। রাজমালায় মহারাজ জুঝারুফায়ের লিকা অভিযান বর্ণন লিখিত হইয়াছে—

"যুদ্ধহেতু সৈন্য সেনা গেলেক সাজিয়া।।
হস্তী ঘোড়া চলিলেক অনেক পদাতি।
ভিন্ন ভিন্ন ক্রমে চলে যার যেই রীতি।।"

জুঝারুফা খণ্ড,—৫০ পৃষ্ঠা।

এস্থলে গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিক এই তিন শ্রেণীর সৈন্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এতদ্ভিন্ন তীরন্দাজ সৈন্যের কথাও আছে।

সেনানায়ক

রাজার ভ্রাতা সেনাপতি

অতি প্রাচীন কালে সেনাপতিত্ব কোনও শ্রেণী বিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না, ত্রিলোচনের পুত্র মহারাজ দাক্ষিণের শাসন কালে ভ্রাতাগণকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং মহারাজ ছেংথুম্ফা-এর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত ইহাই পুরুষানুক্রমিক নিয়ম হইয়াছিল। †

---

* "দুই তিন লক্ষ সেনা আসিল কটক,
মিলিতে চাহেন রাজ্য দেখি ভয়ানক।"

ছেংথুম্ফা খণ্ড,—৫৬ পৃষ্ঠা।

† "রাজার অনুজ দশ হৈল সেনাপতি।
সর্ব্বসেনা ভাগ করি দিল ভ্রাতৃ প্রতি।।
পঞ্চ পঞ্চ সহস্র সেনা এক অংশে পায়।
পুরুষানুক্রমে এই রীতি হয়ে তায়।।"

দাক্ষিণ খণ্ড,—৩৪ পৃষ্ঠা।

মহারাজ ছেংথুম ফা-এর (নামান্তর কীর্ত্তিধর) সময়ে গৌড় বাহিনীর সহিত সমর উপলক্ষে জামাতাকে সেনাপতি করিয়াছিলেন। তদবধি অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত রাজ-জামাতাগণ এই সম্মানিত পদের অধিকারী ছিলেন।* কিয়ৎকাল পরে এই নিয়মও ভঙ্গ হইয়াছিল। তখন যোগ্যতর ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে সৈন্যাধক্ষ করা হইত।

জামাতা সেনাপতি

কোন কোন সময় সেনাপতির প্রতি দেবত্ব আরোপনের দৃষ্টান্ত রাজমালায় পাওয়া যায়; ইহা দেবতার প্রতি অবিচলিত ভক্তি ও বিশ্বাসের পরিচায়ক। ছেংথুম্‌ফা এর মহিষী গৌড়ের সহিত যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই যুদ্ধে,—

সেনাপতির প্রতি দেবত্বের আরোপ।

"চতুর্দ্দশ দেবতায় আগে চলি যায়।
সেনাপতি জানিয়া ত্রিপুরা পিছে ধায়।
চতুর্দ্দশ দেবতা অগ্রে যাইয়া কাটে।
পড়িল অশেষ সৈন্য দেবের কপটে" ইত্যাদি।

ছেংথুম্‌ফা খণ্ড—৫৮ পৃষ্ঠা।

রণ-ভেরী

সেকালে ঢোল বাজাইয়া সৈন্য সমবেত করা হইত। যথা ;

" এ বলিয়া ঢোলে বাড়ি দিতে আজ্ঞা কৈল।
যত সৈন্য সেনাপতি সব সাজি আইল।।"

ছেংথুমফা খণ্ড,—৫৬ পৃষ্ঠা।

সমরকালে ঢোল, দগড় (ডগর) ইত্যাদি দ্বারাই রণবাদ্যের প্রয়োজন নিষ্পাদিত হইত। হেড়ম্ব রাজের সহিত ত্রিপুররাজ দাক্ষিণের সমরকালে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়,—

"হইল তুমুল যুদ্ধ দুই সৈন্য মাঝে।
ঢোল দগড় ভেরী নানা বাদ্য বাজে।।"

দাক্ষিণ খণ্ড,—৩৫ পৃষ্ঠা।

মহারাজ জুঝারুফায়ের লিকা অভিযান কালে পাওয়া যায় ;—
যার যেই সেনা লইয়া ভ্রাতৃগণ রাজার।
সৈন্য মধ্যে চলিয়াছে রাজা ত্রিপুরার।"
জুঝারুফা খণ্ড,—৫০ পৃষ্ঠা।

* "এক জামাতা বিক্রম করে দৈবগতি।
তদবধি রাজার জামাত সেনাপতি।"
ছেংথুম্‌ফা খণ্ড,—৫৯ পৃষ্ঠা।

যুদ্ধাস্ত্র

প্রধানতঃ ধনুর্ব্বাণ, খড়্গ, চর্ম্ম, জাঠা ও ভল্লাদি অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করা হইত। যুদ্ধ শিক্ষাকালেও ঐ সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগের প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা ;—

"মল্লবিদ্যা বিশারদ হৈল সেনাগণ।
খড়্গ চর্ম্ম লৈয়া পাঁচা খেলে* ঢালিগণ।।
খলংমা নদীর তীরে পাষাণ পড়িছে।
ময়লা হৈলে খড়্গ লেঞ্জা † তাথে ধারাইছে।।
খলংমা নদীর তীরে বালুচর আছে।
বীর সবের খড়্গ চর্ম্ম তাথে রাখিয়াছে।।"

দাক্ষিণ খণ্ড—৩৭ পৃষ্ঠা।

আগ্নেয় অস্ত্রের প্রচলন

মহারাজ ছেংথুম্‌ফার সহিত গৌড় বাহিনীর যে তুমুল সংগ্রাম হয়, তাহাতে কেবল উপরি উক্ত অস্ত্রের সাহায্যেই ত্রিপুরার জয়লাভ ঘটিয়া ছিল, এমন নহে। এই সংগ্রামে আগ্নেয়াস্ত্রও ব্যবহৃত হইয়াছিল, রাজমালা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব থাকিলেও ত্রিপুর বংশাবলীতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ‡ মুসলমানগণের পক্ষেও ধনুর্ব্বাণ এবং খড়্গাদি ব্যবহারের প্রমাণ অনেক স্থলেই পাওয়া যায়, তাহাদের আগ্নেয় অস্ত্রও ছিল।

রাজার যুদ্ধ যাত্রা

মহারাজ ত্রিপুরের অভিযান

প্রাচীনকালে ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দ স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, এবং দিগ্বিজয়ের নিমিত্ত দূরদেশে গমন করিতেন, রাজমালায় এ কথার বিস্তর প্রমাণ আছে। মহারাজ ত্রিপুরের প্রসঙ্গে পাওয়া যায়,—

"যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা অবিরত মারে হস্তী ঘোড়া।।
অন্যত্র নৃপতি নাহি পারে যুদ্ধ বলে।
সকলেরে জয় করে নিজ বাহুবলে।।"

ত্রিপুর খণ্ড,—১০ পৃষ্ঠা।

---

* পাঁচা খেলা—কৃত্রিম যুদ্ধ।

† লেঞ্জা ;—জাঠা, শূল।

‡ তীর ধনু কামান বন্দুক শুল্পী রায় বাঁশ।
লইলেক বিষযুক্ত চোখা বোম বাঁশ।।
ত্রিপুর বংশাবলী।

ত্রিপুরের পুত্র মহারাজ ত্রিলোচন দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদিগকে স্বীয় বশতাপন্ন করেন ; এবং ইহার অল্পকাল পরে দিগ্বিজয়ের নিমিত্ত তিনি স্বয়ং নির্গত হইয়াছিলেন ; যথা,—

মহারাজ ত্রিলোচনের অভিযান

"এই মতে নরপতি বঞ্চে কত কাল।
নানান জাতীয় বহু ছিল মহীপাল।।
ফাইফেঙ্গ চাকমা আর খুলঙ্গ লাঙ্গাই
তনাই তৈয়ঙ্গ আর রয়াং আদি ঠাঁই।।
থানাংছি প্রতাপ সিংহ আছে যত দেশ।
লিকা নামে আর রাজা রাঙ্গামাটি শেষ।।
এই সব জিনিবারে ইচ্ছা মনে হৈল।
পাত্র মন্ত্রী সঙ্গে রাজা মন্ত্রণা করিল।।
পাত্রাদির অনুমতি লৈয়া ত্রিলোচনে।*
যুদ্ধ সজ্জা করিয়া চলিল সেনাগণে।।" ইত্যাদি।

ত্রিলোচন খণ্ড,—৩২ পৃষ্ঠা।

অন্যান্য রাজগণের অভিযান

হাম রাজের পুত্র বীররাজ সমরক্ষেত্রে স্বীয় জীবন আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন ;—

"হামরাজ তার পুত্র ভাল রাজা হৈল।
তান পুত্র বীররাজ যুদ্ধ করি মৈল।।"

মহারাজ জুঝারুফা লিকা অভিযানে স্বয়ং যাত্রা করিয়াছিলেন। রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

"যার যেই সেনা লইয়া ভ্রাতৃগণ রাজার।
সৈন্য মধ্যে চলিয়াছে রাজা ত্রিপুরার।।"

জুঝারুফা খণ্ড,—৫০ পৃষ্ঠা।

---

* যুদ্ধাদি বিষয়ে পাত্রগণের অনুমতি গ্রহণ করা রাজনীতিসম্মত কার্য্য। যথা—
"প্রাগাত্মা মন্ত্রিনশ্চৈব ততো ভৃত্যা মহীভৃতা।
জেয়াশ্চানন্তরং পৌরা বিরুদ্ধ্যেত ততোহরিভিঃ।।
যস্ত্বেতান বিজিত্যৈব বৈরিণো বিজিগীষতে।
সোহজিতাত্মা জিতামাত্যঃ শত্রুবর্গেন বাধ্যতে।।"

মার্কণ্ডেয় পুরাণ—২৭শ অঃ।

মর্ম্ম ;—"রাজা, প্রথমে আত্মাকে, পরে মন্ত্রীদিগকে, অনন্তর ভৃত্যবর্গকে, তদনন্তর পৌরদিগকে আয়ত্ত করিয়া পরে শত্রুর সহিত বিরোধ করিবেন। যিনি আত্মা প্রভৃতিকে জয় না করিয়া বৈরীদিগকে জয় করিতে অভিলাষ করেন, সেই অজিতাত্মা নরপতি অমাত্য কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া শত্রুবর্গের আয়ত্ত হন।"

শুক্র নীতি প্রভৃতি গ্রন্থেও এ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ত্রিপুরেশ্বরের রাজ্য বিস্তারের পিপাসার পরিতৃপ্তি হয় নাই, তিনি লিকা রাজাকে পরাভূত করিয়া রাঙ্গামাটি প্রদেশ হস্তগত করিবার পরে,---

বঙ্গদেশের প্রতি হস্তক্ষেপ

"রহিল অনেক কাল সে স্থানে নৃপতি।
বঙ্গদেশ আমল করিতে হৈল মতি।।
বিশাল গড় আদি করি পর্ব্বতীয় গ্রাম।
কালক্রমে সেইস্থান হৈল ত্রিপুর থান।"

জুঝারুফা খণ্ড,---৫২ পৃষ্ঠা।

অতঃপর ত্রিপুরার সমরাঙ্গনে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল; এস্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে। আমরা ছেংথুমাফা খণ্ডে পাইয়াছি, হীরাবন্ত খাঁ বঙ্গরাজ্যের অধীনস্থ একজন চৌধুরী (সামন্ত) ছিলেন।* মহারাজ ছেংথুম্‌ফা (নামান্তর সিংহতুঙ্গফা বা কীর্ত্তিধর), তাঁহার রাজ্য (মেহেরকুল, প্রাচীন কমলাঙ্ক) অধিকার করায়, হীরাবন্ত অনন্যোপায় হইয়া গৌড়েশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। গৌড়াধিপ এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হইয়া, ত্রিপুরা বিজয়ের নিমিত্ত বহু সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ত্রিপুরেশ্বর বীরপুরুষ এবং সমর নিপুণ হইলেও, প্রতিপক্ষের সৈন্য সংখ্যাধিক্যের কথা শুনিয়া, তাঁহার হৃদয়ে সাময়িক দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ দেখা গেল, তিনি স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে—এমন কি, আহবে লিপ্ত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজমহিষী রাজাকে রণ-পরাঙ্মুখ দর্শনে দুঃখিত ও ক্ষুব্ধা হইয়া ক্ষুধিতা সিংহীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া, ভয়াতুর পতিকে বলিলেন;—

গৌড়াধিপের সহিত যুদ্ধের সূত্রপাত

"অখ্যাতি করিতে চাহ আমা বংশে তুমি।
বলে, আসি দেখ রঙ্গ যুদ্ধ করি আমি।।
এ বলিয়া ঢোলে বাড়ি দিতে আজ্ঞা কৈল।
যত সৈন্য সেনাপতি সব সাজি আইল।"

ছেংথুম্‌ফা খণ্ড,---৫৬ পৃষ্ঠা।

সেনাপতিগণকে আপন আপন অধীনস্থ সৈন্যসহ উপস্থিত দেখিয়া,---

"মহাদেবী জিজ্ঞাসিল বিনয় করিয়া।
কি করিবা পুত্রসব কহ বিবেচিয়া।।

* সংস্কৃত রাজমালার মতে ইনি ত্রিপুর রাজ্যের একজন সামন্ত ছিলেন। এই উক্তি নির্ভর যোগ্য নহে। কারণ হীরাবন্ত মেহের কুলের চৌধুরী ছিলেন। সে কালে মেহেরকুল ত্রিপুরার অধীন ছিল না। হীরাবন্ত উপলক্ষিত যুদ্ধে উক্ত স্থান ত্রিপুর রাজ্যভুক্ত হয়।

গৌড় সৈন্য আসিয়াছে যেন যম কাল।
তোমার নৃপতি হৈল বনের শৃগাল।।
যুদ্ধ করিবারে আমি যাইব আপনে।
যেই জন বীর হও চল আমা সনে।।"

তখন,—

"রাণী বাক্য শুনি সভে বীরদর্পে বোলে।
প্রতিজ্ঞা করিল যুদ্ধে যাইব সকলে।।"

ছেংথুম্‌ফা খণ্ড,—৫৬ পৃষ্ঠা।

অতঃপর মহারাণী হৃষ্টচিত্তে মন্ত্রী ও সেনাপতিগণের রমণীদিগকে লইয়া এক বৃহৎ ভোজের আয়োজন করিলেন, এবং তিনি স্বয়ং রন্ধনাদির তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্তা রহিলেন। রাত্রিতে সৈনিকদলকে মদ্যমাংস ইত্যাদির দ্বারা ষোড়শোপচারে ভোজন করাইয়া, পর দিবস প্রত্যুষে হস্তী আরোহণে, বিপুল বাহিনী সহ যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

মহারাণীর যুদ্ধ যাত্রা ও জয় লাভ

পূর্ব্বে ভীত হইয়া থাকিলেও মহারাণীর উত্তেজনাপূর্ণ বাণী শ্রবণ ও সৈনিকদলের উৎসহ সন্দর্শনে, উদ্দীপ্তচিত্তে মহারাজ স্বয়ংও যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দুই দণ্ড বেলার সময় যুদ্ধ আরম্ভ হয়, সমস্ত দিন তুমুল সংগ্রামের পর, এক দণ্ড বেলা থাকিতে অসংখ্য নরশোণিতে সমরক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া, বিজয়লক্ষ্মী ত্রিপুরার অঙ্কশায়িনী হইলেন।* রাজমালার মতে, এই যুদ্ধ গৌড়েশ্বরের সঙ্গে হইয়াছিল, একথা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। এ বিষয়ে রাজমালা আরও বলেন,—

"এসব বৃত্তান্ত সে যে (হীরাবন্ত) গৌড়েতে কহিল।
রাঙ্গামাটি যুঝিবারে গৌড় সৈন্য আইল।।"

সংস্কৃত রাজমালার মত অন্যরূপ ; এই গ্রন্থের বর্ণন দ্বারা জানা যায়, দিল্লীশ্বরের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল। † এই মতদ্বৈধের মীমাংসা করা দুঃসাধ্য হইলেও ঐতিহাসিকগণ

যুদ্ধের প্রতিপক্ষ নির্দ্ধারণ

রাজমালার মতই পোষণ করিয়াছেন। আমরা গৌড়েশ্বর কর্ত্তৃক ত্রিপুরা আক্রমণের কথাই সত্য বলিয়া স্বীকার করি। এবিষয়ের প্রমাণ অতঃপর প্রদান করা যাইতেছে।

---

* "দুই দণ্ড বেলা উদয় হৈল মহারণ।
এক দণ্ড বেলা থাকে সন্ধ্যা ততক্ষণ।।" ছেংথুম্‌ফা খণ্ড,—৫৮ পৃঃ।

† "এবং নিত্যং সতেনোক্তো দিল্লীশ্বর দয়াময়ঃ।
বহু সৈন্য সমাযুক্তো গঙ্গাতীরে মুপাগতঃ।।" ইত্যাদি
সংস্কৃত রাজমালা।

এই যুদ্ধকালে গৌড়েশ্বর কে ছিলেন এবং দিল্লীশ্বরই বা কে ছিলেন, রাজমালায় সে কথার উল্লেখ নাই।

ইতিহাস আলোচনায় জানা যায়, ১১৬৫ শকাব্দে (১২৪৩ খৃঃ) লক্ষ্মণাবতীর মালিক তুগ্রল তুগণ খাঁ জাজনগর আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক এই জাজনগরকে ত্রিপুরা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হইলে, তুগণ খাঁ ছেংথুম ফা এর মহিষীর হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন এরূপ বলা যাইতে পারিত ; কিন্তু এ বিষয়ে মতান্তর আছে। কেহ কেহ বলেন, তুগণ খাঁ যে জাজনগর আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা উড়িষ্যার রাজধানী জাজপুর। মেজর ষ্টুয়ার্ট, উড়িষ্যাধিপতি কর্ত্তৃক তুগণ খাঁ এর পরাজয় বৃত্তান্ত, লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। * ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেব, ষ্টুয়ার্টের মতই সমর্থন করিয়াছেন। † এবং কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহাশয়ও উক্ত মতের পক্ষপাতী ‡ তুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত জাজনগর যে ত্রিপুর রাজ্য নহে, আমরা এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে,---

তুগ্রল খাঁ ও জাজ নগর

"গৌড় দেশী ভগ্ন পাইক দেশেতে পৌছিয়া।
বলিলেন যুদ্ধবার্ত্তা মহা দুঃখী হৈয়া।।
দূত বলে মহারাজ করি নিবেদন।
ত্রিপুরাসুন্দরী নাম রাজরাণী হন।
** মহাযুদ্ধ করিলেন রাণী।
এত বড় যুদ্ধ রাণী কভু নাহি শুনি।।
* * * * *
এত শুনি গৌড় রাজা তাজ্জব (১) হইল।
নারী সঙ্গে যুদ্ধ করি সৈন্য ক্ষয় হৈল।।"

কোন গ্রন্থেই এই বিজিত গৌড়েশ্বরের নামোল্লেখ নাই, একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। ত্রিপুর বংশাবলীতে যুদ্ধের সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, অন্য কোন গ্রন্থে তাহাও পাওয়া যায় না। উক্ত পুস্তিকার রচয়িতা বলেন; —

বিজিত গৌড়েশ্বরের অনুসন্ধান

"ছয়শত পঞ্চাশ সন ত্রিপুরা যখন।
ত্রিপুরাসুন্দরী রাণী করে এই রণ।।"

---

* Stewarts History of Bengal P. P. 38-39.

† Hunter's Orissa, Vol II. P.4

‡ "ভারতী ;--৭ম ভাগ, ১২-১৩ পৃঃ, "জাজনগর" শীর্ষক প্রবন্ধ।

(১) তাজ্জব—বিস্মিত।

ত্রিপুর বংশাবলী রচয়িতার মতে, বঙ্গের সেন বংশীয় কোনও রাজার সহিত এই যুদ্ধ হইয়াছিল, * তিনি রাজার নাম প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। ৬৫০ ত্রিপুরাব্দে, ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দ ছিল। ইতিহাস আলোচনায় জানা যায়, মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি, মহম্মদ-ই বখতিয়ার খিলিজি ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করিয়া, বঙ্গদেশে পাঠান আধিপত্য স্থাপন করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক এই কথা উপেক্ষা করিয়া থাকিলেও, ঘটনা অমূলক বলিয়া মনে হয় না। মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ-ই-সিরাজ, "তবকাৎ-ই-নাসেরী" নামক গ্রন্থে লক্ষ্মণ সেনের উপর যে পলায়নজনিত কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন, তাহা সত্য না হইতে পারে, কিন্তু বখতিয়ার কর্ত্তৃক বঙ্গ বিজয়ের কথা মিথ্যা নহে। তবে, এই বিজয়ের সময় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বুকানন সাহেবের মতে ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দ, মেজর রেভার্টি ও মুন্সী শ্যামপ্রসাদের মতে ৫৯০ হিঃ (১১৯৪ খ্রীঃ), ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহের মতে ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দ, পাঠান বিজয়ের কাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ষ্টুয়ার্ট ও ওয়াইজ সাহেবের মতে ৬০০ হিঃ (১২০৩-৪ খ্রীঃ), ডাক্তার কিল্‌হর্ণ (১) ও রিভারিজের মতে (২) ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ও ব্লকম্যানের মতে (৩) ১১৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঠান কর্ত্তৃক বঙ্গ বিজয় হইয়াছিল। গৌড় রাজমালার লেখক, ব্লকম্যানের মতের অনুসরণ করিয়াছেন। (৪) উইলফোর্ড সাহেবের মতে (৫) ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দ, টমাস্ সাহেবের মতে (৬) ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দ, প্রাচ্যবিদ্যার্নব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে (৭) ১১৯৭-৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, স্বর্গীয় পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের মতে (৮) ১১২৪ শক (১২০২-৩ খ্রীঃ) পাঠান বিজয়ের সময় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গয়ার বিষ্ণুপাদ মন্দিরের প্রশস্তি আলোচনায় নির্ণীত হইয়াছে, গোবিন্দপাল দেব ১১৬১ খ্রীঃঅব্দে মগধের সিংহাসন-রূঢ় হইয়াছিলেন (৯) তাঁহার ৩৮ বৎসর রাজ্য ভোগের পরে মহম্মদ-ই-বখতিয়ার

"যে সময়ে এই যুদ্ধ ত্রিপুরে হইল।
গৌড়দেশে সেনবংশী রাজগণ ছিল।।"—ত্রিপুর বংশাবলী।

(১) Indian Antiquary-Vol, XIX
(২) J. A. S. B.-1898. Pt. 1, P.2
(৩) J. A. S. B.-1873. Pt. 1, P.211
(৪) গৌড় রাজমালা—৭১ পৃষ্ঠা।
(৫) Asiatic Researches-Vol. IV. P. 203
(৬) Initial Coinage of Bengal
(৭) J. A. S. B.-1896. Pt. 1, P.31
(৮) সাহিত্য—১৩০১, ৩ পৃষ্ঠা।
(৯) J. A. S. B.-Vol. III. No. 18.

বিহার জয় করেন (১)। এই ঘটনার "দোয়ম সালে" গৌড় বিজয় হইয়াছিল। এই যুক্তির অনুসরণ করিয়া ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পাঠান বিজয়ের কাল ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন (২)। উদীয়মান ঐতিহাসিক, স্নেহভাজন শ্রীমান্ যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় রাখাল বাবুর মত সমর্থন করিয়াছেন (৩)। 'সম্বন্ধনির্ণয়' গ্রন্থে সেনরাজবংশের যে রাজত্বকাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা আলোচনায় জানা যায়, মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব কাল ১১২৩-১২০৩ খ্রীষ্টাব্দ। (৪) কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে লক্ষ্মণ সেনের পরেও এক শতাব্দীকাল বঙ্গদেশে সেনবংশীয়গণের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁহারা বলেন, বখ্তিয়ার কর্ত্তৃক বঙ্গ বিয়জের কথা সত্য হইলেও, পুনর্ব্বার হিন্দুগণ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ অধিকৃত হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্থলে, মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের অর্দ্ধ শতাব্দী পরে, মুগীশউদ্দীন য়ুজবক, নোদিয়া (নদীয়া) জয় করিয়া, বিজয় কাহিনী স্মরণার্থ নূতন মুদ্রা প্রস্তুতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। (৫)

ঐতিহাসিকগণের শেষোক্ত মত সমর্থনযোগ্য আরও প্রমাণ আছে। মাধব সেন, কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেন নামক লক্ষ্মণ সেনের তিন পুত্র বিদ্যমান ছিলেন। সেন বংশীয় রাজগণের তাম্রফলকে মাধব সেনের নামোল্লেখ নাই, কিন্তু কেশব ও বিশ্বরূপ সেনের নাম পাওয়া যায়। ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, লক্ষ্মণ সেনের পরবর্ত্তী কেশব সেনের তাম্রশাসনের যে যে স্থানে মাধব সেনের নাম উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা কাটিয়া কেশব সেনের নাম খোদিত হইয়াছে। এতদ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, মাধব সেনের অনুজ্ঞায় তাম্রফলক উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তদনুসারে দান সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই মাধব সেন পরলোক গমন করায়, কেশব সেন সিংহাসনারূঢ় হইয়া, মাধব সেনের নাম কাটিয়া, আপন নাম যোগ করিয়াছেন। * মদন পাড়র তাম্রফলকেও একটী নাম উঠাইয়া ফেলিয়া তৎস্থলে বিশ্বরূপ সেনেরও নাম উৎকীর্ণ হইয়াছে। † ইহাও পূর্ব্বোক্ত শাসনের ন্যায় মাধবের নামের স্থলে

---

(১) J. A. S. B.-1876. Pt. 1, P.P. 331-32

(২) J. A. S. B.-1913. P. 277 & 285

(৩) ঢাকার ইতিহাস—২য় খণ্ড, ১০ম অঃ, ৩৯৯ পৃষ্ঠা।

(৪) আদিশূর ও বল্লালসেন—পরিশিষ্ট ৩১ পৃষ্ঠা।

(৫) Catalogue of Coins in the Indian Museum. Calcutta-Vol. II, Pt. II. P. 146 No. 6.

* গৌড়ে ব্রাহ্মণ—২৫৭ পৃষ্ঠা টীকা।

† Journal of the Asiatic Society of Bengal

বিশ্বরূপের নাম খোদিত হইয়াছে বলিয়া অনেক অনুমান করেন। রামজয় কৃত কুল পঞ্জিকা, ইণ্ডোএরিয়াণ এবং আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে লক্ষ্মণ সেনের পরে, মদুসেন রাজার নাম পাওয়া যায়। কোন কোন ঐতিহাসিক এই মধুসেন ও মাধবসেন অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন।* সেন বংশীয়গণের শাসনকালের হিসাবে এই মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না, অতঃপর এবিষয়ের আলোচনা করিব।

বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে তাঁহাকে গর্গ যবনান্বয় প্রলয় কালরুদ্রঃ" এই বিশেষণে অলঙ্কৃত করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা অনুমিত হয়, তিনি যবনদিগকে বারংবার পরাজিত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ঘোর দেশীয় তুরস্কদিগকে গর্গ যবনান্বয়' বলা হইয়াছে।

লক্ষ্মণসেরে পর, তাঁহার তিন পুত্রই ক্রমান্বয়ের বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত প্রমাণদ্বারা ইহাই জানা যাইতেছে। হরি মিশ্রের কারিকায় লিখিত আছে---

"বল্লাল তনয়ো রাজা লক্ষ্মণোভূৎ মহাশয়ঃ।

*   *   *   *   *

তৎপুত্র কেশবো রাজা গৌড় রাজ্যঃ বিহায় সঃ।"

কুলাচার্য্য এডুমিশ্র লিখিয়াছেন,—

নৃপং তং কেশবো ভূপতিঃ সৈন্যৈর্বিপ্রগণৈঃ পিতামহকৃতৈ রণৈশ্চ যক্তোগতঃ। তাং চক্রে নৃপতির্মহাদরতয়া সম্মানয়ন্ জিবিকাং তদ্বর্গস্য চ তস্য চ প্রথমতশ্চক্রে প্রতিষ্ঠান্বিতঃ।"

লক্ষ্মণ সেনের পরেও যে গৌড়ে সেন রাজগণের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল, তদ্বিষয়ে এতদিতিরিক্ত প্রমাণ প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক সংগৃহীত একখানি হস্ত লিখিত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লেখ আছে,---পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরম সৌগত "মধুসেন" ১১৯৪ শকে (১২৭২ খ্রীঃ) বিক্রমপুরে আধিপত্য করিয়াছিলেন। † কথিত আছে, ইনি তুরস্কদিগকে বারম্বার পরাজিত করিয়াছিলেন। এই সময় প্রায় সমগ্র বরেন্দ্রভূমি, রাঢ়, মিথিলা এবং বাগড়ীর পশ্চিমাংশ মুসলমান গণের কুক্ষিগত হইলেও মধুসেন, দুর্ভেদ্য একডালাদুর্গে ‡

* ঢাকার ইতিহাস—২য় খণ্ড, ১০ম আঃ, ৪১৩ পৃষ্ঠা।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড, ৩৫৪ পৃঃ।

‡ দুরদুরিয়ার ৮ মাইল দক্ষিণে, বানার ও লক্ষ্যানদীর সঙ্গমস্থলে এই স্থান অবস্থিত। একডালার অবস্থান সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে ; এবং একাধিক একডালার অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে।

উত্তর পূর্ব্ব ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিত আছে, 'সম্রাটের আগমনে সাম্‌স্‌উদ্দিন সুবর্ণগ্রামের নিকটবর্ত্তী দুর্ভেদ্য একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন।" এই একডালাই আমাদের লক্ষ্যস্থল। এই দুর্গ মহারাজ বল্লাল সেন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

আশ্রয় লইয়া, পূর্ব্ববঙ্গে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তারিখ-ই-বরণী নামক মুসলমান ইতিহাস গ্রন্থ হইতে জানা যায়, যে সময় দিল্লীশ্বর বলবন, তুঘরিল খাঁকে দমন করিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশে আগমন করেন, তৎকালে (১২৮০খ্রীঃঅব্দে) সুবর্ণ গ্রামের সিংহাসনে দনৌজ রায় নামক এক হিন্দু নরপতি অধিষ্ঠিত ছিলেন ; দক্ষিণে সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত তাঁহার একাধিপত্য ছিল। হরিমিশ্র বিরচিত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলজি গ্রন্থে পাওয়া যায়, গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশব সেন এবং কেশব সেনের পুত্র দনৌজ মাধব। সময়ের সমতা দৃষ্টে অনুমিত হয়, এই দনৌজ মাধব ও পূর্ব্ব কথিত মধুসেন অভিন্নব্যক্তি ; মাধব শব্দের স্থলে পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত গ্রন্থে "মধু" লিখিত হওয়া বিচিত্র নহে।

গৌড়ের সহিত ত্রিপুরার যুদ্ধ ১২৪০ খ্রীঃ অব্দের ঘটনা। এই যুদ্ধের পূর্ব্বের, ১২০০ খ্রী অব্দে মুসলমানগণের বঙ্গবিজয়ের কথা অভ্রান্ত হইলে, লক্ষ্মণসেনের শাসনকাল ত্রিপুরযুদ্ধের পূর্ব্বেই অবসান হইয়াছিল, ধরিতে হইবে। এবং উক্ত যুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে (১২৮০ খ্রী অব্দে) সুবর্ণগ্রামের সিংহাসনে, লক্ষ্মণসেনের পৌত্র ও কেশবসেনের পুত্র দনৌজ মাধবকে অধিষ্ঠিত দেখিতেছি। লক্ষ্মণসেনের পরে ও দনৌজ মাধবের পূর্ব্বে, কেশব সেন বঙ্গের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, ইতিহাস ও তাম্রফলক আলোচনায় ইহার প্রমাণ পাইবার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করাইয়াছে। অতএব ত্রিপুরা আক্রমণ কালে (১২৪০ খ্রীঃ অব্দে) কেশব সেন বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং তিনিই ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়া মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। আমরা কেশব সেনকেই ত্রিপুরা আক্রমণকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি।*

বিজয় শ্রী ভূষিতা মহারাণীর নাম

বিজয়ীমালায় বিভূষিতা মহারাণীকে লক্ষ্য করিয়া স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন---"ভারতীয় মহিলাকুলমধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। গড়মণ্ডলের অধীশ্বরী দুর্গাবতী এবং ঝানসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ ভীষণ সমরে স্ব স্ব প্রাণ আহুতি প্রদানপূর্ব্বক অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করতঃ বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন ; কিন্তু বিজয়লক্ষ্মীর

* স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় ত্রিপুরা আক্রমণকারীর নাম বা জাতি নির্ণয় করেন নাই। সুহৃদ্বয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় গিয়াসউদ্দিনকে আক্রমণকারী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ২য় ভাঃ, ১ম খঃ, ৬ষ্ঠ, অঃ, ৭৫ পৃঃ।) এই নির্দ্ধারণ অভ্রান্ত নহে। গিয়াউদ্দিন ১২১২ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা পদে নিযুক্ত হইয়া ১২২৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা আক্রমণ ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। সুতরাং এই যুদ্ধের পূর্ব্বেই গিয়াসউদ্দিনের শাসনকাল শেষ হইয়াছিল।

সাহচর্য্য তাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই, বিজয়ী পতাকা তাঁহাদের শীর্ষে উড্ডীন হয় নাই। ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে, রাজমালা লেখক বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয় এহেন রমণীরত্নের নাম স্বীয় গ্রন্থে করেন নাই।"* শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রণেতাও এই বীরাঙ্গনার নাম না পাইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। †

এমন প্রাতঃস্মরণীয়া বীরেন্দ্রকুল বরণীয়া মহিলার নাম বিস্মৃতির অন্ধকার গহ্বরে চির-লুক্কায়িত থাকা বিধাতার ইচ্ছা হইতে পারে না। সৌভাগ্যবশতঃ আমরা এই বীর্য্যবতী ললনার নামোদ্ধার করিবার সুযোগ পাইয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। তাঁহার নাম "ত্রিপুরাসুন্দরী" ছিল। এই নাম ইতি পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তথাপি এস্থলে পুনরাবৃত্তি না করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিলাম না।

"রাণী সঙ্গে সৈন্যগণ যুদ্ধে প্রবেশিল।
ত্রিপুরাসুন্দরী রাণী হস্তীসোয়ার হইল।।
* * * * *
ছয়শত পঞ্চাশ সন ত্রিপুরা যখন।
ত্রিপুরা সুন্দরী রাণী করে এই রণ।।"

ত্রিপুরবংশাবলী।

মহারাজ রত্ন ফা আত্মকলহে লিপ্ত হইয়া এরূপ বীর প্রসবিনী ত্রিপুরার অম্লান গৌরব ম্লানের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। এতদ্বিষয়ক বিবরণ 'আত্মবিরোধ' শীর্ষক আখ্যায়িকায় লিখিত হইবে। মহারাজ রত্ন ফা গৌড়ের সৈন্য সাহায্যে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, পৈতৃক সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

আত্মবিরোধ গৌরবের হানি

অভিযান ও সৈন্য চালনা

রাজাগণের যুদ্ধ যাত্রাকালে, ডঙ্কা, পতাকা, চন্দ্রধ্বজ, ত্রিশূলধ্বজ ইত্যাদি রাজচিহ্ন সঙ্গে চলিত। গজারোহী, অশ্বারোহী এবং পদাতি সৈন্যগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপে পরিচালিত হইত। এবং অভিযান কালে রাজাকে নিরাপদ রাখিবার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইত। লিকা অভিযানে যে প্রণালীতে

অভিযান কালের সতর্কতা

* কৈলাস বাবুর রাজমালা,—২য় ভাগ, ২য় অঃ ২৫ পৃষ্ঠা।

† শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—২য় ভাগ, ১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ অঃ ৭৫ পৃষ্ঠা।

সৈন্য পরিচালিত হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলেই এ বিষয়ের আভাস পাওয়া যাইবে, যথা,—

'হস্তী ঘোড়া চলিলেক অনেক পদাতি।
ভিন্ন ভিন্ন ক্রমে চলে যার যেই রীতি।।
অগ্র হৈয়া সৈন্য চলে পীঠবর্ত্তী পরে।
লাঙ্গাই সৈন্য চলিলেক নাওড়াই তদন্তরে।।
যার যেই সৈন্য লৈয়া ভ্রাতৃগণ রাজার।
সৈন্য মধ্যে চলিয়াছে রাজা ত্রিপুরার।।
ডাইনে বামে দুই ভাগ সেনাপতিগণ।
বহু সেনাপতি রহে পৃষ্ঠের রক্ষণ।
তাহার পশ্চাতে রহে আর সেনাপতি।
রাজ ভ্রাতৃ সকলের ত্রাণ করে অতি।"

রাজমালা---যুঝার ফা খণ্ড।

সেকালে পট মণ্ডপ বা তদনুরূপ অন্য কোনও সুবিধাজনক বস্তু ছিল না। অভিযান কালে স্থানে স্থানে শিবির সংস্থাপনের নিমিত্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিতে হইত। এই ভার কুকিগণের প্রতি ছিল, রাজমালায় লিখিত হইয়াছে,---"কুকি সৈন্য আগে আগে বানায়ে যে ঘর।" এই নিয়ম বর্ত্তমান কালেও প্রচলিত আছে।

সৈনিকগণের উচ্ছৃঙ্খলতা

সৈনিক বিভাগে সুরার প্রভাব

সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারিগণের মধ্যে অতিরিক্ত মদ্যপানের প্রথা প্রচলিত ছিল। কোন কোন সময় তাহারা সুরামত্ত হইয়া, আত্মকলহে রত হইত ; এবং সেই কলহ সময় সময় এত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইত যে, নিজের কাটাকাটি করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হইত না ; অনেক সময়ে তাহা নিবারণ করা স্বয়ং মহারাজেও অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইত। এস্থলে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইতেছে; —

"বড় বড় যুদ্ধা সব বীর অতিশয়।
মহাবল পদভরে ক্ষিতি কম্প হয়।।
মদ্য মাংসে রত সব গোয়ার প্রকৃতি।
তৃণ প্রায় দেখে তারা গজ-মত্ত-মতি।।
ত্রিপুরার কুলে পুনঃ বহু বীর হৈল।
মদ্য পান করি সবে কলহ করিল।।

তুমুল হইল যুদ্ধ ঘোর পরস্পরে।
তাহা নিবারিত নাহি পারে নৃপবরে।।
আত্মকুল কলহেতে মহা যুদ্ধ ছিল।
পড়িল অনেক বীর রক্তে নদী হৈল।।" ইত্যাদি

রাজমালা,—দাক্ষিণ খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা।

সেনাপতিগণ সময় সময় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া নানারূপ অসঙ্গত কার্য্য করিবার দৃষ্টান্তও রাজমালায় পাওয়া যায়। এমনকি, রাজাকে বধ করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। মহারাজ প্রতাপমাণিক্য এই শ্রেণীর দুর্দ্দান্ত সেনাপতিগণের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন, যথা ; —

রাজা ও রাজ্যের উপর সেনাপতিদের প্রভাব

"রত্নমাণিক্য রাজা স্বর্গে হৈল গতি।
অধার্ম্মিক প্রতাপমাণিক্য হৈল খ্যাতি।
তাহানে মারিল রাত্রে দশ সেনাপতি।"

সামরিক বিভাগ সংক্রান্ত এতদতিরিক্ত বিবরণ এস্থলে উল্লেখ করা অসম্ভব, রাজামালা আলোচনা করিলে এমন অনেক বিবরণ পাওয়া যাইবে, যাহা এই আখ্যায়িকায় আলোচিত হয় নাই।

রাজ্যের অবস্থা

রাজধানী,—ত্রিপুরেশ্বরগণ কিরাত রাজ্যে আসিয়া প্রথমতঃ কোপল বা কপিল নদের তীরবর্ত্তী ত্রিবেগ নগরে রাজপাট স্থাপন করেন ; 'কপিল' ব্রহ্মপুত্র নদের নামান্তর। এই ত্রিবেগের অবস্থান নির্ণয় বিষয়ে পূর্ব্বভাষে আলোচনা করা হইয়াছে। ত্রিবেগে আগমনের পূর্ব্বে এই বংশ কোথায় ছিলেন, তাহাও পূর্ব্বভাষে পাওয়া যাইবে।

কিরাত দেশের প্রথম রাজপাট

মহারাজ ত্রিলোচনের সময় পর্য্যন্ত ত্রিবেগেই রাজধানী ছিল। ত্রিলোচনের পুত্র দাক্ষিণ ভ্রাতৃ বিরোধের ফলে, উক্ত রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া বরচক্র নদীর তীরে 'খলংমা' নামক স্থানে নূতন রাজপাট স্থাপন করেন।* এই সময় বরবক্র নদীর উত্তর তীরবর্ত্তী ভূ-ভাগ ত্রিপুরার

খলংমা নামক স্থানে রাজপাট

* "কপিলা নদীর তীর পাট ছাড়ি দিয়া।
একাদশ ভাই মিলি মন্ত্রণা করিয়া।।
সৈন্য সেনা সমে রাজা স্থানান্তরে গেলা।
বরবক্র উজানেতে খলংমা রহিলা।।"

দাক্ষিণ খণ্ড,—৩৬ পৃঃ।

হস্তচ্যুত এবং কাছাড় রাজ্যের অন্তর্ভুত হইয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে এই রাজধানীও পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প হইয়াছিল;* কিন্তু রাজা পরলোক প্রাপ্ত হওয়ায় সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। প্রতীতের ঊর্দ্ধতন ১২ স্থানীয় মহারাজ কুমার কর্ত্তৃক মনু নদীর তীরবর্ত্তী কৈলাসহরে রাজপাট স্থাপিত হইয়া থাকিলেও তৎকালে খলংমার রাজধানী পরিত্যাগ করিবার প্রমাণ নাই। বরং প্রতীতের রাজত্বের প্রথম ভাগেও খলংমায় রাজধানী থাকিবারই প্রমাণ পাওয়া যায়। হেড়ম্ব রাজার সহিত মহারাজ প্রতীত মিত্রতা স্থাপন করিয়া, বরবক্র নদী, উভয় রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। এই মিত্রতা বদ্ধমূল করিবার অভিপ্রায়ে তিনি হেড়ম্বে যাইয়া কিয়ৎকাল অবস্থান করেন। এই ঘটনার কামাখ্যা, জয়ন্তা প্রভৃতি প্রত্যন্ত রাজগণ বিশেষ চিন্তিতন হইলেন; তাঁহারা হেড়ম্ব ও ত্রিপুরার মধ্যে মনোমালিন্য জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, এক সুন্দরী যুবতীকে পাঠাইয়া দিলেন। পুরাণাদিতে পাওয়া যায়, দেবতাগণ অনেক সময় অপ্সরা দ্বারা যোগীগণের যোগ ভঙ্গে সমর্থ হইয়াছেন। যেই মনোমোহিনী রমণী মুনির মন টলাইতেও সমর্থা, সেই রমণী দুইটী রাজার মধ্যে কলহ উৎপাদন করিবে ইহা আর বিচিত্র কি! ষড়যন্ত্রকারিগণের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, প্রেরিতা রমণীর চাতুরী-বিমুগ্ধ রাজাদ্বয়ের মধ্যে গজকচ্ছপের যুদ্ধ বাঁধিবার উপক্রম ঘটিল। তখন মহারাজ প্রতীত, রমণীকে লইয়া হেড়ম্বরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক খলংমায় আসিয়াছিলেন। † কাছাড়পতি সসৈন্যে পশ্চাদনুসরণ করায়, এই সময়ই প্রতীত খলংমার রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মনগরে এক নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার পরে কৈলাসহরে, তথা হইতে কৈলার গড়ে (কসবায়) রাজধানী পরিবর্ত্তিত হয়। কৈলাসহরে দীর্ঘকাল রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। উক্ত প্রদেশে যে কাতাল ও কাকচাঁদের আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে, তাহা আলোচনা করিলে মনে হয়, ভীষণ দুর্ভিক্ষে উক্ত নগরটী ধ্বংস মুখে পতিত হওয়ায়, রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। গল্পটি এস্থলে প্রদান করিবার সুবিধা ঘটিল না, এই টীকার পরবর্ত্তী অংশে সন্নিবিষ্ট হইবে।

কৈলাসহরে রাজপাট

ত্রিপুর ও হেরম্ব রাজ্যের ব্যবহার

নানা স্থানে রাজধানীর প্রতিষ্ঠা।

---

* "না রহিব এথাতে যাইব অন্য স্থান।
মনঃ স্থির করে রাজা যাইতে উজান।।
অদ্য কল্য যাইব মনে বাসনা না ত্যজে।
সেই স্থানে কাল বশ হৈল মহারাজে।। দক্ষিণ খণ্ড,—৩৮ পৃঃ।

† "সুন্দরী দেখিয়া রাজা ভুলিয়াছে মন।
খলংমার তীরে আইসে ত্রিপুর রাজন।" প্রতীত খণ্ড—৪৮ পৃঃ।

ত্রিপুরার রাজ পাট রাজ্যের উত্তর ভাগে (কাছাড় ও শ্রীহট্ট অঞ্চলে) থাকা কালে, সময় সময় নানা স্থানে বাড়ী নির্ম্মাণের প্রমাণ পাওয়া যায়। ধর্ম্মনগর বিভাগের অন্তর্গত ফটিকউলি (ফটিফুলি) নামক স্থানে মহারাজ ডাঙ্গর ফা এক পুরী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। শ্রীহট্ট জেলাস্থ কানিহাটি পরগণায়, প্রতাপ গড়ের দক্ষিণ দিকস্থ নাগড়া ছড়ার তীরে, ধর্ম্মনগর বিভাগের অন্তর্গত মাণিক ভাণ্ডার ও কল্যাণপুর প্রভৃতি স্থানে এখনও রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ এবং বিস্তীর্ণ রাজপথ ও জলাশয় ইত্যাদি প্রাচীন সমৃদ্ধির শেষ চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে ; এবং তাহা ত্রিপুরেশ্বরগণের কীর্ত্তি বলিয়া অদ্যাপি লোকে ঘোষণা করিয়া থাকে। মাণিক ভাণ্ডার অঞ্চল পূর্ব্বে কৈলাসহর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এক কালে বরবক্রের দক্ষিণ তীরবর্ত্তী সমগ্র ভূ-ভাগ ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তৎকালে আধুনিক করিমগঞ্জ সব-ডিভিসনের অধিকাংশ স্থান ত্রিপুরার কুক্ষিগত থাকিবার কথা নিম্ন প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে,—

"A thousand years ago the Karimgunge Subdivision seems to have been inclued in Tippera Kingdom."

Allene's Assam Districts Gazetteers—Vol. II. (Shylhet) Chap II. P.22

উদয়পুরে রাজপাট

মহারাজ যুঝারু ফা (নামান্তর হিমতি) রাঙ্গামাটী জয় করিয়া নব বিজিত প্রদেশে এক রাজধানী স্থাপন করেন। পরে (উদয়মাণিক্যের শাসন কালে) এই স্থানের নাম 'উদয়পুর' হইয়াছে। এই স্থানে সুদীর্ঘকাল ত্রিপুরার রাজপাট প্রতিষ্ঠিত ছিল। মহারাজ যুঝারু ফা বঙ্গদেশের কিয়দংশ জয় করিয়া বিশালগড়ে এক রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে ত্রিপুরার একটী সেনানিবাসও ছিল।

ডাঙ্গর ফা কর্ত্তৃক রাজ্য বিভাগ

ডাঙ্গর ফা-এর শাসনকালে তিনি সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল কিনা, বুঝা যায় না। কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকিলেও এই ব্যবস্থা অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। কারণ, ডাঙ্গর ফা এইর জীবিত কালেই তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র মহারাজ রত্নমাণিক্য, গৌড় বাহিনীর সাহায্যে সপ্তদশ ভ্রাতা সহ পিতাকে সমরে পরাভূত করিয়া, সমগ্র রাজ্য হস্তগত করেন। তিনি পৈত্রিক রাজধানী রাঙ্গামাটিতেই (উদয়পুরে) রাজত্ব করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত সতরটী বিভাগের নাম এই ;---(১) রাজনগর, (২) কাইচরঙ্গ, (৩) আচরঙ্গ, (৪) ধর্ম্মনগর, (৫) তারকস্থান,

(৬) বিশালগড়, (৭) খুটিমুড়া, (৮) নাকিবাড়ী, (৯) আগরতলা, (১০) মধুগ্রাম, (১১) থানাংচি, (১২) মুহুরীনদী তীর, (১৩) লাউগাঙ্গ, (১৪) বরাকের তীরে, (১৫) তৈলাইরুঙ্গ, (১৬) ধোপাপাথর, (১৭) মণিপুর।

ইহার মধ্যে পার্ব্বত্য কোন কোন স্থান বর্ত্তমান কালে নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য, অনেক কাল পূর্ব্বেই সেই সকল স্থানের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অধিকাংশ স্থান এখনও পূর্ব্ব নামেই পরিচিত, সেই সকল স্থান নির্দ্দেশ করা কষ্টসাধ্য নহে। স্থানের বিবরণ যতটা সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা অতঃপর প্রদান করা হইবে।

রাজ্য বিস্তার ;—ত্রিপুরেশ্বরগণ কিরাতভূমিতে আগমনের পর, উত্তর দিক হইতে ক্রমে দক্ষিণে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মহারাজ ত্রিলোচনের শাসনকালেই রাজ্যের সীমা বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা আরম্ভ হয়। তিনি, কাইফেঙ্গ, চাক্‌মা, খুলঙ্গ, লঙ্গাই, তনাউ, তৈয়ঙ্গ, রিয়াং, থানাংচি, প্রতাপসিংহ, লিকা প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদিগকে জয় করিয়া তাঁহাদের অধিকৃত স্থানসমূহ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরবর্ত্তী কালে, ত্রিপুরার শাসন অমান্য করিয়া, লাঞ্ছিত ও বিপন্ন হইবার দৃষ্টান্ত রাজমালার অনেক পাওয়া যায়।

মহারাজ ত্রিলোচনের শাসনকালে রাজ্য বিস্তার

ত্রিলোচনের পুত্র মহারাজ দাক্ষিণের শাসনকালে, বরবক্র নদীর উত্তর তীরবর্ত্তী ভূ-খণ্ড হেড়ম্বের করতলগত হওয়ায়, ত্রিপুর রাজ্যের সীমা কিয়ৎপরিমাণে খর্ব্ব হইয়াছিল। পরবর্ত্তী ত্রিপুরেশ্বরগণ এই ক্ষতি উদ্ধারের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, এমন বুঝা যায় না। দক্ষিণদিকে রাজ্য বিস্তার করাই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। লিকা রাজ্য, মহারাজ ত্রিলোচন কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াও পরে ত্রিপুর রাজ্যের বশ্যতা অস্বীকার করায়, মহারাজ যুঝারু ফা পুনর্ব্বার উক্তরাজ্য (রাঙ্গামাটী) জয় করিয়া তথায় স্বীয় রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। অতঃপর মহারাজ যুঝারু ফা বঙ্গদেশ জয়ের অভিলাষী হইয়া, বিশালগড় প্রভৃতি কতিপয় স্থানে, আপন আধিপত্য স্থাপন করেন। এতদ্বারাই ত্রিপুরেশ্বরগণের বঙ্গদেশের উপর হস্তক্ষেপ করিবার সূত্রপাত হয়।

মহারাজ ত্রিলোচনের পরবর্ত্তী কালের বিবরণ

অতঃপর মহারাজ ছেংথুম্‌ফা ও মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী গৌড়েশ্বরকে পরাজয় করিয়া, মেহেরকুল অধিকার করেন। এই যুদ্ধের ফলে, মেঘনার তীর পর্য্যন্ত ত্রিপুর রাজ্যের সীমা প্রসারিত হইয়াছিল। ইঁহার শাসনকালে, কিম্বা কিয়ৎকাল পরে, চট্টগ্রামে ত্রিপুরার শাসনদণ্ড পরিচালিত হইয়াছিল। কিন্তু অল্পকাল পরেই, প্রতাপমাণিক্যের শাসনকালে তাহা পুনর্ব্বার মুসলমানগণের কুক্ষিগত হয়। এই সময় ত্রিপুরার প্রচুর অর্থ এবং কতিপয় হস্তী মুসলমানগণের হস্তগত হইয়াছিল।

ত্রিপুরেশ্বরের সহিত গৌড়েশ্বরের যুদ্ধ

প্রধানতঃ হস্তীর নিমিত্তই ত্রিপুরার প্রতি মুসলমানগণের লোলুপদৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। ভারতের নানাস্থানে প্রচুর হস্তী পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ত্রিপুরা পর্ব্বতের হস্তী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর এবং সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট। আবুল ফজল, মোগল সম্রাট আকবরের ‘পীল খানার’ বর্ণনা উপলক্ষে আইন-ই আকবরী গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—“The best elephants are those of Tipperah.”*

ত্রিপুর পর্ব্বতের হস্তীর বিবরণ

প্রতাপমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুকুটমাণিক্য আরাকান রাজ মেংদিকে উপঢৌকন প্রদান দ্বারা প্রসন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে রাজ্যের সীমা সম্বন্ধীয় কোন রকম পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

আত্মবিরোধ

মহারাজ রত্ন ফা (পরে রত্নমাণিক্য) ভ্রাতাদিগকে অপসারিত করিয়া পৈত্রিক সিংহাসন লাভ করিবার নিমিত্ত গৌড়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অপরিণামদর্শিতার ফলে ত্রিপুরার রাজনীতিক যে অবনতি ঘটিয়াছিল কোন কালেই তাহা আর শোধরাইয়া লইবার সুযোগ ঘটে নাই। এই কার্য্যের নিমিত্ত রত্নমাণিক্যের প্রতি দোষারোপ করা নিরর্থক। তাঁহার পিতা ডাঙ্গরফা এর কার্য্যই এই অনিষ্টপাতের মূল বলিয়া ধরা সঙ্গত। তাঁহার কার্য্যের স্থূল মর্ম্ম এই ;---

রাজমালাই বঙ্গভাষায় প্রথম ইতিহাস

মহারাজ ডাঙ্গর ফা (নামান্তর হরিরায়) এর ১৮টি পুত্র ছিল। তিনি পুত্রগণের বুদ্ধির পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, কনিষ্ঠ রত্ন ফা সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, এবং ভবিষ্যতে তিনিই সিংহাসনের অধিকারী হইবেন। † কিন্তু জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া

* Gladwin’s Ayeen Akbery--Vol, I. P. 94

† পুত্রগণের পরীক্ষাসম্বন্ধীয় বিবরণ ‘ডাঙ্গর ফা’ খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে।

কনিষ্ঠের রাজ্যলাভ কৌলিক প্রথা-সম্মত-নহে, এজন্য তিনি রত্ন ফাকে রাজ্যে রাখাই সঙ্গত মনে করিলেন না। তাঁহাকে বিস্তর অর্থ ও সৈন্য ইত্যাদি সঙ্গে দিয়া গৌড়ে প্রেরণ করিলেন। এবং সম্ভবতঃ ভ্রাতৃ বিরোধ নিবারণোদ্দেশ্যেই একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যের অধিকারী না করিয়া, রত্ন ফা ব্যতীত অবশিষ্ট সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিলেন। এই বিভাগ সম্বন্ধীয় বিবরণ পূর্ব্বে প্রদান করা হইয়াছে। এই সময় রত্ন ফাকে রাজ্যভাগ হইতে বঞ্চিত না করিলে হয় ত তিনি গৌড়ের সাহায্যাভিলাষী হইতেন না।

রত্না ফা স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে অল্পকালের মধ্যেই গৌড়েশ্বরের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিলেন। তিনি পিতা এবং ভ্রাতাদিগকে বিতাড়িত করিয়া পৈত্রিক রাজ্য হস্তগত ও পিতার অসঙ্গত কার্য্যের উপযুক্ত ফল প্রদান করিবার নিমিত্ত গৌড়েশ্বরের সাহায্য প্রার্থী হইলেন। গৌড়াধীপ হৃষ্টচিত্তে, বিপুল বাহিনীসহ রত্ন ফাকে দেশে পাঠাইলেন ; এবং গৌড়বাহিনীর সাহায্যে পিতাকে রাজ্যচ্যুত ও ভ্রাতাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া, রত্ন ফা সিংহাসনারূঢ় হইলেন। এতদ্দারা মুসলমানগণের বারম্বার ত্রিপুরা আক্রমণের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। অতঃপর রাজ পরিবারের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইলেই দুর্ব্বল পক্ষ রত্ন ফা এর প্রদর্শিত সুগম পথ অনুসরণে, গৌড়ের সাহায্য লইয়া, রাজ্য মধ্যে রাষ্ট্র বিপ্লব উপস্থিত করিতেন। এই সুযোগে মুসলমানগণ পার্ব্বত্য অপরিচিত রাস্তা ঘাট চিনিয়া লইয়াছিল, এবং ত্রিপুরার সামরিক বল পরীক্ষা করিবার সুবিধা পাইয়াছিল। গৌড়ের সাহায্যে সিংহাসনের অধিকারী ত্রিপুরেশ্বরগণের দুর্ব্বলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যে স্বাভাবিক এবং অনিবার্য্য, এ কথার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এতদ্দরুণ ত্রিপুরার রাজনীতিক গাম্ভীর্য্যের বিস্তার হানি হইয়াছিল।

রত্নফায়ের প্রতি ভ্রাতৃ বধের অপবাদ

এস্থলে আর একটী কথা বলিবার আছে। জেম্স লঙ্ (Rev James Long) সাহেব ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে রাজমালার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করেন। * তাহাতে লিখিত আছে,---Returning with the aid of Mahammadan troops, he conquered the kingdom and beheaded his brothers. †

* J. A. S. B.-Vol, XIX.

† রত্ন ফা ভ্রাতাগণকে ধৃত করিয়া আনিবার সময় রাস্তায় যে যে স্থানে বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে, সেই সকল স্থানের এক একটি নামকরণ হইয়াছিল। এতদ্বিষয়ক বর্ণন উপলক্ষে

অর্থাৎ রত্ন ফা মুসলমান সৈনিকবলের সাহায্যে রাজ্য জয় করিয়া স্বীয় ভ্রাতার শিরশ্ছেদ করেন। কৈলাস বাবু এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন, ---"ভীষণ সংগ্রামে মহারাজ রাজা ফা ও তাঁহার অনুচরগণ হত হইলেন* ভ্রাতৃরুধিরে বিশ্বকোষ সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন,---"কুমার রত্ন ফা নিষ্কণ্টক হইবার নিমিত্ত কুচক্রী সপ্তদশ ভ্রাতার প্রাণ-নাশ করিয়া রাজা হইলেন।" †

ইঁহারা সকলেই লঙ্ সাহেরে বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। রাজমালায় পাওয়া যায়, রত্ন ফা রাজধানী আক্রমণ করিলে, ডাঙ্গর ফা সসৈন্যে পলায়ন করিয়াছিলেন, তৎকালে থানাংচি পর্ব্বতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি পুত্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন, কি মৃত্যুর অন্য কারণ ছিল, তাহা জানা যাইতেছে না। ভ্রাতাগণকে

রাজমালায় লিখিত হইয়াছে ;—

"মুড়া কাটি রাজ ভ্রাতৃ আনে যেই স্থানে।
সমার করিয়া নাম বলে সর্ব্বজনে।।"

এই "মুড়া কাটি" শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ লঙ্ সাহেব ভ্রাতার মুড়া (মস্তক) কাটা হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এরূপ কল্পনা করিবার কোনও আভাস রাজমালায় নাই। যদি আমাদের এই অনুমান সত্য হয়, তবে ইংরেজের পক্ষে এবম্বিধ ক্রটি মার্জ্জনীয় হইতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশীয় ঐতিহাসিকগণ সাহেবের লেখা বেদ বাক্য জ্ঞানে অনেক ভ্রান্ত উক্তি গ্রহণ করিয়া ইতিহাসের যে বিকৃতি ঘটাইতেছেন, ইহা উপেক্ষণীয় বলিয়া মনে হয় না। এইক্ষেত্রেও তদ্রূপ অবস্থা ঘটিয়াছে।

ত্রিপুরা অঞ্চলে পর্ব্বতের টিলা (ক্ষুদ্র শৃঙ্গ) কে মুড়া বলে। সোনামুড়া, রাঙ্গামুড়া, চণ্ডিমুড়া ইত্যাদি অল্পোন্নত পর্ব্বত শৃঙ্গের নাম। পার্ব্বত্য পথে অনেক স্থলে এই শ্রেণীর মুড়া কর্ত্তন করিয়া রাস্তা বাহির করিতে হয়। এস্থলে তাহাই করা হইয়াছিল, তাই লিখিত হইয়াছে—"মুড়া কাটি রাজ ভ্রাতৃ আনে যেই স্থানে।" এই 'মুড়া' শব্দ মস্তক নহে। অভিযান কালে পর্ব্বতের শৃঙ্গ কাটিয়া রাস্তা খুলিবার আর একটী দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে। মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের বিপুল বাহিনীর আচরঙ্গ অভিযান উপলক্ষে,—

"গিরিনদী গুহাপথ, লঙ্ঘিয়া যে মহাসত্ত,
পথ করে পর্ব্বত কাটিয়া"।

কল্যাণমাণিক্য খণ্ড।

* কৈলাসবাবুর রাজমালা—২য় ভাঃ, ২য় অঃ, ৩১ পৃঃ।

† বিশ্বকোষ—৮ম ভাগ, ২০২ পৃঃ।

রত্ন ফা বধ করেন নাই, তাঁহাদিগকে ধৃত ও অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। যথা ;---

গড় জিনি রাঙ্গামাটী ছাড়াইয়া লৈল।
ডাঙ্গর ফার সৈন্য সব পর্ব্বতেতে গেল।।
আর রাজপুত্র সবে ভঙ্গ দিল তায়।
গৌড় সৈন্য তার পাছে খেদাইয়া যায়।।
থানাংচি পর্ব্বতে রাজা ডাঙ্গর ফা মরিল।
আর যত রাজপুত্র লড়াইয়া ধরিল।

ডাঙ্গর ফা খণ্ড,---৬৬ পৃঃ।

ইহাতে ভ্রাতৃবধের কোনও কথা নাই। সংস্কৃত রাজমালা আলোচনায় বুঝা যায়, ডাঙ্গর ফা এরং যুদ্ধে মৃত্যু হয় নাই---রোগে মৃত্যু হইয়াছিল। যিনি ভ্রাতাদিগকে হস্তে পাইয়াও বধ করেন নাই, তিনি পিতৃহন্তা হইবেন, একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। যাহাহউক, রত্ন ফা এর প্রতি পিতৃহত্যার অভিযোগ কেহ উপস্থিত করেন নাই। কিন্তু তাঁহার প্রতি অকারণে ভ্রাতৃ হত্যার দোষারোপ করা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে নিতান্তই অসঙ্গত হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতাই সকলকে পরাস্ত করিয়া রত্ন ফা এর প্রতি সপ্তদশ ভ্রাতৃবধের পাপ চাপাইয়া দিয়াছেন। ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে যাইয়া তাঁহাকে এরূপভাবে আরও অনেক ভিত্তিহীন কথার অবতারণা করিতে দেখা গিয়াছে। ইহাও অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে।

রত্নমাণিক্য পিতৃ ও ভ্রাতৃহন্তা না হইলেও, পিতাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত এবং ভ্রাতাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, একথা সত্য। মহারাজ ডাঙ্গর ফা স্বীয় কার্য্যের দ্বারা ভ্রাতৃবিরোধ ঘটাইয়াছিলেন, এবং এই অপরিণামদর্শিতার প্রতিফল স্বরূপ নিজেও পুত্র হস্তে সম্রাট সাজাহানের অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন।

রত্নফার এর সাহায্যকারী গৌড়েশ্বর

রত্ন ফা এর সাহায্যকারী গৌড়েশ্বর কে ছিলেন তাহা দেখা আবশ্যক। কৈলাসবাবুর মতে, রত্ন ফা, লক্ষ্মণাবতীর মালিক তুগ্রল খাঁ এর সাহায্য পাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন---"৬৯২ ত্রিপুরাব্দে (১২০১ শকাব্দে) ভ্রাতৃ রুধিরে বিজয়ী পতাকা অনুরঞ্জিত করিয়া মহারাজ রত্ন ফা ত্রিপুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ ইহাকেই তুগ্রল

কর্ত্তৃক ত্রিপুরা জয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।" এই উক্তির প্রমাণস্বরূপ তিনি স্টুয়ার্ট এর নিম্নলিখিত মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, ;---"In the year 678 (1279 A. D.) he assembled a very numerous army, and invaded the country of Jagenagur (Tipperah). After having defeated the Raja in a general engagement, he plundered the inhabitants, and brought away with him immense wealth and one hundred elephants."

Stwwart's History of Bengal P.44

এই উক্ত অভ্রান্ত নহে। মহারাজ রত্নমাণিক্যের মুদ্রা আলোচনায় জানা যায়, তিনি তুগ্রল খাঁয়ের শাসনকালের অনেক পরে রাজা হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে অতঃপর বিশেষভাবে আলোচনা করা হইবে। উক্ত মুদ্রা ১২৮৮ শকাব্দে (১৩৬৬ খ্রীঃ অব্দে) নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতদ্দারা রত্নমাণিক্যের শাসন কালের আভাস পাওয়া যাইতেছে। কাহারও কাহারও মতে রত্নমাণিক্য ১৩৫২ খ্রীঃ অব্দে রাজা হইয়াছেন। তুগ্রল খাঁ ১২৭৭ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালার শাসন ভার পাইয়া ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সেই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং রত্নমাণিক্যের পক্ষে তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করা সম্ভবপর হইতে পারে না। তুগ্রল কর্ত্তৃক ত্রিপুরা আক্রমণের কথা সত্য হইলেও তাহা রত্নমাণিক্যের শাসনকালের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা।

ইতিহাস আলোচনায় জানা যায়, ১৩৪৭ খ্রী অব্দ হইতে ১৩৫৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত, সুলতান সামসুদ্দিন বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি গৌড়ের শাসনভার গ্রহণ করিবার অল্পকাল পরে, জাজনগর (ত্রিপুরা) আক্রমণ পূর্ব্বক ত্রিপুরেশ্বরকে বাধ্য করিয়া বহু অর্থ ও অনেকগুলি হস্তী গ্রহণ করিবার কথাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। সময়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গেলে বুঝা যায়, এই সুলতান সামুসদ্দিনই রত্ন ফা এর (রত্নমাণিক্য) পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন।

এই সময়েই রত্ন ফা 'মাণিক্য' উপাধি লাভ করেন। রাজমালায় লিখিত আছে; ---

"রত্ন ফা নাম তার পিতায় রাখিছিল।
রত্ন মাণিক্য খ্যাতি গৌড়েশ্বরে দিল।।

এতদ্বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ স্থানান্তরে বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

শাসনতন্ত্র;---প্রাচীনকালে (মুসলমানদিগের সহিত সংশ্রব ঘটিবার পূর্ব্বে) শাসন প্রণালী কি রকম ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। পাত্র, মন্ত্রী, সেনা, প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণের অতি অল্পসংখ্যক পদের নাম পাওয়া যায়। সেকালে সম্ভবতঃ শাসন ও বিচার উভয়বিধ কার্য্য ইঁহাদের দ্বারাই পরিচালিত হইত।* সেনাপতিগণ সৈনিক বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। অন্য বিভাগের কার্য্যের খোঁজখবর পাওয়া না গেলেও সামরিক বিভাগ যে বিশেষ শক্তিশালী ছিল, তাহার নিদর্শন রাজমালায় বিস্তর পাওয়া যাইবে। ইতিপূর্ব্বে এতদ্বিষয়ক কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। এই সময় শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণরূপে সেনাপতিগণের হস্তগত ছিল। তাঁহারাই পাত্র, মন্ত্রী ইত্যাদি শাসন বিভাগের প্রধান পদগুলি অধিকার করিতেন।

রাজকর

রাজকর কি নিয়মে গ্রহণ করা হইত, তাহাও জানিবার কোন সূত্র পাওয়া যাইতেছে না। পার্ব্বত্য প্রজাগণ, তাহাদের স্বহস্তবয়িত নানাবিধ বস্ত্র, পিত্তল, লৌহ ও কাংস্যনির্ম্মিত বিবিধ বস্তু, গজদন্ত, মৃগ ও মহিষাদির শৃঙ্গ, ঘোটক ও ছাগ ইত্যাদি পর্ব্বত-সুলভ দ্রব্যজাত এবং বিবিধ বন্য জন্তু প্রতিবৎসর রাজকর স্বরূপ প্রদান করিত, ইহার প্রমাণ আছে। কোন কোন সম্প্রদায় করের বিনিময়ে সরকারী নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। সমভূমির কর গ্রহণের প্রণালী কি ছিল, অনেক চেষ্টায়ও তাহা জানিতে পারা গেল না। তবে, রাজকর যে সর্ব্বত্রই অতি লঘু ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাঙালী উপনিবেশ

মহারাজ বঙ্গের সময়ে ত্রিপুরায় বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপনের সূত্রপাত হয়।† অতঃপর মহারাজ রত্নমাণিক্যের সময় বঙ্গদেশ হইতে নানা জাতীয় বহুসংখ্যক লোক আনিয়া রাজ্যমধ্যে স্থাপন করা হইয়াছিল। তিনি গৌড়েশ্বরের অনুমতিক্রমে দশসহস্র ঘর বাঙ্গালী প্রজা আনিয়া ছিলেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন ভদ্রবংশীয় লোকও ছিলেন। রত্নমাণিক্য খণ্ডে এতদ্বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে। ইহা সার্দ্ধ পঞ্চাশত বৎসরের কথা।

---

* রাজমালায় পাওয়া যায়,—"নীতিয়ে পালিত রাজ্য পাত্র মিত্রগণ।"

† "তান পুত্র হইলেক বঙ্গ মহারাজা।
আপনার নামে রাজ্য স্থাপিলেক প্রজা।"

এস্থলে একটী কথার উল্লেখ করা সঙ্গত বোধ হইতেছে। রত্নমাণিক্যের লক্ষ্মণাবতীতে অবস্থান কালে তিন জন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহাদের মধ্যে একজন চিকিৎসা ব্যবসায়ী, বৈদ্যবংশ সম্ভূত, ধন্বন্তরী গোত্রজ জয়নারায়ণ সেন; অপর দুইজন কায়স্থ জাতীয়। তাঁহাদের একজন দক্ষিণ রাঢ়ীর ঘোষবংশ জাত, নাম বড়খাগুব ঘোষ, অপরের নাম পণ্ডিতরাজ। মহারাজ রত্নমাণিক্য রাজদণ্ড ধারণ করিবার পরে, এই তিনব্যক্তিকে স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। বড়খাগুব ঘোষের আদি নিবাস রাঢ় দেশের অন্তর্গত, রাঙ্গামাটী নামক স্থানে ছিল। * অপর দুই ব্যক্তির আদিস্থানের সংবাদ আমরা অবগত নহি। তাঁহারা প্রথমতঃ আধুনিক সরাইল পরগণার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন; তৎপর রাজধানী পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদেরও বাসভূমি পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। ইঁহারা মুসলমানের অনুকরণে ত্রিপুরার শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তন করেন। এবং ত্রিপুরেশ্বরের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী বলিয়া 'বিশ্বাস' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিষ্ণা পরগণার অন্তর্গত বাতিসা নিবাসী বৈদ্যগণ এই সময় রাজচিকিৎসকের পদলাভ করেন।

প্রবাদ অনুসারে, মহারাজ রত্নমাণিক্যের সময় একদল ব্রাহ্মণ ত্রিপুরায় আগমনপূর্ব্বক, তথাকার প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগকে অপসারিত করিয়া রাজকীয় পৌরোহিত্য গ্রহণ করেন। তলাবায়েক ও কালিয়াজুরী প্রভৃতি স্থানে অদ্যাপি তাঁহাদের বংশধরগণ বিদ্যমান আছেন।

রাজাগণের কালনির্ণয়

প্রাচীন ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দের শাসনকালে নির্দ্ধারণ করা নিতান্তই দুরূপ ব্যাপারে পর্য্যবসতি হইয়াছে। মহারাজ ত্রিপুর ও তদাত্মজ ত্রিলোচন, সম্রাট যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক নির্ণীত হওয়ায়, ইঁহাদের প্রাচীনত্ব পাঁচ সহস্র বৎসরের

* রাঙ্গামাটী মুর্শিদাবাদের দ্বাদশ মাইল দক্ষিণে গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ইহার অন্য নাম 'কর্ণসোনা' বা 'কর্ণসেন পুরী'। প্রবাদ অনুসারে প্রাচীন কালে এইস্থানে কর্ণসেন নামক নরপতির রাজধানী ছিল। ফার্গুসনের মতে, এই স্থান ও হিয়েন্ সাঙের লিখিত 'কিরণ সুবর্ণ' নগরী অভিন্ন। কাপ্তান লেয়ার্ড এই রাঙ্গামাটির পুরাতত্ত্ব এশিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণেলে প্রচার করিয়াছেন। (J. A. S. Bengal,-Vol. XXII. P.P. 281-282)

অধিক দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইঁহাদের আবির্ভাব কাল অথবা সিংহাসনারোহণের শকাঙ্ক নির্ণয় করা অসাধ্য। মহারাজ ত্রিলোচন একমাস বয়ঃক্রম কালে সিংহাসণরূঢ় হইয়া ১২০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।* ত্রিলোচনের পুত্র দাক্ষিণের বিবরণ রাজমালায় যৎকিঞ্চিৎ পাওয়া গেলেও শাসনকালে নির্ণয়োপযোগী কোন কথা তাহাতে নাই। দাক্ষিণের পরবর্ত্তী তয় দাক্ষিণ হইতে কীর্ত্তি (নামান্তর নওয়াজ বা নবরায়) পর্য্যন্ত ৬৯ জন রাজার বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। ইঁহাদের মধ্যে ৭৩ সংখ্যক রাজা নীলধ্বজ (নামান্তর ঈশ্বর ফা) ৮৪ বৎসর † এবং ৭৭ সংখ্যক রাজা চন্দ্রশেখর (নামান্তর মাইচুং ফা) ৫৯ বৎসর ‡ রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন, রাজমালা ও শ্রেণীমালা আলোচনা এইমাত্র বিবরণ জানা যাইতেছে। ত্রিপুর সিংহাসনের ১১৮ সংখ্যক রাজা হিমতি (নামান্তর যুঝারু ফা) ত্রিপুরাব্দের প্রবর্ত্তক, সুতরাং তিনি সাড়ে তেরশত বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। এই হিমতির পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পূর্ব্বকথিত মহারাজ চন্দ্রশেখরের পরবর্ত্তী ৪০ জন রাজার কালনির্ণায়ক কোনও নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না। মহারাজ হিমতির পরবর্ত্তী ৪র্থ স্থানীয় মহারাজ কিরীট (নামান্তর ডুঙ্গুর ফা বা হরিরায়) ৫১ ত্রিপুরাব্দে, এবং তাঁহার অধস্তন ১৭শ স্থানীয় মহারাজ ধর্ম্মধর (নামান্তর ছেংকাছাগ) ৬০৪ ত্রিপুরাব্দে যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন ; তাঁহাদের প্রদত্ত তাম্রশাসন দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং তাঁহাদের শাসনকালের একটি মোটামুটী নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। শেষোক্ত যজ্ঞকর্ত্তা ধর্ম্মধরের পুত্র মহারাজ কীর্ত্তিধর (নামান্তর ছেংথুম্ ফা বা সিংহতুঙ্গ ফা) রাজমহিষী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর উৎসাহে ৬৫০ ত্রিপুরাব্দে গৌড়ের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এতদ্দারা তাঁহার শাসনকালের নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কোন্ রাজা, কোন্ সন হইতে আরম্ভ করিয়া কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই।

---

* "বিংশাধিকশতং বর্ষং রাজ্যং ভুক্তা ত্রিলোচনঃ।"

—সংস্কৃত রাজমালা

† "ঈশ্বর ফা নামে হৈল নন্দন তাহার।
করিল চৌরাশি বর্ষ রাজ্য অধিকার।"

—শ্রেণীমালা ও রাজমালা।

‡ "মাইচুং নামে রাজা জন্মে তখন ঘরে।
ঊনষাইট বর্ষ সে যে রাজ্য ভোগ করে।"

—শ্রেণীমালা ও রাজমালা।

কীর্ত্তধরের পরবর্ত্তী, রাজসূর্য্য হইতে রাজা ফা পর্য্যন্ত চারিজন ভূপতির রাজ্যাঙ্ক পাওয়া যাইতেছে না। রাজা ফা এর পুত্র রত্ন ফা এর (পরে রত্নমাণিক্য) রাজ্যাঙ্ক সম্বন্ধে মতভেদ পরিলক্ষিত হইতেছে। কৈলাস বাবুর মতে ইনি ৬৯২ ত্রিপুরাবদে (১২৯২ খ্রীঃ) সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন। চাক্‌লে রোসনাবাদের সেটেলমেন্ট অফিসার মিঃ ক্যামিং (J. G. Cumming. I.C.S.) সাহেবের মতে, রত্নমাণিক্যের রাজত্ব কাল ১২৭৯ হইতে ১৩২৩ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত ৪৪ বৎসর। পরলোকগত সেণ্ডিস্ সাহেব (E.F. Sandy's) তাঁহার লিখিত "History of Tripura" নামক গ্রন্থে উক্ত মতই সমর্থন করিয়াছেন। ইহার কোন অঙ্কই বিশুদ্ধ নহে। মহারাজ রত্নমাণিক্যের ১২৮৮ শকাব্দের (১৩৬৬ খ্রীঃ) উৎকীর্ণ দুইটী মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং ১৩৬৬ খ্রী অব্দে তিনি জীবিত ছিলেন এবং রাজপদেও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইতেছে ; কারণ, সিংহাসনে অধিষ্ঠিত না থাকিলে, তাঁহার নামে মুদ্রা প্রস্তুত হইত না। কিন্তু তাঁহার রাজ্যাভিষেকের ও পরলোক গমনের সময় নির্দ্ধারণ করিবার সুবিধা নাই।

রত্নমাণিক্য স্বর্গগামী হইবার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতাপমাণিক্য সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি অধার্ম্মিক ও অত্যাচারী ছিলেন বলিয়া অল্পকাল পরেই সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। এবং প্রতাপমাণিক্য অপুত্রক থাকায় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুকুটমাণিক্য, ও মুকুটমাণিক্যের পর তাঁহার পুত্র মহামাণিক্য সিংহাসনারোহণ করেন। ইঁহাদের কাহারও শাসন কাল নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। প্রতাপমাণিক্য হইতে মহামাণিক্য পর্য্যন্ত তিন জন ভূপতি ১৪৩০ খ্রী অব্দ পর্য্যন্ত শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন, মোটামুটী ভাবে এই মাত্র নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। মহামাণিক্য রাজমালা প্রথম লহরের অন্তর্গত শেষ রাজা।

ত্রিপুরাব্দ

ত্রিপুররাজ্যে একটী স্বতন্ত্র সন প্রচলিত আছে, তাহা ত্রিপুরা সন বা ত্রিপুরাব্দ নামে অভিহিত। বর্ত্তমান ১৩৩২ বাঙ্গালা সনে, ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দ চলিতেছে ; সুতরাং ইহা বাঙ্গালা সনের তিন বৎসর অগ্রবর্ত্তী। ৫৯০ খ্রীঃ অব্দে এই সন প্রচলিত হইয়াছিল।

ত্রিপুরাব্দ ও বঙ্গাব্দের পার্থক্য

ত্রিপুরাব্দের প্রবর্ত্তক কে—এই সিদ্ধান্তে নানাব্যক্তি নানাবিধ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়, মহারাজ আদি ধর্ম্মপালের তাম্র শাসন আলোচনা উপলক্ষে বলিয়াছেন,---

ত্রিপুরাব্দ বিষয়ে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মত।

"এই সনন্দখানি হইতে ত্রিপুরা সন প্রবর্ত্তনের সময় কতকটা বুঝিতে পারা যায়। এপর্য্যন্ত অনেক অনুসন্ধানেও নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই যে, ত্রিপুরা সনের প্রবর্ত্তক কে। বীররাজ ত্রিপুরা সনের প্রবর্ত্তক বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া গিয়াছেন। বীররাজ ত্রিলোচন হইতে গণনায় উনবিংশ রাজা। কিন্তু ত্রিপুর হইতে সপ্তম রাজা ধর্ম্মপাল প্রদত্ত সনন্দে যখন ৫১ ত্রিপুরাব্দের উল্লেখ আছে, তখন বীররাজের সময় সন প্রবর্ত্তনের কথা কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না। আমার অনুমান হয়, মহারাজ ধর্ম্মপালের পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তম রাজ্য ত্রিপুরের সময়ে ত্রিপুরা সন আরম্ভ হয়, অথবা ত্রিপুরের পুত্র মহারাজ ত্রিলোচন পিতার নামে বা রাজ্যের নামে সন প্রবর্ত্তন করেন। ত্রিলোচন একজন অসীম প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার দ্বারা ত্রিপুরা সন প্রবর্ত্তনই সর্ব্বথা সম্ভবপর।"

শ্রীশ্রীযুতের কৈলাসহর ভ্রমণ,---৩৮ পৃষ্ঠা।

প্রকৃত পক্ষে ইহা সম্ভবপর নহে, এবং সনন্দদাতা মহারাজ ধর্ম্মধর বা ধর্ম্মপাল ত্রিপুরের অধস্তন সপ্তম স্থানীয় নহেন। মহারাজ ত্রিপুর কিম্বা ত্রিলোচন কর্ত্তৃক ত্রিপুরাব্দ প্রবর্ত্তিত হওয়া যে অসম্ভব, পুরুষ সংখ্যার সহিত সময়ের তুলনা করিলে ইহা সহজেই অনুমিত হইবে। এখন ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দ চলিতেছে। বর্ত্তমান ত্রিপুরেশ্বর, মহারাজ ত্রিপুরের অধস্তন ১৩৯ স্থানীয়। সুতরাং ত্রিপুর বা তৎপুত্র ত্রিলোচনকে ত্রিপুরাব্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া ধরা হইলে, প্রতিপুরুষের গড় পরতা কিঞ্চিদধিক ৯ নয় বৎসর পড়িবে। সাধারণ নিয়মে প্রতিপুরুষে ৩৩ বৎসর ধরিয়া কাল গণনা করা হয়। ত্রিপুর-ভূপতিবৃন্দের কাল নির্ণয়োপলক্ষে নানা কারণে এই নিয়ম সম্পূর্ণ প্রযোজ্য না হইলেও নয় বৎসরে একপুরুষ গণনা করা কোন

ক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না এবং এই হিসাব বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার্য্য নহে। বিশেষতঃ মহারাজ ত্রিপুর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে হস্তিনা গমনের কথা সংস্কৃত রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে।* তৎপর মহারাজ ত্রিলোচনের সুখ্যাতি শ্রবণ করিয়া, সম্রাট যুধিষ্ঠির তাঁহাকেও হস্তিনায় নিয়াছিলেন, একথাও রাজমালায় পাওয়া যায়। †

রাজমালার এই মতের বিরুদ্ধবাদীর অভাব নাই। মহাভারত ইত্যাদি প্রামাণিক গ্রন্থের সাহায্যে, ইতিপূর্ব্বে রাজমালার মত সমর্থন পক্ষে যথোচিত চেষ্টা করা হইয়াছে, এস্থলে পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। ‡

উপরে যে সকল বাক্য সন্নিবেশিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা জানা যাইবে ত্রিপুর এবং ত্রিলোচন উভয়েই যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক রাজা। যুধিষ্ঠিরের কালনির্ণয় লইয়া এ পর্য্যন্ত নানা ব্যক্তিকর্ত্তৃক যে সকল আন্দোলন হইয়াছে তাহা পরস্পর মতবিরুদ্ধ হইলেও সকলের মতেই যুধিষ্ঠিরের প্রাচীনত্ব কিঞ্চিন্ন্যূন সার্দ্ধচারি সহস্র বৎসর নির্ণীত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার প্রাচীনত্ব পাঁচ হাহাজ বৎসরেরও কিছু বেশী ; কারণ, তিনি দ্বাপরের শেষভাগের রাজা। সুতরাং তাঁহার সমসাময়িক মহারাজ ত্রিপুর ও ত্রিলোচন ত্রিপুরাব্দের প্রবর্ত্তক হইতে পারেন না। যে অব্দের চতুর্দ্দশ শতাব্দী মাত্র চলিতেছে, তাহা পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত হওয়া অসম্ভব বিধায়, এই মত গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

বীররাজ সম্বন্ধীয় প্রচলিত মত

ত্রিপুরেশ্বর বীররাজ বঙ্গদেশ জয় করিয়া সেই বিজয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ ত্রিপুরাব্দের প্রচলন করিয়াছিলেন, ত্রিপুর রাজ্যে এই প্রচলিত মতই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ; কোন কোন পলিটিক্যাল এজেন্টও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। ঐতিহাসিক Sir Roper Lethbridgeও এই মতের পক্ষপাতী।

---

* "দ্রুহ্যুরাজ সুতো জাত স্ত্রিপুরাখ্যো মহাবলঃ।
তমোগুণ সমাযুক্তঃ সর্ব্ব দৈবাতিগর্ব্বিতঃ।।
যুধিষ্ঠিরস্য যজ্ঞার্থে সহদেবেন নির্জ্জিতঃ।
রাজসূয়ে স গতবান্ যুধিষ্ঠির সমাদৃত।" —সংস্কৃত রাজমালা।

† "ত্রিলোচনস্য সুখ্যাতিং শ্রুত্বা রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
ইন্দ্রপ্রস্থং নিনায়ৈনং তৎ সৌন্দর্য্য দিদৃক্ষয়া।" —সংস্কৃত রাজমালা

বাঙ্গলা রাজমালায়ও এবিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় যথা—
"এহিমতে মহারাজ হৈল অগ্নিকোণে।
রাজা যুধিষ্ঠির দেখা করায়ে ভীম সেনে।।"

‡ 'রাজসূয় যজ্ঞে ত্রিপুরেশ্বর' শীর্ষক আখ্যায়িকা দ্রষ্টব্য। (১৬১ পৃষ্ঠা)

তাঁহার রচিত "The Golden Book of India" নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে ;---

"Eighty-eight in descend from Chandra was Rajah Biraraj, who introduced the Tippera Era, used in the Rajmala or Chronicles of the king of Tipperah"

মর্ম্ম ;—চন্দ্রে অধস্তন ৮৮ স্থানীয় ত্রিপুরেশ্বর বীররাজ কর্ত্তৃক, রাজমালায় ব্যবহৃত ত্রিপুরাব্দ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

ইতিহাস আলোচনায় ত্রিপুর রাজবংশে দুইজন বীররাজের অস্তিত্ব পাওয়া যায় ; একজন মহারাজ ত্রিপুরের অধস্তন ১৯শ স্থানীয়,—দ্বিতীয় ব্যক্তি ৪২শ স্থানীয়। উভয়েই সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন প্রবাদটী ইঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির প্রতি আরোপিত হইয়াছে, জানিবার উপায় নাই। লেথব্রিজ (Lethbridge) সাহেব বীররাজকে চন্দ্রে অধস্তন ৮৮ স্থানীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইনিই ত্রিপুরের অধস্তন ৪২শ স্থানীয়, সুতরাং লেথ্‌ব্রিজের মতে দ্বিতীয় বীররাজই ত্রিপুরাব্দের প্রবর্ত্তক। ইতিহাসে পাওয়া যায়, প্রথম বীররাজ হামরাজের পুত্র, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে রাজমালা বলেন ;---

"হামরাজ তারপুত্র ভালরাজা হৈল।
তার পুত্র বীররাজ যুদ্ধ করি মৈল।"

সংস্কৃত রাজমালায়ও এই বীররাজের নামোল্লেখ হইয়াছে, যথা;---

"হামরাজস্য তনয়ো বীররাজো মহীপতিঃ।।"

প্রথম বীররাজ সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত কোন কথা পাওয়া যাইতেছে না। দ্বিতীয় বীররাজ গজেশ্বরের পুত্র, রাজমালায় ইঁহার নামোল্লেখ ছাড়া অন্য কোন কথাই পাওয়া যায় না ;---

"গজেশ্বর নাম ছিল নৃপতিনন্দন।
পালিল অনেক কাল রাজ্য প্রজাগণ।।
বীররাজ হৈল তার ঘরে এক সুত।
তান পুত্র নাগপতি বহুগুণযুত।।"

সংস্কৃত রাজমালায় ইঁহার নাম "বীররাজ" স্থলে "বিরাজ" লিখিত হইয়াছে। ইহাতেও নাম ভিন্ন অন্য কোন বিবরণ দেওয়া হয় নাই, যথা ;—

"গজেশ্বরস্য তনয়ো বিরাজ ইতিবিশ্রুত।।"

এখন দেখা যাইতেছে, প্রথম বীররাজ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, দ্বিতীয় বীররাজের কোন বিবরণ রাজমালায় নাই। প্রবাদমতে, বঙ্গদেশ বিজয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ ত্রিপুরা সন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে কেহই বঙ্গবিজেতা নহেন। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কালগণনা করিলে, ইঁহারা কেহই ত্রিপুরাব্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। প্রথম বীররাজকে ত্রিপুরা সনের প্রবর্ত্তক ধরিলে প্রতি পুরুষে গড়গড়তা এগার বৎসর, এবং দ্বিতীয় বীররাজকে ধরিয়া পুরুষ-প্রতি গড়ে চৌদ্দ বৎসর মাত্র পড়ে। পুরুষানুক্রমিক কালগণনার নিয়মানুসারে ইহা গ্রাহ্য হইতে পারে না ; সুতরাং এই মতও পরিহার্য্য।

কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মত

স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশায় তাঁহার সংগৃহীত রাজমালায় এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;---

"প্রবাদ অনুসারে জনৈক প্রাচীন ত্রিপুর নরপতি দিগ্বিজয় উপলক্ষে গঙ্গার পশ্চিম তীরে বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া, সেই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য একটী অব্দ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাই অধুনা 'ত্রিপুরাব্দ' নামে পরিচিত।

---কৈলাসবাবুর রাজমালা---২য় ভাঃ, ১ম অঃ ৯ পৃঃ।

কৈলাসবাবু অব্দ-প্রবর্ত্তকের নামোল্লেখ করেন নাই। দ্রুহ্যু কর্ত্তৃক সগরদ্বীপে রাজপাট স্থাপনের কথা পাওয়া গেলেও, পরবর্ত্তী কালে সেইস্থান পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বহুপরবর্ত্তী ইতিহাসে পাওয়া যায়, মহারাজ বিজয়মাণিক্য গঙ্গাতীর পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে ত্রিপুরবাহিনী দ্বারা বঙ্গবিজয় হইয়া থাকিলেও আর কাহাকেও এতদূর অগ্রসর হইতে দেখা যায় নাই। বিজয়মাণিক্যের শাসনকালের অনেক পূর্ব্বে ত্রিপুরাব্দ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সুতরাং কৈলাসবাবুর মতও গ্রহণীয় নহে। প্রকৃতপক্ষে, প্রথম বঙ্গবিজেতাই অব্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া কথিত আছে, গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বিজয়ের সহিত এই প্রবাদ বাক্যের কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই।

পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত

ঐতিহাসিক পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ত্রিপুরাব্দের প্রচলন বিষয়ক আলোচনা উপলক্ষে স্বতন্ত্র এক মত প্রচার করিয়াছেন; তিনি বলেন,---

"৫৯০ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরাব্দ আরম্ভ হয়। সম্ভবতঃ কম্বোজগণ ত্রিপুরা আক্রমণ ও জয় করিয়া এই অব্দ প্রচলিত করেন।"

---বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত।

এই মতও সমর্থন করা যাইতে পারে না। কম্বোজগনের ত্রিপুরা আক্রমণ করিবার কথা ত্রিপুর-ইতিবৃত্তের অগোচর। মঘ কর্ত্তৃক উক্ত রাজ্য অক্রান্ত হইবার প্রমাণ আছে ; তৎসঙ্গে পর্ত্তুগীজ জল-দস্যুগণও সময় সময় যোগদান করিত। কম্বোজ এবং মঘ অথবা পর্ত্তুগীজ এক নহে, এস্থলে এতৎসম্বন্ধে গুটি দুই কথা বলিয়া লওয়া আবশ্যক।

দুইটী কম্বোজ দেশের অবস্থান সম্বন্ধীয় বিবরণ প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে লিখিত আছে,---

"পঞ্চাল দেশমারভ্য ম্লেচ্ছাদ্দক্ষিণ পূর্ব্বতঃ।
কম্বোজ দেশ দেবেশি! বাজিরাশি পরয়াণঃ।।"

অর্থাৎ---পঞ্চাল দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ম্লেচ্ছ দেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিক পর্য্যন্ত কম্বোজ দেশ। এখানে বিস্তর ঘোটক উৎপন্ন হয়।

এতদ্বিষয়ে মহাকবি কালিদাসের মত কিছু স্বতন্ত্র রকমের ; তিনি বলিয়াছেন,

"বিনীতাধ্বশ্রামস্তস্য সিন্ধুতীর বিচেষ্টনৈঃ।
তত্র হূণাবরোধানাং ভর্ত্তৃষু ব্যক্তবিক্রমম্।।
কম্বোজাঃ সমরে সোঢুং তস্য বীর্য্য মনীশ্বরাঃ।
গজালান পরিক্লিষ্টৈ রক্ষোটৈঃ সার্দ্ধমানতাঃ।।
তেষাং সদশ্বভূয়িষ্ঠাস্তুঙ্গা দ্রবিণঃ রাশয়ঃ।
উপদা বিবিশুঃ শশ্বন্নোৎসেকাঃ কোশলেশ্বরম্।।
ততো গৌরীগুরুং শৈলমারুরোহাশ্ব সাধনঃ।"

---রঘুবংশ,---৪র্থ সর্গ।

মর্ম্ম;---মহারাজ রঘু পারসীক, সিন্ধুনদীতীরবাসী এবং হূনদিগকে জয় করিয়া কম্বোজদেশীয় রাজগণকে পরাজয় করেন। কম্বোজেরা তাঁহার নিকট অবনত হইয়া উৎকৃষ্ট অশ্ব ও রাশীকৃত সুবর্ণ উপঢৌকন প্রদান করেন। তৎপর রঘু অশ্ব সাহায্যে গৌরীগুরু পর্ব্বতে আরোহণ করেন।

গৌরীগুরু পর্ব্বত সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। মল্লিনাথের মতে হিমালয় ও গৌরীগুরু অভিন্ন। পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমি, গোরিয়া (Goryaia)

নামক এক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন।* এই জনপদ ভেদ করিয়া গোরনদী কাবুল নদীতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ঋক্‌সংহিতা ও মহাভারতে এই নদী 'গৌরী'নামে অভিহিতা হইয়াছে। এই নদীর পার্শ্বস্থ পর্ব্বতমালা টলেমির মতে 'গোরিয়া' আখ্যা লাভ করিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, কালিদাস এই পর্ব্বত-শ্রেণীকেই গৌরীগুরুঃ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকলমতের মূল্য বিচার করা দুরূহ এবং এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। রঘুবংশের মতানুসারে বর্ত্তমান সিন্ধু ও লগুই নদীর পূর্ব্বাংশে কম্বোজের অবস্থান নির্ণীত হইয়াছে, সুতরাং এই কম্বোজ কর্ত্তৃক ত্রিপুরা আক্রমণের সম্ভাবনা অতি বিরল।

আর একটী কম্বোজদেশের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, ইহার নামান্তর কম্বোডিয়া। লেয়স্ দেশের দক্ষিণ, কোচীন-চীনের পশ্চিম, শ্যামোপসাগর ও চীন সাগরের উত্তর এবং শ্যাম দেশের পূর্ব্ব, এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ কম্বোজ বা কম্বোডিয়া প্রদেশের অন্তর্গত। কেহ কেহ এই প্রদেশকে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত অঙ্গদ্বীপ বলিয়া মনে করেন। এই প্রদেশে প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে জানা গিয়াছে, কম্বোজ রাজ্য শ্যাম দেশ হইতে আনামের দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল. এই স্থানের কোন কোন শিলালিপিতে কিরাত জাতির উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। এই সূত্রে অনেকে অনুমান করেন, কিরাত ও কম্বোজগণ অভিন্ন ; তাঁহারা পরেশবাবুর লিখিত 'কম্বোজ' শব্দ লইয়া কিরাত জাতির প্রতিই অঙ্গুলী সঙ্গেত করিতে চাহেন। আর এক সম্প্রদায় অনুমান করেন, কিরাতগণ উক্ত প্রদেশের আদিম অধিবাসী, পূর্ব্বোক্ত কম্বোজগণ তাহাদিগকে জয় করিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। এই সকল অনুমানের ভিত্তি কোথায়, জানি না ; জানিবার প্রয়োজনও নাই। কারণ, পরেশবাবুর কথিত কম্বোজ কর্ত্তৃক ত্রিপুরা বিজয়ের কথা কোন ইতিহাসেই পাওয়া যাইতেছে না ; সুতরাং কম্বোজগণ যেখানেই থাকুক, এবং যে জাতিই হউক, ত্রিপুরার সহিত তাহাদের সঙ্ঘর্ষ ঘটিবার কথা বিশ্বাস্য নহে। তর্কের খাতিরে পরেশ বাবুর উক্তি মানিয়া লইলেও কম্বোজগণ দ্বারা ত্রিপুরাব্দ প্রচলনের যুক্তি সমর্থন করা যাইতে পারে না। তাহারা ইতিহাসের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া ত্রিপুরা জয় করিয়াছিল, ইহা স্বীকার করিলেও কোন দিন উক্ত রাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই, ঐতিহাসিকমাত্রকেই নির্ব্বিবাদে এই কথা স্বীকার করিতে হইবে। এরূপস্থলে ত্রিপুরারাজ্যে, কম্বোজগণ কর্ত্তৃক বিজয়ের নিদর্শন

* Ptolemy, Bk. VII. Ch. I.

স্বরূপ অব্দ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এবং বিজেতা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত অব্দ গ্রহণ করিয়া, সেই কালের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ত্রিপুরেশ্বরগণ আপনাদের পরাজয় ঘটনা চিরস্মরণীয় করিয়াছিলেন, ইহা নিতান্তই অযৌক্তিক এবং অদ্ভুত ধারণা! এই ধারণা পোষণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না।

বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতার মত

বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয় আর এক নূতন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

"১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের মৃত্যু হয়। তখন ত্রিপুরাব্দ ১২৭২। সুতরাং খৃষ্টাব্দে ও ত্রিপুরাব্দে ৫৯০ বৎসর অন্তর। অতএব খৃষ্টীয় ৬৮২ অব্দে ত্রিপুরাব্দ প্রথম প্রচলিত হয়। তাহা হইলে ঈশানচন্দ্রের মৃত্যুকাল হইতে ১১৮০ বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরাব্দ প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল। ১১৮০ বৎসরে ৩৫।৩৬ পুরুষ ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে, মহারাজ শিবরাজ বা দেবরাজের সময় ত্রিপুরাব্দ প্রচলিত হইয়া থাকিবে।"

—বিশ্বকোষ—৮ম ভাঃ, ২০২ পৃঃ।

ইহা অনুমান মাত্র। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বঙ্গবিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ত্রিপুরাব্দের প্রচলন হইয়াছিল। শিবরাজ বা দেবরাজ কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয় হইবার কোনও নিদর্শন ইতিহাসে নাই ; অথবা ইঁহাদের দ্বারা অন্য কোন এমন উল্লেখযোগ্য কার্য্য হয় নাই, যাহার স্মৃতিরক্ষার্থ একটী নূতন অব্দের প্রচলন সম্ভব হইতে পারে। বিশেষতঃ মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের ঊর্দ্ধতন ৩৫।৩৬ পুরুষের নাম শিবরাজ ও দেবরাজ নহে ; ইঁহারা উক্ত মহারাজের ৬২।৬৩ পুরুষ ঊর্দ্ধে ছিলেন। সুতরাং বিশ্বকোষের নির্দ্ধারণ যে প্রমাদপূর্ণ, ইহা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। খ্রীষ্টীয় ৬৮২ অব্দে ত্রিপুরাব্দে প্রচলনের কথাও অভ্রান্ত নহে; পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ৫৯০ খ্রীঃ অব্দে ত্রিপুরাব্দের আরম্ভ হইয়াছে।

আবার কেহ কেহ বলেন, মহারাজ প্রতীত প্রথম বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন এবং তিনিই ত্রিপুরাব্দের প্রবর্ত্তক। ইতিপূর্ব্বে রাজমালার "প্রুফ কপি" (Proof-copy) স্বরূপ যে অল্প সংখ্যক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাতে লিখিত আছে;—

মহারাজ প্রতীত সম্বন্ধীয় মত

এই মতে রঙ্গেতে প্রতীত রাজা আসে।
শিবদুর্গা বিষ্ণু ভক্তি হইল বিশেষে।।"

লিপিকার-প্রমাদবশতঃ হস্তলিখিত গ্রন্থে 'রঙ্গেতে' শব্দ স্থল 'বঙ্গেতে' লিখিত হইয়াছে। এই 'বঙ্গেতে' শব্দ অবলম্বন করিয়া, পূর্ব্বোক্ত মতাবলম্বীগণ বলিয়া

থাকেন,—“মহারাজ প্রতীত বঙ্গদেশ জয় করিয়া সেই বিজয়-স্মৃতি রক্ষার নিমিত্ত সনের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, এরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত হইবে না।”

এস্থলে আমরাও প্রথমতঃ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম, কিন্তু রাজমালার অন্যান্য উক্তির সহিত এই মতের সামঞ্জস্য লক্ষিত না হওয়ায়, প্রাচীন রাজমালা অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়। তাহা আলোচনায় দেখা গেল, ‘রঙ্গেতে’ শব্দই বিশুদ্ধ। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে,—

“এই মতে রঙ্গসমে আসিল ত্রিপুর।
শিবদুর্গা বিষ্ণু ভক্তি হইল প্রচুর।”

‘রঙ্গসমে’ বাক্যের অর্থ রঙ্গের সহিত। ‘ত্রিপুর’ শব্দ দ্বারা ত্রিপুরেশ্বর (প্রতীত) কে বুঝাইতেছে, ইহা ত্রিপুরা প্রদেশ নহে।

‘বঙ্গেতে’ শব্দের ভ্রমাত্মক ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া যাঁহার মহারাজ প্রতীতের বঙ্গে আগমন ও তৎকর্ত্তৃক অব্দ প্রবর্ত্তনের কথা সত্য বলিয়া মনে করেন, নিম্নোক্ত বিবরণ আলোচনা করিলেই তাঁহাদের ভ্রম অপনোদিত হইবে।

রাজমালা আলোচনায় জানা যাইবে, মহারাজ ত্রিলোচনের রাজধানী কপিলা (ব্রহ্মপুত্র) নদের তীরবর্ত্তী ত্রিবেগ নগরে ছিল। ত্রিলোচনের পরলোকগমনের পরে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত দ্বিতীয় পুত্র রাজা দাক্ষিণ ও অন্য পুত্রগণের বিবাদ হওয়ায়,---

“কপিলা নদীর তীরে পাট ছাড়ি দিয়া।
একাদশ ভাই মিলি মন্ত্রণা করিয়া।।
সৈন্য সেনা সমে রাজ্য স্থানান্তরে গেল।
বরবক্র উজানেতে খলংমা রহিল।।”

রাজমালা—দাক্ষিণ খণ্ড।

এতদ্বারা জানা যাইতেছে, মহারাজ দাক্ষিণ ত্রিবেগ পরিত্যাগ করিয়া বরবক্র (বরাক) নদীর উজানে খলংমা নামক স্থানে রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। এইস্থানে কিয়ৎকাল অবস্থান করিবার পরে, সৈন্যগণ একদা সুরামত্তাবস্থায় আত্মকলহে রত হয় ; ইহার ফলে---“পঞ্চ সহস্র বীর সে স্থানে মরিল।” এই দুর্ঘটনার পরে রাজা ভাবিলেন,---

“না রহিব এথাতে যাইব অন্যস্থান।
মনস্থির করে রাজা যাইতে উজান।।
অদ্য কল্য যাইব মনে বাসনা না ত্যজে।
সেই স্থানে কালবংশ হৈল মহারাজে।।”

রাজা দাক্ষিণ রাজধানী পরিবর্ত্তনের সঙ্কল্প করিয়াও আয়ুঃশেষ হওয়ায় সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। ইহার পর,---

"দাক্ষিণ মরিল রাজা তার পুত্র ছিল।
তৈদক্ষিণ নামে রাজা তখনে করিল।।
* * *
বহুকাল সেই স্থানে পালিলেক প্রজা।
মেখলি রাজার কন্যা বিভা কৈল রাজা।।
তাহান ঔরস পুত্র সুদক্ষিণ নাম।
রূপে গুণে সুদক্ষিণ বড় অনুপম।।
বহুকাল সেই রাজা রহিল তথাত।
সেইস্থানে রাজার মৃত্যু হইল উৎপাত।।
তরদক্ষিণ নাম রাজা তাহার তনয়।
বহুকাল পালে প্রজা নীতি যজ্ঞময়।।"

এই তরদক্ষিণের সময় পর্য্যন্ত রাজধানী পরিবর্ত্তিত হয় নাই, উদ্ধৃত বাক্য দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইতেছে। তরদক্ষিণের পরবর্তী, মহারাজ বিমার পর্য্যন্ত ৪৯ জন রাজার নাম রাজমালায় পাওয়া যায়, তাঁহাদের শাসনকালেও রাজধানী পরিবর্ত্তনের কোন প্রমাণ নাই। বিমারের পুত্র কুমার, ছাম্বুলনগরে শিব দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন, তৎকালে কৈলাসহরে এক বাড়ী নির্ম্মাণ করাইবার কথা রাজমালায় পাওয়া যায় ; কিন্তু এই সময়ও বরবক্রের তীরবর্ত্তী খলংমার রাজপাট পরিত্যাগ করা হয় নাই। কুমারের অধস্তন ১৩শ স্থানীয় মহারাজ প্রতীত হেড়ম্বরাজের সঙ্গে প্রীতি সংস্থাপনপূর্ব্বক উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, রাজ্যদ্বায়ের মধ্যবর্ত্তী সীমা সুদৃঢ় করেন। উভয়ের বন্ধুত্ব অধিকতর বদ্ধমূল করিবার অভিপ্রায়ে মহারাজ প্রতীত কিয়ৎকাল হেড়ম্বে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়,—

"দুই নৃপে অনেক করিল সম্ভাষণ।
একাসনে বৈসে দোহে একত্রে ভোজন।"

উভয় নৃপতির এবম্বিধ প্রীতিভাব সন্দর্শনে পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য নৃপতিবর্গ বিশেষ চিন্তিত হইলেন এবং তাঁহারা ষড়যন্ত্র করিয়া, এক অপূর্ব্ব সুন্দরী কামিনীকে উভয়ের মধ্যে ভেদ জন্মাইবার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন। এই সূত্রে হেড়ম্ব ও ত্রিপুর ভূপতির মধ্যে মনোমালিন্য সঙ্ঘটিত হওয়ায়, ত্রিপুরেশ্বর প্রতীত উক্ত

রমণীকে লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহাতে হেড়ম্বরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিপুরা আক্রমণের নিমিত্ত স্বয়ং অভিযান করিয়াছিলেন। তখন,---

"সসৈন্যে হেড়ম্ব আইসে ত্রিপুর নগরী।
হেড়ম্বের এই তত্ত্ব শুনিল সুন্দরী।
জীবন বধের ভয়ে সুন্দরী আপন।
কান্দিয়া কহিল শুন ত্রিপুর রাজন।।
এই দেশ ছাড় রাজা আমা প্রাণ রাখ।
নতু আমি চলে যাব তুমি একা থাক।।
সুন্দরী দেখিয়া রাজা ভুলিয়াছে মন।
খলংমার কূলে আইসে ত্রিপুর রাজন।"

রাজমালা---প্রতীত খণ্ড।

'খলংমার কূলে আইসে' এই বাক্য দ্বারা বুঝা যাইতেছে, তৎকালেও খলংমায় রাজধানী ছিল। মহারাজ প্রতীত হেড়ম্ব হইতে আসিবার পর সোজাসুজি খলংমায় না গিয়া থাকিলেও তৎকালে বঙ্গে আগমন করেন নাই---ধর্ম্মনগরে গিয়াছিলেন। হেড়ম্বপতি সসৈন্যে ত্রিপুর নগরীতে আগমন করিবার কথা যে উদ্ধৃত বাক্যে পাওয়া যাইতেছে, সেই নগরী আমাদের কথিত ধর্ম্মনগর ; নিম্নোদ্ধৃত বাক্য আলোচনায় ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

"প্রতীত নামেত হইল তাহার তনয়।
হেড়ম্ব রাজার সঙ্গে হইল প্রণয়।
দুইজনে একতা শুনিয়া অন্য রাজা।
* * *
মনে বড় ভয় পাইয়া করিল সন্ধান।
দুই জনে করাইল বড় ভেদ জ্ঞান।
তবে বড় যুদ্ধ হইল দুই রাজার বলে।
নিজ স্থান ছাড়িয়া প্রতীত রাজা চলে।
ধর্ম্মনগর নামে ছিল এক ঠাঁই।
সেখানে আসিল রাজা সঙ্গে বন্ধু ভাই।"

রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত রাজমালা।

হেড়ম্ব হইতে আনীত সুন্দরীর অনুরোধ এবং হেড়ম্বেশ্বরের আক্রমণের ভয়ে,

মহারাজ প্রতীত ধর্ম্মনগর হইতে খলংমায় গমন করিয়াছিলে, তাই রাজমালার পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যে পাওয়া যাইতেছে---"খলংমার কূলে আসে ত্রিপুর রাজন।"

এতদ্দারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, প্রতীতের শাসনকাল পর্য্যন্ত খলংমাতেই রাজধানী ছিল, এবং তিনি ধর্ম্মনগরে আর এক রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। ধর্ম্মনগর জুরী নদীর তীরে অবস্থিত। মহারাজ প্রতীতের পূর্ব্বে মহারাজ কুমারের মনুনদীর তীরবর্ত্তী কৈলাসহর নগরীতে আর এক বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই সকল বিবরণ আলোচনায় জানা যাইতেছে, মহারাজ প্রতীতের শাসনকাল পর্য্যন্ত ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দ আসামের সীমা অতিক্রম করিয়া বঙ্গদেশের উপর হস্ত প্রসারণ করেন নাই ; কারণ সেকালে ত্রিবেগ, কৈলাসহর ও ধর্ম্মনগর প্রভৃতি স্থান আসামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরূপ অবস্থায় মহারাজ প্রতীত বঙ্গদেশ জয় করিয়া ত্রিপুরাব্দের প্রচলন করিয়াছেন, এবম্বিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না।

আর একটী কথা আছে। মহারাজ কিরীটের (আদি ধর্ম্মপাল) ৫১ ত্রিপুরাব্দে তাম্র শাসন দ্বারা ভূমিদান করিবার বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রদান করা হইয়াছে. তিনি প্রতীতের অধস্তন ৮ম স্থানীয়। প্রতীতকে ত্রিপুরাব্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া ধরা হইলে, ৫১ বৎসর সময়ের মধ্যে ৮ম পুরুষের অভ্যুদয় নিতান্তই অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে ; সুতরাং এই হিসাবেও প্রতীতকে ত্রিপুরাব্দের প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে না।

শ্রীহট্টের ইতিহাস প্রণেতার মত

পূর্ব্বোক্ত মতবাদিগণের উক্তি খণ্ডন জন্য যে সকল কথা বলা হইল, বোধ হয় তাহাই যথেষ্ট। এখন আর একটী মতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রণেতা সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় বলিয়াছেন,---

"প্রতীতের পুত্র মিরিছিম, তৎপুত্র গগন, তাঁহার পুত্র নওয়ার বা নবরায়, তৎপুত্র যুঝারুং ফা (যুদ্ধজয় বা হিমতিছ), ইনি রাঙ্গামাটী জয় করিয়া তথায় এক নূতন রাজবাটী স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নব-দেশবিজয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ আদি পুরুষের নামানুক্রমে ত্রিপুরাব্দের প্রচলন করেন।"

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত---২য় ভাঃ, ১ম খঃ, ৪র্থ অঃ, ৪৯ পৃঃ।

এই যুঝারুং ফা সম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে,---

এই মতে রাঙ্গামাটী ত্রিপুরে লইল।
নৃপতি যুঝার পাট তথাতে করিল।।

*　　　*　　　*

রহিল অনেক কাল সে স্থানে নৃপতি।
বঙ্গদেশ আমল করিতে হৈল মতি।।
বিশালগড়ে আদি করি পাব্বর্বতীয় গ্রাম।
কালক্রমে সেই স্থান হৈল ত্রিপুর ধাম।।"

রাজমালা---যুঝারু ফা খণ্ড।

সংস্কৃত রাজমালায়ও এই বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদান করা হইল---

"ততঃ সংপ্রাপ্য সকলং সবিশালগড়াধিকং।
পর্ব্বত গ্রামবহুলং গজবাজী সমযুতং।।
ততঃ প্রভৃতি জাতাস্য যুঝারু রিতি নামতা।
ততঃ স বিধিং পুণ্যং কৃত্বা স্বর্গমুপাযযৌ।।"

উদ্ধৃত বাক্যাবলী দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, মহারাজ হিমতি (নামান্তর যুঝারু ফা বা হামতার ফা) সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদেশের কিয়দংশ অধিকার করিয়া ছিলেন।

অব্দ-প্রবর্ত্তক সম্বন্ধীয় শেষ সিদ্ধান্ত

তৎপূর্ব্বে কোনও ত্রিপুর ভূপতির বঙ্গদেশ জয় করিবার প্রমাণ নাই। সুতরাং এই যুঝারু ফা, বঙ্গ বিজয়ের স্মৃতি রক্ষার নিমিত্ত ত্রিপুরাব্দের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এরূপ নির্দ্ধারণ করিলে প্রবাদবাক্যের সার্থকতা রক্ষা পাইবে, এবং এই নির্দ্ধারণ দ্বারা যুঝারু ফা এর অধস্তন চতুর্থস্থানীয় মহারাজ কিরীট (নামান্তর দানকুরু ফা বা হরি রায়) ৫১ ত্রিপুরাব্দে আদি ধর্ম্ম পা উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক যজ্ঞ সম্পাদন ও তাম্র-পত্র দ্বারা ভূমি দান করিয়াছিলেন, এই বিষয়েরও সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে।

আরও দেখা যাইতেছে, উক্ত নির্দ্ধারণানুসারে হিসাব করিলে বর্ত্তমান ত্রিপুরেশ্বর পর্য্যন্ত প্রতিপুরুষে গড়পড়তা ২১ একুশ বৎসরেরও কিছু অধিক দাঁড়ায়। ত্রিপুররাজবংশের সম্যক বিবরণ আলোচনা করিলে, এই গড়পড়তার পরিমাণ অসঙ্গত বা অসম্ভব বলিয়া মনে করিবার এবং মহারাজ যুঝারু ফা কর্ত্তৃক ত্রিপুরাব্দ প্রবর্ত্তনের কথা অস্বীকার করিবার কোন কারণই থাকিতে পারে না। অতএব ইহাই সঙ্গত নির্দ্ধারণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কাতাল ও কাকচাঁদের বিবরণ

কাতাল ও কাকচাঁদের সহিত ত্রিপুর-পুরাবৃত্তের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই টীকার ১৮৫ পৃষ্ঠায় ইঁহাদের নামোল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। এস্থলে তাঁহাদের স্থূল বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে।

ইঁহারা দুই সহোদর ছিলেন ; কাতাল জ্যেষ্ঠ ও কাকচাঁদ কনিষ্ঠ। ইঁহাদের বাড়ী ছিল ত্রিপুররাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট কৈলাসহরে। কাতালের বিস্তর নগদ সম্পত্তি ছিল এবং কাকচাঁদ ছিলেন গোলাভরা শস্য-সম্পদের অধিকারী।

উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাব থাকিলেও তাঁহাদের কোঁদল-প্রিয়া সহধর্ম্মিনীগণের মধ্যে সেই পবিত্রভাবের একান্তই অভাব ছিল। এতদুভয়ের প্রতিনিয়ত কলহ হেতু ভ্রাতৃদ্বয় স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন এবং বিভিন্ন বাড়ীতে বাস করিতে বাধ্য হন; কিন্তু তদ্দরুণ তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বভাবের বিন্দুমাত্রও বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই।

একদা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্যব্যপদেশে কাতাল ও কাকচাঁদ দীর্ঘকালের নিমিত্ত প্রবাস যাত্রা করিলেন। উভয়েরই পরিবারবর্গ বাড়ীতে রহিয়াছিল। এই সময় দেশে এমন ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল যে রাশি রাশি অর্থ দিয়াও একমুষ্টি আহার্য্য-শস্য পাওয়া যাইতেছিল না। এই দুর্ঘটনায় সহস্র সহস্র লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। প্রাণের মমতায় পতি পত্নীকে এব জননী সন্তানকে পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। যাহার গৃহে সামান্য পরিমাণ শস্য ছিল, দস্যু ও তস্করের দৌরাত্ম্যে সেও সম্বলবিহীন হইয়া অনাহারে দিন যাপন করিতে বাধ্য হইল। অনেকে প্রাণের দায়ে দেশ পরিত্যাগ করিল। সমগ্রদেশ শ্মশানে পরিণত হইল।

এই ভীষণ দুর্দ্দিনে, কাতালের ভাণ্ডরে বিপুল অর্থ সঞ্চিত থাকা সত্ত্বেও তাঁহার স্ত্রীপুত্রগণ অনশনে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কাতালের স্ত্রী প্রাণান্তকারী বিপদ হইতে পরিত্রাণের আসায় কাকচাঁদের স্ত্রীর শরণাপন্ন হইলেন, এবং ইচ্ছামত মূল্য লইয়া ধান্য প্রদানপূর্ব্বক জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে বিস্তর অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ক্রূরস্বভাবা কাকচাঁদ-পত্নীর কঠিন হৃদয় কিছুতেই দ্রব হইল না। এহেন দারুণ বিপদকালে কাতালের স্ত্রীকে ধান্যদানে সাহায্য করা দূরের কথা---তাঁহাকে কর্কশ ভাষায় বলিয়া দিলেন---'তুমি যেই টাকার গর্ব্বে ধরাকে সরা বলিয়া মনে কর, এখন সেই টাকা গিলিয়াই জীবন রক্ষা কর গিয়ে। আমার ন্যায়

গরীবের সাহায্য লইয়া কেন আত্মসমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবে। কাকচাঁদের স্ত্রীর পূর্ব্বাপর একই কথা। কাতাল-গৃহিণীর ব্যাকুল রোদনে, বালক বালিকাগণে ক্ষুৎপীড়িত সজল নয়ন ও শীর্ণ দেহ দর্শনেও তাঁহার পাষাণ হৃদয়ে করুণার সঙ্কার হইল না। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে এত মুষ্টি ধান্য প্রদান করিতেও তিনি সম্মতা হইলেন না।

কোথাও শস্য নাই---কাহারও সাহায্য লাভের আশা নাই। সকলেই আত্মজীবন লইয়া ব্যস্ত ও বিপন্ন ; কে কাহাকে এ বিপদে সাহায্য করিবে? কাতালের স্ত্রী কোন উপায়েই শস্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। অপোগণ্ড সন্তানগুলি অনাহারে অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া, তাঁহার চক্ষের উপর একে একে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইল; পরিশেষে তাঁহার শোকতাপ জর্জরিত দেহও সন্তানগণের পার্শ্বে চিরনিদ্রিত হইল! কাতালের সমৃদ্ধিশালী সুখের সংসার জনশূন্য হইল, অগণিত অর্থ, তাঁহার পরিবারবর্গকে রক্ষা করিতে পারিল না।

এই হৃদয় বিদারক দুর্ঘটনার কিয়দ্দিবস পরে কাতাল দেশে ফিরিলেন ; তিনি সমস্ত অবস্থা জানিয়া, শোকে, ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইলেন। এত কাল যে বিপুল অর্থের অধীশ্বর বলিয়া গৌরব করিতেন, সেই সম্পত্তি, প্রিয় পরিবারবর্গকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না দেখিয়া, তাঁহার হৃদয়ে যে দারুণ শোকানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহা একান্তই অসহনীয় হইয়া উঠিল। কাতাল, বাড়ীর সম্মুখে এক বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, অসার ধনসম্পত্তি সেই সরোবরে নিক্ষেপ করিয়া, নিজেও তাহার গর্ভে নিমজ্জিত হইলেন ; কাতালের সমস্ত জ্বালার অবসান হইল।

ইহার অল্পকাল পরে কাকচাঁদ বাড়ী আসিয়া, অগ্রজের ও তাহার সন্তান-সন্ততিগণের শোচনীয় মৃত্যুর ঘটনা অবগত হইলেন। তাঁহার ভ্রাতৃ-বৎসল-হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। নির্ম্মম গৃহিণীই এই দারুণ অনর্থের মূল, একথা ভাবিতে তাঁহার জীবন প্রতি---সংসারের প্রতি---পাপের জীবন্তমূর্ত্তি সহধর্ম্মিনীর প্রতি, ঘোর বিরাগ জন্মিল। গোলাস্থিত শস্যরাশিকে তিনি ভ্রাতৃ বিয়োগের মূলীভূত কারণ বলিয়া মনে করিলেন।

ভ্রাতৃ-শোকোন্মত্ত কাকচাঁদ সাত পাঁচ ভাবিয়া অগ্রজের পথ অনুসরণের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহারও একটী দীঘি ছিল ; তিনি গোলা ভাঙ্গিয়া শস্যরাশি সেই সরোবরে নিক্ষেপ করিলেন ; এবং পরিবারবর্গের সকলকে একখানা নৌকার গুড়ার সহিত দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া, নিজে তাহাতে আরোহণ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে নৌকাখানা সরোবরের মধ্যভাগে নিয়া, কুঠার দ্বারা তাহার তলা ভাঙ্গিয়া

দিলেন। এই উপায়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই কাকচাঁদ সবংশে ভ্রাতৃবধজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিলেন।

আজ কাতাল ও কাকচাঁদ নাই, তাঁহাদের বংশও নাই ; কিন্তু নাম আছে এই ভ্রাতৃযুগল সম্বন্ধীয় প্রবাদের সাক্ষীস্বরূপ কাতালের দীঘি ও কাকচাঁদের দীঘি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। বর্ত্তমান কালে কাতালের দীঘির চারিপাড় যুড়িয়া কৈলাসহর বিভাগের সহর অবস্থিত রহিয়ছে। তাহার অল্প পশ্চিম দিকে, কাকচাঁদের দীঘির পাড়ে কৈলাসহরের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। রাজসরকারী ব্যয়ে সরোবরদ্বয় সংস্কৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু পরিসরের খর্ব্বতা সাধিত হইয়াছে।

কাতাল ও কাকচাঁদের পরিচয় সংগ্রহ করা বর্ত্তমানকালে দুঃসাধ্য। অনেকে অনুমান করে, ইঁহারা দাস-জাতীয় সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থ ছিলেন ; এবং এই ভ্রাতৃযুগলই তথাকার আদিম অধিবাসী। প্রাচীনকালে কৈলাসহর অঞ্চলে কিরাত জাতিরই প্রাধান্য ছিল। তাহাদের প্রভাব খর্ব্ব হইবার পর ক্রমশঃ হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতির বসতি স্থাপন হয়। কাতাল ও কাকচাঁদ সেই সময়ের লোক হওয়াই সম্ভবপর।

কৈলাসহরে দীর্ঘকাল ত্রিপুরার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। যেই ভীষণ দুর্ভিক্ষের কথা লইয়া কাতাল ও কাকচাঁদের আখ্যায়িকার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই দারুণ দুর্ভিক্ষই কৈলাসহর হইতে রাজধানী উঠাইয়া লইবার মূল কারণ। এই ঘটনার কাল বিশুদ্ধভাবে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

অগুরু কাষ্ঠ

এই টীকার ১৬৯ পৃষ্ঠায় অগুরু কাষ্ঠের উল্লেখ হইয়াছে। মহাভারত সভাপর্ব্বে, রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের বর্ণন উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে, কিরাতগণ অন্যান্য দ্রব্যের সহিত অগুরু লইয়া উপস্থিত ছিল ; যথা,---

"চন্দনাগুরু কাষ্ঠানাং ভারান্‌কালীয় কস্য চ।
চর্ম্মরত্ন সুবর্ণানাং গন্ধনাশ্চৈব রাশয়ঃ।।"

মহাভারত---সভাপর্ব্ব, ৫২ অঃ, ১০ শ্লোক।

এতদ্বারা জানা যাইতেছে, মহাভারতের কালে কিরাতদেস অগুরুর নিমিত্ত প্রখ্যাত ছিল। বর্ত্তমানকালেও ত্রিপুরার পার্ব্বত্যপ্রদেশে এবং আসাম অঞ্চলে বিস্তর অগুরু জন্মিয়া থাকে, স্থানীয় ভাষায় ইহাকে 'আগর' বলে। আসাম

প্রদেশে উৎপন্ন হইবার কথা মহাকবি কালিদাসেরও জানা ছিল। তাঁহার রঘুবংশ কাব্যে পাওয়া যাইতেছে।

"চকম্নেতীর্ণ লৌহিত্যে তস্মিন্ প্রাগ্জ্যেতিষেশ্বরঃ।

তদ্ গজালামতং প্রাপ্তে সহকালাগুরুদ্রুমৈঃ।।

রঘুবংশ,---৪র্থ সর্গ।

ইহা চন্দন জাতীয় বৃক্ষ, অনেকে ইহাকে 'অগুরু-চন্দন' বলে। এই বৃক্ষের পত্রের সহিত চন্দন-পত্রের অনেক সাদৃশ্য আছে। চন্দন বৃক্ষের সমগ্রভাগের সারাংশ ব্যবহারোপযোগী হয়, আগর বৃক্ষ, তদ্রূপ নহে ; এই জাতীয় বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ স্থানে স্থানে নানা আকার বিশিষ্ট খণ্ড খণ্ড সার জন্মে, অনেক স্থলে ইহা কাষ্ঠের সহিত জড়িত ভাবে থাকে, কোন কোন স্থানে কাষ্ঠ হইতে স্বতন্ত্রভাবে পিণ্ডাকারে থাকিতেও দেখা যায়। এই সকল খণ্ডকে 'দোম' বলে। এই দোমই মূল্যবান, বৃক্ষের অন্য অংশ বড় বেশী কাজে লাগে না। কোন কোন দেশে ইহার ত্বক্ দ্বারা কাগজ প্রস্তুত হয়। প্রাচীনকালে কাগজ বা তাল পত্রের পরিবর্ত্তে এই বৃক্ষের ত্বক্ পুথি লেখার কার্য্যে ব্যবহৃত হইত।

কোন্ বৃক্ষে অগুরু জন্মিয়াছে, বিশেষজ্ঞ ব্যতীত সকলে তাহা বুঝিতে পারে না। সাধারণতঃ যে বৃক্ষে অগুরু উৎপন্ন হয়, সেই বৃক্ষে কালবর্ণের এক জাতীয় পিপীলিকা সর্ব্বদা বাস করে ; ইহাই অগুরু উৎপন্ন বিষয়ক পরিজ্ঞানের একটী বিশেষ অবলম্বন। ব্যবসায়িগণ এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

অগুরু বৃক্ষের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট, কিন্তু তাহার দোম (সারাংশ) কৃষ্ণবর্ণ। ইহার সৌরভ অতি মনোহর। দেবর্ব্বার্চ্চনাদি কার্য্যে ইহা ধূপের ন্যায় জ্বালান হয়, এবং শিলায় ঘষিয়া চন্দের ন্যায়ও ব্যবহার করা হয়। অগুরুর আতর অতি উৎকৃষ্ণ এবং বিশেষ মূল্যবান। এদেশে আতর ও এসেন্স প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে, অগুরু একটী প্রধান বিলাস দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থসমূহে 'অগুরু-চন্দন-চুয়া' নিয়ত ভোগ্য বস্তু মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে ; এবং বারম্বার অগুরুর উল্লেখ পাওয়া যায়। সেকালে আরব, পারস্য ও গ্রীস প্রভৃতি দূরবর্ত্তী দেশে বিস্তর অগুরু প্রেরিত হইত ; এখনও নানা প্রদেশে বিস্তর পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে। অগুরু দ্বারা আতর, তৈল, সাবান ও এসেন্স ইত্যাদি বিশেষ আদরণীয় বিবিধ বিলাস-দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অগুরু কেবল বিলাসীগণেরই উপভোগ্য নহে। ইহা ঔষধরূপেও ব্যবহৃত হয়।

অগুরুর তৈল কোন কোন রোগে মহোপকারী। বৈদ্যকগ্রন্থে অগুরু তিক্ত, উষ্ণ ও কটু গুণান্বিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ; এবং এতদ্দ্বারা কফ, বায়ু, মুখরোগ, কর্ণ ও চক্ষের পীড়া, গ্রন্থিবাত এবং দুষ্টরক্ত ইত্যাদি পীড়ার উপশম হয়।

কিরাত প্রদেশে (ত্রিপুরা ও আসাম অঞ্চলে) বিস্তর অগুরু উৎপন্ন হইয়া থাকে, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ত্রিপুর রাজ্য কিরাত প্রদেশে সংস্থাপিত হইয়াছিল, একথাও বলা গিয়াছে। প্রাচীনকালে আসাম অঞ্চলেই ত্রিপুরার রাজধানী ছিল। সুতরাং আবহমানকাল এই মূল্যবান বস্তুকে ত্রিপুরেশ্বরগণের একায়ত্ত সম্পত্তি বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমানকালেও এই সম্পদের পরিমাণ নিতান্ত কম নহে। সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মনগর বিভাগেই ইহার আধিক্য দৃষ্ট হয়।

এস্থলে আর একটী কথা উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়। ত্রিপুর রাজ্যের বর্ত্তমান রাজধানী আগরবন কর্ত্তন দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া স্থানের নাম 'আগরতলা' হইয়াছে, এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। এবিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিলেও এই প্রবাদবাক্য দ্বারা উক্ত রাজ্যে আগর (অগুরু) বৃক্ষের আধিক্য থাকা প্রমাণিত হইতেছে।

কিরাত জাতি

রাজমালায় কিরাত জাতির কথা বারম্বার উল্লেখ করা হইয়াছে। ত্রিপুর রাজ্য কিরাত দেশে অবস্থিত এবং কিরাত জাতিই এই রাজ্যের আদিম অধিবাসী। সুতরাং এই জাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে প্রদান করা আবশ্যক। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে। কিরাত দেশ ও তাহার অবস্থান বিষয়ক বিবরণ পূর্ব্বেই সন্নিবেশিত হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে Nonnos গ্রীকভাষায় একখানি মহাকাব্য লিখিয়াছেন। তাহার নাম Dionysiaka বা Bassarika । এই গ্রন্থে কিরাতদিগের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রন্থকার বলেন, কিরাতজাতি নৌযুদ্ধে অভ্যস্ত ছিল, তাহাদের নৌকাগুলি চর্ম্মনির্ম্মিত। এই কিরাতদিগের অধিনায়কের নাম ছিল Thyamis ও Olkaros । ইহারা দুইজনেই নৌচালনবিশারদ Tharserosএর

পুত্র। এই গ্রীকগ্রন্থে কিরাতের নাম "Cirradioi" বলিয়া উল্লিখিত আছে।* M' Crindle সাহেব 'কিরাদই'কে কিরাত বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'Periplus of the Erythracan Sea'র রচয়িতা কিরাতদিগকে Kirrhadai সংজ্ঞা দিয়াছেন। Pliny কিরাতদিগকে Scyrites বা Syrites নামে অভিহিত করিয়াছেন। M'Crindle বলে, কিরাতগণ পার্ব্বত্য জাতি, অরণ্য ও পর্ব্বত উহাদের বাসস্থান, শিকারলব্ধদ্রব্যই ইহাদের উপজীবিকা ; শাস্ত্রসম্মত হিন্দুধর্ম্মাচার ইহারা রক্ষণ করিয়া চলিত না বলিয়া কিরাতগণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।** প্রাচীন শিলালিপি পাঠে জানিতে পারা যায় যে, কিরাতগণ আসাম হইতে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছিল। নেপালের 'কিরান্তি' জাতি যে কিরাতজাতির অন্তর্নিবিষ্ট, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। † এই কিরাতজাতি কালক্রমে পূর্ব্বভারতের পার্ব্বত্যভূমি অধিকার করিয়া বসে। যে যে স্থানে গমন করিয়া ইহারা বাস করিয়াছে, তত্তৎভূমি কিরাতভূমি নামে আখ্যাত হইয়াছে। কাজেই কিরাতভূমির পরিসর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

কিরাতগণ অতি প্রাচীন জাতি। বৈদিকগ্রন্থে ইহাদের কথা আছে। বাজসনেয়ী সংহিতায় উল্লিখিত আছে যে, ইহারা গুহাবাসী (৩০-১৬) ‡। অথর্ব্ববেদে (১০।৪।১৪) একজন 'কৈরাতিকা'র (কিরাতবালার) উল্লেখ আছে। Lassen, তাঁহার 'ভারতীয় পুরাতত্ত্বে' (Lassen, Indische Alterthumskunde, 12, 530-534) প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, কিরাতগণ বৈদিক যুগের পর নেপালের পূর্ব্বাঞ্চলে বাস করিত।

---

* "By the Cirradioi are meant the Kirata, a race spread along the shores of Bengal to eastward of the mouths of the Gangas as far as Arracan. They are described by the author of the "Periplus of the Erythracan Sea" who calls them the Kirrhadai as savages with flat noses. He places them on the coast to the west of the Ganges but erroneously. They are the Airrhadai of Ptolemy"--M'Crindles Ancient India. p 199 (1901).

** M'Crindles's Ancient India, p61

† M'Crindle বলেন, কিরাতগণ ভুটানের অধিবাদী, অধুনা নেপালে তাহাদের বহু পরিবার বর্ত্তমান রহিয়াছে।

‡"The Pygmies are the kirata--the Mongolian hillmen of Bhotan or the wild tribes of the Assam frontier perhaps." [Intercourse between India and the Western world–H. G. Rawilinson P. 27]

তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ—৩।—৪।১২।১ দ্রষ্টব্য।

মানবধর্ম্মশাস্ত্রে কিরাতদিগকে বৃষলত্ব-প্রাপ্ত ক্ষত্রিয় আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। যথা ঃ---

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ।।"

মনুসংহিতা---(১০।৪৪)

অনেকে আবার কিরাতদিগকে ম্লেচ্ছ প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।* কিন্তু ইহারা মূলতঃ যে ক্ষত্রিয় ছিল, তাহা আধুনিক পণ্ডিতগণও স্বীকার করেন। †

এক সময়ে হিমালয়ের পূর্ব্বাংশে, বর্ত্তমান ভুটান, আসামের পূর্ব্বাংশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, ব্রহ্মদেশ, এমন কি চীন সমুদ্র তীরবর্ত্তী কম্বোজ পর্য্যন্ত কিরাতজাতির বাসভূমি ছিল। এখনও নেপালের পূর্ব্বাংশ হইতে আসাম অঞ্চলের পার্ব্বত্য-প্রদেশ ও ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে কিরাতগণ বাস করিতেছে। নেপালের পাব্বুতীয় বংশাবলী পাঠে জানা যায়, আহীর বংশের পর, ১৯ জন কিরাত বংশীয় রাজা নেপালে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরেও দীর্ঘকাল তথায় কিরাতদিগের প্রাধান্য ছিল। পরিশেষে নেপালরাজ পৃথ্বীনারায়ণ ইহাদিগকে পরাভূত করেন। তদবধি তাহাদিগকে দীনহীন অবস্থায় অরণ্যবাসী হইতে হইয়াছে। আসাম এবং ত্রিপুরা অঞ্চলের কিরাতগকণ, দ্রুহ্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ (বর্ত্তমান ত্রিপুর রাজবংশ) কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছে।

কিরাতদিগের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় বা জাতি আছে। তাহাদের মধ্যে রাজার সংখ্যাও কম ছিল না। দিগ্বিজয় উপলক্ষে অর্জ্জুন, ভীম ও নকুল প্রভৃতি কিরাতরাজগণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন (সভাপর্ব্ব---২৫, ২৯, ৩১ অধ্যায়)। সভাপর্ব্বের ৪র্থ অধ্যায়ে দুইজন ও ২৯ অধ্যায়ে সাতজন কিরাত রাজের উল্লেখ পাওয়া যায়, এতদ্ব্যতীত বনপর্ব্বে এবং ভীষ্ম পর্ব্বেও কিরাতের কথা আছে।

কিরাতগণের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় সুসভ্য এবং কোন কোন সম্প্রদায় নিত্যন্ত অসভ্য চর্ম্ম পরিহিত ছিল। ইহাদের মধ্যে যাহারা অতিশয় দুষ্ট ছিল, তাহারা অধম কিরাত নামে অভিহিত হইত।

---

* "ভেদাঃ কিরাতশবর পুলিন্দা ম্লেচ্ছ জাতয়ঃ।"

অমরকোষ—শূদ্রবর্গ, ৫৬।৫৭ পর্য্যায়।

† Zimmer (Altindisches Leben--p. 32), Ludwig (Translation of the Rigveda, 3, 207), Vincent Smith (Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, 258)

‘হদার লোক’

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ত্রিপুরা জাতির মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় রাজচিহ্ন ধারণ করে, এবং কোন কোন সম্প্রদায় দেবার্চ্চনাদির কার্য্য করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তও সম্প্রদায় বিশেষ নিযুক্ত আছে। ইহাদের দ্বারা রাজ সরকারী যে সকল কার্য্য সম্পাদিত হয়, স্থানীয় ভাষায় তাহাকে ‘হদার কার্য্য বলে, এবং কার্য্যনির্ব্বাহকদিগকে ‘হদার লোক’ বলা হয়।

ত্রিপুরা জাতি কয়েকটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত, তদ্বিবরণ স্থানান্তরে প্রদান করা হইবে। তাহাদের মধ্যে পুরাণ তিপ্রা সম্প্রদায়ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান এবং ইহারাই হদার কার্য্য করিয়া থাকে। হদার লোকগণ রাজকর হইতে বর্জ্জিত আছে। যে সম্প্রদায়ের হদার লোক দ্বারা যে যে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহার স্থূল বিবরণ এস্থলে দেওয়া গেল। তাহারা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত এগারটি হদা বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত।

(১) **বাছাল**---প্রবাদ আছে যে, ইহারা পূর্ব্বে ত্রিপুরারাজ্যের অধিপতি ছিল। ইহাদিগকে পরাজয় করিয়া চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ ত্রিপুররাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রবাদের কোনও ভিত্তি নাই। হালামগণ হইতে ত্রিপুরা রাজ্য চন্দ্রবংশীয়গণের হস্তে আসিয়াছে, ইহাই ঐতিহাসিক সত্য। বাছালগণ পূর্ব্বে সুবার অধীনে ‘হস্তী খেদার’ কার্য্য করিত। এক্ষণে ইহাদের উপর নিম্নোক্ত কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়াছে ;---

(ক) রাজদরবারে ইহাদিগকে রৌপ্যনির্ম্মিত ‘পান’ ও ‘পাঞ্জা’ বহন করিতে হয়। ত্রিপুরেশ্বর যখন মিছিল লইয়া কোথাও গমন করেন, তখনও বাছালদিগকে ঐ কার্য্য করিতে হয়। ‘পান’ ও ‘পাঞ্জা’ রাজকীয় সুলতানতের অঙ্গ।

(খ) রাজবাড়ীতে পার্ব্বত্যপদ্ধতিক্রমে কোন পূজায় অনুষ্ঠান হইলে, বংশগুচ্ছ দিয়া দেবদেবীর মূর্ত্তি এবং পূজার মণ্ডপ প্রস্তুতকরণ ইহাদের কার্য্য। পূজায় ইহারা জলও যোগাইয়া থাকে।

(গ) ত্রিপুররাজ্যে বিবাহকালে বিবাহ-বেদির চারিপাশে পত্রশাখা সংযুক্ত বংশ পুতিয়া দিবার প্রথা আছে। রাজপরিবারস্থ কাহারও বিবাহে এই কার্য্যে বাছালদিগেরই অধিকার।

(ঘ) প্রতিবর্ষে বিজয়ার দিবস ‘হসম ভোজন’ নামক অপর্য্যাপ্ত মদ্যপানাদি ক্রিয়ার একটী অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ঐ অনুষ্ঠানের জন্য বাছালদিগকে

বংশনির্ম্মিত দীপাধার প্রস্তুত করিতে হয়। এই উপলক্ষে যে সকল নওয়াতিয়া তিপ্রা * নিমন্ত্রিত হয়, তাহাদিগের আহারের জন্য বাঁশের বেড়া দিয়া স্থানটিকে ঘিরিতে হয়। † এ কার্য্যও বাছালদিগের করণীয়।

২। **সিউক**---'সিউক' শব্দের অর্থ শিকারী। ইহারা রাজপরিবারের আহারের জন্য পশুপক্ষী শিকার করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহারা রাজদরবারে (উপাধি বিতরণ কালে) চন্দনের পাত্র ধারণ করে। রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণের বিবাহ উপলক্ষে মাঙ্গলিক কার্য্যে জন্য ইহারা পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে সধবা (এয়ো) আনয়ন করে, পাত্রী-পক্ষের 'জয় ভরা'র কার্য্য করিয়া থাকে। কুয়াই-তুইয়াদিগের সহিত ইহাদিগকে চন্দ্রাতপ দিয়া বিবাহবেদী সাজাইতে হয়।

৩। **কুয়াই তুইয়া**---পান সুপারি বাহক 'কুয়াই তুইয়া' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের ছয়টী প্রধান কার্য্য।

(ক) দরবারে উপাধি বিতরণকালে ফুলের মালা দেওয়া।

(খ) সিংহাসন-ঘরে প্রত্যহ ধূপধুনা দেওয়া এবং বিশেষ বিশেষ পুজোপলক্ষে রাজসিংহাসন ধৌত করা।

(গ) পূজার প্রসাদ বাঁটিয়া দেওয়া।

(ঘ) পূজার সময় মহারাজের এবং ঠাকুরপরিবারের বসিবার জন্য উপযুক্ত স্থানাদির বন্দোবস্ত করা।

(ঙ) বিবাহের সময় পাত্রে এবং পাত্রপক্ষের 'জলভরা'র কার্য্য করা।

(চ) সিউকদিগের সহিত বিবাহ-বেদী সজ্জিত করা।

৪। **দৈত্যসিং বা দুইসিং**---ইহারা রাজকীয় ধ্বজা বা নিশান বহন করিয়া থাকে। যুদ্ধ কালে শ্বেত পতাকা বহন করা ইহাদের কার্য্য। দরবারে, মিছিলে এবং পূজার সময় শ্বেত নিশান বহন করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহারা দেবতার কাঠাম তৈয়ারি করে এবং হসম ভোজনের সময় মাংস কুটিয়া থাকে।

৫। **হুজুরিয়া**, ৬। **ছিলটিয়া**---মূলতঃ একই হদার দুইটী বাজু বা সম্প্রদায়। হুজুরে অর্থাৎ ত্রিপুরেশ্বরের নিকট সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতে হয় বলিয়া ইহারা, ''হুজুরিয়া' আখ্যায় আখ্যাত হয়। ইহাদিগকে উপস্থিত মত

* ইহারা স্থানীয় ভাষায় 'কাতাল' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

† চারিদিকে বাঁশের বেড়া দিয়া ঘেরা জায়গাকে তিপরাগণ 'বিতল' বলিয়া থাকে।

বহুবিধ কার্য্য করিতে হয়। রাজপ্রাসাদ হইতে বিভিন্ন দেবালয়ে বা পূজার স্থানে বলির এবং ভোগের দ্রব্যাদি ইহারা বহন করে।

৭। **আপাইয়া**---এই শব্দের অর্থ 'মৎস্য-ক্রেতা'। ইহারা পূর্ব্বে রাজপরিবারের ব্যবহারার্থ মৎস্যাদি ক্রয় করিত। এখন ইহাদিগকে রাজবাড়ীর জ্বালানি কাঠ যোগাইতে হয়।

৮। **ছত্রতুইয়া বা ছকক-তুইয়া**---এই শব্দের অর্থ ছত্রবাহক। ইহারা রাজ-দরবারের সময় চন্দ্রবাণ, সূর্য্যবাণ, মাহী মূরত, ছত্র, আরঙ্গী প্রভৃতি সুলতানত (রাজচিহ্ন) ধারণ করিয়া থাকে।

৯। **গালিম**---ইহারা পূজক। কের, খার্চ্চি প্রভৃতি পূজায় ইহারা পৌরোহিত্য করিয়া থাকে।

১০। **সুবে নারাণ**---পূজা এবং হসম-ভোজন উপলক্ষে মৎস্য কোটা ইহাদের কার্য্য।

১১। **সেনা**---পূর্ব্বোক্ত দশটী সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কেহ অগম্যা গমন করে (অর্থাৎ মাসতুত ভগিনী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কন্যা, পিতৃব্য-কন্যা প্রভৃতিকে বিবাহ করে) তাহা হইলে তাহাকে ত্রিপুরেশ্বরের আদেশ লইয়া কুল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ অপরাধী 'সেনা' নামে অভিহিত হয়। তবে, তাহার পুত্রাদি স্বজাতিকে ভোজ দিয় পুনরায় আপনাদের দফাভুক্ত হইতে পারে। ইহারা হসম-ভোজনের সময় চুল্লি প্রস্তুত, রন্ধনের বাসনাদি ধৌত এবং ঠাকুর লোকদিগের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করে। হসম-ভোজনের আহার্য্য প্রস্তুত হইলে, ইহারা দামামা বাজাইয়া নিমন্ত্রিত লোকদিগকে আহ্বান করিয়া থাকে। সেনাগণ খার্চ্চি পূজার সময় ঢোল বাজায়।

হদার লোক ব্যতীত 'জুলাই' সম্প্রদায় দ্বারা মহারাণীগণের এবং রাজপরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের প্রয়োজনীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

রাজমালায় বর্ণিত বিশেষ বিশেষ বিবরণের সহিত শাস্ত্রবাক্যের সাদৃশ্য

(প্রথম লহর)

সপ্তদ্বীপের বিবরণ

রাজমালা প্রথম লহরে (৫ পৃষ্ঠায়) 'গ্রন্থারম্ভে' লিখিত আছে ;---

চন্দ্রবংশে মহারাজা যযাদি নৃপতি।

সপ্তদ্বীপ জিনিলেক এক রথে গতি।।"

রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব, সপ্তদ্বীপ সম্বন্ধীয় যে আখ্যায়িকা বর্ণন করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগত হইতে তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

"যাযদবভাষয়তি সুরগিরিমনুপরিক্রামন্ ভগবানাদিত্যো
বসুধাতলমর্দ্ধেনৈব প্রতপত্যর্দ্ধেনাচ্ছাদয়তি তদাহি
ভগবদুপাসনোপচিতাতি পুরুষ প্রভাবস্তদনভিন্দন্ সমজবেন
রথেন জ্যোতির্ময়েন রজনীমপি দিনং করিষ্যামীতি সপ্তকৃত্ব
স্তরণিমনুপর্য্যক্রামৎ দ্বিতীয় ইব পতঙ্গঃ। এবং কুর্ব্বাং প্রিয়ব্রতমাগত্য
চতুরাননস্তবাধিকরোহয়ং ন ভবতীতি নিবারয়ামাস।।
যে বা উহ তদ্রথচরণমেমিকৃতাঃ পরিখা তাস্তে সপ্ত সপ্ত সিন্ধব আসন্।।
যত এব কৃতাঃ সপ্তভুবোদ্বীপা জম্বূ প্লক্ষ শাল্মলি কুশ ক্রৌঞ্চ শাক পুষ্কর
সংজ্ঞ।
তেষাং পরিমাণং পূর্ব্বস্মাৎ পূর্ব্বস্মাদুত্তরোত্তরো যথা সংখ্যং
দ্বিগুণ মানেন বহিঃ সমন্তত উপকপ্তাঃ।।"

শ্রীমদ্ভাগবত---৫ম স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়, ২৯-৩২ শ্লোঃ।

মর্ম্ম ;--"মহারাজ! তাঁহার (প্রিয়ব্রতের) প্রভারে কথা কি বলিব, একদা ভগবান আদিত্য যখন সুমেরু পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিয়া লোকালোক পর্ব্বত পর্যন্ত প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহাতে ভূমণ্ডলের অর্দ্ধভাগ প্রকাশমান ও অর্দ্ধভাগ তিমিরাবৃত হইতেছিল। তখন ঐ রাজা, দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লোকালোক পর্য্যন্ত প্রকাশ করাতে ধরাতলের অর্দ্ধভাগে প্রকাশ ও অর্দ্ধভাগে অন্ধকার হইতেছে, ইহাতে ভালদেখা যাইতেছে না, অতএব ঐ বিষয়ে অসন্তুষ্ট হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি নিজ প্রভাবে রজনীকেও দিন করিব। পরে সূর্য্যের রথ তুল্য বেগশালী জ্যোতির্ম্ময় রথে আরোহণ

পূর্ব্বক দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় সাতবার সূর্য্যের পশ্চাৎদিকে ভ্রমণ করিলেন, অর্থাৎ সূর্য্যের অস্তাচলাবরোহ সময়ে প্রিয়ব্রত স্বয়ং উদয়াচলে আরোহণ করেন। হে রাজন, প্রিয়ব্রতের ঐপ্রকার আচরম অসম্ভব নহে, কারণ ভগবানের উপাসনা করাতে তাঁহার অলৌকিক প্রভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পরন্ত, যখন তিনি ঐরূপ করিতেছিলেন, সেই সময় ভগবান ব্রহ্মা তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক নিবারণ করিয়া কহিলেন, বৎস নিবৃত্ত হও, এ তোমার অধিকার নহে।

"প্রিয়ব্রতের রথচক্রদ্বারা যে সাতটী গর্ত্ত হইয়াছিল, ঐ সপ্তখাত সাত সমুদ্র হইয়াছে। সেই সপ্ত সাগর দ্বারাই পৃথিবীর সাতটী দ্বীপ রচিত হইয়াছে ; তাহাদের নাম---জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর।

"হে রাজন্, এই সকল দ্বীপের পরিমাণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব দ্বীপের বিস্তার হইতে ক্রমশঃ দ্বিগুণ, ইহারা সমুদ্রের বহির্ভাগে চারিদিকে আছে।"

এই সপ্তদ্বীপের বাহিরে এক একটী সমুদ্র আছে, সেই সমস্ত লবণ জল, ইক্ষুরস জল, সুরা জল, ঘৃত জল, দধি জল, দুগ্ধ জল এবং শুদ্ধ জল সমন্বিত ; এই সকল সমুদ্র সপ্তদ্বীপের পরিখা স্বরূপ।

বর্হিষ্মতিপতি প্রিয়ব্রত, তত্তুল্য চরিত্রবান্ সাতটী আত্মজের প্রত্যেককে পূর্বোক্ত এক একটী দ্বীপের অধিপতি করিয়া ছিলেন। সেই সপ্ত পুত্রের নাম আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব যজ্ঞবাহু, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, মেধাতিথি, ও বীতিহোত্র।

পূর্ব্ব কথিত সপ্তদ্বীপের পরিমাণফল, নামোৎপত্তির কারণ, শাসন কর্ত্তা, প্রাকৃতিক বিবরণ ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধে অনেক বিবরণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, এস্থলে তৎসমস্তের আলোচনা করা অসম্ভব।

নিজের প্রতি দেবত্বের আরোপ

মহারাজ ত্রিপুর নিতান্ত অনাচারী এবং দেবদ্বেষী হইয়াছিলেন। এমন কি, তিনি নিজকে দেবতা বলিয়া ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। রাজমালার ত্রিপুরখণ্ডে লিখিত আছে,---

(১) "আপনাকে আপনি দেবতা করে জ্ঞান।
মানা করে অন্যে যদি করে যজ্ঞ দান।"
ত্রিপুরখণ্ড---১০ পৃষ্ঠা।
(২) "অনেক বৎসর সে যে ছিল এই মতে,
দ্বাপর শেষেতে শিব আসিল দেখিতে।
আপনা হইতে সে যে না জানিল বড়।
কাল বশ হৈল রাজা না চিনে ঈশ্বর।।

তাহা দেখি কুপিত হইল পশুপতি।
সকল মঙ্গল শিব নাহি অব্যাহতি।
* * *
মারিলেক শূল অস্ত্র হৃদয় উপর।
শিব মুখ হেরি রাজা ত্যজে কলেবর।।

ত্রিপুরখণ্ড---১১ পৃষ্ঠা।

ধর্ম্মবিশ্বাস বিবর্জ্জিত মহারাজ ত্রিপুর, সর্ব্ববিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান বন্ধ এবং ধার্ম্মিকগণের প্রতি নানাবিধ উপদ্রব করিয়া রাজ্যের ও প্রকৃতি পুঞ্জের যে দুরবস্থা ঘটাইছিলেন, রাজমালার ত্রিপুরখণ্ডে তদ্বিষয়ক বিবরণ পাওয়া যাইবে।

রাজমালার মতে ত্রিপুর, মহাদেব কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। পুরাতত্ত্ব আলোচনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, সে কালে ত্রিপুর রাজ্যে শৈব সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রাধান্য ছিল ; এ বিষয় পূর্ব্বভাষে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ত্রিপুর পরলোক গমন করিবার পরেও এই রাজ্যে শৈবধর্ম্মের বিশেষ প্রাধান্য ছিল ; এ বিষয় পূর্ব্বভাষে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ত্রিপুরা পরলোক গমন করিবার পরেও এই রাজ্যে শৈবধর্ম্মের প্রাবল্য কম ছিল না। মহারাজ ত্রিলোচন, জননীর শিব আরাধনার ফলে, এবং তাঁহার বর প্রভাবে জন্মলাভ করিয়াছিলেন, রাজমালার ইহাই মত। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে মনে হয়, অধার্ম্মিক ও শিবদ্বেষী ত্রিপুর শৈব সম্প্রদায়ের হস্তে হত হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি বা যে সম্প্রদায়ই হন্তা হউক, অধর্ম্মাচরণই যে তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

সত্যযুগে অত্রিবংশ সম্ভূত প্রজাপতি অঙ্গরাজ-নন্দন পাপাত্মা বেণ রাজ্য লাভের পর যে সকল ধর্ম্মাবিগর্গিত কার্য্য করিয়াছিলেন, মহারাজ ত্রিপুরও ঠিক তদনুরূপ পাপকার্য্যানুষ্ঠানকারী হইবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এতদুভয়ের চিত্র পাশাপাশি ভাবে রাখিবার যোগ্য। বেণের চরিত্র সম্বন্ধে জানা যায় ;---

'স আরূঢ় নৃপস্থান উন্নদ্ধোহষ্ট বিভূতিভিঃ।
অবমেনে মহাভাগান্ স্তব্ধঃ সম্ভাবিতঃ স্বতঃ।
এবং মদান্ধ উৎসিক্তো নিরঙ্কুশ ইব দ্বিপঃ।
পর্য্যটন্ রথমাস্থায় কম্পয়ন্নিব রোদসীং।
ন যষ্টব্যং ন দাতব্যং ন হোতব্যং দ্বিজাঃ ক্বচিৎ।
ইতি ন্যবারয়দ্ধর্ম্মং ভেরী ঘোষেণ সর্ব্বতঃ।।"

শ্রীমদ্ভাবগত---৪র্থ স্কন্ধ, ১৪শ অঃ, ৪ শ্লোক।

মর্ম্ম ;---"বেণ রাজাসনে আরূঢ় হইয়া লোকপাল সকলের অষ্টৈশ্বর্য্য দ্বারা দিন দিন অধিকতর উদ্ধত হইতে লাগিল এবং আপনিও আপনাকে সম্ভাবিত অর্থাৎ আমিই শূর, আমিই পণ্ডিত ইত্যাদি অভিমান দ্বারা স্তব্ধ হইয়া, মহাভাগ ব্যক্তিদিগকে

অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিল। এই প্রকারে ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ ও গর্ব্বিত হইয়া নিরঙ্কুশ হস্তীর ন্যায় রথারূঢ় হইয়া সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিত, তাহার ভ্রমণে স্বর্গ মর্ত্ত্য কম্পমান হইত। অনন্তর সে সকল স্থানে ভেরী দ্বারা ঘোষণা দিয়া এই কথা বলিল, 'অহে ব্রাহ্মণসকল! সাবধান সাবধান, কখন যাগ বা হোম করিও না।'' এই প্রকারে আপনার অধিকার মধ্যে ধর্ম্ম কর্ম্ম একেবারে রহিত করিয়া দিল।''

বেণ ধর্ম্মহীন মর্য্যাদা সংস্থাপনের নিমিত্ত প্রয়াসী হইলেন, তৎফলে রাজ্যমধ্যে নানাবিধ উপদ্রব ও ধর্ম্মলোপের আশঙ্কা উপস্থিত হওয়ায়, শঙ্কান্বিত মারীচি প্রভৃতি ঋষিগণ তাহাকে ধর্ম্মকার্য্যে রত করিবার নিমিত্ত প্রিয়বচনে বিস্তর উপদেশ ও অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সুফলের আশায় তাঁহারা যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে বিষময় ফল উৎপন্ন হইল। শ্রীমদ্ভাগবতে এ বিষয় নিম্নলিখিত মত বর্ণিত হইয়াছে---

শ্রীবেণ উবাচ---

বালিশাবত যূয়ং বা অধর্ম্মে ধর্ম্মমানিনঃ।
যে বৃত্তিদং পতিং হিত্বা জারং পতিমুপাসতে।।
অবজানন্ত্যমী মূঢ়া নৃপরূপিণমীশ্বরং।
নানু বিন্দন্তি তে ভদ্রমিহলোকে পরত্র চ।।
কো যজ্ঞ পুরুষো নাম যত্র বো ভক্তিরীদৃশী।
ভর্তৃস্নেহবিদুরাণাং যথা জারে কু যোষিতাং।।
বিষ্ণুর্বিরিঞ্চো গিরিশ ইন্দ্রো বায়ুর্যমো রবিঃ।
পর্জ্জন্যোধনদঃ সোমঃ ক্ষিতিরগ্নিরপাম্পতিঃ।।
এতে চান্যে চ বিবুধাঃ প্রভবো বর শাপয়োঃ।
দেহে ভবন্তি নৃপতেঃ সর্ব্বদেবময়ো নৃপঃ।।
তস্মান্মাং কর্ম্মভির্ব্বিপ্রা যজধ্বংগতমৎসরাঃ।
বলিঞ্চ সহ্যং হরত মত্তোহন্যঃ কোহগ্রভুক্ পুমান্।
ইথং বিপর্য্যয়মতিঃ পাপীয়ানুৎপথং গতঃ।
অনুনীয়মানস্তদ্দ্ধজ্ঞাং ন চক্রে ভ্রষ্টমঙ্গলঃ।

শ্রীমদ্ভাগবত---৪র্থ স্কন্ধ, ১৪ অঃ, ১৭-২০ শ্লোক।

মর্ম্ম ;---''মুনিগণের ঐ সকল উপদেশ বচন শ্রবণ করিয়া বেণ ক্রোধে অধীর হইল এবং কহিল, অহে! তোমরা বড় মূর্খ, অধর্ম্মকে বলিয়া মানিতেছ, আমি সকলের অনাদিপ্রদ পতি, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা উপপতির তুল্য

অন্যের উপাসনা করে, তাহারা অতি মূঢ়। আমি যে নৃপরূপী ঈশ্বর, আমাকে তাহারা তদ্রূপ জানিয়া অবজ্ঞা করে, কিন্তু ঐ অপরাধে ইহলোকে বা পরলোকে কুত্রাপি তাহারা আপনাদের মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে না।

"অহে ঋণিগণ! যজ্ঞ পুরুষ কে? যেমন ভর্ত্তৃস্নেহ পরাঙ্মুখী অসতী স্ত্রী উপপতির প্রতি স্নেহবতী হয়, তাহার ন্যায় তোমরা আপনা প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া কাহার প্রতি এত ভক্তি করিতেছ? অহে! তোমরা কি জান না? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, যম, সূর্য্য, মেঘ, পৃথিবী, জল এই সকল ও অন্যান্য যে যে দেবতা বর এবং শাপ প্রদানে সমর্থ, তাঁহারা সকলেই নরপতির দেহে বর্ত্তমান, ইহাতেই রাজা সর্ব্বদেব স্বরূপ, সুতরাং তিনিই ঈশ্বর, তদ্ভিন্ন যত সকলই তাঁহার অংশমাত্র।

"হে দ্বিজগণ! আমি সেই রাজা, তোমরা মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মদ্বারা আমারই অর্চ্চনা কর এবং আমার নিমিত্ত করাদি আহরণ করহ, আমাভিন্ন আর কে আরাধ্য আছে? উৎপথগামী পাপাত্মা বেণ বিপরীত বুদ্ধি হইয়া এই প্রকার কহিলে, মুনিগণ পুনর্ব্বার বিবিধ বিনয় বাক্যে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে দুরাত্মা সমস্ত মঙ্গল হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল, অতএব মুনিদের প্রার্থনানুসারে কার্য্য করিল না।"

এই ধর্ম্ম বিগর্হিত দাম্ভিকতার ফলে মহারাজ বেণ, ঋষিগণের কোপদৃষ্টিতে পতিত এবং তাঁহাদের দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন। হরিবংশ গ্রন্থের হরিবংশ পর্ব্ব পঞ্চম অধ্যায়ে বেণ চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনারই অনুরূপ ; তজ্জন্য এস্থলে তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করা হইল না। রাজমালার সহিত আখ্যায়িকা মিলাইলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ত্রিপুর, বেণের চরিত্র অবিকল অনুকরণ করিতে যাইয়া, তাঁহার ন্যায় পাপপঙ্কে নিমজ্জিত এবং ধ্বংস মুখে পতিত হইয়াছিলেন।

দ্বাপরের শেষভাগে ত্রিপুরের সমসাময়িক, কারূষ বা পুণ্ড্র দেশের অধিপতি বসুদেবের পুত্র মহারাজ পৌণ্ড্রক "আমিই বাসুদেব" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন; এবং শ্রীকৃষ্ণের সমীপে নিম্নোক্ত বার্ত্তাসহ দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন—

"বাসুদেবোহবতীর্ণোহহমেক এব নচাপরঃ।
ভূতানামনুকম্পার্থং ত্বন্তু মিথ্যাবিধাং ত্যজ।।
যানি তমস্মচ্চিহ্নানি মৌঢ্যাদ্বিভর্ষি সাত্বত।
ত্যক্ত্বেহি মাং ত্বং শরণং নোচেদ্দেহি মমাহবং।।

শ্রীমদ্ভাগবত—১০ম স্কন্ধ, ৬৬ অঃ, ৩ শ্লোক।

মর্ম্ম ;---"ভূতানুকম্পার্থ আমি একাই বাসুদেব রূপে অবতীর্ণ হইয়াছি, অপর ব্যক্তি হয় নাই ; অতএব তুমি মিথ্যা বাসুদেব নাম পরিত্যাগ কর। হে সাত্বত ! তুমি মূঢ়ত্ব প্রযুক্ত আমার চিহ্নসকল ধারণ করিয়াছ, সে সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক আসিয়া আমার শরণাগত হও, নতুবা আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর।"

পিপীলিকার পক্ষোদগমের চরম ফলের ন্যায় মৃত্যুর নিমিত্তই মদমত্ত পৌণ্ড্রকের এবম্বিধ ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রমুখে, তাঁহার জীবনের সহিত দেবত্ব লাভের দুরাকাঙ্ক্ষা নির্ব্বাপিত হয়। হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণেও ইহার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

ভগদত্তও শ্রীকৃষ্ণের বিদ্বেষী ছিলেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং দেবতা বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায়, শৈবধর্ম্মপ্রভান্বিত পূর্ব্বভারত, প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণকে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন, পরবর্ত্তী কালে উত্তরোত্তর সেই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এস্থলে আর একটী আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইতেছে, বেণ ও ত্রিপুর যেরূপ পাপাচারী ছিলেন, বেণের পুত্র পৃথু এবং ত্রিপুরের পুত্র ত্রিলোচন তেমনি ধার্ম্মিক, প্রজারঞ্জক এবং সৎজ্ঞানান্বিত হইবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। দুঃখের দাবদাহনান্তে সুশীতল শান্তিবারি সিঞ্চন, যে বিধির বিধান---যাঁহার প্রসাদে নিবিড় অন্ধকারের আড়ালে শান্তিময় স্নিগ্ধজ্যোতিঃ বিদ্যমান---পাপের তাণ্ডবাভিনয়ের পরে পুণ্যের জ্যোতির স্ফূরণ, সেই করুণাময়েরই বিচিত্র বিধান।

বিষু সংক্রমণে শ্রাদ্ধ

ত্রিলোচন খণ্ডে, মহারাজ ত্রিলোচনের ধর্ম্ম কার্য্যানুষ্ঠান বিষয়ক আলোচনা স্থলে লিখিত আছে ;---

"বিষু-সংক্রামণে পিতৃলোক শ্রাদ্ধ করে।
ব্রাহ্মণে অন্নাদি দান প্রাতে নিরন্তরে।"
রাজমালা---৩৩ পৃষ্ঠা।

এই 'বিষু সংক্রমণ' ও বিষুব সংক্রান্তি একই কথা। শাস্ত্রে পাওয়া যায়, যে সময়ে দিনমান ও রাত্রিমান সমান হয়, অর্থাৎ চৈত্রমাসের শেষদিনে যখন সূর্য্য মীন রাশি অতিক্রম করিয়া মেষ রাশিতে, এবং আশ্বিন মাসের শেষ দিনে যে সময়

সূর্য্য কন্যা রাশি হইতে তুলা রাশিতে গমন করেন, সেই সময়কে 'বিষুব বলা হয়। প্রতিলোম ও অনুলোম গতি ধরিয়া ইহার হিসাব হইয়া থাকে। এতৎ সম্বন্ধীয় জ্যোতির্ব্বচন নিম্নে দেওয়া হইতেছে ;---

"মেষসংক্রমতঃ পূর্ব্বং পশচাৎ তারা দিনান্তরে।
প্রতিলোম্যানুলোম্যেন বিষুবারম্ভণং ভবেৎ।।
বিষুবারম্ভণং যত্র সমং মানং দিবানিশোঃ।।

শাস্ত্রানুসারে বিষুব সংক্রান্তি শ্রাদ্ধের নিমিত্ত প্রশস্ত্র। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার মতে ; ---

"অমাবস্যাষ্টকা বৃদ্ধিঃ কৃষ্ণপক্ষোহয়ন দ্বয়ম্।
দ্রব্যং ব্রাহ্মণসম্পত্তির্বিষুবৎ সূর্য্য সংক্রমঃ।।
ব্যতীপাতো গজচ্ছায়া গ্রহণং চন্দ্র সূর্য্যয়োঃ।
শ্রাদ্ধং প্রতিরুচিশ্চৈব শ্রাদ্ধকালাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।।
যাজ্ঞবল্ক সংহিতা---১ অঃ, ২১৭।১৮ শ্লোঃ।

মর্ম্ম ;---অমাবস্য, অষ্টকা, বৃদ্ধি, অপর পক্ষ, দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি, উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, কৃষ্ণসারাদি মৃগপ্রাপ্তিকাল, ব্রাহ্মণ সম্পত্তি লাভকাল, মেঘ ও তুলা সংক্রান্তি (বিষুব সংক্রান্তি), সামান্য সংক্রান্তি, ব্যতীপাতযোগ, গজচ্ছায়া (চন্দ্র মঘা নক্ষত্রে বা সূর্য্য হস্তানক্ষত্রে থাকিতে যদি ত্রয়োদশী তিথি হয়), চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ এবং যে সময় শ্রাদ্ধ করিতে বিশেষ ইচ্ছা হয়, সেই সকল কালকে শ্রাদ্ধকাল বলে।

গজ-কচ্ছপী যুদ্ধ বিবরণ

মহারাজ ত্রিলোচনের পুত্র দৃক্‌পতি ও দাক্ষিণের মধ্যে পিতৃ রাজ্য লইয়া বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, তদুপলক্ষিত সমরে বিস্তর লোকক্ষয় হইয়াছিল। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে রাজমালা বলিয়াছেন ;---

"এই মতে যুদ্ধ কৈল সর্ব্ব সহোদর।
গজ কচ্ছপের মত যুঝিল বিস্তর।।
আত্ম কলহ ভ্রাতৃ ধনের জন্য হয়।
পিতৃধন জন হেতু বহু সেনা ক্ষয়।।"

রাজমালা---দাক্ষিণ খণ্ড, ৩৬ পৃঃ।

গজ কচ্ছপের যুদ্ধের সহিত এই যুদ্ধের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। উভয় যুদ্ধই পৈতৃক সম্পত্তি লইয়া ভ্রাতাগণের মধ্যে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

গজ কচ্ছপের যুদ্ধ বিবরণ মহাভারতে লিখিত আছে ; তাহাতে জানা যায়, খগরাজ গরুড় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, স্বীয় পিতা কশ্যপের নিকট আহার্য্য প্রার্থী হওয়ায় তিনি বলিলেন ;---

"কশ্যপ উবাচ,---
"ইদংসরো মহাপুণ্যং দেবলোকেহপি বিশ্রুতম্।।
যত্র কূর্ম্মাগ্রজং হস্তী সদা কর্ষত্যবাঙ্মুখঃ।
তয়োর্জন্মান্তরে বৈরৎ সম্প্রবক্ষ্যাম্য শেষতঃ।।
তন্মে তত্ত্বং নিবোধস্ব যৎপ্রমাণৌ চ তাবুভৌ।
আসীদ্বিভাবসুর্ণাম মহর্ষিঃ কোপনো ভৃশম্।।
ভ্রাতা তস্যানুজশ্চাসীৎ সুপ্রতিকো মহাতপাঃ।
স নেচ্ছতি ধনং ভ্রাতা সহৈকস্থং মহামুনিঃ।
বিভাগং কীর্ত্তয়ত্যেব সুপ্রতীকং হি নিত্যশঃ।
অথাব্রবীচ্চতং ভ্রাতা সুপ্রতীকং বিভাবসুঃ।
বিভাগং বহবো মোহাৎ কুর্ত্তমিচ্ছন্ত নিত্যশঃ।
ততো বিভক্তাস্ত্বন্যোহন্যং বিক্রুধ্যন্তেহর্থ মোহিতাঃ।।
ততঃ স্বার্থপরান্ মূঢ়ান্ প্রথগ্ ভূতান্ স্বকৈধ নৈঃ।
বিদিত্বা ভেদয়ন্ত্যেতান মিত্রা মিত্ররূপিণঃ।।
বিদিত্বা চাপরে ভিন্নানন্তরেষু পতন্ত্যথ।
ভিন্নানামতুলো নাশঃ ক্ষিপ্রমেব প্রবর্ত্ততে।।
তস্মাদ্ বিভাগং ভ্রাতৃণাং ন প্রশংসন্তি সাধবঃ।
গুরুশাস্ত্রেহনিবদ্ধনামন্যোন্যেনাভিশঙ্কিনাম্।।
নিয়ন্তং ন হি শক্যস্ত্বং ভেদতো ধনমিচ্ছসি।
যস্মাৎ তস্মাৎ সুপ্রতীক হস্তিত্বং সমবাপ্স্যসি।।
শপ্তস্ত্বেবং সুপ্রতীকো বিভাবসুরথাব্রবীৎ।
ত্বমপ্যন্ত জলচর কচ্ছপঃ সম্ভবিষ্যসি।।
এবমন্যোন্যশাপাৎ তৌ সুপ্রতীক বিভাবসু।
গজকচ্ছপতাং প্রাপ্তাবর্থার্থং মূঢ় চেতসৌ।।
রোষ দোষানুসঙ্গেণ তির্য্যগ্‌যোনিগতাবুভৌ।
পরস্পর দ্বেষরতৌ প্রমাণ বলদর্পিতৌ।।
সরস্যস্মিন্ মহাকায়ৌ পূর্ব্ব বৈরানুসারিণৌ।
তয়োরন্যতঃ শ্রীমান্ সমুপৈতি মহাগজঃ।।

যস্য বৃংহতি শব্দেন কূর্ম্মোহপ্যন্তর্জলেশয়ঃ।
উত্থিতোহসৌ মহাকায়ঃ কৃৎস্নং বিক্ষোভয়ন্ সরঃ।।
যং দৃষ্ট্বা বেষ্টিত করঃ পততোষ গজো জলম্।
দন্ত হস্তাগ্রলাঙ্গুল পাদ বেগেন বীর্য্যবান্।।
বিক্ষোভয়ং স্ততো নাগঃ সরো বহু ঝষাকুলম্।
কূর্ম্মোহপ্যভ্যুদ্যতশিরা যুদ্ধায়াভ্যেতিবীর্য্যবান্।।
ষড়ুচ্ছ্রিতো যে জনানি গজস্তাদ্দ্বিগুণায়তঃ।
কূর্ম্মস্ত্রিযোজনোৎসেধো দশ যোজন মণ্ডলঃ।।
তাবুভৌ যুদ্ধ সম্মত্তো পরস্পর বধৈষিনৌ।
উপযুজ্যাশু কর্ম্মেদং সাধয়েহিত মাত্মনঃ।।
মহাভ্রমনসঙ্কাশং তং ভুক্ত্বামৃতমানয়।
মহাগিরি সমপ্রখ্যং ঘোররূপঞ্চ হস্তিনম্।।"

মহাভারত---আদিপর্ব্ব, ২৯ অঃ, ১৩-৩২ শ্লোক।

মর্ম্ম ;---"মহর্ষি কশ্যপ কহিলেন, বৎস্য! অনতিদূরে ঐ পবিত্র সরোবরটী দেখিতেছ, উহা দেবলোকেও বিখ্যাত। ঐ স্থলে দেখিতে পাইবে, এক হস্তী অবাঙ্মুখ হইয়া কূর্ম্মরূপী স্বকীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরকে আকর্ষণ করিতেছে। উহাদিগের আকারের পরিমাণ ও জন্মান্তরীণ বৈরবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"বিভাবসু নামে অতি কোপনস্বভাব এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর মহাতপাঃ সুপ্রতীক, ভ্রাতার সহিত একান্তে থাকিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, এই নিমিত্ত তিনি আপনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট সর্ব্বদা পৈত্রিক ধন বিভাগের কথা উত্থাপন করিতেন। একদা বিভাবসু ক্রুদ্ধ হইয়া সুপ্রতীককে কহিলেন, দেখ অনেকেই মোহপরবশ হইয়া পৈত্রিক ধন বিভাগ করিতে অভিলাষ করে ; কিন্তু বিভাগান্তর ধনমদে মত্ত হইয়া পরস্পর বিরোধ আরম্ভ করে। স্বার্থপর মূঢ়ব্যক্তিরা স্বীয়ধন অধিকার করিলে শত্রুপক্ষ মিত্রভাবে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের আত্মবিচ্ছেদ জন্মাইয়া দেয় এবং ক্রমশঃ দোষ দর্শাইয়া পরস্পরের রোষবৃদ্ধি ও বৈরভাব বদ্ধমূল করিতে থাকে। এইরূপ হইলে তাহাদিগের সর্ব্বদাই সর্ব্বনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই কারণে ভ্রাতৃগণের ধন বিভাগ সাধুদিগের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু তুমি নিতান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় ঐ কথাই বারংবার উত্থাপন করিয়া থাক। আমি বারণ করিলেও তাহাতে কর্ণপাত কর না ; অতএব তুমি বারণ-যোনি প্রাপ্ত হও, সুপ্রতীক এইরূপে শাপগ্রস্ত হইয়া বিভাবসুকে কহিলেন, তুমি কচ্ছপের যোনি প্রাপ্ত হও।

"এইরূপে সুপ্রতীক ও বিভাবসু পরস্পরের শাপ প্রভাবে গজত্ব ও কচ্ছপত্ব প্রাপ্ত

হইয়াছেন। এইক্ষণে তাঁহারা রোষদোষে তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত, পরস্পর বিদ্বেষ রত এবং শরীরের গুরুত্ব ও বলদর্পে একান্ত দর্পিত হইয়া জন্মান্তরীণ বৈরানুসারে এই সরোবরে অবস্থান করিতেছেন। ঐ দেখ, গজের বৃংহিত শব্দে মহাকায় কচ্ছপ সরোবর আলোড়িত করিয়া জল মধ্য হইতে সত্বর উত্থিত হইতেছে। গজ তাহাকে দেখিতে পাইয়া অতি প্রকাণ্ড শুণ্ডদণ্ড আস্ফালন পূর্ব্বক জলে অবগাহন করিতেছে। উহার শুণ্ডদণ্ড, লাঙ্গুল ও পাদ চতুষ্টয়ের তাড়নে সরোবর বিক্ষোভিত হইতেছে। অতিপরাক্রান্ত কূর্ম্মও মস্তক উন্নত করিয়া যুদ্ধার্থ অভ্যাগত হইতেছে। গজের কলেবর ছয়যোজন উন্নত ও দ্বাদশ যোজন আয়ত। কূর্ম্ম তিন যোজন উন্নত ও তাহার পরিধি দশ যোজন। হে বৎস! উহারা পরস্পরের বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধে মত্ত হইতেছে, উহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ কর।"

এইরূপে গরুড়ের উদরস্থ হওয়ায়, গজ কচ্ছপের বিবাদ নিবারিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালের হস্তী ও কচ্ছপের পরস্পর আকার বৈষম্য দর্শনে এই যুদ্ধ অসম্ভব মনে হইতে পারে, কিন্তু সেকালের কচ্ছপ, বর্ত্তমানকালের হস্তী অপেক্ষা ছোট ছিল না। হিমালয়ের সন্নিহিত শিবালিক পাহাড়ে প্রাপ্ত প্রস্তরীভূত কচ্ছপের কঙ্কাল যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন, সেই কঙ্কাল বৃহদাকারের হস্তী অপেক্ষা কোন অংশেই ছোট নহে।

যদুবংশ ধ্বংসের বিবরণ

রাজমালায় দাক্ষিণ খণ্ডে পাওয়া যায়,---মহারাজ দাক্ষিণের সৈন্যগণ সুরামত্ত অবস্থায় পরস্পর কাটাকাটি করিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এতৎসম্বন্ধীয় রাজমালার উক্তি এই ;---

"মদ্য মাংসে রত সব গোয়ার প্রকৃতি।
তৃণপ্রায় দেখে তারা গজ মত্ত মতি।।
ত্রিপুরার কূলে পুনঃ বহু বীর হৈল।
মদ্যপান করি সবে কলহ করিল।।
তুমুল হইল যুদ্ধ ঘোর পরস্পর।
তাহা নিবারিতে নাহি পারে নৃপবর।।

আত্মকূল কলহেতে মহাযুদ্ধ ছিল।
পড়িল অনেক বীর রক্তে নদী হৈল।।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে বড় অহঙ্কার।
অস্ত্রাঘাতে পড়ে যত নাহি সীমা তার।।
* * *
যদুবংশ ক্ষয় যেন মুহূর্ত্তেকে হৈল।
চিন্তায়ে বিকল রাজা সর্ব্বসৈন্য মৈল।।"

দাক্ষিণখণ্ড---৩৭।৩৮ পৃঃ।

যদুবংশ ধ্বংসের সহিত এই সৈন্যক্ষয়ের বিশেষ সাদৃশ্য আছে বলিয়াই উপমাস্থলে যদুবংশের নামোল্লেখ হইয়াছে। যদুকুল নির্ম্মূলের বিবরণ মহাভারতে যাহা পাওয়া যায় তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;---

বৈশম্পায়ন উবাচ,---
"বিশ্বামিত্রং চ কণ্বং চ নারদং চ তপোধনম্।
সারণ প্রমুখা বীরা দদৃশুর্দ্বারকাং গতাংন্।।
তে তান্ সাম্বং পুরস্কৃত্য ভূষয়িত্বা স্ত্রিয়ং যথা।
অব্রুবন্নুপসঙ্গম্য দৈবদণ্ড নিপীড়িত।।
ইয়ং স্ত্রী পুত্রকামস্য বভ্রোরমিততেজসঃ।
ঋষয়ঃ সাধু জানীত কিমিয়ং জনয়িষ্যতি
ইত্যুক্তাস্তে তদা রাজন্ বিপ্রলম্ভ প্রধর্ষিতাঃ।
প্রত্যব্রুবংস্তান্ মুনয়ো যত্তচ্ছৃনু নরাধিপ।।
বৃষ্ণ্যন্ধক বিনাশায় মূষলং ঘোরমায়সম্।
বাসু দেবস্য দায়াদঃ সাম্বোহয়ং জনয়িষ্যতি।।
যেন যূয়ং সুদুবৃত্তা নৃশংসা জাতমন্যবঃ।
উচ্ছেত্তারঃ কুলং কৃৎস্নমৃতে রাম জনার্দ্দনৌ।।"

মহাভারত---মৌশল পর্ব্ব, ১ম অঃ, ১৫-২০ শ্লোকঃ।

মর্ম্ম ;---"বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও তপোধন নারদ দ্বারকানগরে গমন করেন। সারণ প্রভৃতি কতিপয় মহাবীর তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ শাম্বকে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া তাঁহাদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! ইনি অমিতপরাক্রম বভ্রুর পত্নী। মহাত্মা বভ্রু পুত্রলাভে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছেন। অতএব আপনারা বলুন, ইনি কি প্রসব করিবেন।

"সারণ প্রভৃতি বীরগণ এই কথা কহিলে সেই সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ আপনাদিগকে

প্রতারিত বিবেচনা করিয়া রোষ ভরে তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দুর্বৃত্তগণ! এই বাসুদেব তনয় শাম্ব, বৃষ্ণিও অন্ধকবংশ বিনাশের নিমিত্ত ঘোরতর লৌহময় মূষল প্রসব করিবে। ঐ মূষল প্রভাবে মহাত্মা বলদেব ও জনার্দ্দন ভিন্ন যদুবংশের আর সকলেই এক কালে উৎসন্ন হইবে।”

এই অমোঘ ব্রহ্মশাপই যদুবংশ ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল। যাদবগণ এই অভিসম্পাতের প্রভাব হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। শাম্ব মূষল প্রসব করিবার পর তাহা রাজপুরুষগণ দ্বারা চূর্ণিত ও সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল। এবং মদিরাসক্ত যাদবদিগকে সতত সতর্ক রাখিবার অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণের অনুজ্ঞায় তাহাদের মধ্যে সুরা প্রস্তুত ও ব্যবহার বন্ধ হইল, কিন্তু তাহা অধিককাল স্থায়ী হইল না; কিয়দ্দিবস পরে তাহারা এত উচ্ছৃঙ্খল হইলেন, যে, ভগবান বাসুদেবের সম্মুনে সুরাপান করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশমতে সপরিবারে প্রভাস তীর্থে গমন করিলেন। তথায় সুরামত্ত সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মার মধ্যে কলহ হওয়ায়, সেই কলহ ক্রমে গুরুতর হইয়া যুদ্ধের সূচনা করিল। মদিরাবিভোর ভোজ ও অন্ধকগণ মত্ততা হেতু সকলেই এক একটী পক্ষ অবলম্বন করিলেন---উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইল। এই যুদ্ধে ;---

“বহুত্বান্নিহতৌ তত্র উভৌ কৃষ্ণস্য পশ্যতঃ।
হতং দৃষ্ট্বা তু শৈনেয়ং পুত্রং চ যদুনন্দনঃ।।
এরকাণাং তদা মুষ্টিং কোপাজ্জগ্রাহ কেশবঃ।
তদভুস্মূষলং ঘোরং বজ্রকল্পময়োময়ম্।।
জঘান কৃষ্ণস্তাং স্তেন যে যে প্রমুখতোহভবন্।।
ততোহন্ধকাশ্চ ভোজাশ্চ শৈনেয়া বৃষ্ণয়স্তথা।
জঘ্নুরন্যোন্যমাক্রন্দে মূষলৈঃ, কাল চোদিতাঃ।।
যস্ত্যেষামেরকাং কশ্চির্জ্জগ্রাহ কুপিতো নৃপ।।
ব্রজ ভুতেন সা রাজন্নদৃশ্যত তদা বিভো।
তৃণং চ মুষলীভূতমপি তত্রব্যদৃশ্যত।।
ব্রহ্মদণ্ড কৃতং সর্ব্বমিতি তদ্বিদ্ধি পার্থিব।
অবিধ্যান্ বিধ্যতে রাজন্ প্রক্ষিপন্তিস্ম যত্তৃণম্।।
তদ্বজ্রভূতং মুষলং ব্যদৃশ্যত তদা দৃঢ়ম।।
অবধীৎ পিতরং পুত্রঃ পিতাপুত্রং চ ভারত।। ইত্যাদি।।

মহাভারত---মৌশল পর্ব্ব, ৩য় অঃ, ৩৫-৪১ শ্লোক।

রণক্ষেত্রে কবন্ধ দর্শন

মূলগ্রন্থের ৫৮ পৃষ্ঠায়, গৌড়েশ্বরের সহিত মহারাজ ছেংথুম্ফা-এর যুদ্ধ বিবরণে লিখিত হইয়াছে ;—

"দুইদণ্ড বেলা উদয় হৈল মহারণ।
একদণ্ড বেলা থাকে সন্ধ্যা ততক্ষণ।।
এমত সময় রাজার উর্দ্ধে দৃষ্টি হৈল।
দেখিল গগনে এক কবন্ধে নাচিল।।
তাহা দেখিয়া সৈন্যেরা রোমাঞ্চিত হয়।
একদণ্ড নাচি মুণ্ড ভূমিতে পড়য়।।
রামকৃষ্ণ নারায়ণ নৃপতি স্মরিল।
রামায়ণ প্রমাণ যে রাজায়ে বলিল।।
একলক্ষ নর যদি যুদ্ধ করি মরে।
তবে সে কবন্ধ নাচে গগন উপরে।।" ইত্যাদি।

কোন কোন রামায়ণে, রণক্ষেত্রে কবন্ধ দর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু রাজমালার উক্তির সহিত কিঞ্চিৎ মতবৈষম্য আছে। এই গ্রন্থের মতে, একলক্ষ সৈন্যক্ষয় হইলে রণক্ষেত্রে কবন্ধ দেখা যায়। সাধক কবি, মহাত্মা তুলসী দাস বলিয়াছেন, দশকোটি সৈন্য বিনাশের ফলে, একটী কবন্ধ সমর প্রাঙ্গণে নৃত্য করে। তাঁহার উক্তি এই ;—

"মরে কোটিদশ পয়দর যবহি।
নাচত এক কবন্ধ রণ তবহি।।
নৃত করতঃ যব কোটি কবন্ধা।
তব এক খেচর উঠত নিবন্ধা।।
খেচর কোটি নাচহি নিহ কণ্টা।
তব এক ধনুকর বাজত ঘণ্টা।।" ইত্যাদি

তুলসীদাসের রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

অদ্ভুত রামায়ণে পাওয়া যায়, উগ্রচণ্ডা রূপিনী সীতা রণাঙ্গণে সহস্রস্কন্ধ রাবণকে বধ করিয়া, তাহার মুণ্ড লইয়া মাতৃকাগণের সহিত কন্দুক ক্রীড়ায় প্রবৃত্তা

হইয়াছিলেন। সেই সময়,---

ন কোহপি রাক্ষসস্তত্র করপাদ শিরোযুতঃ।
কবন্ধা যে চ নৃত্যন্তি তেষাং পাদা প্রতিষ্ঠিতাঃ।।
কবন্ধং রাবণস্যাপি নৃত্যন্তং চ ব্যলোকয়ৎ।
তদ্দৃষ্ট্বা সুমহাঘোরং প্রেতরাজপুরোপমম্।।"

অদ্ভুত রামায়ণ---২৪শ সর্গ, ৩৫।৩৬ শ্লোক।

মণ্ডল

রাজমালা প্রথম লহরের মূলাংশে শিববাক্যে পাওয়া যাইতেছে,---

"এই যে মণ্ডলে তুমি মহারাজা হৈলা।
জিনিবা সকল রাজা আমা বর পাইলা।"

ত্রিলোচন খণ্ড---৩২ পৃষ্ঠা।

'মণ্ডল' শব্দটি সংস্কৃত ভাষা সম্ভূত এবং বহুপ্রাচীন। বৈদিক গ্রন্থাদিতেও এই শব্দের উল্লেখ থাকা দৃষ্ট হয়।

প্রাচীনকালে স্থানের বিস্তৃতি জ্ঞাপক ভুক্তি, মণ্ডল ও খণ্ডল প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত ছিল। 'মণ্ডলের বিস্তৃতি' ভুক্তি অপেক্ষা ছোট এবং খণ্ডল অপেক্ষা বড় ছিল। 'মণ্ডল' নামক বিভাগ সেকালে দ্বাদশ রাজক নামেও অভিহিত হইত, যথা---

"সান্মণ্ডলে দ্বাদশ রাজকে চ।
দেশে চ বিম্বে চ কদম্বকে চ।।"

মণ্ডলের বিবরণ মনুসংহিতায়, অমর টীকায় এবং মেদিনী কোষে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ইহার বিস্তৃতি সম্বন্ধে লিখিত আছে,---

"চতুর্যোজন পর্য্যন্তমধিকারং নৃপস্য চ।
যো রাজা তচ্ছতগুণঃ স এব মণ্ডলেশ্বর।।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ---৮৬ অধ্যায়।

উদ্ধৃত শ্লোকে মণ্ডলের পরিমাণ ফলের সহিত মণ্ডলেশ্বরের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। অভিদানে 'মণ্ডলেশ', "মণ্ডলেশ্বর" ও 'মণ্ডলাধিপতি' প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। মণ্ডলেশ্বরগণ বিশেষ সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী থাকিবারও অনেক পরিচয় আছে। তাহার একটী নিম্নে প্রদান করা গেল।

"উপতেঃ কোষ দণ্ডাভ্যাং সামাত্যঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
দুর্গস্থশ্চিন্তয়েৎ সাধু মণ্ডলং মণ্ডলাধিপঃ।।"

কামন্দকীয় নীতিসার (৮।১।১)

এই শ্লোকে পাওয়া যাইতেছে, মণ্ডলাধিপতির কোষ, দণ্ড, অমাত্য, মন্ত্রী ও দুর্গাদি সহায় ছিল। সুতরাং এতদ্দ্বারা মণ্ডলাধিপের শাসনতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ থাকিবার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বোধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের বাক্য দ্বারা জানা যায়, নৃপ বা রাজোপাধিধারী ব্যক্তিগণ অপেক্ষা মণ্ডলেশ্বর অধিকার শতগুণ অধিক ছিল। তাঁহারা 'পরমেশ্বর' 'পরমভট্টারক' 'রাজাধিরাজের (সম্রাটের) সামন্ত ছিলেন। এবং সেকালে তাঁহাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি অসাধারণ ছিল।

কেহ কেহ বলেন, 'মণ্ডলেশ্বর' রাজচক্রবর্ত্তীর (সম্রাটের) উপাধি। শব্দকল্পদ্রুমেরও ইহাই মত ; উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে---'সম্রাট---যে মণ্ডলেশ্বরঃ। যো মণ্ডলস্য ... দ্বাদশ রাজ মণ্ডলস্য ঈশ্বরঃ।" প্রাচীন বিবরণ আলোচনায় ইহাই বুঝা যায়, চারি যোজন পরিমিত স্থানের অধিপতিগণ নৃপ বা রাজা, বারজন রাজার অধিপতিগণ মণ্ডলেশ্বর বা মণ্ডল এবং বারজন মণ্ডলেশ্বরের অধিপতি ব্যক্তি, রাজচক্রবর্ত্তী, রাজাধিরাজ বা সম্রাট পদবাচ্য হইতেন। মণ্ডলেশ্বরগণ, সম্রাটের সামন্ত মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। ইঁহারা ভূমির অধিপতি ছিলেন বলিয়া 'ভৌমিক' উপাধি লাভ করিতেন। 'ভৌমিক' শব্দ কালক্রমে 'ভুঁইয়া' হইয়াছে। দ্বাদশ ভৌমিক বা বার ভূঁইয়া উপাধি, মণ্ডলেশ্বর উপাধির পরিবর্ত্তে প্রচলিত হইয়াছিল।

শাসন সৌকর্য্যার্থ এই প্রণালী পাশচাত্য দেশেও গৃহীত হইয়াছিল। গ্রীসের ইতিহাসে ডোডেকো পোলিস' বা দ্বাদশ বিভাগ সংক্রান্ত বিবরণ পাওয়া যায়। মধ্যযুগে ইউরোপে 'ফিউডেল্-প্রথা (Feudal System) প্রবর্ত্তিত ছিল। এই সকল প্রথা যে ভারতীয় শাসন প্রণালীর অনুসরণে হইয়াছে, তাহা অতি সহজবোধ্য।

ত্রিপুরা স্বাধীন রাজ্য হইলেও রাজমালা রচয়িতা সেকালের প্রথানুসরণে 'মণ্ডল' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, ইহাকে সঙ্গত ব্যবহার বলা যাইতে পারে না। সম্ভবতঃ ভারত সম্রাটের অধীন রাজা মনে করিয়াই 'মণ্ডল' শব্দটি ব্যবহার করা হইয়া থাকিবে।

বঙ্গদেশে অদ্যাপি 'মণ্ডল' শব্দের প্রচলন আছে। তবে দ্বাদশ ভৌমিক হইতে উৎপন্ন 'ভুঁইয়া' শব্দ যেমন বর্ত্তমানকালে, ভদ্রলোক মাত্রেরই সম্মানসূচক উপাধি মধ্যে দাঁড়াইয়াছে, তদ্রূপ নিম্ন সমাজে, গ্রামের প্রধান ব্যক্তিগণ 'মণ্ডল' পদবী লাভ করিয়া থাকে। কালপ্রভাবে দেশ ও সমাজের অবনতির সঙ্গে সম্মানসূচক উপাধিগুলিও অবনত স্থান বা পাত্র আশ্রয় করে।

দেবতার দর্শনলাভ

প্রথম লহরে মহারাজ ত্রিলোচন কর্ত্তৃক চতুর্দ্দশ দেবতার অর্চ্চনার কথা বর্ণনা উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে ;---

"শিব আজ্ঞা অনুসারে চন্তাই নৃপতি।
ক্ষীরোদের তীরে গেল অতি শীঘ্রগতি।।
যথাতে আছয়ে বিষ্ণু গোলোক বিহারী।
অনন্তের শয্যাপরে বসিছেন হরি।।

* * *

চন্তাই রাজাকে দ্বারে রাখি গেল আগে।
শিব আজ্ঞা অনুসারে কহিবার লাগে।।
চন্তাই আসিছি প্রভু রাজা রহে দ্বারে।
বার্ষিক পূজন নাথ পূজিবার তরে।।
শুনিয়া হাসিল প্রভু ত্রিভুবন পতি।"---ইত্যাদি

ত্রিলোচন খণ্ড---২৯ পৃষ্ঠা।

অন্যত্র মৈছিলি রাজোপাখ্যানে পাওয়া যায়,---

"আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে।
পূজাগৃহে গেল রাজা চন্তাই সহিতে।।
চতুর্দ্দশ দেবতাকে প্রত্যক্ষ দেখিল।
যার যেই নিজাসনে বসি পূজা লৈল।।
বর মাগিলেন রাজা পুত্রের কারণে।
না হইব তব পুত্র কহে ত্রিলোচনে।।
ক্রোধ হৈল নরপতি মৃত্যু না জানিল।
মারিল শিবেরে তীর পায়েতে পড়িল।

* * *

তাহা শুনি শিবে কহে চন্তাইর প্রতি।
কলিযুগে যত লোক হৈব পাপমতি।।
দেখা নাহি দিব আমি পূজার সময়।
পদচিহ্ন পাইবেক যে সবে পূজয়।।"
তৈদাক্ষিণ খণ্ড---৪৫ পৃষ্ঠা।

উদ্ধৃত বাক্যাবলী আলোচনায় জানা যায়, সেকালে মনুষ্যগণ দেবতার দর্শন

লাভ এবং দেবতাগণের সহিত বাক্যলাপ করিবার অধিকারী ছিলেন। রাজমালা রচয়িতার এই উক্তি আপন উদ্ভাবিত নহে---ইহা শাস্ত্রসম্মত কথা। মহর্ষি নারদ দেবলোকে গমন করিতেন, দেবতাগণের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন, অনেক সময় অনেক সংবাদ প্রদান দ্বারা দেবতাদিগকে তুষ্ট বা রুষ্ট করিতেন, এরূপ উক্তি অনেক শাস্ত্র গ্রন্থেই পাওয়া যায়। কেবল নারদ কেন---সেকালে সকল মহাপুরুষের নিমিত্তই দেবলোকের দ্বার অবারিত ছিল, একথার দৃষ্টান্তেরও অসদ্ভাব নাই। দেবার্চ্চন কালে দেবতার দর্শনলাভ ও বর প্রার্থনার কথাও শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে অনেক আছে। পরবর্ত্তী কালেষ ধর্ম্ম-ভাবে শৈথিল্যের সঙ্গে সঙ্গে দেবতার দর্শনলাভ মানব সমাজের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে।

উদ্ধৃত বাক্যে পাওয়া যায়, রাজাকে দ্বারে রাখিয়া চন্তাই বিষ্ণুর মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। স্কন্দ পুরাণে বিষ্ণু খণ্ডের ২৩শ অধ্যায়ে ঠিক এতদনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে। তাহাতে লিখিত আছে, তপোবন নারদ মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে লইয়া ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তিনি রাজাকে দ্বারে রাখিয়া ব্রহ্মার আলয়ে প্রবেশ করেন।

কলিযুগে দেবতার দর্শনলাভ হইবে না, মহাদেবের এই বাক্য রাজমালায় লিখিত হইয়াছে। স্কন্ধপুরাণে ইহার অনুরূপ বাক্য পাওয়া যায়। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বালুকারাশি দ্বারা দেবতাগণ বিকল ইন্দ্রিয় হইয়া ভগবানের দর্শনলাভের নিমিত্ত স্তব করায়, প্রত্যাদেশ হইয়াছিল---

> "অশরীরা তদাবাণী পুনঃ প্রাদুর্বভূবহ।১৭
>
> অত্র্যর্থে ভোঃ সুরা যত্নং কর্ত্তুমর্হত মা বৃথা।
>
> অদ্য প্রভৃতি দেবস্য দর্শনং দুর্লভং ভুবি।।১৮
>
> তত্র স্থানেহপিতং নত্বা তদ্দর্শন ফলং লভেৎ।
>
> স্বয়ম্ভুবোহন্তিকং গত্বা হেতুং জ্ঞাস্যথ নিশ্চিত্‌ম।।১৯

স্কন্দপুরাণ---বিষুঃখণ্ড, ৯ম অধঃ।

মর্ম্ম ;---সহসা আকাশবাণী হইল, ভগবান পুনরাবির্ভূত হইবেন। হে সুরগণ, এজন্য আর বৃথা যত্ন করিও না। অদ্যাবধি পৃথিবীতে ভগবদ্দর্শন দুর্লভ হইল। এই ক্ষেত্রে তাঁহাকে প্রণাম করিলে, তাঁহার দর্শনের ফল প্রাপ্ত হইবে। এই ঘটবার কারণ ব্রহ্মার নিকট যাইয়া নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হও।

এই সকল উক্তি দ্বারা অনেকে ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাসে তিনটী যুগের কল্পনা করিয়া থাকেন। প্রথমযুগ---অন্ধকার মিশ্র আলোকের যুগ, এই সময় মনুষ্যগণ দেবতার দেখা পায়, তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলে। ইহাকে বলা হয়, অতি

অস্পষ্ট ঐতিহাসিক স্মৃতির সঙ্গে কল্পনা বিজড়িত যুগ। দ্বিতীয় যুগ––ঐতিহাসিক স্মৃতি কথঞ্চিৎ স্পষ্ট, তথাপি কল্পনা প্রবণ। এইযুগে দেবতার দর্শনলাভ না ঘটিলেও আকাশবাণী ইত্যাদি দ্বারা প্রত্যাদেশ পাওয়া যায়। তৃতীয় যুগ––ঐতিহাসিক ঘটনার যুগ, এই যুগের ইতিহাসে দেবতার সহিত সম্পর্ক নাই, দৃশ্যমান জগতের ঘটনাবলী লইয়াই তাহা গঠিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে।

কেহ কেহ আবার ইতিহাসকে চারিটী স্তরে বিভক্ত করেন। তাঁহাদের মতে প্রথমস্তর উপাখ্যানমূলক, এইস্তরের আগাগোড়া অমূলক উপকথায় পূর্ণ। দ্বিতীয় স্তরকে তাঁহারা উপকথা মিশ্রিত ঐতিহাসিক যুগ বলেন, এই স্তরে সম সাময়িক কীর্ত্তি কাহিনীর সহিত কল্পনা বিজড়িত আছে। তৃতীয় স্তর ঐতিহাসিক যুগ বটে, কিন্তু তাহাতে অনেক অসত্য কথা মিশ্রিত হইয়াছে এবং অনেকাংশে একদেশদর্শিতা দোষ দুষ্ট। তাঁহাদের মতে চতুর্থস্তরই অর্থাৎ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা সমর্থিত যে বিবরণ অধুনা সংগ্রহ করা যাইতেছে, তাহাই প্রকৃত ইতিহাস।

এইমত সর্ব্ববাদীসম্মত হইতে পারে কি? ইতিহাস কালের সাক্ষী। কাল-বিবর্ত্তনে, আজ যাহা সম্ভব, সহস্র বৎসর পরে তাহা অসম্ভব হইবে। এজন্য কি বর্ত্তমান কালের ঘটনা বা বিবরণগুলিকে কাল্পনিক মনে করিয়া সহস্র বৎসরান্তে ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে পুঁছিয়া ফেলিতে হইবে? যদি তাহাই করিতে হয়, তবে প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহ করা কোন কালেই সম্ভবপর হইবে না। অবশ্য প্রাচীন ইতিহাসে রূপক বর্ণনা অনেক আছে, কাল্পনিক কথা মোটেই নাই, তাহাও সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে না। কিন্তু এই কারণে প্রাচীন ইতিহাসকে সমূলে উৎপাটিত করিতে যাওয়া সঙ্গত হইবে না। যে যুগকে প্রকৃত ঐতিহাসিক যুগ বলা হইতেছে, সেই যুগের প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মধ্যেও অনেকে কৃত্রিম সনন্দ বা স্বরচিত তাম্রশাসন ব্যবহারের অপবাদ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। প্রাচীন কালের লোকগণ কল্পনাপ্রিয় হইতে পারেন, কিন্তু সেই কল্পনাও সত্যের সংশ্রব বিবর্জ্জিত ছিল না, ধীরভাবে আলোচনা করিলে ইহাই প্রমাণিত হইবে।

রাজমালা প্রথম লহরে উল্লিখিত স্থান সমূহের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(বর্ণমালানুক্রমিক)

অবন্তিকা ;---(৭ পৃষ্ঠা---৮ম পংক্তি)। উজ্জয়িনী নগরী। ইহা অবন্তি বা শিপ্রা নদীর তীরে অবস্থিত। কালিদাস উজ্জয়িনীর বর্ণনা উপলক্ষে বলিয়াছেন,--- ''শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব'' ইত্যাদি। মৎস্য পুরাণের মতে এইস্থানে মঙ্গলগ্রহের জন্ম হইয়াছিল। পুরাকালে এই স্থানে কালিকা দেবীর ও মহাকালের মন্দির ছিল। শক্তি সঙ্গম তন্ত্রে পাওয়া যায় ;---

''তাম্রপর্ণীং সমাসাদ্য শৈলার্দ্ধশিখরোর্দ্ধতঃ।
অবন্তী সংজ্ঞকো দেশো কালিকা তত্র তিষ্ঠতি।।''

কালিদাস মেঘদূতে মহাকালের বিবরণ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। স্কন্দ পুরাণের মতে অবন্তিকা নগরী মোক্ষদায়িকা। যথা ;---

''অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরীদ্বারাবতীচৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা।।''

রাজমালায়, মোক্ষদায়িকা বলিয়াই অন্যান্য পুণ্যভূমির সহিত অবন্তিকার নামোল্লেখ করা হইয়াছে।

অমরপুর ;---(৫২ পৃষ্ঠা---১৭ পংক্তি)। ইহা উদয়পুরের পূর্ব্বদিকে, গোমতী নদীর দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত। প্রাচীন কালে এইস্থানে ত্রিপুরার রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান সময়ে এই স্থান ত্রিপুর রাজ্যের একটী উপবিভাগ মধ্যে পরিগণিত। এখানে দেওয়ানী, ফৌজদারী ও কালেক্টরী ইত্যাদি আফিস, থানা, তহশীল কাছারী, সেনানিবাস ও ডাকঘর স্থাপিত আছে। মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসন কালে খনিত সুবিশাল 'অমর সাগর' নামক দীর্ঘিকা এখানকার একটী প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি। এই দীঘির পূর্ব্বপাড়ে রাজবাড়ী ছিল। অমরমাণিক্যের নামানুসারে স্থানের নাম 'অমরপুর' হইয়াছে।

অযোধ্যা---(৭ পৃঃ-৮ পংক্তি)। এই নগরী সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত। এইস্থানে সূর্য্যবংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। এই পুণ্য ভূমির কীর্ত্তি কণিকা লইয়াই মহাকবি বাল্মিকী প্রসিদ্ধ। এখানে রাম-লীলার অনেক মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। স্কন্ধ পুরাণের মতে এইস্থান মোক্ষদায়িনী। ইতিপূর্ব্বে 'অবন্তিকা' শব্দের বিবরণ লিপি উপলক্ষে যে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা

আলোচনায় জানা যাইবে, মোক্ষদায়িকা সপ্ত-তীর্থের মধ্যে অযোধ্যাও একটী। এইস্থান মোক্ষ প্রদায়িনী বলিয়াই রাজমালায় ইহার নামোল্লেখ হইয়াছে।

আগরতলা ;---(৬২ পৃঃ-১৪ পংক্তি)। এই নগরী ত্রিপুরার বর্ত্তমান রাজধানী। হাওড়া নদীর তীরে এ, বি, রেলওয়ের আখাউড়া ষ্টেশন হইতে পূর্ব্ব দিকে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

'আগরতলা' নাম সম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচলিত আচে। কেহ বলে, এখানে বিস্তর আগর (অগুরু) বৃক্ষ ছিল বলিয়া স্থানের নাম 'আগরতলা' হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে আগর মাহামুদ নামক জনৈক মুসলমানের নামানুসারে এই স্থানের নাম 'আগরতলা' হইয়াছিল। রাজমালা আলোচনায় জানা যায়, মহারাজ ডাঙ্গর ফা স্বীয় সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে রাজ্য বিভক্ত করিবার সময় আগর ফা নামক পুত্রকে এই স্থান প্রদান করিয়াছিলেন।* অনেকের মতে, আগর ফা-এর নামানুসারে এইস্থান আগরতলা নামে আখ্যাত হইয়াছে। আমরা শেষোক্ত মতই অধিকতর সমর্থন যোগ্য বলিয়া মনে করি।

আগরতলা পুরাতন হাবেলী ও নূতন হাবেলী, এই দুইভাগে বিভক্ত। নূতন হাবেলী পূর্ব্বদিকে দুইক্রোশ দূরে পুরাতন হাবেলী অবস্থিত। মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের শাসনকালে নূতন হাবেলীতে রাজপাট স্থানান্তরিত করিবার সূত্রপাত হয় ; এবং তাঁহার পরবর্ত্তীকালে ক্রমশঃ নূতন হাবেলীই রাজধানীতে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে পুরাতন হাবেলীতে চতুর্দ্দশ দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং রাজপরিবারস্থ কতিপয় ব্যক্তি তথায় বাস করিতেছেন।

আগর ফা-এর সময়ে আগরতলায় রাজবাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল কি না, তদ্বিষয়ে নির্ভর যোগ্য কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাড়ী নির্ম্মিত হইয়া থাকিলেও তৎকালে আগরতলার ভাগ্যে রাজধানীর প্রতিষ্ঠান জনিত গৌরব অধিককাল ঘটিয়াছিল না। মহারাজ ডাঙ্গর ফা পুত্রগণের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিয়া দেওয়ার অল্পকাল পরেই, তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র রত্নমাণিক্য পিতাকে সিংহাসনচ্যুত ও ভ্রাতাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া, সমস্ত রাজ্যে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার রাজধানী উদয়পুরেই ছিল। অতঃপর মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য আগরতলায় রাজপাট সংস্থাপন করিয়াছিলেন; 'কৃষ্ণমালা' গ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"তারপরে রাজ গেল, আগরতলায়।
বসতি কারণে পুরী করিল তথায়।।"

---

* "আগর ফা পুত্রে রাজা আগরতলা দিল।"
ডাঙ্গর ফা খণ্ড, ...৬১ পৃষ্ঠা।

এই পুরী নির্ম্মাণের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্যন্ত কিঞ্চিদধিক দেড়শতাব্দী যাবত এই স্থানে ত্রিপুরার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত আছে।

আচরঙ্গ ;---(৬২ পৃঃ-৬ পংক্তি)। ত্রিপুর রাজ্যের প্রথম পত্তনকালে এই আচরঙ্গ, রাজ্যের দক্ষিণ সীমা বলিয়া নির্দ্ধারিত ছিল। রাজমালায় রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশক যে উক্তি আছে, তাহা আলোচনায় জানা যায় ;---"উত্তরে তৈরঙ্গ নদী দক্ষিণে আচরঙ্গ।"

রাজমালায় পাওয়া যায় আচরঙ্গ ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী রাঙ্গামাটির (উদয়পুরের) পূর্ব্ব উত্তর কোণে অবস্থিত ;—

"উদয়পুর পূর্ব্ব উত্তর কোণে আচরঙ্গ।
ত্রিপুর রাজার থানা জানে সর্ব্ববঙ্গ।।"

কল্যাণমাণিক্য খণ্ড।

মহারাজ যশোধরমাণিক্যের শাসনকালে উদয়পুর রাজধানী মোগল কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবার পরে, রণজিৎ নামক জনৈক ত্রিপুর সেনাপতি আচরঙ্গে যাইয়া আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি কিয়ৎকাল তথায় রাজত্ব করিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ পিতৃ আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

মহারাজ কল্যাণমাণিক্য এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, লক্ষ্মীনারায়ণকে ধৃত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। রাজপুত্র গোবিন্দ নারায়ণ সসৈন্যে যাইয়া লক্ষ্মীনারায়ণকে ধৃত করিয়া, তাঁহাকে সমস্ত সম্পত্তি সহ রাজধানীতে আনিয়াছিলেন। এতৎ সম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে ;---

"উদয়পুর যখন মগলে লইল।
রণজিৎ সেনাপতি আচরঙ্গে গেল।।
আচরঙ্গে গিয়া সে যে নরপতি হৈল।
নিজ বাহুবলে সেই প্রজাকে শাসিল।।
সেই স্থানে থাকিয়া যে রাজ্য-ভোগ করে।
আচরঙ্গ রঞ্জিতের * মৃত্যু হৈল পরে।।
তার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ হৈল নরপতি।
রাজা হৈয়া রাজ্যশাসে সেই মহামতি।।
এই মত কতদিন ছিল সেই স্থানে।।
কল্যাণমাণিক্য রাজা দূতমুখে শুনে।।
রাজা বলে আমা রাজ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ।
রাজ্যাস্পদ করে সে যে আমা বিড়ম্বন।।
এমত বলিয়া রাজা মন্ত্রীতে আদেশ।
ধরিয়া আনিতে তাকে আচরঙ্গদেশ†।।

---

* এস্থলে 'রণজিৎ'কে 'রঞ্জিত' বলা হইয়াছে।
† আচরঙ্গ দেশ—আচরঙ্গ দেশ হইতে।

রাজার প্রধান পুত্র গোবিন্দ নারায়ণ।
তাকে সম্বোধিয়া নৃপ বলিল তখন।।
রণজিৎ পুত্র হয় লক্ষ্মী নারায়ণ।
সসৈন্যে ধরিয়া তাকে আনহ আপন।।
* * *
সর্ব্বসৈন্য গিয়া তথা চৌদিকে বেষ্টন।
সৈন্যসমে * ধরা গেল লক্ষ্মীনারায়ণ।।
কল্যাণ মাণিক্য খণ্ড।

আচরঙ্গ উদয়পুরের উত্তর পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। উদয়পুরের পূর্ব্বদিকস্থ গোমতী নদীর উৎপত্তি স্থানের (ডম্বুরের) পূর্ব্বভাগে মাইনি। এই মাইনি পর্ব্বতের পূর্ব্বপার্শ্বে একটী উপত্যকা আছে, তাহার পূর্ব্বভাগে আচরঙ্গ নদী, ইহাকে সাধারণতঃ আচলঙ্গ বলা হয়। এই নদী চট্টগ্রাম জেলাস্থ কর্ণফুলী নদীতে পতিত হইয়াছে। এই নদীর তীরবর্ত্তী পর্ব্বত আচরঙ্গ (আচলঙ্গ) নামে অভিহিত। স্থানটি বহু দূরবর্ত্তী, এবং সেকালে অতিশয় দুর্গম ছিল। ত্রিপুর বাহিনীর অভিযান বর্ণন উপলক্ষে রাজমালা বলেন ;—

'গিরি নদী গুহা পথ, লঙ্ঘিয়া যে মহাসত্ত,
পথ করে পর্ব্বত কাটিয়া।
উচ্চ নীচ পথ করি, লঙ্ঘিয়া বহুল গিরি,
থরে থরে সৈন্যের গমন।
সর্ব্বসৈন্য আনন্দিত, কিছু মাত্র নাহি ভীত,
রাজ সৈন্য চলিয়াছে রূপে।
এক মাস এই মতে, যাইতে হইল পথে,
আচরঙ্গ গিয়া উত্তরিল।
কল্যাণ মাণিক্য খণ্ড।

গিরিবর্ত্ম দুরধিগম্য বলিয়া সাধারণতঃ তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে কিছু অধিক সময় লাগিয়া থাকে। কিন্তু যে স্থানে যাইতে রাস্তায় একমাস অতিবাহিত হয়, সেই স্থান যে নিকটবর্ত্তী নহে, একথা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

পরলোকগত কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহাশয়, তাঁহার সংগৃহীত রাজমালায় রাজ্যের সীমা সম্বন্ধীয় যে পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা এই রূপ ;—

"উত্তরে তৈরঙ্গ নদী দক্ষিণে রসাঙ্গ।"

এই 'রসাঙ্গ' শব্দদ্বারা কৈলাস বাবু রাজ্যের দক্ষিণ সীমা আরাকান স্থির করিয়াছেন। কোথা হইতে এই পাঠ উদ্ধার করা হইয়াছে জানি না, কিন্তু ইহা

---

* সৈন্যসমে—সৈন্যসহিত।

ভ্রমসঙ্কুল। আরাকান, পরবর্ত্তী কোন কোন সময় ত্রিপুরার হস্তগত হইয়া থাকিলেও প্রথমাবস্থায় রাজ্যের দক্ষিণ সীমা রাঙ্গামাটী (উদয়পুর) পর্য্যন্তও বিস্তৃত ছিল না। রাজমালা আলোচনায় জানা যাইবে, মহারাজ ত্রিলোচন রাঙ্গামাটী অধিকার করিয়া থাকিলেও তাহা পুনর্ব্বার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। মহারাজ হিমতি (নামান্তর যুঝারু ফা) রাঙ্গামাটীর পরবর্ত্তী বিজেতা। এরূপ অবস্থায় আরাকান পর্য্যন্ত রাজ্যের সীমা কল্পনা করা অপেক্ষা, রাঙ্গামাটীর (উদয়পুরের) সন্নিহিত আচরঙ্গকে দক্ষিণ সীমা বলিয়া নির্দ্ধারণ করাই সঙ্গত এবং বিশুদ্ধ হইবে, নতুবা রাজমালার উক্তি উপেক্ষা করা হয় এবং তদ্দরুণ ইতিহাসও ক্ষুণ্ণ হইবে।

মহারাজ ডাঙ্গর ফা সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিয়া দেওয়ার কালে, এক পুত্রকে আচরঙ্গে রাজা করিয়াছিলেন। * এই স্থান কোন পুত্রকে দিয়াছিলেন, রাজমালায় তাহার উল্লেখ নাই।

আর্য্যবর্ত্ত ;---(৭ পৃষ্ঠা - ৪ পংক্তি) সাধারণঃ হিমাচল ও বিন্ধ্যগিরির মধ্যবর্ত্তী ভূ-ভাগ আর্য্যবর্ত্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মেধাতিথি ও কল্লুকভট্ট প্রভৃতি মনুসংহিতার ভাষ্যকার এবং টীকাকারগণের ইহাই মত। মেধাতিথি বলিয়াছেন ;---

"পর্ব্বতয়োর্হিমদ্বিন্ধ্যয়োর্যদন্তরং মধ্যংস আর্য্যাবর্ত্তো দেশো বুধৈঃ শিষ্টৈরূচ্যতে।" (মেধাতিথি ভাষা ২।২২)। আভিধানিক অমরও এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

মনুর ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ আর্য্যাবর্ত্তের যে সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহা উপরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা মনুর যে বচনের বিবৃতি দিয়াছেন, সেই বচনটা এই ;---

"আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধা।"

মর্ম্ম ;---"পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত, উত্তর ও দক্ষিণে গিরি ; ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে পণ্ডিতেরা আর্য্যাবর্ত্ত বলেন।"

এই বাক্যদ্বারা হিমগিরি ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্ত্তী, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানকে আর্য্যাবর্ত্ত বলা হইয়াছে।

উৎকল ;---(৭ পৃঃ - ৯ পংক্তি)। পুরুষোত্তম ক্ষেত্র উৎকলের দক্ষিণ পূর্ব্ব ভাগে পুরী জেলায়, সমুদ্র তীরবর্ত্তী জগন্নাথ ক্ষেত্র ভারত বিখ্যাত হিন্দুতীর্থ। সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুই এই তীর্থকে পুণ্যপ্রদ বলিয়া মনে করে। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি এই তীর্থকে বৌদ্ধ ধর্ম্মমূলক বলিয়া

---

* "আর পুত্র রাজা হৈল আচরঙ্গ যত্র।"
ডাঙ্গরফা খণ্ড।

ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ;

(১) জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রামূর্ত্তি বৌদ্ধধর্ম্ম যন্ত্রের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছে।

(২) বুদ্ধের রথযাত্রার অনুকরণে জগন্নাথের রথযাত্রার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

(৩) শ্রীক্ষেত্রে জাতিবিচার নাই, বৌদ্ধধর্ম্ম-সঙ্গত কার্য্য।

(৪) দশাবতারের চিত্রে বুদ্ধস্থানে জগন্নাথ মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া থাকে।

এক সম্প্রদায় আবার ইহার কোন কথাই স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন ;—

(১) প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থ সমূহে দারু-ব্রহ্ম মূর্ত্তির উল্লেখ আছে, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপনের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ। সুতরাং জগন্নাথ মূর্ত্তির সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্ম-যন্ত্রের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই।

(২) রথযাত্রাও বৌদ্ধগণের অনুকরণে প্রবর্ত্তিত বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন না। বুদ্ধের অনেক পূর্ব্বে, জগন্নাথ ব্যতীত অনেক হিন্দু দেবদেবীর রথাযাত্রার বিবরণ পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের রথে গমন করিয়াছিলেন, ইহা বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বের ঘটনা। এতদ্দ্বারাও উক্তমত সমর্থিত হইতেছে।

(৩) শ্রীক্ষেত্রে জাতিবিচার নাই, একথা তাঁহারা স্বীকার করেন না। কেবল মহাপ্রসাদ গ্রহণ কালে জাতিবিচার করা হয় না। এতদ্ব্যতীত তথায় জাতিভেদ চিরদিনই চলিয়া আসিয়াছে। পুণ্যক্ষেত্রে মহাপ্রসাদ গ্রহণ পক্ষে জাতি বিচার পরিত্যাগ করিবার প্রথা আধুনিক বলিয়া তাঁহারা বলেন।

(৪) দশাবতারের চিত্রে বুদ্ধদেব স্থলে জগন্নাথের মূর্ত্তি অঙ্কনও আধুনিক চিত্রকরের কার্য্য বলিয়া তাঁহারা ইহাও অগ্রাহ্য করেন।

এস্থলে উপরিউক্ত বিষয় সমূহের আলোচনা করা অসম্ভব এবং অনাবশ্যক। শ্রীক্ষেত্র হিন্দুগণের তীর্থ বলিয়াই শাস্ত্রমত ও জনমত দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহার বিরুদ্ধ উক্তি লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে না।

কাইচরঙ্গ ;---(৬২ পৃঃ - ৬ পংক্তি)। সাধারণতঃ ইহাকে কাচলং বলে। পূর্ব্ব কথিত আচলঙ্গ নদীর সন্নিহিত কাছলঙ্গ ছড়ার তীরে, বর্ত্তমান পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুর রাজ্যস্থিত সাবরুম বিভাগের সীমান্ত প্রদেশে এই স্থান অবস্থিত।

কাইফেঙ্গ ;---(৩২ পৃঃ - ১৫ পংক্তি)। ইহা কুকি প্রদেশের (লুসাই পর্ব্বতের) সন্নিহিত স্থান। এখানে 'কাইফেঙ্গ' সম্প্রদায়ের কুকিগণের আবাস স্থান ছিল।

কামাখ্যা ;---(৪৭ পৃঃ - ৮ পংক্তি)। ইহা কামরূপের একটী প্রধান নগর,

ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। 'কামাখ্যা' নাম সম্বন্ধে কালিকা পুরাণে লিখিত আছে ;---

"ভগবান উবাচ---
কামার্থমাগতা যস্মান্ময়া সার্দ্ধং মহাগিরৌ।
কামাখ্যা প্রোচ্যতে দেবী নীলকূটে রহোগতা।।
কামদা কামিনী কামা কান্তা কামাঙ্গদায়িনী।
কামাঙ্গ নাশিনী যস্মাৎ কামাখ্যা তেন চোচ্যতে।।"

মর্ম্ম ;---"ভগবান বলিতেছেন, এই মহাদেবী অভিলাষ পূরণের জন্য আমার সহিত নীলকূটে আগমন করায় 'কামাখ্যা' নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি কামদা, কামিনী, কামা, কান্তা, কামাঙ্গদায়িনী ও কামাঙ্গ নাশিনী হওয়ায়, 'কামাখ্যা' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।'

কামাখ্যা একটী পীঠস্থান, এইস্থানে দেবীর যোনিমণ্ডল পতিত হইয়াছিল। এইস্থানের দেবী কামাখ্যা এবং ভৈরব উমানন্দ। গরুড় পুরাণে লিখিত আছে ;---

"কামরূপং মহাতীর্থং কামাখ্যা তত্র তিষ্ঠতি।"
গরুড় পুরাণ---(৮৯।১৬)

মহীরঙ্গ নামক জনৈক দানব এই স্থানের প্রাচীন রাজা বলিয়া আসাম-বুরুঞ্জিতে লিখিত আছে। মহীরঙ্গের পর তদ্বংশীয় নরকাসুর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, কালিকাপুরাণের ৩৬শ হইতে ৪০শ অধ্যায়ে এতদ্বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। কথিত আছে,---নরকাসুর আসুরিক দর্পে উন্মত্ত হইয়া ভগবতী কামাখ্যাকে বিবাহ করিতে চাহেন, দেবীর চাতুরী জালে, অসুরের সেই মনোরথ ব্যর্থ হইয়াছিল। নরকাসুর কর্ত্তৃক প্রথমতঃ কামাখ্যা দেবীর মন্দির নির্ম্মিত হয়।

নরকাসুরের পুত্র ভগদত্ত স্বনাম প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। মহাভারতে একাধিক বার ইঁহার নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

দানব বংশের পরে, এই স্থানে ক্রমান্বয়ে ব্রহ্মপুত্র বংশীয় ব্রাহ্মণগণ, নারায়ণ দেব বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ, পালবংশীয়গণ, কামাতাপুরের রাজবংশ ও কোচবংশ রাজত্ব করিয়াছেন। সময় সময় এই স্থান ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইবার বিবরণও পাওয়া যায়। ইন্দ্রবংশীয়---আহোন জাতি এই স্থানে কিয়ৎকাল রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। মুসলমানগণও মধ্যে মধ্যে এই প্রদেশ আক্রমণ ও হস্তগত করিয়াছিলেন। পরিশেষে ইংরেজের হস্তগত হইয়াছে। এতদ্দেশে উপর্য্যুপরি যে সকল রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছে, এস্থলে তাহার বিবরণ দেওয়া অসম্ভব।

কাশী ;--- (৭ পৃঃ - ৮ পংক্তি)। ইহা ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান হিন্দুতীর্থ ;

ভাগীরথী তীরে অবস্থিত। 'কাশী' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে শিব পুরাণে লিখিত আছে ;---

"কর্ম্মণাং কর্ষণাৎ সা বৈ কাশীতি পরিকথ্যতে।"

জ্ঞানসংহিতা---(৪৯।৪৬)

মর্ম্ম ;---"এখানে জীবগণ শুভাশুভ কর্ম্ম সমুদয় ক্ষয় করিয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হয়, এই হেতু ইহার নাম কাশী।

স্কন্দ পুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডের মতে,---

"কাশতেহত্র যতো জ্যোতিস্তদনাখ্যেয়মীশ্বর।

অতো নামাপরং চাস্ত কাশীতি প্রথিতঃ বিভো।।" ২৬।৬৭।

মর্ম্ম ;---"সেই বাক্যের অগোচর পরম জ্যোতিঃ এই ক্ষেত্রে প্রকাশমান হয় বলিয়া ইহা কাশী নামে বিখ্যাত হউক।"

বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের মতে আয়ু বংশীয় সুহোত্র-নন্দন কাশ কাশীর প্রথম রাজা। তৎপুত্র কাশীরাজ বা কাশ্য। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই কাশীরাজের নামানুসারে তদীয় রাজ্য 'কাশী' নামে প্রখ্যাত হইয়াছে। এই মতান্তরের মীমাংসা করা সহজ সাধ্য নহে।

কাশী হিন্দুর তীর্থস্থান হইলেও বৌদ্ধ যুগে এই পুণ্যভূমির প্রতি আধিপত্য বিস্তারের বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে, বারাণসীর পার্শ্ববর্ত্তী সারনাথই ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। মুসলমান কর্ত্তৃকও এই তীর্থভূমি অনেক রকমে উৎপীড়িত হইয়াছে। কিন্তু কোন কালেই ইহার গৌরবের লাঘব হয় নাই। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে চীন পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং যখন বারাণসী ধামে আগমন করেন, তৎকালে সেই স্থানে শতাধিক দেবমন্দির ও প্রায় দশ সহস্র দেবোপাসক দর্শন করিয়াছিলেন। এই সময় তথায় বৌদ্ধ সংখ্যা তিন হাজারের বেশী ছিল।

হিন্দুশাস্ত্রমতে কাশী অপেক্ষা পবিত্র তীর্থ জগতে নাই। মৎস্য পুরাণে এই মুক্তিধামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লিখিত আছে ;---

"ইদং গুহ্যতমং ক্ষেত্রং সদা বারানসী মম।

সর্ব্বোষামেব ভূতানাং হেতুর্মোক্ষস্য সর্ব্বদা।।" ১৮০।৪৭।

মর্ম্ম ;---"আমার এই বারাণসীক্ষেত্র সর্ব্বদাই গুহ্যতম, ইহা নিয়তই সমস্ত জীবগণের মোক্ষ লাভের হেতু।"

এতদ্ব্যতীত শিবপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ প্রভৃতিতে এবং কাশীখণ্ডে কাশীমাহাত্ম্য সম্বন্ধীয় অনেক কথা পাওয়া যায়।

এই স্থানের দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বর প্রধান দেবতা। অন্নবিধায়িনী জগন্মাতা অন্নপূর্ণা দয়ার দর্ব্বা হস্তে লইয়া, দীন-দুঃখীদিগকে অন্ন বিতরণ করিতেছেন। কাশীর

অন্নসত্রদ্বারা সমাজের বিস্তর উপকার হইতেছে। এখানকার পঞ্চক্রোশ পরিমিত স্থান পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত। কাশীখণ্ডে পাওয়া যায় ;—

"অবিমুক্তান্মহাক্ষেত্রাদ্বিশ্বেশ সমধিষ্ঠিতাৎ।
ন চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্রম্যমিহ ব্রহ্মাণ্ডগোলোকে।।
ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ন ভবেৎ পঞ্চক্রোশ প্রমাণতঃ।।
যথা যথা হি বর্দ্ধেত জলমেকার্ণবস্য চ।
তথা তথোন্নয়েদীশস্তৎক্ষেত্রং প্রলয়াদপি।।
ক্ষেত্রমেতত্রিশূলাগ্রে শূলিনস্তিষ্ঠতি দ্বিজ।
অন্তরীক্ষে ন ভূমিষ্ঠং নৈক্ষন্তে মূঢ়বুদ্ধয়ঃ।।'

কাশীখণ্ড---২২ অঃ, ৮২-৮৫ শ্লোক।

মর্ম্ম ;---"যেখানে বিশ্বেশ্বর বাস করেন, সেই মহাক্ষেত্র অবিমুক্ত * অপেক্ষা মনোরম ও মঙ্গলদায়ক বস্তু এই ব্রহ্মাণ্ড গোলোক মধ্যে কোথাও নাই। এই স্থান পঞ্চক্রোশ পরিমিত। প্রলয়কালে একার্ণবের জল যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়, মহাদেব সেই পরিমাণে এই ক্ষেত্র উন্নমিত করিয়া উচ্চে তুলিয়া থাকেন। দ্বিজবর! এই ক্ষেত্র শূলধারী মহাদেবের ত্রিশূলের অগ্রভাগে অবস্থিত। ইহা আকাশে ও ভূমিতে অবস্থিত নয়, মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাহা বুঝিতে পারে না।"

কাশীরাজ্য প্রথমতঃ আয়ুবংশীয় হিন্দু নৃপতিগণ কর্ত্তৃক শাসিত হয় এই সময়ে হৈহয়গণ বারম্বার কাশী আক্রমণ ও রাজাকে বধ করায়, কাশীশ্বর দিবোদাস কর্ত্তৃক গঙ্গার উত্তর ও গোমতীর দক্ষিণকূলে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। কোন কোন পুরাণের মতে, দিবোদাসের পূর্ব্বে হৈহয়গণ কাশীরাজ্যে অধিকার করিয়াছিলেন, পরে দিবোদাস হৈহয় বংশীয় রাজা ভদ্রশ্রেন্যকে বিনাশ করিয়া পিতৃরাজ্য অধিকার করেন। পুনর্ব্বার দিবোদাসকে পরাভূত করিয়া হৈহয়গণ আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন হৈহয়দিগকে দূরীভূত করিয়া পুনর্ব্বার পৈত্রিক রাজ্য অধিকার করেন। এইরূপ ওতপ্রোতভাবে বারাণসী ক্ষেত্রে বারম্বার রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিবার প্রমাণ পাওয়া যায়।

---

* কাশীধান অবিমুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। লিঙ্গ পুরাণে লিখিত আছে ;—

"বিমুক্তং ন ময়া যস্মান্মোক্ষতে বা কদাচন।
মম ক্ষেত্রমিদং তস্মাদবিমুক্তমিতি স্মৃতম্।।" ৯২।১৫

মর্ম্ম ;—"এই স্থান আমাকর্ত্তৃক কদাচ বিমুক্ত নয় অর্থাৎ আমি কখনও পরিত্যাগ করি নাই বা করিব না। এই নিমিত্ত উহা অবিমুক্ত নামে বিখ্যাত।"

ইহার পর ক্রমান্বয়ে প্রদ্যোৎবংশীয়, গুপ্তবংশীয় ও পালবংশীয় রাজাগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইবার পর, এই রাজ্য মুসলমানগণের হস্তগত হয়।

মুসলমান শাসনকালে (ঔরঙ্গজিবের সময়) বারাণসী নাম পরিবর্ত্তন করিয়া স্থানের নাম 'মহম্মদাবাদ' করা হয়। দিল্লীশ্বর মহাম্মদশাহ হিন্দুর পবিত্রতীর্থকে হিন্দুরাজার অধীনে রাজা সঙ্গত মনে করিয়া, বারাণসীর পাঁচক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত গঙ্গাপুর নিবাসী মনসারাম নামক জমিদারকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন, এবং তাঁহার হস্তেই শাসনভার অর্পণ করেন। কিন্তু মহাম্মদশাহের পরলোক গমনের পর হইতেই কাশীরাজের প্রতি আক্রমণ আরম্ভ হইল. অনেক ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া মুসলমান শাসনকাল অতিক্রম করিবার পর ইংরেজ শাসনকালে (ওয়ারেণ হেষ্টিংস এর সময়) কাশীরাজ্য জমিদারীতে পরিণত হয়। দীর্ঘকাল পরে পুনর্ব্বার অল্পদিন হইল ইহাকে দেশীয় রাজ্যে পরিণত করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেন্ট সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

কাশীধাম বিদ্যা ও জ্ঞান চর্চ্চার কেন্দ্রস্থল। জ্ঞান পিপাসুগণের দেখিবার অনেক জিনিস এখানে আছে ; তন্মধ্যে অম্বর পতি মানসিংহের প্রতিষ্ঠিত মানমন্দির উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি। কাশী একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। শিল্পের নিমিত্তও এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বানারসের রেশমী কাপড়, শাল, বানারসী শাড়ী ও খেলনা ইত্যাদি বস্তুর খ্যাতি জগৎব্যাপী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গঙ্গার পরপারে 'ব্যাসকাশী' বিদ্যমান। উক্ত স্থানের বিবরণ এস্থলে দেওয়া অনাবশ্যক।

কিরাতদেশ ;--- (৫ পৃঃ -১৭ পংক্তি)। কিরাত দেশের অবস্থান নির্ণয় সম্বন্ধীয় আলোচনা ইতি পূর্ব্বে করা হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। বিষ্ণু পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ও বামণ পুরাণ প্রভৃতির মতে কিরাত দেশ ভারতের পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত। মহাভারতের সভাপর্ব্ব, ৫২ অধ্যায়ের বর্ণন দ্বারাও উপরি উক্ত পুরাণ সমূহের মতই সমর্থিত হইতেছে। ব্রহ্মদেশ ও কম্বোজ হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি আলোচনায় জানা যায়, তত্তৎ প্রদেশস্থ আদিম অধিবাসী পাৰ্ব্বত্য জাতিদিগকে 'কিরাত' বলা হইয়াছে। এতদ্বারা অনুমিত হয়, এককালে হিমালয়ের পূর্ব্বভাগস্থ স্থান এবং বর্ত্তমান ভূটান, আসামের পূর্ব্বাংশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, ব্রহ্মদেশ এবং চীনসমুদ্রের তীরবর্ত্তী কম্বোজ পর্য্যন্ত স্থান কিরাত ভূমি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইত। বর্ত্তমান কালেও নেপালের পূর্ব্বাংশ হইতে আসাম, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পাৰ্ব্বত্য প্রদেশে কিরাতগণ বাস করিতেছে।

কুরুক্ষেত্র ;---(৭ পৃঃ -১০ পংক্তি)। ইহা হিন্দুগণের একটী তীর্থস্থান। কুরুক্ষেত্র নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মহাভারতে লিখিত আছে ;---

"পুরা চ রাজর্ষিবরেণ ধীমতা, বহূনি বর্ষাণ্যমিতেন তেজসা।
প্রকৃষ্টমেতৎ কুরুণা মহাত্মনা, ততঃ কুরুক্ষেত্রমিতীহ পপ্রথে।"

মর্ম্ম ;---পুরাকালে কুরু নামক রাজর্ষি এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ইহার 'কুরুক্ষেত্র' নাম হইয়াছে।

কুরু কর্ত্তৃক ভূমি কর্ষণের কারণ, মহাভারত শল্যপর্ব্বের ৫৩ অধ্যায়ে নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"মহর্ষি কহিলেন, পূর্ব্বকালে কুরুরাজ এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "রাজন্! তুমি কি অভিপ্রায়ে অতি যত্নে এই ভূমি কর্ষণ করিতেছ?" কুরুরাজ বলিলেন, "হে পুরন্দর! যে সকল ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে কলেবর ত্যাগ করিবে, তাহারা অনায়াসে স্বর্গলোকে গমন করিতে পারিবে ; আমার ভূমি কর্ষণের ইহাই উদ্দেশ্য।" সুররাজ তাঁহাকে উপহাস করিয়া চলিয়া গেলেন। কুরুরাজ ইন্দ্রের উপহাসে অনুমাত্রও দুঃখিত না হইয়া একান্ত মনে ভূমি কর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সুররাজ ভূপতির দৃঢ়তর অধ্যবসায় দর্শনে ভীত হইয়া, দেবগণের নিকট রাজর্ষির বাসনা জানাইলেন। পরে তিনি দেবগণের বাক্যানুসারে কুরুরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "রাজর্ষে! আর তোমার কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই, যাহারা এই স্থানে আলস্যশূন্য হইয়া অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে, অথবা যুদ্ধে নিহত হইবে, তাহারা নিশ্চয়ই স্বর্গগমন করিবে।" কুরুরাজ ইন্দ্রের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া ক্ষান্ত হইলেন, সুরপতিও সুরলোকে চলিয়া গেলেন।"

কুরুক্ষেত্র নামটি সুপ্রাচীন। ঋগ্বেদীয় ঐতরের ব্রাহ্মণ, শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণ, কাত্যায়ন শ্রৌম সূত্র, পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয়-আরণ্যক প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে কুরুক্ষেত্রের নামোল্লেখ আছে। ইহার অপর নাম সমস্ত পঞ্চক। মহাভারতে পাওয়া যায়,---

"প্রজাপতেরুত্তরবেদিরুচ্যতে সনাতনী রাম সমন্ত-পঞ্চকম্।
সমীজিরে যত্র পুরা দিবৌকসো বরেণ সত্রেণ মহাবরপ্রদাঃ।।"

শল্যপর্ব্ব,---৫৩।১।

মর্ম্ম ;---"হে রাম! সমন্ত-পঞ্চক ব্রহ্মার উত্তর বেদী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যেখানে পূর্ব্বে মহাবর-প্রদ দেবগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।"

শতপথ ব্রাহ্মণ এবং জাবালোপনিষদেও এই স্থানকে দেবতাগণের যজ্ঞভূমি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মহাভারত কুরুক্ষেত্রের সীমা নিম্নোক্তরূপ পাওয়া যায় ;---

"উত্তরেণ দৃষদ্বত্যা দক্ষিণেন সরস্বতীম্।
যে বসন্তি কুরুক্ষেত্র তে বসন্তি ত্রিপিষ্টপে।।"

ব্রহ্মাবেদী কুরুক্ষেত্রং পুণ্যং ব্রহ্মর্ষি সেবিতম্।
তরন্তুকারন্তু কয়োর্যদন্তরং রামহ্রদানাঞ্চ নচক্রুকস্য চ।।
এতৎ কুরুক্ষেত্র সমন্ত পঞ্চকং।"

বনপর্ব্ব---৮৩।২০৫, ২০৮।

মর্ম্ম ;---"দৃষদ্বতীর উত্তরে ও সরস্বতী নদীর দক্ষিণে পুণ্যপ্রদ ব্রহ্মর্ষি সেবিত ব্রহ্মবেদী কুরুক্ষেত্র। যে কুরুক্ষেত্রে বাস করে, সে স্বর্গলোকে বাস করে। তরন্তুক, অরন্তুক, রামহ্রদ ও মচক্রুক এই সমুদয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানই কুরুক্ষেত্র সমন্ত-পঞ্চক।"

কুরুক্ষেত্র 'ধর্ম্মক্ষেত্র' নামেও অভিহিত হইয়াছে * ইহার পরিমাণ ফল দ্বাদশ যোজন বা ৪৮ ক্রোশ। যথা ;---

"ধর্ম্মক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং দ্বাদশযোজনাবধি।"

হেমচন্দ্র---৪।১৬।।

কুরু পাণ্ডবের সুবিখ্যাত ভারত যুদ্ধ এই স্থানে সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে ;---

'তপত্যাং সূর্য্যকন্যায়াং কুরুক্ষেত্রপতিঃ কুরুঃ।।"

ভাগবত---৯।২২।৪।

অর্থাৎ---সূর্য্যতনয়া তপতীর গর্ব্তে (সম্বরণের ঔরসে) কুরু নামে যে রাজা জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই প্রথম কুরুক্ষেত্রপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তৎপর সম্ভবতঃ এইস্থান তদ্বংশীয় রাজগণের শাসনাধীনই ছিল। ভারত যুদ্ধের পরে এই স্থান পাণ্ডবগণের করতলস্থ হয়। চন্দ্রবংশীয় রাজগণের পরে ইহা কাহার হস্তগত হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। এই স্থান কিয়ৎকাল মগধ রাজগণের শাসনাধীন থাকিয়া পরে কান্যকুব্জের হিন্দু নরপতিগণের অধিকার ভুক্ত হয়। অতঃপর মামুদ গজনী থানেশ্বর আক্রমণ ও কুরুক্ষেত্রের 'চক্রস্বামী' নামক বিষ্ণুমূর্ত্তির ধ্বংস সাধন করেন। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ একবার মুসলমানগণের হস্ত হইতে কুরুক্ষেত্রের উদ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পতনের সঙ্গে সঙ্গে পুনর্ব্বার মুসলমানগণের কুক্ষিগত হয়। এই সময় মুসলমানগণ হিন্দুর অনেক তীর্থ লোপ ও অনেক দেবালয় বিধ্বস্ত করিয়াছেন। হিন্দু বিদ্বেষী ঔরংজেব তীর্থ যাত্রীদিগকে গুলি করিয়া বধ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। শিখদিগের অভ্যুদয়ে এই অত্যাচার দমিত হইয়াছিল।

---

* শ্রীমদ্ভগবদগীতার প্রথম পংক্তিতেই লিখিত আছে ;---
"ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যযুৎসবঃ।"

কোঁচ ;---(২০ পৃঃ - ৮ পংক্তি)। প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের মানচিত্র আলোচনায় জানা যায়, উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত স্থানে জলপাইগুড়ির দক্ষিণভাগে কোঁচগণের বসতি ছিল। এই স্থান হেড়ম্ব রাজ্যের প্রত্যন্ত দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কোঁচগণ সময় সময় হেড়ম্ব রাজ্য আক্রমণ করিত। রাজমালায় হেড়ম্ব পতির এইরূপ উক্তি বর্ণিত আছে ;---

"ম্লেচ্ছ কোচ আদি সবে রাজ্য আসি লৈল।
বৃদ্ধ সময় আমার বিঘ্ন উপজিল।।"

ত্রিলোচন খণ্ড---২০ পৃঃ

যোগিনী তন্ত্রে কোঁচদিগকে 'কুবাচ' বলা হইয়াছে এবং তাহাদের দ্বারা কামরূপ রাজ্য বিজিত হইবে, ইহারও উল্লেখ আছে। যথা ;---

"সৌমারৈশ্চ কুবাচৈশ্চ যবনৈর্যুদ্ধমুল্বণম্।
ভবিষ্যতি কামপৃষ্ঠে বহুসৈন্য সমাকুলম্।।
ততো রণে চ সৌমারং জিত্বা যবন-ঈপ্সিতম্।
বর্ষমেবাকরোদ্রাজ্যং মকারাদি মহীপতিঃ।।
তৎ সহায়ং সমাসাদ্য কুবাচঃ স্বীয় রাজ্য ভাক্।
বর্ষান্তে যবনং হিত্বা সৌমারো রাজ্যনায়কঃ।।
কুমারী চন্দ্র কালেন্দৌ গতে শাকে মহেশ্বরি।
কামরূপে মনেঃ পৃষ্ঠ সংযোগং সম্ভবিষ্যতি।।
কামরূপে তথা রাজ্যং দ্বাদশাব্দং মহেশ্বরি।
কুবাচ সংগতো ভূত্বা যবনশ্চ করিষ্যতি।।
যষ্ঠবর্গ-পঞ্চমাদিস্ততঃ শরীরমিচ্ছতি।
শাসিতব্যং কামরূপং সৌমারৈশ্চ কুবাচকৈঃ।।
যবনশ্চ কুবাচশ্চ সৌমারশ্চ তথাপ্লবঃ।
কামরূপাধিপো দেবি শাপমধ্যেন চান্যকঃ।।"

যোগিনীতন্ত্র---১।১২ পটল।

মৰ্ম্ম ;---"সৌমার, কুবাচ (কোঁচ) ও যবনগণের বিপুল যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। এই যুদ্ধে মকরাদি কুবাচ নৃপতি জয়লাভ করিয়া এক বৎসর রাজ্য শাসন করিবেন। তৎপর ১৩১৯ শাকে (?) সৌমার কামরূপ অধিকার করিয়া বার বৎসর রাজ্য পালন করিবেন। এই শাপ কাল মধ্যে তথায় যবন, (১)

(১) যবন ;---ত্রেতাযুগে বহু নামক এক রাজা ছিলেন। তিনি হৈহয় ও তাল জঙ্ঘ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বনে পলায়ন করেন এবং তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎপুত্র সগর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃশত্রুগণকে আক্রমণ করায়, তাহারা পরাজিত হইয়া বশিষ্টের আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন সগর বশিষ্ঠ ঋষির নিকট বলিলেন,—"আমি এই পিতৃশত্রুদ্বয়ের শিরচ্ছেদ করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অথচ আপনি ইহাদিগকে আশ্রয়

কুবাচ (২) সৌমার (৩), ও প্লব (৪) প্রভৃতি রাজগণ কামরূপের শাসনকর্ত্তা হইবেন।”

কুবাচ বা কোঁচ রাজ্য বর্ত্তমান কালে কোচবেহার বা কুচবিহার নামে পরিচিত। এই রাজ্যের উত্তর দিকে জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিম দ্বার, পূর্ব্বে আসামের গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত পূর্ব্বদ্বার, রঙ্গপুর, গদাধর ও স্বর্ণকোশী নদী ; দক্ষিণে রঙ্গপুর ; পশ্চিমে জলপাইগুড়ি ও রঙ্গপুর। ইহার ক্ষেত্রফল ১৩০৭ বর্গমাইল।

খলংমা ;---(৩৬ পৃঃ - ৫ পংক্তি)। ইহা বরবক্র নদীর তীরবর্ত্তী স্থান। ত্রিলোচনের পুত্র দাক্ষিণ হেড়ম্ব রাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ত্রিবেগের (ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্ত্তী) রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃগণসহ খলংমায় আসিয়া রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজমালায় পাওয়া যায় ;---

“কপিলা নদীর তীর পাট ছাড়ি দিয়া।
একাদশ ভাই মিলি মন্ত্রণা করিয়া।।
সৈন্যসেনা সমে রাজা স্থানান্তরে গেল।
বরবক্র উজানে খলংমা রহিল।।”

দাক্ষিণ খণ্ড,---৩৬ পৃঃ।

প্রদান করিয়া নিধন করিতে বারণ করিতেছেন। উভয় কার্য্যই আমার পালনীয়, সুতরাং কি কর্ত্তব্য বলিয়া দিন্।” বশিষ্ঠ বলিলেন---‘শিরচ্ছেদ ও শিরোমুণ্ডন একরূপ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব ইহাদিগকে শিরোমুণ্ডন করিয়া তাড়াইয়া দাও, তবেই উভয় দিক রক্ষা হইবে।’ সগর তাহাই করিলেন। পরিশেষে ইহারা নিত্যন্ত ম্লেচ্ছাচারী হওয়ায় ‘যবন’ নামে খ্যাত হইয়াছে।

(যোগিনী তন্ত্র---১।৬ পৃঃ)

(২) কুবাচ---কোঁচ।

(৩) সৌমার---স্বর্গ-নর্ত্তকী কঙ্কাবতী শাপগ্রস্তা হইয়া কৌরব-বধু হইলেন। কুরুক্ষেত্রে কৌরব রমণীগণ যখন প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল, তখন তিনি চন্দ্রচূড় পর্ব্বত-শিরে আরোহণ করিয়াছিলেন। সেই পর্ব্বতে ইন্দ্র কর্ত্তৃক অরিন্দম নামক এক পাপাচারী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ইহার বংশধরগণই সৌমার নামে প্রসিদ্ধ।

(যোগিনী তন্ত্র---২।১৪।)

(৪) প্লব---কীর্ম্মি নাম্নী কোনও বাহ্লীক রমণী (বাহ্লীকগণ মহাভারত উক্ত শাল্বের পুত্র) ভারত যুদ্ধের পর, কাশীধামে মুক্তিমণ্ডপে তপস্যা করিতে থাকেন। বলি পুত্র বাণাসুর তখন মহাকালরূপে কাশীর দ্বার রক্ষা করিত। এই মহাকাল, কীর্ম্মির সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাহাতে সঙ্গত হয়। তাহা হইতে মহাঙ্কুশ নামক এক পুত্র উৎপন্ন হইল। মহাদেব তাহাতে শাল্বরাজ্য কামরূপ দান করিয়া ‘প্লব’ অর্থাৎ ‘যাও’ এই বাক্যদ্বারা মুক্তিমণ্ডপ হইতে বিদায় করিলেন। মহাদেবের এই বাক্য হইতে তাহারা ‘প্লব’ নামে অভিহিত হইয়াছে।

(যোগিনী তন্ত্র---১।৬ পৃঃ)

বরবক্র (বরাক) নদীর অংশ বিশেষকে ত্রিপুরাগণ খলংমা বলিত। নদীর নামানুসারে তৎতীরবর্ত্তী স্থানের নামও খলংমা হইয়াছিল। পাৰ্ব্বত্য প্রদেশে এরূপ নামকরণের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। মনুভেলী, সুর্ম্মাভেলী, দেওভেলী, লঙ্গাইভেলী ইত্যাদি স্থানের নাম, নদীর নামানুসারেই হইয়াছে। 'ভেলী' শব্দ আধুনিক হইলেও স্থানের নামগুলি প্রাচীন, তাহার সহিত 'ভেলী' যোগ করা হইয়াছে মাত্র। খলংমা সম্বন্ধে ত্রিপুরার অপর ইতিহাস 'কৃষ্ণমালা' নামক হস্ত লিখিত গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে ;---

"হিড়িম্ব দেশের দক্ষিণেতে এক নদী।
বরচক্র নাম তার ঘোষে অদ্যাবধি।।
খলংমা বলয়ে ত্রিপুর সকলে।
কুকি সবে বসতি করয়ে তার কূলে।।"

কৃষ্ণমালা।

এই স্থানে দাক্ষিণ হইতে প্রতীত পর্য্যন্ত ৬৭ জন ভূপতির রাজপাট স্থাপিত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহারাজ প্রতীত কাছাড়ের রাজার সহিত কলহ করিয়া খলংমায় আসিবার কথা রাজমালায় লিখিত আছে, যথা ;---

"খলংমার কূলে আসে ত্রিপুর রাজন।"

মহারাজ প্রতীতের সময়ে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়া থাকিলেও খলংমার রাজপাট একেবারে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল না,---এতদ্বারা তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

খুটিমুড়া ;--- (৬২ পৃঃ - ১১ পংক্তি)।এই স্থান ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট সদর বিভাগের (আগরতলার), এবং ধ্বজনগর ও বিশালগড়ের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। মহারাজ রাজধর মাণিক্য কৈলাসহর (মনুতীর) হইতে উদয়পুরে গমন কালে খুটিমুড়া বামে রাখিয়া দক্ষিণাভিমুখী গিয়াছিলেন ; যথা---

"খুটিমুড়া বামে করি ধ্বজনগর পথে।
বিশাল গড় হইয়া চলে ডোম ঘাটি তাতে।।
উদয়পুর আসি রাজা প্রবেশিল পুরী।।"

রাজধর মাণিক্য খণ্ড।

ডাঙ্গর ফা পুত্রগণের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিবার কালে এক পুত্রকে খুটিমুড়ায় স্থাপন করিয়াছিলেন। * কোন্ পুত্র এই স্থানের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই।

---

* "খুটিমুড়া দিল এক নৃপতি নন্দন।"

ডাঙ্গর ফা খণ্ড।

এই স্থানে প্রাচীন বাড়ীর নিদর্শন এবং পাকা ঘাটযুক্ত দীঘি পুষ্করিণী ইত্যাদি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। একটী দীঘিকে অদ্যাপি 'খুটামারার দীঘি' নামে অভিহিত করা হয়। সম্ভবতঃ 'খুটিমুড়া' স্থলে 'খুটামারা' নাম হইয়াছে।

খুলঙ্গ ;—(৩২ পৃঃ - ১৫ পংক্তি)। ইহা কুকি প্রদেশের (লুসাই পর্ব্বতের) অন্তর্গত স্থান। এই স্থানে কুকি জাতির বসতি ছিল।

গৌড় ;---(৫৩ পৃঃ, ২৯ পংক্তি) এই স্থান বঙ্গদেশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। শক্তি সঙ্গম তন্ত্রে গৌড়ের বর্ণন পাওয়া যায়,---

"বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদঃ।।"

"বঙ্গদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবনেশ্বরের সীমা পর্য্যন্ত গৌড়দেশ নামে বিখ্যাত। এখানকার লোকেরা সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ।"

পূর্ব্বকালে 'পঞ্চগৌড়' অর্থাৎ পাঁচটি প্রদেশের নাম গৌড় ছিল। মাধবাচার্য্য তাঁহার দুর্গমাহাত্ম্যে আকবর বাদশাহকে পঞ্চ গৌড়েশ্ব বলিয়াছেন, যথা ;—

"পঞ্চ গৌড় নামে দেশ পৃথিবীর সায়।
একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার।।"

কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিবৃত্ত রাজতরঙ্গিণীতেও পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্কন্দ পুরাণীয় সহ্যাদ্রি খণ্ডে এই পঞ্চগৌড়ের নামোল্লেখ আছে, যথা ;---

"সারস্বতাঃ কান্যাকুব্জা উৎকলা মৈথিলাশ্চ যে।
গৌড়াশ্চ পঞ্চধাচৈব পঞ্চগৌড়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

উত্তরার্দ্ধ---১অঃ।

"সারস্বত অর্থাৎ সরস্বতীর তীরবর্ত্তীস্থান, কনোজ, উৎকল, মিথিলা ও গৌড় এই পাঁচটী স্থানকে পঞ্চগৌড় বলে।"

রাজমালায় বঙ্গদেশস্থ গৌড়েরই উল্লেখ হইয়াছে ; অন্য গৌড়দেশের সহিত রাজমালার সম্বন্ধ নাই। এই গৌড়রাজ্যে গুপ্তবংশীয়, পালবংশীয় ও সেনবংশীয় হিন্দুরাজগণ রাজত্ব করিয়াছেন। এই রাজ্য কিয়ৎকালের নিমিত্ত কাশ্মীর রাজের হস্তগত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে গৌড় নামে কোন নগর থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন গঙ্গাতীরবর্ত্তী গৌড় নগরে রাজধানী স্থাপন করিবার

প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেন উক্ত নগরীকে 'লক্ষ্মণাবতী' নামে অভিহিত করেন। তৎপর তিনি নবদ্বীপে আর এক নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

হিন্দুরাজত্বকালে রাজধানী যে স্থানেই থাকুক না কেন, রাজাগণ 'গৌড়েশ্বর' নামে পরিচিত ছিলেন। মুসলমান শাসন সময়ে তাঁহাদের অধিকৃত ভূভাগ 'লখ্‌নৌতি' নামে অভিহিত হইত। 'লখ্‌নৌতি' শব্দ 'লক্ষ্মণাবতী' হইতে সমুদ্ভূত বলিয়াই মনে হয়। মুসলমান শাসনকালে গৌড়নগর বিশেষ সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত হইয়াছিল। ১৬৩৯ খৃঃ অব্দে শাহসুজা রাজমহলে রাজধানী উঠাইয়া লওয়ায়, এই স্থান শ্রীভ্রষ্ট হইয়া ক্রমশঃ হিংস্রজন্তু সঙ্কুল অরণ্যে পরিণত হয়। অদ্যাপি এই স্থানে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। শুনা যায়, এই সমৃদ্ধজনপদ অরণ্যে পরিণত হইবার মহামারীই একমাত্র কারণ।

চাখমা ;---(৩২ পৃঃ - ১৫ পংক্তি)। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম এককালে রিয়াংগণের আবাস ভূমি ছিল, চাখমাগণ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া উক্ত স্থানে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করে। তদবধি চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে চাখ্‌মাগণের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। চাখমাগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ; ইহাদের আদিম বাসভূমি আরাকান।

চাখমা দেশ চাখমাজাতি দ্বারাই শাসিত হইতেছিল। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট কুকিদিগের অত্যাচার নিবারণকল্পে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম একটী জেলায় পরিণত করেন। তৎকালে চাখমা সরদারগণের রাজশক্তি রহিত করিয়া তাঁহাদিগকে জমিদার শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে 'রাজা' ও 'দেওয়ান' উপাধিধারী কতিপয় চাখমা সরদার কর্ত্তৃক উক্ত প্রদেশ শাসিত হইতেছে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ও তদন্তর্ভুক্ত রাঙ্গামাটী প্রভৃতি স্থান চাখমা দেশ নামে অভিহিত ছিল।

ছাম্বুল নগর ;---(৪৩ পৃঃ - ১০ পংক্তি)। এই স্থান সম্বন্ধে পূর্ব্বে একবার আলোচনা করা হইয়াছে। এস্থলে অধিক কথা না বলিয়া ইহার অবস্থান বিষয়ক দুই একটী কথা বলা হইবে মাত্র।

রাজমালায় বারম্বার ছাম্বুল নগরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহারাজ বিমারের পুত্র কুমার শিব দর্শনার্থ ছাম্বুলনগরে গিয়াছিলেন, যথা, ---

"তারপুত্র কুমার পরেতে রাজা হয়।
কিরাত আলয়ে আছে ছাম্বুল নগর।
সেইস্থানে গিয়াছিল শিবভক্তিতর।।

* * *

গুপ্তভাবে আছে তথা অখিলের পতি।
মনুরাজ সত্যযুগে পূজিছিল অতি।।
মনুনদীতীরে মনু বহু তপ কৈল।
তদবধি মনুনদী পুণ্য নদী হৈল।
রাজমালা---ত্রৈদক্ষিণ খণ্ড, ৪২।৪৩ পৃঃ

এতদ্বিষয়ে সংস্কৃত রাজমালার উক্তি নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ;---

"বিমারস্য সুতোজাতঃ কুমারঃ পৃথিবীপতিঃ।
স রাজা ভুবনখ্যাতঃ শিবভক্তি পরায়ণঃ।।
কিরাত রাজ্যে স নৃপশ্ছাম্বুলনগরান্তরে।
শিবলিঙ্গং সমাদ্রাক্ষীৎ সুবড়াই কৃতেমঠে।।
ততঃ শিবং সমভ্যর্চ্চ্য নিত্যং তুষ্টাবভূমিপঃ।
রাজাশ্রুত্বেদমাশ্চর্য্যং পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতঃ।
কথমত্র মহাদেবঃ কিরাতনগরে স্থিতঃ।
ইতি রাজ বচঃ শ্রুত্বা মুকুন্দো ব্রাহ্মণোহব্রবীৎ।।
পুরাকৃত যুগে রাজন্ মনুনা পূজিতঃ শিবঃ।
অত্রৈব বিরলে স্থানে মনু নাম নদীতটে।।
গুপ্তভাবেন দেবেশঃ কিরাত নগরে বসৎ।।"

এতদ্বারা ছাম্বুল নগরের কতিপয় উল্লেখযোগ্য বিষয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা এই ;---

(১) ছাম্বুল নগর কিরাত দেশে অবস্থিত।

(২) এইস্থানে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে।

(৩) সুবড়াই (ত্রিলোচন) এই স্থানে শিব মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

(৪) এইস্থান মনু নদীর তীরে অবস্থিত।

(৫) মহারাজ কুমার এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক শিবের আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন।

এই সকল অবস্থাদ্বারা ছাম্বুলনগরের অবস্থান নির্ণয় করিতে হইবে। আমরা দেখিতেছি ;---

(১) কৈলাসহরে পূর্ব্বকালে কিরাত (কুকি) গণের বাস ছিল। এমন কি, বর্ত্তমান লংলা নামক স্থানেও তাহাদেরই আধিপত্য থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহারাজ ধর্ম্মধর ব্রাহ্মণদিগকে তাম্রপত্র দ্বারা ভূমি দান করার পর, আর্য্যবসতিহেতু কুকিগণ দূর পর্ব্বতে সরিয়া গিয়াছে। এতদ্বারা কৈলাসহর ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ যে কিরাতদেশ ছিল, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। বর্ত্তমান কালেও কুকিগণ কৈলাসহরের অদূরবর্ত্তী পাবর্বত্য প্রদেশে বাস করিতেছে।

(২) কৈলাসহরের পার্শ্ববর্ত্তী উনকোটী তীর্থে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন।

এতদ্ব্যতীত উক্ত অঞ্চলে অন্য কোথাও বিখ্যাত শিবালয় থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(৩) সুবড়াই (মহারাজ ত্রিলোচন) উক্ত ঊনকোটী তীর্থেই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। তথায় অদ্যাপি প্রাচীন মন্দিরের চিহ্ন এবং বিস্তর পুরাতন ইষ্টক বিদ্যমান রহিয়াছে।

(৪) কৈলাসহর মনু নদীর তীরে অবস্থিত। ঊনকোটী তীর্থও এই নদী হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে।

(৫) কৈলাসহরের উত্তর দিকে একটী রাজবাড়ী ছিল। তদপেক্ষা কৈলাসহরের আরও নিকটে প্রাচীন রাজ বাড়ীর চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। মহারাজ কুমার ইহারই কোন বাড়ীতে অবস্থান করিয়া শিবারাধনা করিতেছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।*

এই সকল কারণে আমরা ঊনকোটী তীর্থ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কৈলাসহরের প্রাচীন নাম ছাম্বুলনগর ছিল, ইহাই অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করি। বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা মহাশয়, চন্দ্রনাথ (সীতাকুণ্ড) তীর্থকে ছাম্বুলনগর বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু উক্ত স্থান মনুনদীর তীরবর্ত্তী নহে ; এবং উক্ত নদীর ঠিক বিপরীত দিকে সুদূরে অবস্থিত, এই একটি মাত্র কারণেই তাঁহার সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হইতেছে।

জয়ন্ত (জয়ন্তিয়া) ;---(৪৭ পৃঃ - ৮৭ পংক্তি)। বর্ত্তমান আসাম প্রদেশের অন্তর্গত একটী বিস্তৃত ভূ-ভাগ। পূর্ব্বে এইস্থান হিন্দুরাজ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। দেশাবলীর মতে এই স্থানে জয়ন্তেশীদেবী বিরাজ করেন। বৃহন্নীল তন্ত্রে ইহা পীঠস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যথা ;---

"জয়ন্তং বিজয়ন্তঞ্চ সর্ব্বকল্যাণদং প্রিয়ে।"

বৃহন্নীলতন্ত্র---৫ম পটল।

জয়ন্তরাজ প্রতিবৎসর নরবলিদ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিতেন। এই রাজ্যের শেষ রাজা রাজেন্দ্র সিংহ নরবলি প্রদানের দরুণ ইংরেজের কোপদৃষ্টিতে পতিত হন, এবং এই কারণেই ১৮৩৫ অব্দে তিনি রাজ্যচ্যুত এবং গভর্ণমেন্টের বৃত্তিভুক্ হইয়াছিলেন। এখন এই রাজ্যের পার্ব্বত্যপ্রদেশ খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের অন্তর্গত ও সমতল প্রদেশ শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।

---

* "তল্লিঙ্গে শিবমারাধ্য কুমারাখ্যো মহীপতিঃ।
সুখং বহুবিধং ভুক্তা কৈলাস ভবনং যযৌ।
সংস্কৃত রাজমালা।

তেলাইঙ্গ ;---(৬২ পৃষ্ঠা - ২৪ পংক্তি)। এইস্থান হেড়ম্ব (কাছাড়) রাজ্যের অন্তর্গত।

ত্রিপুরা ;---(৯ পৃঃ - ৮ পংক্তি)। ত্রিপুরা রাজ্য। এই স্থানের নামোৎপত্তি, অবস্থান ও সীমা ইত্যাদি বিষয় পূর্ব্বভাষে আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

ত্রিবেগ ;---(৬ পৃঃ - ৪ পংক্তি)। এই স্থানে ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী ছিল। ইহা কপিল (ব্রহ্মপুত্র) নদের তীরে অবস্থিত। এই স্থানের বিবরণ পূর্ব্বভাষে প্রদান করা হইয়াছে ; এজন্য এস্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল না।

থানাংচি ;---(৩২ পৃঃ-১৬ পংক্তি)। ইহা কুকিপ্রদেশ। প্রাচীন ত্রিপুর রাজ্যের পূর্ব্ব ও লুসাই পর্ব্বতের পশ্চিম দিকস্থ পাব্বর্ত্য প্রদেশে এই স্থান অবস্থিত। মহারাজ ত্রিলোচনের শাসন কালে প্রথমতঃ থানাংচি প্রদেশ ত্রিপুর রাজ্যভুক্ত হয়। রাজমালায় ত্রিলোচন খণ্ডে লিখিত আছে ;—

"থানাংচি প্রতাপসিংহ আছে যত দেশ।
লিকা নামে আর রাজা রাঙ্গামাটী শেষ।।
এই সব জিনিবারে ইচ্ছা মনে হৈল।।" ইত্যাদি।

এই বিজয়ের পরে থানাংচি নিবাসী কুকি সম্প্রদায় ত্রিপুরার অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া আপনাদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়াছিল। মহারাজ ডাঙ্গর ফা এর শাসনকাল পর্য্যন্ত ইহারা মস্তক উত্তোলন করিতে সাহসী হয় নাই। তৎকালে থানাংচিতে ত্রিপুরার একটী থানা ছিল। * সেকালে সেনানিবাসকে 'থানা' বলা হইত। রাজমালায় পাওয়া যায়, ডাঙ্গর ফা আপন সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে রাজ্যবিভাগ করিয়া দেওয়ার কালে---"থানাংচি স্থানেতে রাজা হৈল একজন।" ডাঙ্গর ফা স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র রত্ন ফা কর্ত্তৃক আক্রান,ত ও বিতাড়িত হইয়া থানাংচিতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই স্থানেই পরলোকগমন করেন।† ইহার পরে কোন সময় কুকিগণ ত্রিপুরার বশ্যতা অস্বীকার করিয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবার সুবিধা নাই।

মহারাজ ধন্য মাণিক্যের শাসনকালে, থানাংচির রাজা একটি শ্বেতহস্তী ধৃত করিয়াছিলেন। ত্রিপুরেশ্বর সেই হস্তী চাহিয়া পাঠাইলে, থানাংচি রাজ তাহা প্রদান করিতে অসম্মত হন। এই সূত্রে ত্রিপুরার সহিত থানাংচির যুদ্ধ সঙ্ঘটন হয়।

---

* "ডাঙ্গর ফা রাজার কালে থানাংচিতে থানা।"—রাজমালা।

† "থানাংচি পর্ব্বতে রাজা ডাঙ্গর ফা মরিল।
আর যত রাজপুত্র লড়াইয়া ধরিল।"
ডাঙ্গর ফা খণ্ড।

আট মাস যুদ্ধের পর, থানাংচি প্রদেশ, শ্বেতহস্তী সহ পুনর্ব্বার ত্রিপুর রাজ্যের হস্তগত হইয়াছে।

দ্বারিকা ;---(৭ পৃঃ - ৯ পংক্তি)। দ্বারিকা গুজরাটের অন্তর্গত কাঠিয়াবাড়ের মধ্যে একটী বন্দর, এই স্থান বরোদার গাইকোয়ারের অধীন। ইহা হিন্দুর তীর্থভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং বরোদা হইতে পশ্চিমদিকে ১৩৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এইস্থানের দ্বারকা নাথের মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ দেবালয়। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিগ্রহ 'রণছোড়জী' পূজকগণ কর্ত্তৃক অপহৃত ও অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, দ্বিতীয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাহাও উপরিউক্ত রূপে অপহৃত হইবার পর, বর্ত্তমান দেবমূর্ত্তি স্থাপন করা হইয়াছে।

এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী ছিল। ইহার অপর নাম কুশস্থলী। শ্রীকৃষ্ণের রাজপাট স্থাপনের পূর্ব্ব হইতেই এই স্থান তীর্থ বলিয়া পরিকীর্ত্তিতে ছিল, এখনও ইহা একটী প্রধান তীর্থভূমি বলিয়া পরিগণিত। প্রতি বৎসর বহু যাত্রী পুণ্যকামনায় এইস্থানে গমন করিয়া থাকে।

ধর্ম্মনগর ;---(৬২ পৃঃ - ৮ পংক্তি)। এই স্থান, কৈলাসহরের পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ ঊনকোটী পর্ব্বতের পূর্ব্বপ্রান্তে জুড়ি নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার নামান্তর ফটিকউলি বা ফুটিকুলি। প্রথমতঃ মহারাজ প্রতীত, তৎপর মহারাজ ডাঙ্গর ফা এই স্থানে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহারাজ বিজয়মাণিক্য সেই বাড়ীতে কিয়ৎকাল অবস্থান করিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিজয়মাণিক্যের অভিযান বর্ণন উপলক্ষে রাজমালা বলেন ;---

'লংলাদেশ হইয়া ধর্ম্মনগর আইসে।
হরগৌরী পূজিল কামনা বিশেষে।।
ডাঙ্গরফার পুরী মধ্যে ছিল কতদিন।
নারেঙ্গা কমলা বাগ দেখিল প্রবীন।।''

বিজয়মাণিক্য খণ্ড।

মহারাজ ডাঙ্গর ফা সপ্তদশ পুত্রকে রাজ্যভাগ করিয়া দিবার কালে এক পুত্রকে এই স্থান প্রদান করিয়াছিলেন। রাজমালায় লিখিত আছে ;—''আর পুত্র ধর্ম্মনগরেতে রাজা ছিল''। এই পুত্রের নাম রাজমালায় লিখিত নাই, সুতরাং বর্ত্তমান কালে নাম নির্দ্ধারণ করা দুঃসাধ্য হইয়াছে।

ধর্ম্মনগর বর্ত্তমানকালে ত্রিপুর রাজ্যের একটী বিভাগরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এইস্থানে বিভাগীয় আপিস, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, থানা, বনকর, আফিস, ডাকঘর, স্কুল ও ডাক্তারখানা ইত্যাদি সংস্থাপিত আছে। এ, বি, রেল পথের

কুলাউড়া ষ্টেশন হইতে পার্ব্বত্য পথে এবং জুড়ি ষ্টেশন হইতে নৌকাযোগে এই স্থানে যাতায়াত করা যাইতে পারে।

ধর্ম্মনগর বহু প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। মহারাজ প্রতীত খলংমা হইতে ধর্ম্মনগরে রাজপাট স্থাপনকালে এই স্থানের যে অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিলেই আমাদের উক্তির জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যাইবে। রাজমালায় লিখিত আছে ;---

"ধর্ম্মনগরের কথা শুন নৃপমণি।
ধর্ম্মের বসতি স্থান হেন অনুমানি।।
নিত্য জপ, তপ, হোম অতিথি পূজন।
পরম আনন্দ যুক্ত বটে সর্ব্বজন।
সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ জাতি করে বেদ পাঠ।
নিদ্রা হনে চৈতন্য জন্মায় বন্দীভাট।।
গন্ধ যুক্ত পুষ্প বহু রস যুক্ত ফল।
অতিমিষ্ট ভোজ্যগুলা নির্ম্মল কমল।।
অধর্ম্মের নাহি লেশ পুণ্যের ভাজন।
নানা গুণে রূপে যুক্ত বটে সর্ব্বজন।।"

রাজা বাবুর বাড়ীতে রক্ষিত রাজমালা।

ধর্ম্মনগরের প্রাচীন সরোবর, বহুসংখ্যক পুষ্করিণী, প্রশস্ত ও সুদীর্ঘ বর্ত্ম, প্রাচীন বাড়ীর চিহ্ন ইত্যাদি অবলোকন করিলে উপরিউক্ত বর্ণনার সত্যতা উপলব্ধি হয়। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অথবা কুকির অত্যাচারে এই বিশাল জনপদ জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল ; দীর্ঘকাল পরে আবার সেইস্থান লোকালয়ে পরিণত হইয়াছে।

ধোপাপাথর ;---(৬২ পৃঃ - ২৫ পংক্তি)। আধুনিক শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত একটী জনপদ। পূর্ব্বে এই স্থান ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। মহারাজ ডাঙ্গর ফা স্বীয় সপ্তদস পুত্রকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দেওয়ার কালে এই স্থানে এক পুত্রকে রাজা করিয়াছিলেন। রাজমালায় পাওয়া যায় ;---

"ধোপা পাথরেতে রাজা আর একজন।"

কোন্ পুত্রকে এখানে রাজা করিয়াছিলেন, রাজমালা এ বিষয়ে নির্ব্বাক ; ইহা জানিবার কোন উপায় নাই।

কর্ণফুলী নদীর পরপাড়ে আর একটী স্থানের নাম ধোপাপাথর ছিল। মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসন কালে, ত্রিপুর বাহিনী আরাকান্ বিজয়ার্থ গমন

করিবার পর, মঘের হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। তৎকালে ;---

"সেই স্থান ছাড়িয়া আইসে কর্ণফুলী।
মঘ সৈন্য পাছে পাছে আসিল সকলি।।
ধোপা পাথরের পথে কর্ণফুলী পার।
মঘ সৈন্য পাছে পাছে আসে মারিবার।।"

কৈলাসহরের সন্নিহিত কানিহাটী পরগণায় একটী স্থান বর্ত্তমান কালে 'ধোপাটিলা' নামে পরিচিত ; এইস্থান কানিহাটী চা বাগানের সংলগ্ন। ইহার পূর্ব্বদিকে বিস্তীর্ণ 'রাজার দীঘি' ও রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বে এই স্থানের নাম ধোপাপাথর ছিল কিনা, জানিবার উপায় নাই। কিন্তু এখানে যে ত্রিপুরার রাজবাড়ী ছিল, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইবে।

নৈমিষারণ্য ;---(৭পৃঃ - ৯ পংক্তি)। এই স্থান গোমতী নদীর তীরবর্ত্তী। এখানে চক্রতীর্থ অবস্থিত। নৈমিষারণ্য নামকরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায়,---

"এবং কৃত্বা ততো দেবো মুণিং গৌরমুখং তদা।
উবাচ নিমিষেনেদং নিহতং দানবং বলম্।
অরণ্যেহস্মিংস্ততস্তেন নৈমিষারণ্য সংজ্ঞিতম্।
ভবিষ্যতি যথার্হং বৈ ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।।"

বরাহপুরাণ।

মর্ম্ম ;---"গৌরমুখ মুনি এখানে নিমিষকাল মধ্যে অসুরসৈন্য ও তাহাদের বল ভস্মীভূত করিয়াছিলেন, এজন্য এস্থান নৈমিষারণ্য নামে খ্যাত হইয়াছে।"

দেবী ভাগবতের মতে নৈমিষারণ্য পবিত্রতীর্থ, এখানে কলির প্রবেশাধিকার নাই। কূর্ম্ম পুরাণের ৪০ অধ্যায় এবং বিষ্ণুপুরাণে এই তীর্থের বিবরণ পাওয়া যায়।

পৌরব ;---(৯ পৃঃ - ২৩ পংক্তি)। ইহা দাক্ষিণাত্যে, মাহীষ্মতী ও সৌরাষ্ট্রে মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। মহাভারতের কালে এই স্থানে একটী হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং দক্ষিণ দিগ্বিজয়ী সহদেব এই রাজ্য জয় করিয়াছিলেন।

প্রতাপসিংহ ;---(৩২ পৃঃ -২৩৬ পংক্তি)। নামান্তর প্রতাপছি। ইহা লুসাই পর্ব্বতের সন্নিহিত কুকিগণের বসতি স্থান। এই কিরাত অধ্যুষিত প্রদেশ বারম্বার ত্রিপুর রাজ্যের কণ্ঠ-লগ্ন হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনতাপ্রিয় অধিবাসীবৃন্দ সুদীর্ঘকাল আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টায় প্রবৃত্ত ছিল, এবং অনেকবার ত্রিপুরার অধীনতাসূত্র ছিন্ন করিয়াছে। মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে,

সেনাপতি রায়কাচাগের বাহুবলে ইহারা বশতাপন্ন হইবার পর আর কখনও রাজশাসন অমান্য করিতে দেখা যায় নাই।

প্রয়াগ ;---(৭ পৃঃ - ১২ পংক্তি)। ইহা হিন্দুর একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থানে এই তীর্থ অবস্থিত। ইহার আধুনিক নাম এলাহাবাদ। প্রয়াগ মাহাত্ম্য অনেক পুরাণেই পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণের ১০২ হইতে আরম্ভ করিয়া ১০৭ অধ্যায় পর্য্যন্ত, পদ্মপুরাণের ভূমিখণ্ডে ১২৩ অধ্যায়ে, এবং কূর্ম্মপুরাণের ৩৩ অধ্যায়ে এই তীর্থের মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 'প্রয়াগ মাহাত্ম্য' নামক স্বতন্ত্র একখানা গ্রন্থও আছে।

প্রয়াগে মস্তক মুণ্ডন করা একটী প্রধান পুণ্য কার্য্য। স্ত্রীলোকগণের মস্তক মুণ্ডন সম্বন্ধে কেশের অগ্রভাগ কর্ত্তন করাই সাধারণ বিধি, কিন্তু প্রয়াগে তাহাদিগকেও সমস্ত কেশ মুণ্ডন করিতে হয়। 'প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব' গ্রন্থে লিখিত আছে, প্রয়াগতীর্থে সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিলে, তাহার কেশ পরিমিত বৎসর স্বর্গলোকে গতি হয়। চলিত প্রবাদেও পাওয়া যায় ;---

"প্রয়াগে মুড়াইয়া মাথা, মর্‌গে পাপী যথা তথা।"

প্রয়াগে শ্রাদ্ধ ও দানাদির ফল অতুলনীয়। মাঘ মাসে এখানে সকল তীর্থের সমাগম হয়, এজন্য মাঘমাসে এই তীর্থ করিলে সকল তীর্থের ফল লাভ হয়। মৎস্য পুরাণে লিখিত আছে ;---

"মাঘে মাসি গমিষ্যন্তি গঙ্গা যমুনা সঙ্গমং।
গবাং শত সহস্রস্য সম্যক দত্তস্য যৎফলং।।
প্রয়াগে মাঘমাসে বৈ ত্র্যহং স্নাতস্য তৎফলম্।।"

মর্ম্ম ;---"বিধি পূর্ব্বক সহস্র সংখ্যক গাভী দান করিলে যে ফল হয়, মাঘ মাসে প্রয়াগতীর্থে তিন দিন স্নান করিলে তাদৃশ ফল হয়। মাঘমাসে প্রয়াগ স্নানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।"

প্রয়াগ মাহাত্ম্য সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ এস্থলে আলোচনা করা অসম্ভব, সুতরাং তদ্বিষয়ে নিরস্ত থাকিতে হইল।

প্রাচীনকালে এইস্থান কোশলরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাদবগণ এই স্থানে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছেন। ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান এই স্থান কোশলরাজ্যভুক্ত দেখিয়াছেন। ১২৯৪ খৃঃ অব্দে এই প্রদেশ মুসলমানগণের হস্তগত হয়। সম্রাট আকবরের শাসনকালে এই স্থানের নাম 'আলাহাবাদ'

হইয়াছে। মার্হাট্টাগণ কোন কোন সময় এই স্থান মুসলমানগণের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইত, কিন্তু দীর্ঘকাল আপনাদের বশে রাখিতে সমর্থ হয় নাই। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব তাঁহার দেয় অর্থের পরিবর্ত্তে এই স্থান বৃটীশ গভর্ণমেন্টকে প্রদান করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এখানে সিপাহী বিদ্রোহ হইয়াছিল।

প্রাগজ্যোতিষ ;---(১০ পৃঃ - ৩ পংক্তি) কামরূপ দেশ। প্রাগ্‌জ্যোতিষ নাম করণ সম্বন্ধে কালিকা পুরাণে লিখিত আছে ;---

"অত্রৈব হি স্থিতো ব্রহ্মা প্রাঙ্‌ নক্ষত্রং সসর্জ চ।
ততঃ প্রাগজ্যোতিষাখ্যোয়ং পুরী শক্র পুরী সমা।
কালিকা পুরাণ---৩৭ অঃ।

মর্ম্ম ;---"পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই স্থানে থাকিয়া নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; এজন্য ইহার প্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ।"

প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ হিন্দুর একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ; এখানে দেবীর যোনিপীঠ পতিত হওয়ায় ইহা মহাপীঠে পরিণত হইয়াছে। এই স্থান পুণ্যপ্রদ ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য ভারতের পূর্ব্বদিগবর্ত্তী।

রামায়ণের মতে কুশের পুত্র অমূর্ত্তরজস্‌ 'প্রাগ্‌জ্যোতিষ' পুর স্থাপন করেন ; ইহার বর্ত্তমান নাম গৌহাটী। এই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের নাম হইতে এক সময়ে সমস্ত আসাম ও তৎসন্নিহিত বিস্তৃত ভূভাগ "প্রাগ্‌জ্যোতিষ" নামে খ্যাত হয়। কালিকা পুরাণের সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ে পাওয়া, যায়, নরকাসুর কর্ত্তৃক প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। নরকের পুত্র ভগদত্ত ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ইনি পাণ্ডবগণের দিগ্বিজয় কালে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন * এবং ভারতযুদ্ধে একটী প্রধান নায়কের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। † মহাভারত স্ত্রী পর্ব্বের ২৩ অধ্যায়ে, ভগদত্ত পর্ব্বতবাসী ম্লেচ্ছাধিপতি বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। ইহার বংশ দীর্ঘকাল প্রাগ্‌জ্যোতিষে রাজত্ব করিয়াছেন।

ইহার পর কিয়ৎকাল এই রাজ্য ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছিল। ম্লেচ্ছের পরে, প্রলম্ভ নামে অন্যএক বংশের অধিকার বিস্তার হয়, এই বংশ আপনাদিগকে ভগদত্তের বংশ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন। অতঃপর 'পাল' উপাধিধারী

* মহাভারত—উদ্যোগপর্ব্ব, ১৬শ অঃ।
† মহাভারত—কর্ণ পর্ব্ব, ৫ম অঃ।

ভৌমরাজাগণ শাসন দণ্ড ধারণ করেন। তৎপর স্থানে গৌড়ের পাল বংশীয় রাজগণের অধিকার বিস্তার হইয়াছিল। ইহার কিয়ৎকাল পরে মুসলমানগণ প্রাগ্‌জ্যোতিষের উপর হস্ত প্রসারণ করেন। এ স্থলে এতদধিক আলোচনা করিবার সুবিধা নাই।

বঙ্গ ;—(৩২ পৃঃ - ৩ পংক্তি)। বাঙ্গালাদেশ। প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে এই প্রদেশ 'সমতট' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা নিষ্প্রয়োজন।

বর্ব্বর ;---(১০ পৃঃ - ৪ পংক্তি)। অযোধ্যা প্রদেশস্থ খেরি জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এইস্থানে মুসলমান শাসনকালের একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। কতিপয় হিন্দু দেবমন্দির ও মুসলমানগণের মসজিদ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশালগড় ;---(৫২ পৃঃ - ৪ পংক্তি)। এই স্থান ত্রিপুর রাজ্যস্থিত আগরতলা রাজধানী হইতে দক্ষিণ দিকে ৬ ক্রোশ দূরে, বুড়িমা নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা ধান্য, চাউল ও কার্পাসের একটী প্রধান বাণিজ্য স্থান। এই স্থানের 'গোলাঘাটি বাজার বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। ব্যবসায়িগণ এই স্থানে গোলা করিয়া পণ্যদ্রব্য মজুত রাখে বলিয়া বাজারের নাম 'গোলাঘাটি' হইয়াছে। এই স্থান বঙ্গের শাসনাধীন ছিল, মহারাজ যুঝারু ফা প্রথমতঃ এই স্থান জয় করিয়া ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি রাঙ্গামাটী জয় করিয়া ;---

> "রহিল অনেক কাল সেস্থানে নৃপতি।
> বঙ্গদেশ আমল করিতে হইল মতি।।
> বিশালগড় আদি করি পাৰ্ব্বতীয় গ্রাম।
> কালক্রমে সেই স্থান হৈল ত্রিপুর বাম।"
>
> যুঝার ফা খণ্ড।

এইস্থানে সেনানিবাস স্থাপিত হওয়ায় স্থানের নাম 'বিশালগড়' হইয়াছে। এখানে যুঝার ফা এক পুরীও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার দীর্ঘকাল পরে, মহারাজ ডাঙ্গর ফা পুত্রগণের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিবার সময় এই স্থানে এক পুত্রকে স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজমালায় পাওয়া যায় ;---"বিশালগড়েতে রাজা হৈল এক জন।" কোন পুত্রকে এখানে রাজা করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই।

বৰ্ত্তমান কালে এইস্থানে ত্রিপুরার রাজ সরকারী স্কুল, ডাক্তারখানা, ডাকঘর, পুলিশের থানা, তহশীল কাছারী এবং বনকর আফিস ইত্যাদি স্থাপিত আছে। এ, বি, রেল লাইনের কমলাসাগর ষ্টেশন অবতরণ করিয়া এইস্থানে

যাইবার রাজপথ আছে। নয়ানপুর ষ্টেশন হইতে বুড়িমা নদী পথেও যাতায়াত করা যাইতে পারে।

মণিপুর ;---(৬২ পৃষ্ঠা - ২৬ পংক্তি)। ইহা ত্রিপুর রাজ্যস্থ বিলোনীয়ার সন্নিহিত মুহূরী নদীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত। বর্ত্তমান সময়ে ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারীর অন্তর্গত জগৎপুর তহশীল কাছারীর এলাকায় পতিত হইয়াছে। এই গ্রামের উত্তরে উত্তর ধর্ম্মপুর ও দক্ষিণে দক্ষিণ ধর্ম্মপুর গ্রাম। ত্রিপুরেশ্বরের ব্রহ্মোত্রভোগী অনেক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ এইস্থানে বাস করিতেছেন। মণিপুরের এক মাইল দূরবর্ত্তী উত্তর ধর্ম্মপুরে উচ্চ টিলার উপর একটী ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, এইস্থানে সমসের গাজির সহিত ত্রিপুরেশ্বরের যুদ্ধ হয়।

মথুরা ;---(৫ পৃঃ - ১৪ পংক্তি)। ইহা হিন্দুগণের একটী তীর্থস্থান। এই স্থান শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি এবং লীলাক্ষেত্র। এই নগরী পূত-সলিলা কালিন্দি কূলে অবস্থিত।

রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে লিখিত আছে, মধুদৈত্য মহাদেবের কৃপায় এক অপূর্ব্ব শূল লাভ করে। এবং শূলপাণি বলিয়াছিলেন, এই শূল যতদিন তোমার পুত্রের হস্তে থাকিবে, ততদিন তাহাকে কেহই বধ করিতে সমর্থ হইবে না। এই বর লাভ করিয়া মধুদৈত্য এক সুপ্রভপুর নির্ম্মাণ করিলেন। যথাকালে মধুর লবণদৈত্য নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। লবণ দুর্ব্বিনীত ও অবাধ্য হওয়ায় মধুদৈত্য তাহাকে শিবদত্ত শূল অর্পণ করিয়া বরুণালয়ে চলিয়া গেলেন। ক্রমে লবণের দৌরাত্মে সকলে অস্থির হইয়া উঠিল, রামের আদেশানুসারে শত্রুঘ্ন আসিয়া বীরত্বে ও কৌশলে লবণকে বধ করিলেন। এই ঘটনায় ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রসন্ন হইয়া শত্রুঘ্নকে বর প্রদান করিতে চাহিলে, তিনি যাজ্ঞা করিলেন, যে, এই দেবনির্ম্মিত মধুপুরী শীঘ্রই রাজধানী হউক। দেবগণ প্রীত হইয়া বলিলেন, এই স্থান শূরসেনা নামে খ্যাত হইবে। এতদ্বিষয়ক রামায়ণের উক্তি নিম্নে দেওয়া যাইতেছে ;---

"প্রত্যুবাচ মহাবাহুঃ শত্রুঘ্ন প্রযতাত্মবান্।
ইয়ং মধুপরী রম্যা মধুরা দেবনির্ম্মিতা।।
নিবেশং প্রাপ্নুরাচ্ছীঘ্রমেষ মেহস্ত বরঃ পরঃ।
তংদেবাঃ প্রীতমনসো বাঢ়নিত্যেব রাঘবম্।।
ভবিষ্যতি পুরীরম্যা শূরসেনা ন সংশয়ঃ।
তে তথোক্ত্বা মহাত্মনো দিবমারুরুহু স্তদা।"

উত্তরাকাণ্ড---৮৩ অঃ, ৫।৬ শ্লোক)।

অতঃপর শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক, এই দৈত্যরাজ্যে যদুবংশ সম্ভূত শূরসেন স্থাপিত হন। এবং অল্পকাল মধ্যেই ইহা সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হয়। পূর্ব্বে এই স্থানের নাম মধুপরী বা মধুরা ছিল। সম্ভবতঃ, 'মধুরা' শব্দ পরিবর্ত্তিত হইয়া 'মথুরা' হইয়াছে। মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণে মথুরা নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় কোন কথা লিখিত হয় নাই।

কেবল হিন্দুর তীর্থস্থান বলিয়াই এই স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এমন নহে, এই স্থান বৌদ্ধ এবং জৈল সম্প্রদায়েরও তীর্থভূমি। এখানে অনেক বৌদ্ধ স্তূপ ও জৈন মন্দির আছে।

শূরসেন বংশের হস্তচ্যুত করিয়া কিয়ৎকাল কংস এই স্থানে রাজত্ব করেন। শ্রীকৃষ্ণ কংসকে নিধন করিয়া পুনর্ব্বার উগ্রসেনকে মথুরা রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। জরাসন্ধের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারিকাপুরীতে গমন করিবার পর, এই স্থান শূরসেনদিগের হস্তচ্যুত হয়। তৎপরে এই রাজ্য পাটলিপুত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। অতঃপর এই স্থানে শকাধিপত্য বিস্তৃত হয়। ইহার পরে ক্রমান্বয়ে গুপ্তবংশ ও পুনর্ব্বার শূরসেনবংশ এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছেন। শূরসেনগণের পরবর্ত্তী শাসনকালে ইহা মুসলমানগণের কুক্ষিগত হয়। ইংরেজ শাসনকালে এই স্থান জেলায় পরিণত হইয়াছে। বৃন্দাবন, এই জেলার উপবিভাগ।

মধুগ্রাম ;---(৬২ পৃঃ --- ১৫ পংক্তি)। ইহা বর্ত্তমান সাবরুম বিভাগের সন্নিহিত শ্রীনগর মৌজার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম। এখন এই স্থান বৃটিশ রাজ্যের অন্তর্গত এবং ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারীর অন্তর্নিবিষ্ট।

মায়া ;---(৭ পৃঃ - ৮ পংক্তি)। মায়াপুর, ইহা হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী। চীন পরিব্রাজক হোয়েন চুয়ং এই স্থানকে 'ম-য়ু-লো' নামে আখ্যাত করিয়াছেন। ইহা হিন্দুর তীর্থস্থান, গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এই স্থানে মায়াদেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন ; এই দেবীমূর্ত্তির তিনটী মস্তক ও চারিখানা হস্ত। এক হস্তে চক্র, এক হস্তে মুণ্ড এবং অপর হস্তে ত্রিশূল ধারণ করিয়া দেবী, একটী পরাজিত মূর্ত্তিকে বিনাশ করিতে উদ্যতা। এতদ্ব্যতীত এখানে নারায়ণ শিলার একটী মন্দির আছে।

এই স্থানে একটী পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা বেণ রাজার নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। বহু পুরাতন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিয়া বুঝা যায়, এই স্থানটি অনেক প্রাচীন, এবং এককালে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল।

মেখল বা মেখলী ;---(৬ পৃঃ - ৭ পংক্তি)। ইহা মণিপুর রাজ্যের নামান্তর। এই দেশকে সাধারণতঃ 'মেখল দেশ' এবং অধিবাসীকে 'মেখলী'

বা 'মিতাই' বলে। ভারত যুদ্ধে উপস্থিত রাজগণের মধ্যে মেখলী রাজার নাম পাওয়া যায়, যথা ;---

"প্রাগজ্যোতিষাদনু নৃপঃ কোশলোহথ বৃহদ্বলঃ।
মেকলৈঃ কুরুবিন্দে চ ত্রিপুরৈশ্চ সমন্বিতঃ।।"

এখানকার রাজবংশ বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া পরিচিত। এই প্রদেশের লোক সাধারণতঃ বলিষ্ঠ, সাহসী ও যোদ্ধা। মণিপুরীগণের স্বতন্ত্র একটী ভাষা আছে, এবং এই ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট উপাখ্যান রচিত হইয়াছে। মণিপুরে অনেক বিষয়ে বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাজ্যের পার্ব্বত্য অরণ্যে উৎকৃষ্ট টাটু ঘোড়া (Pony) পাওয়া যায়। এখানকার গো, মহিষ ও কুক্কুর অন্য দেশীয় তত্তৎ জাতীয় প্রাণী হইতে স্বতন্ত্র রকমের।

মণিপুরীগণ বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। এতদ্দেশীয় নরনারী সকলেই সঙ্গীত নিপুণ। মণিপুরী মহিলাগণের রাস-লীলার অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের শিল্পকার্য্যে অসাধারণ নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

মেহেরকুল ;---(৫৬ পৃঃ, --- ২ পংক্তি)। আধুনিক কুমিল্লা ও তৎসন্নিহিত স্থান সমূহ লইয়া একটী স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, এই রাজ্যের রাজধানী সম্ভবতঃ কমলাঙ্গ নগরে (কুমিল্লায়) প্রতিষ্ঠিত ছিল। চীন পরিব্রাজক হিয়োন সঙং সমতট (বঙ্গ) রাজ্যের পূর্ব্বদক্ষিণ ভাগে কমলাঙ্ক নগর অবস্থিত দেখিয়াছিলেন ; ইহা সাগর তীরবর্ত্তী দেশ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সম্ভবতঃ দাশরাজগণ কর্ত্তৃক এই রাজ্য শাসিত হইতেছিল, এবং 'মেহেরকুল' রাজ্য নামে অভিহিত হইত। ময়নামতীর গানে পাওয়া যায়, কুমিল্লায় পশ্চিম দিকস্থ পাটিকা (পাটিকারা) নগরে থাকিয়া ময়নামতী মেহেরকুলের রাজার প্রতি শাসনবাক্যে বলিয়াছিলেন ;---

"ক্ষেণেক রহ বসুমতী ক্ষেণেক রহ তুমি।
মেহেরকুলের রাজাকে প্রত্যক্ষ দেখাই আমি।"

কিয়ৎকালের নিমিত্ত পাটিকারা ও মেহেরকুল উভয় প্রদেশই ময়নামতীর পিতা তিলকচন্দ্রের হস্তগত হইয়াছিল, পরে তাঁহার দৌহিত্র (ময়নামতীর পুত্র) গোবিন্দচন্দ্র তাহা উত্তরাধিকারী সূত্রে লাভ করেন। ময়নামতীর গানে এতদ্বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

ছেংথুম ফা (কীর্ত্তিধর) ত্রিপুরার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকা কালে, মেহেরকুল বঙ্গরাজ্যের অধীন ছিল এবং হীরাবন্ত নামক একজন চৌধুরী কর্ত্তৃক এই রাজ্য শাসিত হইত। মহারাজ কীর্ত্তিধর গৌড়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া মেহেরকুলসহ, মেঘনা নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। কালক্রমে উক্ত

স্থান মুসলমানগণের হস্তগত হইয়া, মেহেরকুল একটি পরগণায় পরিণত হইয়াছে। এই স্থান এখন ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। কুমিল্লা নগরী এই পরগণার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ম্লেচ্ছ ;—(২০ পৃঃ - ৮ পংক্তি)। ধর্ম্মজ্ঞান বিরহিত জাতিই সাধারণতঃ ম্লেচ্ছসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহাদের অধ্যুষিত জনপদ ম্লেচ্ছদেশ নামে অভিহিত। শাস্ত্র গ্রন্থে ম্লেচ্ছের নিম্নলিখিত রূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ;---

"গোমাংস খাদকো যশ্চ বিরুদ্ধং বহুভাষতে।
সর্ব্বাচার বিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে।।"

প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব।

মহাভারতে পৌণ্ড্র, কিরাত, যবন, সিংহল, বর্ব্বর, খস, চিবুক, পুলিন্দ, চীন, হূণ, কেরল প্রভৃতি ম্লেচ্ছ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। যযাতি নন্দন অনুর বংশধরগণ ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ত্রিপুর রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী জয়ন্তী প্রভৃতির ম্লেচ্ছ আখ্যা লাভের কথা স্থানান্তরে বলা হইয়াছে।

যবন ;---(৫ পৃঃ - ১৫ পংক্তি)। মৎস্য পুরাণের মতে নিম্নলিখিত জাতিগুলি যবন দেশোদ্ভব বলিয়া যবন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে ;---

"তান্ দেশান্ প্লাবয়তি স্ম ম্লেচ্ছা প্রায়াশ্চ সর্ব্বশঃ।
সশৈলান্ কুকুরান্ রৌধ্রান্ বর্ব্বরান্ যবনান্ খসান্।।"

মৎস্য পুরাণ---১২০।৪৩।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ (৫৮।৫২) ও মৎস্য পুরাণ (৩৪ অঃ) মতে যযাতি পুত্র তুর্ব্বসুর বংশধরগণ সদাচার বিহীন যবন হইয়াছিলেন। কেহ কেহ গ্রীক্ জাতিকেও যবন বলিয়া থাকেন।

যবনগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত প্রদেশ, যবনদেশ নামে অভিহিত।

যশপুর ;---(৬৯ পৃঃ - ৫ পংক্তি)। ইহা ত্রিপুর রাজ্যে বিলনীয়া বিভাগের অন্তর্গত নলুয়া তহশীল কাছারীর সন্নিহিত গ্রাম। বর্ত্তমান কালে বৃটিশ রাজ্যে পতিত হইয়াছে।

রত্নপুর ;---(৬৯ পৃঃ - ৫ পংক্তি)। ইহা উদয়পুরের যে স্থান বর্ত্তমান কালে 'মহাদেব বাড়ী' নামে প্রসিদ্ধ, তাহার প্রাচীন নাম রত্নপুর। স্বর্গীয় মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্যের শাসনকালে তিনি পিতার স্মৃতি-কল্পে এই স্থানের 'রাধাকিশোরপুর' নাম করিয়াছেন।

রয়াং ;---(৩২ পৃঃ - ১৬ পংক্তি)। রিয়াং প্রদেশ। এই স্থান ত্রিপুর

রাজ্যের অন্তর্গত গোমতী নদীর উৎপত্তি স্থানের পূর্ব্বদিকে মাইনি নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত। যথা ;---

"গোমতী নদীর যথাতে উৎপত্তি।
ডমরু নামেতে তীর্থ জান তান খ্যাতি।
তার পূর্ব্বেতে টিলা মায়োনী নাম ধরে।
রিহাঙ্গ বসতি ছিল সে নদীর তীরে।"

কৃষ্ণমালা

মাইনি নদী বহুদূর ঘুরিয়া চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী নদীতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। এই নদীর তীরবর্ত্তী স্থান এখনও মাইনি নামে প্রখ্যাত। এই স্থানে পূর্ব্বে রিয়াং জাতির বাস ছিল। সমগ্র পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম এককালে রিয়াং কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ছিল ; মঘগণ সেই স্থান হইতে রিয়াংদিগকে বিতাড়িত করিয়া, আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করে।

কৃষ্ণমালা আলোচনায় জানা যায়, মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য (যুবরাজ থাকা কালে) সমসের গাজী কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া কিয়ৎকাল রিয়াংপ্রদেশে অবস্থান ও তথায় এক পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।*

রাঙ্গামাটী ;---(৩২ পৃঃ - ১৭ পংক্তি)। ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর পূর্ব্বে রাঙ্গামাটী নামে অভিহিত হইত। এই স্থান গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। পূর্ব্বকালে এই স্থান মঘ জাতীয় লিকা সম্প্রদায়ের রাজার শাসনাধীন ছিল। ত্রিপুরেশ্বর হিমতি (যুঝারু ফা) এই স্থান জয় করিয়া স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। রাজমালায় লিখিত আছে ;---

"এই মতে রাঙ্গামাটি ত্রিপুরে লইল।
নৃপতি যুঝার পাট তথাতে করিল।"

তদবধি এই স্থান ত্রিপুর রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। মহারাজ উদয় মাণিক্যের শাসনকালে স্থানের নাম রাঙ্গামাটীর পরিবর্ত্তে 'উদয়পুর' করা হয়। রাজমালায় পাওয়া যায় ;---

"রাঙ্গামাটী নাম রাজ্য পূর্ব্বাবধি ছিল।
উদয়মাণিক্যাবধি উদয়পুর হৈল।"

উদয়মাণিক্য খণ্ড।

* "রিহাঙ্গেতে গিয়া যুবরাজ কৃষ্ণমণি।
আশ্বাসিল সকল ত্রিপুরগণ আনি।
মায়োনী নদীর তীরে পুরী নির্ম্মাইয়া।
তথা রহে যুবরাজ হরষিত হৈয়া।।"

কৃষ্ণমালা।

এতৎ সম্বন্ধে শ্রেণীমালা গ্রন্থে লিখিত আছে ;---

"গোপীপ্রসাদ নারায়ণ পূর্ব্বে নাম ছিল।
উদয়মাণিক্য নামে নৃপতি হইল।।
রাঙ্গামাটী নাম দেশ ছিলেক পূর্ব্বের।
উদয়পুর আপন নামে করিল দেশের।।"

এই উদয়পুর পীঠস্থান বলিয়া হিন্দু জগতে বিশেষ পরিচিত ও আদৃত। এখানে সতীর দক্ষিণ পদ পতিত হইয়াছিল। এই পীঠের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রদান করা হইয়াছে।

এই স্থান ত্রিপুর রাজ্যের একটী উপরিভাগে পরিণত হইয়াছে। এখানে বিভাগীয় আফিস, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, স্কুল, ডাক্তারখানা, ডাকঘর, পুলিশথানা, তহশীল কাছারী ইত্যাদি স্থাপিত আছে।

প্রতি বৎসর শিব চতুর্দ্দশী উপলক্ষে এখানে একটী মেলা বসিয়া থাকে।

চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশে বর্ত্তমানকালে যে রাঙ্গামাটী নামক স্থান পাওয়া যায়, সেকালে তাহা পূর্ব্বোক্ত রাঙ্গামাটির অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। শেষোক্ত রাঙ্গামাটীর সহিতও ত্রিপুর রাজ্যের সম্বন্ধ থাকিবার বিষয় ; ইতিপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

বঙ্গদেশে আরও রাঙ্গামাটীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তাহার সহিত রাজমালার কিম্বা ত্রিপুর রাজ্যের কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিবার সম্ভাবনা অতি বিরল।

রাজনগর ;---(৬২ পৃঃ - ৫ পংক্তি)। এই স্থান উদয়পুরের সন্নিহিত গোমতী নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত। এখনও এই স্থান রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে ; মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য উক্ত বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

মহারাজ ডাঙ্গর ফা স্বীয় পুত্রগণের মধ্যে রাজ্য বিভাগকালে জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা ফাকে এই স্থান অর্পণ করিয়াছিলেন। রাজমালায় উক্ত হইয়াছে ;---

"রাজাফা নামেতে পুত্র রাজার প্রধান।
রাজা করিল তাকে রাজনগর স্থান।"

এই রাজবাড়ী গোমতী নদীর তীরবর্ত্তী উন্নত শৈলশৃঙ্গে অবস্থিত। এখান হইতে বহুদূরবর্ত্তী স্থান দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহা পর্ব্বত-প্রাচীর ও নদীপরিখা দ্বারা সুরক্ষিত দুরাক্রমনীয় দুর্গ বিশেষ।

লাঙ্গাই ;---(৩২ পৃঃ, - ১৫ পংক্তি)। এই স্থান ত্রিপুর রাজ্যের পূর্ব্ব উত্তর প্রান্তে লঙ্গাই নদীর তীরে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থান কুকিগণের আবাসভূমি ছিল। যুবরাজ কৃষ্ণমণি (পরে কৃষ্ণমাণিক্য) মুসলমান কর্ত্তৃক অত্যাচারিত

হইয়া এখানে 'বঙ্' সম্প্রদায়ের কুকিপল্লীতে সসৈন্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যথা ;---

"লঙ্গাই নদীর তীরে বঙ্ পাড়া ছিল।
সৈন্য সমে যুবরাজ তথা উত্তরিল।।"
কৃষ্ণমালা।।

লঙ্গাই নদী বর্ত্তমান সময়ে আসামের সহিত ত্রিপুর রাজ্যের সীমা বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে। উক্ত নদীর পরপারস্থিত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ লইয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত ত্রিপুরার দীর্ঘকাল ব্যাপী বিবাদ চলিয়াছে ; অদ্যাপি তাহার মীমাংসা হয় নাই। বিষয়টি ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্টের আলোচনাধীন আছে।

লিকাপাড়া ;---(৫০ পৃঃ - ২৩ পংক্তি)। এই স্থান রাঙ্গামাটীর (উদয়পুরের) পূর্ব্বদিকে লিকাছড়ার তীরে অবস্থিত। রাজামালায় পাওয়া যায়,---

"অরণ্যের পূর্ব্ব ভাগে লিকানামে ছড়া।
যত আছে ছড়াকুল লিকাদফা পাড়া।।"
যুঝার ফা খণ্ড---৫০ পৃষ্ঠা।

এই স্থানে লিকা সম্প্রদায়ের মঘগণের বসত ছিল, রাঙ্গামাটীও তৎকালে ইহাদের অধিকারে থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সমার ;---(৬৬ পৃষ্ঠা---২৮ পংক্তি)। গোমতী নদীর উৎপত্তি স্থানের (তম্বুরের পূর্ব্বদিকে সমার নদী ও তাহার তীরে সমার নামক স্থান ছিল। এইস্থানে রিয়াং জাতির বাস থাকিবার কথা কৃষ্ণমালায় পাওয়া যায়,---

"সমার নদীর তীরে রিয়াঙ্গের রায়।
আছে হেন বার্ত্তা তথা চর মুখে পায়।।"

স্বর্ণগ্রাম ;---(৬৮ পৃঃ --- ৭ পংক্তি)। ইহাকে সুবর্ণগ্রামও বলে ; ডাক নাম সোণার গাঁও। আধুনিক ঢাকা জেলার, নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত সোণারগাঁও পরগণায় এই স্থান অবস্থিত।

ঢাকার ইতিহাসে সুবর্ণ গ্রাম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কতিপয় কথা লিখিত আছে ;
---

(১) "জনশ্রুতি যে মহারাজ দ্রুহ্যুর অনন্তর বংশ্য মহারাজ জয়ধ্বজের সময়ে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের উপর সুবর্ণ বর্ষিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা সুবর্ণগ্রাম আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।"*

(২) "ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী ও লক্ষ্যা এই নদ, নদীত্রয়ের সম্মিলন স্থান ত্রিবেণী বলিয়া পরিচিত। কথিত আছে, যযাতির পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে মহাবল

* ঢাকার ইতিহাস—উপক্রমনিকা, ৯ পৃষ্ঠা।

পরাক্রান্ত তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্য কিরাত ভূপতিকে রণে পরাঙ্মুখ করিয়া কোপল (ব্রহ্মপুত্র) নদের তীরে ত্রিবেগ বা ত্রিবেণী নগর সংস্থাপন পূর্ব্বক তথায় স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।''*

(৩) ''বন্দরে চৌধুরীগণের অধ্যুষিত ভদ্রাসন, রাজা কৃষ্ণদেব প্রদত্ত বলিয়া, রাজবাড়ী নামে প্রসিদ্ধ। আমাদের মতে উহা দ্রুহ্যুর অধস্তন বংশীয় কোনও রাজার বাস হইতে রাজবাড়ী আখ্যা প্রাপ্ত হয়। রাজার প্রদত্ত বলিয়া নাম রাজবাড়ী হওয়া সম্ভবপর নহে।''†

উদ্ধৃত প্রথম কথার আলোচনায় পরিদৃষ্ট হয়, ত্রিপুর রাজবংশে জয়ধ্বজ নামক কোন রাজা ছিলেন না। ধ্বজমাণিক্য ও জয়মাণিক্য নামক দুইজন রাজার নাম বংশলতায় পাওয়া যায়। ইঁহারা অনেক পরবর্ত্তী কালের রাজা, ইঁহাদের রাজধানী রাঙ্গামাটিতে (বর্ত্তমান উদয়পুর) ছিল। এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে ত্রিপুর ভূপতিগণই দ্রুহ্যুর বংশধর, এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান কালে ঐ বংশের উপর অন্য দাবিদার নাই। ঢাকার ইতিহাসে কথিত জনশ্রুতি ত্রিপুরেশ্বরগণের প্রতি আরোপিত হইবার উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না।

দ্বিতীয় কথার আলোচনায় দেখা যায়, দ্রুহ্যুর অধ্যুষিত ত্রিবেগ স্বর্ণগ্রাম নহে। আমরা পূর্ব্বভাষে এবিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, এস্থলে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

তৃতীয় কথার আভাস রাজমালায় পাওয়া যায়। মহারাজ বিজয়মাণিক্য দিগ্বিজয় যাত্রাকালে কিয়দ্দিবস সুবর্ণগ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে পাঁচ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন, তদবধি একটী জনপদের নাম 'পঞ্চদ্রোণ' হইয়াছে ;---চলিত ভাষায় এই স্থান অদ্যাপি 'পাঁচদোণা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু তিনি স্থায়ীভাবে এই স্থানে বাস্তব্য করেন নাই। ইহার পূর্ব্বে মহারাজ রত্নমাণিক্য সুবর্ণগ্রাম হইতে কতিপয় বাঙ্গালী আনিয়া আপন রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। এবং সময় সময় ত্রিপুরেশ্বরগণের সুবর্ণগ্রাম বিজয় করিবার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়, কিন্তু তথায় কখনও ত্রিপুরার রাজধানী স্থাপনের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না।

* ঢাকার ইতিহাস---১ম খণ্ড, ২৪শ অঃ, ৪৭২ পৃষ্ঠা।

† ঢাকার ইতিহাস—১ম খণ্ড, ২৪শ অঃ, ৪৮৮ পৃষ্ঠা।

রাজমালার সমালোচক রেভারেণ্ড জেম্‌স লঙ্ সাহেব সুবর্ণগ্রামের সহিত ত্রিপুরার পূর্ব্বোক্তরূপ সম্বন্ধের আভাস প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন ;—

"Samsher jung obtained the government and agreed to pay the revenue without any delay, but the people not recognising him as the legitimate heir, he then installed as Raja one of the Tripura familly who resided at Sonargan, but they still refused."*

এই উক্ত আলোচনা করিলে স্বতঃই মনে হয়, সুবর্ণগ্রামে ত্রিপুরার রাজধানী থাকিবার কথা সত্য, এবং পরবর্ত্তী কালেও তথায় রাজবংশের একটী শাখা বিদ্যমান ছিল ; সমসের গাজি সেই বংশ হইতেই একজন রাজা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু একথা নিতান্তই ভিত্তিহীন। সমসের গাজী যাঁহাকে সাক্ষীগোপাল রাজা করিয়াছিলেন, তিনি মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের পৌত্র, উদয়পুর হইতে তাঁহাকে নেওয়া হইয়াছিল, যথা ;—

"দুহানকে তথা রাখি কটক সহিত।
সমসের গাজি গেল আপনা বাড়ীত।।
তথা গিয়া বিবেচনা করিলেক সারা।
না হইলে ত্রিপুর রাজা না মিলে ত্রিপুরা।।
ভুবনে বিখ্যাত ধর্ম্মমাণিক্য নৃপতি।
গদাধর ঠাকুর যে তাহার সন্ততি।।
লবঙ্গ ঠাকুর গদাধরের সন্ততি।
উদয়পুরেতে তিনি করয়ে বসতি।।
তাহাকে করিব রাজা রিহাঙ্গেতে গিয়া।
তবে সে ত্রিপুর সব মিলিব আসিয়া।।
এত ভাবি লবঙ্গ ঠাকুরের কারণ।
উদয়পুরেতে লোক পাঠাইল তখন।।
লোক আসি লবঙ্গ ঠাকুরকে লইয়া।
উপস্থিত হইলেক রিহাঙ্গেতে গিয়া।।
লক্ষ্মণ মাণিক্য নাম তখনে করিয়া।
রাজা করিলেক তানে রিহাঙ্গেতে গিয়া।।"

কৃষ্ণমালা।

---

* J. A. S. B--Vol. XIX

এই লবঙ্গ ঠাকুর (লক্ষ্মণমাণিক্য) মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইবার পর, সুবর্ণগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজমালায় পাওয়া যায়,---

"রিহাঙ্গ হইতে লক্ষ্মণ মাণিক্য রাজন।
স্বর্ণগ্রামে কত দিন আছিল তখন"।। লক্ষ্মণ মাণিক্য খণ্ড।

এই লক্ষ্মণমাণিক্যের সুবর্ণগ্রামস্থিত বাড়ীকেই রাজবাড়ী বলা হয়।

ত্রিপুরার রাজধানী সুবর্ণগ্রামে না থাকিলেও তথায় যে প্রাচীনকালে হিন্দু নৃপতির রাজপাট স্থাপিত ছিল, একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে লক্ষ্মণ সেন নদীয়া হইতে পলায়ন করিয়া সুবর্ণগ্রামে আসিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, তিনি রামপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১২৮০ খৃঃ অব্দে সুবর্ণ গ্রামের সিংহাসনে লক্ষ্মণ সেনের পৌত্র দনৌজরায় বা দনৌজমাধব নামক রাজা বিদ্যমান ছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে এইস্থান মুসলমানগণের কুক্ষিগত হয়।

হরিদ্বার ;---(৭ পৃঃ --- ১০ পংক্তি)। ইহা হিন্দুর একটী তীর্থস্থান। এই স্থান উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সাহারাণপুর জেলার অন্তর্গত, গঙ্গা তীরে অবস্থিত।

হরিদ্বার অপেক্ষাকৃত আধুনিক নাম ; পূর্ব্বে ইহা 'কপিল' নামে অভিহিত হইত। এইস্থানে কপিল মুনির তপোবন ছিল। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র যাত্রী এই পবিত্র তীর্থে গমন করিয়া থাকে। প্রতি বার বৎসর অন্তর এই স্থানে কুম্ভমেলা হয়। এই পুণ্যক্ষেত্র সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে লিখিত আছে ;---

"সর্ব্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু দুর্ল্লভা।
হরিদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে।।
সবাসবাঃ সুরাঃ সর্ব্বে হরিদ্বারং মনোরমং।
সমাগত্য প্রকুর্ব্বন্তি স্নান দানাদিকং মুনে।।
দৈব যোগান্মুনে তত্র যে ত্যজন্তি কলেবরং।
মনুষ্য পক্ষী কীটাদ্যাস্তে লভন্তে পরং পদং।।"

মর্ম্ম ;---"সকলস্থানেই গঙ্গা সুলভ কিন্তু হরিদ্বার, প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগর সঙ্গম, এই তিন স্থানে গঙ্গা অতি দুর্ল্লভ। ইন্দ্রাদি দেবগণ এই হরিদ্বারে সমাগত হইয়া স্নান দানাদি করিয়া থাকেন। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি যে কোন প্রাণী এই স্থানে দেহত্যাগ করে, তাহারা পরম পদ লাভ করিয়া থাকে।"

এই তীর্থ হরিপ্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ বলিয়া ইহার নাম হরিদ্বার। এইস্থান গঙ্গাদ্বারা নামেও অভিহিত হয়। গঙ্গা এইস্থান হইতে অবতীর্ণা হইয়াছেন বলিয়া উক্ত নাম হইয়াছে। গঙ্গাস্নান এবং পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ ও দানই এই তীর্থে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য।

হস্তিনা ;---(৫ পৃষ্ঠা, --- ১৩ পংক্তি)। চন্দ্রবংশীয় হস্তী নামক রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নগর, হস্তিনাপুর। উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ ঘীরাট জেলায় অবস্থিত। এইস্থানে পাণ্ডবগণের রাজধানী ছিল।

হীরাপুর ;---(৬৯ পৃঃ --- ৬ পংক্তি)। এইস্থান ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর নগর উপকণ্ঠে, পূর্ব্বদিকে একক্রোশ দূরে অবস্থিত। ইহা গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী। এই স্থানের নাম পূর্ব্বে লক্ষ্মীপুর ছিল, উদয়মাণিক্যের রাণী সেই নামের পরিবর্ত্তে হীরাপুর নাম করেন ; যথা ;---

"হীরাপুর নাম পূর্ব্বে লক্ষ্মীপুর ছিল।
উদয় মাণিক্য রাণী হীরাপুর কৈল।।"
রাজমালা।

মহারাজ বিজয়মাণিক্য এইস্থানে তাঁহার মহিষীকে বনবাস দিয়াছিলেন। রাজমালায় লিখিত আছে ;---

"সেইক্ষণে মহাদেবী দিল বনবাস।
হীরাপুরে রাখে রাণী জীবনে নৈরাস।"
বিজয় মাণিক্য খণ্ড।

এখানে ত্রিপুরেশ্বরগণের অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। স্থানটী সেকালে রাজধানীরই অন্তর্গত ছিল।

হেড়ম্ব ;---(১১ পৃঃ --- ১৬ পংক্তি)। ইহা কাছাড়ের নামান্তর। হিড়িম্ব রাক্ষসের সহোদরা, হিড়িম্বা কাছাড় রাজবংশের আদি মাতা বলিয়া মহাভারত আলোচনায় জানা যায়। হিড়িম্বার বংশধরগণের শাসনাধীন ছিল বলিয়া স্থানের নাম হেড়ম্ব হইয়াছে। ভবিষ্য পুরাণীয় ব্রহ্মখণ্ডে হেড়ম্বের নাম প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা,---

"বরেন্দ্র তাম্রলিপ্তঞ্চ হেড়ম্ব মণিপুরকম্।
লৌহিত্যস্ত্রৈপুরং চৈব জয়ন্তাখ্যং সুসঙ্গকম্।।"
ভবিষ্যপুরাণ---ব্রহ্মখণ্ড, (৬।৬৪)

এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম রণচণ্ডী। একথাও ভবিষ্য পুরাণে পাওয়া যাইতেছে ;

"হেড়ম্বদেশমধ্যে চ রণচণ্ডী বিরাজতে।
বরবক্রা সরিৎ, পার্শ্বে হিড়িম্বা লোক দুর্জ্জয়া।"
ভবিষ্যপুরাণ---ব্রহ্মখণ্ড (২২।৪১)।

ঘটোৎকচ এখানকার প্রথম রাজা। দেশাবলীতে লিখিত আছে—"হেড়ম্ব দেশের প্রথম রাজা ঘটোৎকচ, তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কর্ণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিলে তৎপুত্র বর্ব্বরীক এখানকার রাজা হন।" কাছাড়ের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী কমিশনার এড্গার সাহেবের মতে, নির্ভরনারায়ণ কাছাড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

এড্গার সাহেবের মত কাছাড় রাজ্যের প্রাচীনত্ব নির্দ্ধারণের পরিপন্থী। এই রাজ্য যে বহু প্রাচীন, তাহা রাজমালা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। মহারাজ ত্রিলোচন হেড়ম্বের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং ত্রিলোচনের জ্যেষ্ঠ পুত্র দৌহিত্র সূত্রে হেড়ম্বরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সুতরাং এই রাজ্য যে সুপ্রাচীন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। এককালে এই রাজ্যের দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রম ছিল। মহারাজ গোবিন্দ চন্দ্র এখানকার শেষ রাজা। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে ইহা ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

রাজমালা প্রথম লহরে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(বর্ণমালানুক্রমিক)

অনু ;---(৫ পৃষ্ঠা, --- ৫ পংক্তি)। ইনি ভারত সম্রাট যযাতির চতুর্থ পুত্র। ইঁহার জননী, দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা। যযাতি শুক্রশাপে জরাগ্রস্ত হওয়ায়, অনুকে জরাভার গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। অনু্য পিতৃআজ্ঞা পালনে অসম্মত হওয়ায় যযাতি ইঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন।

আগর ফা ;---(৬২ পৃঃ --- ১৪ পংক্তি)। ইনি মহারাজ ডাঙ্গর ফা এর পুত্র। ডাঙ্গর ফা এর অষ্টাদশ পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ রত্ন ফাকে গৌড়ে পাঠাইয়া, অবশিষ্ট সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তৎকালে আগর ফা আগরতলায় রাজত্ব পাইলেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই রত্ন ফা গৌড়েশ্বরের সাহায্য পিতাকে সিংহাসনচ্যুত ও ভ্রাতৃবর্গকে অবরুদ্ধ করিয়া রাজ্যেস্বর হইয়াছিলেন। এই রত্ন ফা পরে রত্নমাণিক্য নামে খ্যাত হইয়াছেন।

আচঙ্গ ফা ;---(৪২ পৃঃ --- ১৯ পংক্তি)। নামান্তর সুরেন্দ্র বা হাচং ফা। ইনি চন্দ্র হইতে গণনায় ৯৯ সংখ্যক ও ত্রিপুর হইতে গণনায় ৫৪ স্থানীয় ভূপতি। ইঁহার পিতা মহারাজ ইন্দ্রকীর্ত্তির পরলোক গমনের পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বীরসিংহ সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে, আচঙ্গ ফা সিংহাসনের অধিকারী হন। ইহার অধিক কোন বিবরণ রাজমালায় পাওয়া যায় না। ইঁহার পরলোক গমনের পর তৎপুত্র বিমার রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন।

আচঙ্গফনাই ;---(৪২ পৃঃ --- ১৬ পংক্তি)। নামান্তর উত্তুঙ্গফণী বা ইন্দ্রকীর্ত্তি। ইনি মহারাজ সূর্য্যরায়ের পুত্র। পিতার পরলোক গমনের পর, রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন। ইনি চন্দ্র হইতে গণনায় ৯৭ ও ত্রিপুর হইতে গণনায় ৫২ স্থানীয়। ইঁহার শাসনকালের কোনও বিবরণ রাজমালায় পাওয়া যায় না। পুত্র বীরসিংহের (নামান্তর চরাচর) হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ইনি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আচোঙ্গ ফা ;---(৫৯ পৃঃ --- ১১ পংক্তি)। নামান্তর রাজসূর্য্য বা কুঞ্জহোম্ ফা। ইনি মহারাজ কীর্ত্তিধরের (নামান্তর ছেংথুম ফা) পুত্র। ইঁহার মহিষীর নাম আচোঙ্গ মা। এই সময় হইতে কতিপয় রাজার শাসনকাল পর্য্যন্ত রাজা ও রাণীর এক নাম পাওয়া যায়। মহারাজ আচোঙ্গ ফা এই নিয়মের প্রবর্ত্তক। ইনি চন্দ্র হইতে গণনায় ১৪১ স্থানীয় এবং ত্রিপুরের অধস্তন ৯৫ সংখ্যক ভূপতি। ইঁহার পরলোক গমনের পর তৎপুত্র খিচুং ফা (নামান্তর মোহন) ত্রিপুর সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।

আচোঙ্গ মা ;---(৫৯ পৃঃ ---১৯ পংক্তি)। ইনি মহারাজ আচোঙ্গ ফা-এর মহিষী। পতি বিয়োগের পর ইহার পুত্র খিচুং ফা (নামান্তর মোহন) রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন।

ইন্দ্রকীর্ত্তি ;---(৪৫ পৃঃ, ---১৮ পংক্তি)। ইনি মহারাজ নরেন্দ্রর পুত্র। চন্দ্র হইতে গণনায় ১০৮ ও ত্রিপুর হইতে গণনায় ৬৩ স্থানীয়। ইঁহার শাসনকালের কোন বিবরণ রাজমালায় নাই। ইঁহার পরে তৎপুত্র বিমান (নামান্তর পাইমারাজ) ত্রিপুর রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছেন।

ঈশ্বর ফা ;---(৪০ পৃঃ, ---২ পংক্তি)। নামান্তর নীলধবজ। ইনি মহারাজ যোগেশ্বরের পুত্র। চন্দ্র হইতে গণনায় ৭৩ ও ত্রিপুর হইতে গণনায় ২৮ স্থানীয় অধস্তন পুরুষ। ইনি ৮৪ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া, পুত্র বসুরাজের (নামান্তর

রঙ্গ্খাই) হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিয়া পরলোক গমন করেন। এতদতিরিক্ত কোন বিবরণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই।

কতর ফা ;---(৪০ পৃঃ ---১৬ পংক্তি)। নামান্তর কাশীরাজ। ইনি হরিরাজের (নামান্তর খাহাম) পুত্র। চন্দ্র হইতে অধস্তন ৮৪ ও ত্রিপুর হইতে ৩৯ স্থানীয়। ইনি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ও ধার্ম্মিক ছিলেন। ইঁহার পরলোক গমনের পর, তদীয় পুত্র কালাতর ফা (নামান্তর মাধব) রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন।

কমল রায় ;---(৫৩ পৃঃ ---১৯ পংক্তি)। ইনি মহারাজ মুকুন্দ ফা বা কুন্দ ফা এর পুত্র। চন্দ্র হইতে অধস্তন ১২৭ ও ত্রিপুর হইতে ৮২ স্থানীয়। ইঁহার শাসন বিবরণী বর্ত্তমান কালের অগোচর। ইঁহার পরলোক গমনের পর, তদাত্মজ কৃষ্ণদাস রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কালাতর ফা ;---(৪০ পৃঃ --- ১৭ পংক্তি)। নামান্তর মাধব। ইনি মহারাজ কাশীরাজের (নামান্তর কতর ফা) পুত্র। চন্দ্র হইতে ৮৫ ও ত্রিপুর হইতে ৪০ স্থানীয়। ইঁহার স্বজাতির প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। পুত্র চন্দ্র ফা এর (নামান্তর চন্দ্ররাজ) হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ইনি লোকান্তর প্রাপ্ত হন।

কুন্দ ফা ;---(৫৩ পৃঃ, ---১৮ পংক্তি) নামান্তর মুকুন্দ ফা। ইনি মহারাজ ললিত রায়ের আত্মজ ; চন্দ্র হইতে অধস্তন ১২৬ ও মহারাজ ত্রিপুর হইতে গণনায় ৮১ স্থানীয়। ইঁহার শাসন বিবরণী জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। কুন্দ ফাওর লোকান্তরের পর তৎপুত্র কমল রায় পিতৃ সিংহাসনে আরূঢ় হন।

কুমার ;---(৪২ পৃঃ ---২১ পংক্তি)। ইনি মহারাজ বিমারের পুত্র। চন্দ্র হইতে গণনায় ১০১ স্থানীয় ও মহারাজ ত্রিপুরের অধস্তন ৫৬ স্থানীয় রাজা। ইনি শিব আরাধনার নিমিত্ত ছাম্বুলনগরে রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। পুরাকালে কৈলাসহর এবং ঊনকোটী পর্ব্বত ছাম্বুলদেশ নামে অভিহিত হইত, সমগ্র অবস্থা আলোচনায় ইহাই প্রমাণিত হইতেছে ; এবিষয়ে আমরা ইতিপূর্ব্বে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। বরবক্র তীর হইতে ইনিই কৈলাসহরে আসিয়া স্বতন্ত্র রাজধানী স্থাপন করেন। ইঁহার পুত্র সুকুমার পৈত্রিক সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস ;---(৫৩ পৃঃ --- ২০ পংক্তি)। মহারাজ কমলরায়ের পুত্র। চন্দ্রের অধস্তন ১২৮ ও ত্রিপুরের অধস্তন ৮৩ স্থানীয় রাজা। ইঁহার দুই রাণীর

গর্ব্ভে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ; তন্মধ্যে ছোট মহারাণীর গর্ব্ভজাত যশ ফা রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন।

খারঙ্গ ফা ;---(৫৩ পৃঃ ---১৪ পংক্তি)। নামান্তর রামচন্দ্র বা কুরুঙ্গ ফা। ইনি প্রসিদ্ধ যজ্ঞকর্ত্তা মহারাজ কিরীটের (দানকুরু ফা বা হরিরায়) পুত্র। চন্দ্রে পরবর্ত্তী ১২৩ ও ত্রিপুরের অধস্তন ৭৮ স্থানীয় রাজা। শাসন বিবরণী জানিবার কোনও সূত্র পাওয়া যায় না। ইঁহার পর, তদীয় পুত্র নৃসিংহ (নামান্তর ছেংফণাই বা সিংহফণী) রাজ্য লাভ করেন।

খাহাম ;---(৪০ পৃঃ ---১৫ পংক্তি)। নামান্তর হরিরাজ। ইনি মহারাজ তরহামের পুত্র। চন্দ্র হইতে অধস্তন ৮৩ ও ত্রিপুর হইতে ৩৮ স্থানীয় রাজা। ইঁহার পরবর্ত্তী রাজা তৎপুত্র কতর ফা (নামান্তর কাশীরাজ)।

খিচোং ফা ;---(৫৯ পৃঃ, --- ২১ পংক্তি)। নামান্তর মোহন। ইনি আচঙ্গ ফা এর পুত্র। চন্দ্রের অধস্তন ১৪২ ও ত্রিপুরের পরবর্ত্তী ৯৭ স্থানীয় রাজা। শাসন বিবরণী পাওয়া যায় না। ইঁহার পরে তদাত্মজ হরিরায় (ডাঙ্গর ফা) সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন।

খিচোং মা ;---(৫৯ পৃঃ, --- ২২ পংক্তি)। ইনি মহারাজ খিচোং ফা এর মহিষী। শিল্প নৈপুণ্যের নিমিত্ত ইনি ত্রিপুর রাজ্যে চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন। ইঁহার প্রযত্নে রাজপরিবারে এবং রাজ্য মধ্যে নানাবিধ শিল্পকার্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। রাজপরিবারের শিক্ষাভার ইনি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে বিশেষ সুফল হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

গগন ;---(৪৯ পৃঃ, ৩ পংক্তি)। নামান্তর কাকুথ। ইনি মহারাজ মরিচীর পুত্র। চন্দ্র হইতে গণনায় ১৬৬ ও ত্রিপুর হইতে ৭১ স্থানীয় রাজা। রাজমালায় ইঁহার নামমাত্র উল্লেখ আছে, অন্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। গগনের অভাবে তৎপুত্র নওরায় রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন।

গঙ্গারাম ;---(৪৬ পৃঃ, --- ৪ পংক্তি)। নামান্তর রাজগঙ্গা। ইনি মহারাজ বঙ্গের আত্মজ। চন্দ্র হইতে ১১২ ও ত্রিপুর হইতে ৬৭ পুরুষ অন্তর ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পরবর্ত্তী রাজা, তৎপুত্র চিত্রসেন বা ছাত্রুরায়।

গজেশ্বর ;---(৪০ পৃঃ, ---২১ পংক্তি)। ইনি চন্দ্ররাজের পুত্র। চন্দ্র হইতে অধস্তন ৮৭ ও ত্রিপুর হইতে ৪২ স্থানীয় রাজা। ইঁহার শাসন বিবরণী দুষ্প্রাপ্য। পুত্র বীররাজকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রাখিয়া ইনি পরলোক গমন করেন।

চন্দ্র ফা ;---(৪০ পৃঃ, ---২০ পংক্তি)। নামান্তর চন্দ্ররাজ। ইনি মহারাজ মাধব বা কালাতর ফা এর পুত্র। বহুকাল রাজ্য ভোগের পর পুত্র গজেশ্বরের হস্তে

রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন।

চম্পা ;---(৫৪ পৃঃ, --- ১৩ পংক্তি)। নামান্তর চম্পকেশ্বর। মহারাজ সম্প্রাটের পুত্র। অন্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। ইঁহার অভাবে, তৎপুত্র মেঘরাজ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।

চরাতর ;---(৪২ পৃঃ, --- ১৭ পংক্তি)। নামান্তর চরাচর বা বীরসিংহ। ইনি মহারাজ ইন্দ্রকীর্ত্তির পুত্র। ইঁহার পুত্র না থাকায় ভ্রাতা সুরেন্দ্র (আচং ফা) রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন।

ছাক্রুরায় ;---(৪৬ পৃঃ --- ৫ পংক্তি)। নামান্তরত চিত্রসেন বা শুক্ররায়। ইনি মহারাজ গঙ্গারায়ের পুত্র। কোন ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে না। ইঁহার লোকান্তরের পর, পুত্র প্রতীত রাজপাট লাভ করিয়াছিলেন। ইনি চন্দ্র হইতে ১১৩ ও ত্রিপুর হইতে ৬৮ স্থানীয়।

ছেঙ্গাচাগ ;---(৫৪ পৃঃ, --- ১৫ পংক্তি)। নামান্তর ধর্ম্মধর বা ছেংকাচাগ। ইনি মেঘরাজের পুত্র। চন্দ্র হইতে ১৩৯ ও ত্রিপুর হইতে ৯৪ স্থানীয় ভূপতি। ইনি বেদজ্ঞ পণ্ডিত নিধিপতি দ্বারা কৈলাসহরে এক বিরাট যজ্ঞ সম্পাদন করাইয়াছিলেন। পুত্র ছেংথুম্ ফা (কীর্ত্তিধর) কে উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান রাখিয়া ইনি লোকলীলা সম্বরণ করেন।

ছেংথুম্ ফা ;---(৫৪ পৃঃ,--- ১৬ পংক্তি)। নামান্তর সিংহতুঙ্গ ফা বা কীর্ত্তিধর। ইনি মহারাজ ধর্ম্মধরের পুত্র। চন্দ্রের অধস্তন ১৪০ ও ত্রিপুরের অধস্তন ৯৫ স্থানীয়। হীরাবন্ত নামক মেহেরকুলের জনৈক চৌধুরী গৌড়েশ্বরের ভেট লইয়া গৌড়ে যাইতেছিলেন, মহারাজ ছেংথুম ফা সেই ভেট ও হীরাবন্তের রাজ্য কাড়িয়া লওয়ায়, সেই সূত্রে গৌড়ের সহিত তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। গৌড় বাহিনীর বিশালত্ব দেখিয়া মহারাজ ভীত ও যুদ্ধে বিরত হইয়াছিলেন, মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরীদেবীর উৎসাহে যুদ্ধ হয়। মহাদেবী স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়া, অরাতি শোণিতে রণক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া, জয়লাভ করিয়াছিলেন। ৬৫০ ত্রিপুরাব্দে এই যুদ্ধ হয়, তৎকালে মহারাজ কেশব সেন বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই যুদ্ধের ফলে মেহেরকুল রাজ্য জয় ও মেঘনার তীর পর্য্যন্ত ত্রিপুর রাজ্যের সীমা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। অন্তিমে স্বীয় পুত্র রাজসূর্য্য বা আচঙ্গ ফা এর হস্তে রাজ্য ভার অর্পণ করিয়া ছেংথুম ফা স্বর্গগামী হন।

---

* ইহা ত্রিপুরা ভাষা জাত। ছেং--তরবারী, থুম--খেলা। 'ছেংথুমফা' শব্দের অর্থ তরবারী খেলায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

ছেঙ্গফণাই ;---(৫৩ পৃঃ, ---১৫ পংক্তি)। নামান্তর নৃসিংহ বা সিংহফণী। ইনি রামচন্দ্রের (নামান্তর খারুং ফা) পুত্র। ইঁহার শাসনকালের কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। ইনি চন্দ্র হইতে ১২৪ ও ত্রিপুর হইতে ৭৯ স্থানীয় ভূপতি। ইঁহার পুত্র অভাবে ভ্রাতা ললিত রায় রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন।

জাঙ্গি ফা ;---(৫৩ পৃঃ, --- ২ পংক্তি)। নামান্তর রাজচন্দ্র বা জনক ফা। ইনি যুঝারু ফা এর পুত্র। চন্দ্র হইতে অধস্তন ১১৯ ও ত্রিপুর হইতে ৭৪ স্থানীয়। ইনি চতুর্দ্দশ দেবতার প্রতি বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন এবং রাজ্যের নানাস্থানে উক্ত দেবতার অর্চ্চনা করিয়াছেন। অন্তিমে পুত্র পার্থ বা দেবরায়ের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিয়া স্বর্গলাভ করেন।

ডাঙ্গর ফা ;---(৬০ পৃঃ, --- ৩ পংক্তি)। নামান্তর হরিরায়। ইনি মহারাজ মোহনের (খিচুং ফা) পুত্র। চন্দ্রের অধস্তন ১৪২ ও ত্রিপুরের অধস্তন ৯৭ স্থানীয়। ইনি রাজ্যের নানাস্থানে পুরী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইঁহার অষ্টাদশ পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ রত্ন ফাকে গৌড়ে প্রেরণ করিয়া, অপর সপ্তদশ পুত্রকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। কনিষ্ঠপুত্র গৌড়ের সাহায্য গ্রহণে পিতাকে বিতাড়িত ও ভ্রাতাগণকে অবরুদ্ধ করিয়া, সিংহাসন লাভ করেন। পলায়নপর ডাঙ্গর ফা থানাংচি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, সেইস্থানে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ডাঙ্গর মা ;---(৬৩ পৃঃ, --- ৫ পংক্তি)। মহারাজ ডাঙ্গর ফা এর মহিষী। রাজার নামানুসারে ইঁহার নামকরণ হইয়াছিল। ত্রিপুর রাজ্যে কিয়ৎকাল এই নিয়ম প্রচলিত থাকিবার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ডুঙ্গুর ফা ;---(৫৩ পৃঃ, --- ১২ পংক্তি)। নামান্তর কিরীট বা দানকুরু ফা ; হরিরায় নামেও পরিচিত ছিলেন। ইনি শেবরায় বা শিবরায়ের পুত্র। চন্দ্র হইতে ১২২ ও ত্রিপুর হইতে ৭৭ স্থানীয়। ইনি মিথিলা হইতে পাঁচজন বেদজ্ঞ তপস্বী আনয়নপূর্ব্বক এক বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞ মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞের প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে সম্পাদিত হইয়াছে। এই পুণ্যকার্য্য দ্বারা তিনি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক 'আদিধর্ম্ম পা' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে ব্রাহ্মণপঞ্চককে পাঁচখণ্ড বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ দান করায়, সেই সমগ্র ভূখণ্ডের নাম 'পঞ্চখণ্ড' হইয়াছে। শ্রীহট্ট জেলার পঞ্চখণ্ড পরগণা এই ভূভাগ লইয়া গঠিত। এতদ্বিষয়ক বিবরণ পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। অন্তিমে, পুত্র রামচন্দ্রে (খারুং ফা) হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া ডুঙ্গুর ফা পরলোক গমন করেন।

তয়দক্ষিণ ;---(৩৮ পৃঃ, --- ১৩ পংক্তি)। নামান্তর তৈদক্ষিণ। ইনি মহারাজ ত্রিলোচনের পৌত্র ও দাক্ষিণের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৪৯ ও ত্রিপুর হইতে ৪র্থ স্থানীয়। ইনি মণিপুরের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই সময় মণিপুরের রাজা কে ছিলেন, নির্ণয় করা কঠিন। ইহাই মণিপুরের সহিত ত্রিপুরের প্রথম বৈবাহিক সম্বন্ধ। তয়দক্ষিণের পরে তদীয় পুত্র সুদক্ষিণ রাজ্য লাভ করেন।

তরজুঙ্গ ;---(৩৯ পৃঃ, --- ২০ পংক্তি)। ইনি মহারাজ নৌযোগ রায়ের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৬২ ও ত্রিপুর হইতে ১৭ শ স্থানীয়। ইঁহার ইতিহাস অতীতের তমোময় গহ্বরে নিহিত, তাহার উদ্ধার অসম্ভব হইয়াছে। ইঁহার পরে, পুত্র রাজধর্ম্মা (তররাজ) সিংহাসন লাভ করেন।

তরদাক্ষিণ ;---(৩৯ পৃঃ, --- ৬ পংক্তি)। মহারাজ সুদক্ষিণের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৫১ ও ত্রিপুর হইতে ৬ষ্ঠ স্থানীয়। ইনি বিশেষ ধার্ম্মিক এবং সতত যজ্ঞপরায়ণ ছিলেন। অন্তিমে, পুত্র ধর্ম্মধর (ধর্ম্মতরু) কে রাজ্যভার প্রদান করিয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হন।

তরফণাই ফা ;---(৪০ পৃঃ, --- ১১ পংক্তি)। নামান্তর ত্রিপলী। ইনি চন্দ্ররায়ের (তাভুরাজের) পুত্র। চন্দ্র হইতে ৭৯ ও ত্রিপুর হইতে ৩৪ অধস্তন বংশ্য। ইঁহার শাসন বিবরণী বর্ত্তমানকালের অগোচর। ইনি পরলোক গমন করার পর, পুত্র সুমন্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তরবঙ্গ ;---(৩৯ পৃঃ, --- ১৪ পংক্তি)। নামান্তর মহারাজ সুধর্ম্মার পুত্র। চন্দ্র হইতে ৫৫ ও ত্রিপুর হইতে ১০ম স্থানীয়। ইঁহার পুত্র দেবাঙ্গ পৈত্রিক সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন।

তররাজ ;---(৩৯ পৃঃ, --- ২১ পংক্তি)। নামান্তর রাজধর্ম্মা। মহারাজ তরজুঙ্গের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৬৩ ও ত্রিপুর হইতে ১৮শ স্থানীয় রাজা। ইনি নিতান্ত সাধু ছিলেন, রাজমালায় এই কথামাত্র পাওয়া যায়। পুত্র হামরাজের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তরলক্ষ্মী ;---(৩৯ পৃঃ, --- ২৮ পংক্তি)। নামান্তর রূপবান্। মহারাজ লক্ষ্মীতরুর পুত্র। চন্দ্র হইতে ৬৯ ও ত্রিপুর হইতে ২৪ শ স্থানীয়। পুত্র লক্ষ্মীবান (মাইলক্ষ্মী) ইঁহার পরে রাজ্য লাভ করেন।

তরহাম ;---(৪০ পৃঃ, --- ১৪ পংক্তি)। ইনি তরহোম নামেও অভিহিত হইতেন। ইঁহার পিতা মহারাজ রূপবন্ত (নামান্তর শ্রেষ্ঠ)। ইনি চন্দ্র হইতে

অধস্তন ৮২ ও ত্রিপুর হইতে ৩৭ স্থানীয়। পুত্র খাহাম (হরিরাজ) কে সিংহাসন অর্পণ করিয়া ইনি পরলোক গমন করেন।

তাভুরাজ ;---(৪০ পৃঃ, --- ১০ পংক্তি)। নামান্তর চন্দ্ররাজ বা তরুংরাজ। ইনি মহারাজ চন্দ্রশেখরের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৭৮ ও ত্রিপুর হইতে ৩৩ স্থানীয়। ইঁহার পুত্র তরফণাই পিতৃ সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন।

তুর্ব্বসু ;---(৫ পৃঃ, --- ৫ পংক্তি)। দেবযানীর গর্ব্ভজাত সম্রাট যযাতির পুত্র। ইনি পিতৃ জরা গ্রহণ করিতে অসম্মত হওয়ায় যযাতি ইঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন।

তৈছরাও ;---(৪৪ পৃঃ, --- ২ পংক্তি)। নামান্তর বীরচন্দ্র বা তক্ষরাও। ইনি মহারাজ সুকুমারের পুত্র। চন্দ্র হইতে ১০৩ ও ত্রিপুর হইতে ৫৮ স্থানীয়। এই ভূপতির ইতিহাস পাওয়া যায় না। ইঁহার লোকান্তরের পর, পুত্র রাজেশ্বর সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিল।

তৈছুঙ্গ ফা--(৪৫ পৃঃ, --- ১২ পংক্তি)। নামান্তর তেজং ফা। মহারাজ রাজেশ্বরের পুত্র। চন্দ্র হইতে ১০৬ ও ত্রিপুর হইতে ৬১ স্থানীয়। ইনি মহারাজ নাগেন্দ্রের (ক্রোধেশ্বর) ভ্রাতা। ক্রোধেশ্বরের পুত্র না থাকায় ইনি সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার অভাবে তৎপুত্র নরেন্দ্র রাজ্যাধিকারী হন।

ত্রিপুর ;---(৬ পৃঃ, --- ১২ পংক্তি)। মহারাজ দৈত্যের পুত্র, এবং ত্রিলোচনের পিতা। ত্রিবেগে জন্ম বলিয়া ইঁহার নাম ত্রিপুর হইয়াছিল। ইনি চন্দ্র হইতে ৪৬ স্থানীয়। ইঁহার শাসনকালে রাজ্যের নাম ত্রিপুরা করা হয়। ত্রিপুর নিতান্ত পাপিষ্ঠ ও অত্যাচারী ছিলেন। তাঁহার অনাচারে প্রকৃতিপুঞ্জ ও প্রত্যন্ত ভূপতিবৃন্দ উৎপীড়িত হইতেছিলেন। আশুতোষ প্রজা রক্ষার নিমিত্ত সংহারক মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া শূলাঘাতে ত্রিপুরকে সংহার করেন। অতঃপর শিববরে ত্রিপুরের ত্রিলোচন নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রিপুরার রাজদণ্ড ধারণ করেন।

ত্রিলোচন ;---(৯ পৃঃ, --- ১১ পংক্তি)। ইনি মহারাজ ত্রিপুরের পুত্র। ত্রিপুরের মহিষী হীরাবতী শিব আরাধনা করিয়া এই পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, জন্মকালে ইঁহার ললাটদেশে একটী চক্ষু পরিলক্ষিত হইয়াছিল ; তদ্ধেতু ত্রিলোচন নাম হইয়াছে। শিববরলব্ধ ত্রিলোচনকে প্রকৃতিপুঞ্জ শিবের পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিল, এবং সসম্মানে তাঁহাকে সিংহাসনে সংস্থাপন করিল।

ত্রিলোচন সুপণ্ডিত, ধার্ম্মিক, দয়ালু এবং প্রবাল পরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। ইনি হেড়ম্বের রাজদুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার দ্বাদশ পুত্র 'বার ঘর ত্রিপুর' নামে অভিহিত হইয়াছিল। ত্রিলোচনের প্রথম পুত্র হেড়ম্ব মাতামহের রাজ্যলাভ করেন। ত্রিলোচনের পরলোক গমনের পর ২য় পুত্র দাক্ষিণ ত্রিপুর সিংহাসন অধিকার করিলে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত এই সূত্রে যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং এই সংগ্রামের ফলে ত্রিপুরার কিয়দংশ হেড়ম্ব রাজ্যভুক্ত হয়। ত্রিলোচনের শাসনকালে শাসনকালে ত্রিপুর রাজ্য সুখশান্তি পূর্ণ হইয়াছিল।

দক্ষ ;---(৮ পৃঃ, —২১ পংক্তি)। মহাভারত ও পুরাণাদির মতে দক্ষ, ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। মৎস্য পুরাণে লিখিত আছে, ---

"শরীরানথ ব্যক্ষ্যামি মাতৃহীন প্রজাপতেঃ।
অঙ্গুষ্ঠাদ্দক্ষিণাদ্দক্ষঃ প্রজাপতিরজায়ত।।"

মৎস্যপুরাণ---৩।৯।

গরুড় পুরাণ, কালিকা পুরাণ, হরিবংশ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে দক্ষের উৎপত্তি বিবরণ লিখিত আছে। ইনি শিব-জায়া সতীর পিতা। ইঁহার শিবহীন যজ্ঞের ফলে সতী দেহত্যাগ করেন এবং তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা ভারতের নানা প্রদেশে মহাপীঠ স্থাপিত হয়। দক্ষের ছাগমুণ্ড লাভ এই যজ্ঞের শেষ ফল। ঋগ্বেদে ইঁহার নামোল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি প্রজাসৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

দাক্ষিণ ;---(৩৪ পৃঃ, --- ৫ পংক্তি)। ইনি মহারাজ ত্রিলোচনের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৪৮ ও ত্রিপুর হইতে ৩য় স্থানীয়। ইনি নিজ সহোদর হেড়ম্বরাজ কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাভূত হইয়া, কপিলা নদীর তীরবর্ত্তী ত্রিবেগ নগরীর রাজপাট পরিত্যাগ করতঃ বরবক্রের তীরস্থ খলংমা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। এতদ্দরুণ কুকিপ্রদেশস্থ বিস্তীর্ণ ভূভাগ ত্রিপুরার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। ইঁহার সময় রাজভ্রাতাগণ সেনাপতি নিযুক্ত হয়, এই নিয়ম দীর্ঘকাল স্থিরতর ছিল।

দুর্য্যোধন ;---(৩৩ পৃঃ, ---১০ পংক্তি)। ইনি কুরুবংশীয় ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র। পাণ্ডবগণের প্রতি বিশেষতঃ ভীমসেনের প্রতি ইনি নিতান্ত বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন। ইঁহার কূটনীতির দরুণ ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এই যুদ্ধে ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গসহ স্বয়ং নিহত হন। এই যুদ্ধে ভারতমাতা অসংখ্য বীরপুত্র হারাইয়া যে দুর্গতিগ্রস্তা হইয়াছিলেন, সেই দুর্গতি কোন কালেই অপনোদিত হয় নাই।

দুরাশা ;---(৪২ পৃঃ, --- ৮ পংক্তি)। নামান্তর ধূসরাঙ্গ বা ধরাঈশ্বর। ইনি দেবরাজের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৯২ ও ত্রিপুর হইতে ৪৭ স্থানীয় ভূপতি। ইঁহার ঐতিহাসিক তথ্য বর্ত্তমান কালের অগোচর। ইঁহার পরলোক গমনের পর, পুত্র বারকীর্ত্তি বা বিরাজ ত্রিপুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

দুর্ল্লভেন্দ্র চন্তাই ;---(৩ পৃঃ, ---১৬ পংক্তি)। ইনি চতুর্দ্দশ দেবতার প্রধান পূজক ছিলেন। ত্রিপুর রাজবংশের পুরাবৃত্ত ইঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। রাজমালা প্রথম লহর, মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের আদেশানুসারে, ইঁহার দ্বারা বর্ণিত এবং পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ইহা পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্বের কথা।

দেবযানী ;---(৫ পৃঃ, --- ৬ পংক্তি)। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা। দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বাদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার সহিত ইঁহার নিতান্ত সদ্ভাব ছিল। একদা ইঁহার বাপীতীরে বসন রাখিয়া জলকেলীতে প্রবৃত্তা ছিলেন, এই সময় ইন্দ্র বায়ুরূপ ধারণ করিয়া কূলস্থিত সমস্ত বসন উড়াইয়া একত্র করিয়া দিলেন। জলবিহারান্তে শর্ম্মিষ্ঠা ব্যস্ততাবশতঃ দেবযানীর বসন পরিধান করায়, এই সূত্রে উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়। ক্রোধান্বিতা শর্ম্মিষ্ঠা, দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে গমন করিলেন। এদিকে নহুষ পুত্র যযাতি মৃগয়া উপলক্ষে সেই স্থানে আসিয়া দেবযানীকে কূপ হইতে উদ্ধার করেন। শুক্রাচার্য্য কন্যার দুর্গতিতে ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যনগর পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হওয়ায়, বৃষপর্ব্বা তাহা জানিতে পারিয়া শুক্রাচার্য্যের প্রীতিসম্পাদনার্থ যত্নবান হইলেন। শুক্র বলিলেন, "দেবযানীকে প্রসন্ন না করিলে, আমার প্রসন্নতা লাভ তোমার পক্ষে অসম্ভব হইবে।" দেবযানী বলিলেন, "আমার এই কামনা যে, শর্ম্মিষ্ঠা আমার দাসী হউক ; আমার পিতা আমাকে যেস্থানে দান করিবেন, শর্ম্মিষ্ঠা সেই স্থানে আমার অনুগমন করিবে।" কার্য্যতঃ তাহাই হইল, শর্ম্মিষ্ঠা, দেবযানীর দাসীরূপে শুক্রাচার্য্যের আলয়ে গমন করিলেন।

কিয়ৎকালে পরে যযাতি দেবযানীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন, শর্ম্মিষ্ঠা তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। কিন্তু শুক্রাচার্য্য তখনই যযাতিকে বলিয়া দিলেন, শর্ম্মিষ্ঠাকে যেন তিনি পত্নীভাবে ব্যবহার না করেন।

কালক্রমে যযাতির, দেবযানীর গর্ব্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামক পুত্রদ্বয় এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ব্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামক পুত্রত্রয় জন্মগ্রহণ করেন। যযাতি

শুক্রের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া শর্ম্মিষ্ঠার গর্ব্ভে পুত্রোৎপাদন করায়, কোপান্বিত শুক্রাচার্য্যের অভিসম্পাত তিনি জরাগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

দেবরাজ ;---(৪২ পৃঃ, -- ২ পংক্তি)। ইনি ত্রিপুরেশ্বর শিক্ষরাজের পুত্র। চন্দ্র হইতে অধস্তন ৯১ ও ত্রিপুর হইতে ৪৬ স্থানীয়। ইঁহার পরে তদীয় পুত্র দুরাশা পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন।

দেবরায় ;---(৫৩ পৃঃ, --- ৮ পংক্তি)। নামান্তর পার্থ বা দেবরাজ। ইনি মহারাজ রামচন্দ্রে পুত্র। চন্দ্র হইতে ১১৯ ও ত্রিপুর হইতে ৭৫ স্থানীয়। ইনি বিশেষ ধার্ম্মিক ও গো, ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। শাসন বিবরণী জানিবার উপায় নাই। পুত্র শেবরায় (শিবরায়) কে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান রাখিয়া ইনি পরলোক গমন করেন।

দেবাঙ্গ ;---(৩৯ পৃঃ, -- ১৫ পংক্তি)। ইনি মহারাজ তরবঙ্গের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৫৬ ও ত্রিপুর হইতে ১১শ স্থানীয়। ইনি পিতৃ সিংহাসনে অধিরোহণের পর কি কি কার্য্য করিয়াছেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। পুত্র নরাঙ্গিতের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ইনি পরলোক গমন করেন।

দৈত্য ;---(৬ পৃঃ, --- ৯ পংক্তি)। ইনি চন্দ্র হইতে ৪৫ স্থানীয় ভূপতি ; মহারাজ চিত্রায়ুধের পুত্র। ইঁহার আত্মজ মহারাজ ত্রিপুর নিতান্ত অত্যাচারী এবং প্রজাপীড়ক রাজা ছিলেন। তিনি শিব কর্ত্তৃক নিহত হন। রাজমালায় দৈত্য হইতেই রাজগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে ; তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের বিবরণ এই গ্রন্থে নাই। ইনি সুদীর্ঘকাল রাজ্যশাসন করিয়া বার্দ্ধক্যে পুত্র হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

দ্রুহ্যু ;---(৫ পৃঃ, --- ৫ পংক্তি)। ইনি সম্রাট যযাতির পুত্র, শর্ম্মিষ্ঠার গর্ত্তজাত প্রথম সন্তান। ইনি শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত পিতার জরাভার গ্রহণ করিতে অসম্মত হওয়ায় সম্রাট যযাতি এই অভিশাপ দ্বারা নির্ব্বাসিত করিলেন যে, যেখানে অশ্ব, রথ, রাজযোগ্যযান, অথবা শিবিকা ইত্যাদি দ্বারা গমনাগমন করা যাইতে পারে না, ভেলা কিম্বা সন্তরণ দ্বারা যাতায়াত করিতে হয়, তুমি সেইস্থানে গমন কর। ইনি ত্রিপুর রাজকুলের আদিপুরুষ। এতদ্বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বভাষে দ্রষ্টব্য।

ধনরাজ ফা ;---(৪০ পৃঃ, --- ৬ পংক্তি)। ইনি ত্রিপুরাধিপতি বসুরাজের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৭৫ ও ত্রিপুর হইতে ৩০ স্থানীয়। ইঁহার শাসন বিবরণী

অজ্ঞেয়। পুত্র হরিহর (মুচং ফা) ইঁহার উত্তরাধিকারী সূত্রে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।

ধৰ্ম্মধর ;—(৩৯ পৃঃ, --- ১০ পংক্তি)। নামান্তর ধৰ্ম্মতর বা ধৰ্ম্মতরু। ইনি মহারাজ তরদাক্ষিণের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৫২ ও ত্রিপুর হইতে ৭ম স্থানীয়। ইনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, রাজমালায় ইহার অধিক কিছু পাওয়া যায় না। ইঁহার অভাবে, তদাত্মজ ধৰ্ম্মপাল ত্রিপুরার রাজদণ্ড ধারণ করেন।

ধৰ্ম্মপাল ;---(৩৯ পৃঃ --- ১০ পংক্তি)। ইনি উপরিউক্ত ধৰ্ম্মধরের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৫৩ ও ত্রিপুর হইতে ৮ম স্থানীয়। ইনি ধাৰ্ম্মিক এবং জীবহিংসাবিরত ছিলেন। অন্তিমে সধৰ্ম্মা (সুধৰ্ম্ম) নামক পুত্রের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন।

ধৰ্ম্মমাণিক্য ;---(৮ পৃঃ, --- ১৭ পংক্তি)। ইনি মহামাণিক্যের পুত্র। চন্দ্রে অধস্তন ১৪৮ ও ত্রিপুরের অধস্তন ১০৩ স্থানীয় ভূপতি। ইনি একান্ত ধাৰ্ম্মিক ছিলেন এবং রাজ্যলাভের পূর্ব্বে সন্ন্যাসী বেশে দীর্ঘকাল তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, সন্ন্যাসীবেশী ধৰ্ম্মদেব বারাণসী ধামে এক বৃক্ষমূলে নিদ্রিত থাকা কালে, একটি সর্প ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহার মস্তকে পতিত সূর্য্যতাপ নিবারণ করিতেছিল ; কৌতুক নামক জনৈক ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে ইঁহাকে অসাধারণ মনুষ্য বলিয়া মনে করেন। ইহার অল্পকাল পরেই দেশ হইতে লোক যাইয়া মহারাজ ধৰ্ম্মকে পিতৃবিয়োগের সংবাদ প্রদান করে এবং রাজ্যভার গ্রহণের নিমিত্ত দেশে লইয়া আইসে।

ধৰ্ম্মমাণিক্য বিশেষ ধাৰ্ম্মিক এবং পরাক্রমশালী ভূপতি ছিলেন। ইঁহার প্রযত্নে রাজমালা রচনার সূত্রপাত হয়। এই গ্রন্থের প্রথম লহর বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর পণ্ডিত দ্বারা রচনা করাইয়া ইনি চিরস্মরণীয় কীৰ্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

কুমিল্লা নগরী স্থিত ধৰ্ম্মসাগর মহারাজ ধৰ্ম্মের সমুজ্জ্বল কীৰ্ত্তি। এই বিশালব্যাপী অদ্যাপি সুনীলবক্ষ বিস্তার করিয়া ধৰ্ম্মমাণিক্যের সৎকাৰ্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

ধৰ্ম্মাঙ্গদ ;---(৩৯ পৃঃ, --- ১৭ পংক্তি)। ইনি মহারাজ নরাঙ্গিতের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৫৮ ও ত্রিপুর হইতে ১৩ স্থানীয়। ইঁহার ইতিহাস কিছুই জানা যায় না। অন্তিমে স্বীয় পুত্র রুক্মাঙ্গদের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র ;---(৩৩ পৃঃ, --- ১১ পংক্তি)। ইনি দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের ঔরসে,

অম্বিকার গর্ব্ভজাত, কুরু বংশীয় বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্র। ব্যাসদেব অম্বিকার সহিত সঙ্গত হইবার কালে তাঁহার গভীর কৃষ্ণবর্ণ, বিশাল শ্মশ্রু এবং পিঙ্গল জটা দর্শনে ভীতা হইয়া অম্বিকা নেত্র নিমীলন করিয়াছিলেন, এই হেতু ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হইলেন। ইঁহার দুর্য্যোধনাদি শত পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডবগণ তাঁহাদের বিনাশ সাধন করেন।

নরাঙ্গিত ;---(৩৯ পৃঃ, --- ১৬ পংক্তি)। ইনি মহারাজ দেবাঙ্গের আত্মজ। চন্দ্র হইতে ৫৭ ও ত্রিপুর হইতে ১২ স্থানীয়। ইঁহার শাসন বিবরণী পাওয়া যায় না। ইঁহার পরে তৎপুত্র ধর্ম্মাঙ্গদ সিংহাসন লাভ করেন।

নরেন্দ্র ;---(৪৫ পৃঃ, --- ১৮ পংক্তি)। ইনি মহারাজ নাগেন্দ্রের পুত্র। চন্দ্র হইতে ১০৭ ও ত্রিপুর হইতে ৬২ স্থানীয়। ইঁহার পরে তৎপুত্র ধর্ম্মাঙ্গদ সিংহাসন লাভ করেন।

নাওরায় ;---(৪৯ পৃঃ, ---৪ পংক্তি)। নামান্তর কীর্ত্তি বা নবরায়। ইনি মহারাজ গগনের পুত্র। চন্দ্র হইতে ১১৭ ও ত্রিপুর হইতে ৭৮ স্থানীয়। ইঁহার ইতিবৃত্ত দুষ্প্রাপ্য। পুত্র হিমতি বা হামতার ফা এর হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ইনি পরলোকে গমন করেন।

নাগপতি ;---(৪০ পৃঃ, --- ২৫ পংক্তি)। নামান্তর নাগেশ্বর। ইনি বীররাজের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৮৯ ও ত্রিপুর হইতে ৪৪ স্থানীয়। ইঁহার পরলোক গমনের পর, পুত্র শিক্ষরাজ রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

নাগেশ্বর ;---(৩৯ পৃঃ, ৩০ পংক্তি)। ইনি মহারাজ লক্ষ্মীবান বা মাইলক্ষ্মীর পুত্র। চন্দ্রের অধস্তন ৭০ ও ত্রিপুরের অধস্তন ২৫ স্থানীয়। পুত্র যোগেশ্বরের হস্তে রাজ্য অর্পণ করিয়া ইনি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নৌগযোগ ;---(৩৯ পৃঃ, ---১৯ পংক্তি)। নামান্তর নৌগরায়। ইনি মহারাজ সোমাঙ্গদের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৬১ ও ত্রিপুর হইতে ১৬শ স্থানীয়। ইঁহার পর তৎপুত্র তরজুঙ্গ রাজ্য লাভ করেন।

পুরু ;---(৫ পৃঃ, --- ৫ পংক্তি)। ইনি শর্ম্মিষ্ঠার গর্ব্ভসম্ভূত সম্রাট যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র। যযাতি শুক্রশাপে জরাগ্রস্ত হইয়া, পুত্রগণকে জরাভার গ্রহণ জন্য অনুরোধ করায় পুরু এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পিতার প্রীতি সাধন করেন। এই হেতু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ইনিই পিতৃ সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। পুরুর সন্ততিগণ তাঁহার নামানুসারে ‘পুরুবংশীয়’ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

প্রতাপমাণিক্য ;---(৬৯ পৃঃ, --- ২০ পংক্তি)। মহারাজ রত্নমাণিক্যের পুত্র। চন্দ্র হইতে ১৪৬ ও ত্রিপুর হইতে ১০১ স্থানীয়। ইনি অধিক কাল রাজ্য

ভোগ করিতে পারেন নাই। অধার্ম্মিক ও অত্যাচীরা হওয়ায় সেনাপতিগণ ইঁহাকে নিহত করিয়া, ইঁহার সহোদর মুকুটমাণিক্যকে রাজা করিয়াছিলেন।

প্রতাপরায় ;---(৫৪ পৃঃ, --- ৪ পংক্তি)। ইনি মহারাজ সাধুরায়ের পুত্র। চন্দ্র হইতে ১৩২ ও ত্রিপুর হইতে ৮৭ স্থানীয়। ইনি পরদাররত ছিলেন, এই পাপে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তৎপৌত্র বিষ্ণুপ্রসাদ পিতামহের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।

প্রতীত ;---(৪৬ পৃঃ, --- ৯ পংক্তি)। ইনি মহারাজ চিত্রসেনের পুত্র। চন্দ্র হইতে ১১৪ ও ত্রিপুর হইতে ৬৯ স্থানীয়। ইনি হেড়ম্ব রাজের সহিত প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, বরবক্র নদী ত্রিপুর ও হেড়ম্ব রাজের মধ্যসীমা নির্দ্ধারণ করেন। এবং উভয়ে এইরূপ প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ ইহলেন যে, যদি দৈববলে কাক ধবলবর্ণ হয়, তথাপি তাঁহারা এই সীমা উল্লঙ্ঘন করিবেন না। পার্শ্ববর্ত্তী অন্য রাজ্যসমূহের শক্তিক্ষয় করাই ইঁহাদের বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ; এবং সেই বন্ধুত্ব ঘনীভূত করিবার নিমিত্ত মহারাজ প্রতীত হেড়ম্বে যাইয়া কিয়ৎকাল বাস করিয়া ছিলেন। তৎকালে উভয় রাজা একত্র আহার, একাসনে উপবেশন করিতেন, এক মুহূর্ত্তের জন্যও একে অন্যের সঙ্গ ছাড়া হইতেন না। দুইটী প্রধান শক্তির এবম্বিধ সম্মিলন দর্শনে প্রত্যন্ত রাজন্যবর্গ ভীত এবং চিন্তিত হইয়া, উভয়ের মধ্যে ভেদ জন্মাইবার নিমিত্ত চেষ্টিত হইলেন, এবং সকলে পরামর্শ করিয়া এক রূপবতী যুবতীকে তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাদের এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল না, সুচতুরা যুবতীর চাতুরীজালে বিজড়িত রাজদ্বয়ের মধ্যে ঘোর বিবাদ সঙ্ঘটিত হইল ; মহারাজ প্রতীত রমণীকে লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এতদুপলক্ষেই ত্রিপুরারবরবক্র তীরবর্ত্তী খলংমা রাজপাট পরিত্যাগ করা হইয়াছিল। মহারাজ প্রতীত ধর্ম্মনগরে যাইয়া নূতন রাজপাট স্থাপন করেন।

মহারাজ প্রতীত সাধুচরিত্র এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। শিব, দুর্গা ও বিষ্ণুর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। বার্দ্ধক্যে স্বীয় পুত্র মরীচির হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, প্রতীত পরলোক গমন করেন।

বঙ্গ ;---(৪৬ পৃঃ,---২ পংক্তি)। নামান্তর নবাঙ্গ। ইনি ত্রিপুরেশ্বর যশোরাজের পুত্র। চন্দ্র হইতে ১১১ ও ত্রিপুর হইতে ৬৬ স্থানীয়। ইঁহার শাসন কালে ত্রিপুর রাজ্যে বাঙ্গালী প্রজা স্থাপনের সূত্রপাত হয়। এতদ্ভিন্ন ইঁহার কোন বিবরণ জানিবার সুবিধা নাই। ইনি স্বীয় আত্মজ গঙ্গারায়কে উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

বাণেশ্বর ;---(৫৪ পৃঃ, --- ১০ পংক্তি)। নামান্তর বাণীশ্বর। ত্রিপুরেশ্বর

বিষ্ণু প্রসাদের পুত্র। চন্দ্র হইতে ১৩৪ ও ত্রিপুর হইতে ৮৯ স্থানীয়। ইঁহার শাসন বিবরণী দুষ্প্রাপ্য। পুত্র বীরবাহুর হস্তে রাজ্যভার প্রদান পূর্ব্বক ইনি স্বর্গীয় হইয়াছিলেন।

বাণেশ্বর ;---(৩ পৃঃ, —২০ পংক্তি)। ইনি শ্রীহট্টবাসী ব্রাহ্মণ এবং ত্রিপুর দরবারে সভা পণ্ডিত ছিলেন। পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও চন্তাই দুর্ল্লভেন্দ্রের সহিত একযোগে ইনি রাজমালার প্রথম লহর রচনা করেন। রাজমালার এই অংশ পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন। ইঁহার বংশধর বিদ্যমান নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭৯ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

বিমান ;---(৪৫ পৃঃ, --- ১৯ পংক্তি)। নামান্তর পাইমারাজ। ইনি মহারাজ ইন্দ্রকীর্ত্তির পুত্র। চন্দ্র হইতে ১০৯ ও ত্রিপুর হইতে ৬৪ স্থানীয় রাজা। অন্তকালে পুত্র যশোরাজের হস্তে রাজ্য ভার প্রদান করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন।

বিমার ;---(৪২ পৃঃ, ---২০ পংক্তি)। ইনি মহারাজ সুরেন্দ্রের পুত্র। চন্দ্র হইতে ১০০ ও ত্রিপুর হইতে ৫৫ স্থানীয়। ইঁহার ইতিহাস বর্ত্তমানকালে উদ্ধার করিবার উপায় নাই। ইঁহার পর, স্বীয় পুত্র কুমার পিতৃ সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন।

বিরাজ ;---(৪২ পৃঃ, —৯ পংক্তি)। নামান্তর বারকীর্ত্তি বা বীররাজ। ইনি মহারাজ দুরাশার পুত্র। চন্দ্র হইতে ৯৩ ও ত্রিপুর হইতে ৪৮ স্থানীয়। ইঁহার পরলোক গমনের পর, তদাত্মজ সাগর ফা রাজতক্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিষ্ণুপ্রসাদ ;---(৫৪ পৃঃ, —৮ পংক্তি)। মহারাজ প্রতাপ রায়ের পৌত্র। চন্দ্র হইতে ১৩৩ ও ত্রিপুর হইতে ৮৮ স্থানীয়। প্রতাপরায় বর্ত্তমানে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পরলোকপ্রাপ্ত হওয়ায়, ইনি রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপ্রসাদ অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন এবং দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিয়াছেন। ইঁহার পর, পুত্র বাণেশ্বর রাজ্যলাভ করেন।

বীরবাহু ;---(৫৪ পৃঃ---১১ পংক্তি)। ইনি মহারাজ বাণেশ্বরের পুত্র। চন্দ্র হইতে ১৩৫ ও ত্রিপুর হইতে ৯০ স্থানীয়। ইঁহার পরে তদীয় পুত্র সম্রাট সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন।

বীররাজ ;—(৩৯ পৃঃ,—২৩ পংক্তি)। ত্রিপুরাধিপতি হামরাজের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৬৫ ও ত্রিপুর হইতে ২০ স্থানীয়। ইনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করায় তৎপুত্র শ্রীরাজ সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন।

বৃষপর্ব্বা ;---(৫ পৃঃ---১৬ পংক্তি)। দৈত্যরাজ। ইনি দ্রুহ্যু জননী শর্ম্মিষ্ঠার পিতা।

বীররাজ (২য়) ;---(৪০ পৃঃ,---২৪ পংক্তি)। ইনি মহারাজ গজেশ্বরের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৮৮ ও ত্রিপুর হইতে ৪৩ স্থানীয়। ইঁহার ইতিবৃত্ত জানা নাই। পুত্র নাগেশ্বর (নামান্তর নাগপতি) ইঁহার পরবর্ত্তী রাজা।

ভীমসেন ;---(৩৩ পৃঃ, ---৩ পংক্তি)। ইনি কুন্তির গর্ত্তজাত, বায়ু হইতে সমুৎপন্ন পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র ; দ্বিতীয় পাণ্ডব নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি সম্রাট যুধিষ্ঠিরের সহিত ত্রিপুরেশ্বরের সাক্ষাৎ করাইয়াছিলেন।

মনু ;---(৪৩ পৃঃ,---১৯ পংক্তি)। জনৈক ঋষি। ইনিই মনুসংহিতা রচয়িতা বলিয়া অনেকে মনে করেন। ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্গত মনু নদীর তীরে ইঁহার আশ্রম ছিল, এবং তিনি কিয়ৎকাল এইস্থানে শিবারাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। প্রাচীন রাজমালাধৃত যোগিনী তন্ত্রের বচনে পাওয়া যায় ;---

"পুরাকৃত যুগে রাজন মনুনা পূজিত শিবঃ।
তত্রৈব বিরলে স্থানে মনুনাম নদীতটে।।"

মলয়চন্দ্র ;---(৪২ পৃঃ,---১৪ পংক্তি)। ইনি মহারাজ সাগর ফা-এর পুত্র। চন্দ্র হইতে ৯৫ ও ত্রিপুর হইতে ৫০ স্থানীয়। ইঁহার পরবর্ত্তী কালে তদাত্মজ সূর্য্যনারায়ণ বা সূর্য্যরায় ত্রিপুর সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন।

মহামাণিক্য ;---(৭০ পৃঃ,---৬ পংক্তি)। মহারাজ মুকুটমাণিক্যের পুত্র। চন্দ্র হইতে ১৪৮ ও ত্রিপুর হইতে ১০৩ স্থানীয়। ইনি বিশেষ ধার্ম্মিক এবং প্রজাবৎসল রাজা চিলেন। ইঁহার লোকান্তর গমনের পরে, তদীয় পুত্র ধর্ম্মমাণিক্য রাজ্যভার প্রাপ্ত হন।

মাইচোঙ্গ ফা ;---(৪০ পৃঃ,---৮ পংক্তি)। নামান্তর চন্দ্রশেখর। ইনি মচুং ফা এর পুত্র। চন্দ্র হইতে ৭৭ ও ত্রিপুর হইতে ৩২ স্থানীয়। ইনি ৫৯ বৎসর রাজ্য পালন করিয়াছিলেন ; রাজমালায় এতদতিরিক্ত কোন কথার উল্লেখ নাই। পুত্র চন্দ্ররাজ (নামান্তর তাভুরাজ বা তরুরাজ), পিতার লোকান্তর গমনের পর সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন।

মাইলক্ষ্মী ;---(৩৯ পৃঃ,---২৯ পংক্তি)। নামান্তর লক্ষ্মীবান। ইনি মহারাজ রূপবানের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৭০ ও ত্রিপুর হইতে ২৫ স্থানীয়। অন্তিমে, পুত্র নাগেশ্বরের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

মাল্ছি ;---(৪৯ পৃঃ,---২ পংক্তি)। নামান্তর মরীচি, মিছলী বা মরুসোম। ইনি মহারাজ প্রতীতের পুত্র। চন্দ্র হইতে ১১৫ ও ত্রিপুর হইতে ৭০ স্থানীয়। ইঁহার পরলোক গমনের পর, তৎপুত্র গগন সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন।

মুকুটমাণিক্য ;---(৬৯ পৃঃ,---২০ পংক্তি)। নামান্তর মকুন্দ। ইনি মহারাজ রত্নমাণিক্যের পুত্র ও প্রতাপ মাণিক্যের ভ্রাতা। চন্দ্র হইতে ১৪৭ ও ত্রিপুর হইতে ১০২ স্থানীয়। মহারাজ রত্নমাণিক্য পরলোক গমন করিবার পর, প্রতাপমাণিক্য রাজা হইয়াছিলেন। অনাচারী ও অধার্ম্মিক বলিয়া তিনি সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক নিহত হইবার পর, মুকুটমাণিক্য সিংহাসন লাভ করেন।

মূচঙ্গ ফা ;---(৫৩ পৃঃ,---২৩ পংক্তি)। নামান্তর হরিহর। ইনি মহারাজ ধনরাজ ফা এর পুত্র। চন্দ্র হইতে ৭৬ ও ত্রিপুর হইতে ৩১ স্থানীয়। ইঁহার ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। ইনি পরলোক গমন করার পর, তদীয় পুত্র চন্দ্রশেখর (নামান্তর মাইচোঙ্গ ফা) রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন।

মেঘ ;---(৫৪ পৃঃ,---১৪ পংক্তি)। নামান্তর মেঘরাজ। মহারাজ চম্পকেশ্বরের পুত্র। চন্দ্র হইতে ১৩৮ ও ত্রিপুর হইতে ৯৩ স্থানীয়। পুত্র ছেংকাচাগ (ধর্ম্মধর) কে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান রাখিয়া ইনি পরলোক গমন করেন।

মৈছিলিরাজ ;---(৪৫ পৃঃ, ১৬ পংক্তি)। নামান্তর নাগেন্দ্র বা ক্রোধেশ্বর। ইনি মহারাজ রাজেশ্বরের পুত্র। চন্দ্র হইতে ১০৫ ও ত্রিপুর হইতে ৬০ স্থানীয়। ইনি পুত্র কামনায় মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। শিব বলিলেন "তোমার পুত্র হইবে না।" রাজা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদেবকে লক্ষ্য করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। রাজার এই ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া মহাদেব আদেশ করিলেন, তুমি অন্ধ হইবে। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর, আশুতোষ পুনর্ব্বার বলিলেন, "মনুষ্যের রক্ত চক্ষে দিলে তোমার অন্ধত্ব মোচন হইবে, কিন্তু স্ত্রীসঙ্গম করিলে তোমার মৃত্যু হইবে।" মনুষ্যের রক্ত সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরিত হইল। মৈছিলী বা মছলু উপাধিযুক্ত পাৰ্ব্বত্য একটী সম্প্রদায় নরবলির নিমিত্ত লোক সংগ্রহ করিত। এই কার্য্যের ভার তাহাদের হস্তেই পতিত হইল। এই সূত্রে রাজ্য মধ্যে ভীষণ অশান্তি ও ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। কাহাকে কখন ধরিয়া নেয় তাহা অনিশ্চিত বলিয়া, সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। কিয়ৎকাল পরে মনুষ্যের রক্তদ্বারা মহারাজ রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র না থাকায় ভ্রাতা তেজং ফা রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন। মৈছিলী সম্প্রদায়ের ন্যায় নিষ্ঠুর মনে করিয়া প্রজাসাধারণ রাজাকে 'মৈছিলিরাজ' নামে অভিহিত করিয়াছিল।

মোচঙ্গ ফা ;---(৪০ পৃঃ,--৭ পংক্তি)। নামান্তর উদ্ধব। ইনি মহারাজ যশ ফা এর পুত্র ; চন্দ্র হইতে ১৩০ ও ত্রিপুর হইতে ৮৫ স্থানীয়। ইনি অধার্ম্মিক এবং

পরদার রত হওয়ায়, সেই পাপে ইঁহার পুত্রোৎপন্ন হয় নাই। ভ্রাতা সাধুরায় ইঁহার পরে রাজা হইয়াছিলেন।

যদু ;---(৫ পৃঃ,---৫ পংক্তি)। সম্রাট যযাতির, দেবযানী গর্ব্ভজাত পুত্র। ইনি জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলেও পিতৃজরা গ্রহণে অসম্মত হওয়ায় যযাতি ইঁহাকে অভিপ্ত ও নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যাদবগণ ইঁহার বংশ সম্ভূত।

যযাতি ;---(৫ পৃঃ,--- ২ পংক্তি)। ইনি নহুষের পুত্র। পিতার অবর্ত্তমানে ইনি ভারত সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী এবং দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা ইঁহার মহিষী ছিলেন। দেবযানীই পরিণীতা মহিষী, শর্ম্মিষ্ঠা রাজকন্যা হইলেও পিতৃ আদেশে দেবযানীর দাসীরূপে সঙ্গে গিয়াছিলেন। দেবযানীর বিবরণে এতদ্বিষয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এস্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল না। যযাতি শুক্রের শাপে জরাগ্রস্ত হইয়া, সকল পুত্রকেই স্বীয় জরাভার গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন, কনিষ্ঠ পুরু ব্যতীত অন্য কোন পুত্র তাঁহার বাক্য পালন না করায়, কনিষ্ঠকে রাজ্যের অধিকারী করিয়া অন্য পুত্রগণকে সম্রাট পুরুর অধীনে নানাস্থানে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। এই কারণে পুরু কনিষ্ঠ হইয়াও হস্তিনার সিংহাসন লাভ করেন।

যশ ফা ;---(৫৩ পৃঃ, ২২ পংক্তি)। নামান্তর যশোরাজ। মহারাজ কৃষ্ণদাসের পুত্র, চন্দ্র হইতে ১২৯ ও ত্রিপুর হইতে ৮৪ স্থানীয়। ইঁহার অভাবে, পুত্র মোচঙ্গ ফা (উদ্ধব), রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন।

যশোরাজ ;---(৪৫ পৃঃ,---২১ পংক্তি)। ইনি বিমানের পুত্র। চন্দ্র হইতে ১১০ ও ত্রিপুর হইতে ৬৫ স্থানীয়। ইনি সাধু এবং সদাচারী ছিলেন। অন্তিমে বঙ্গ নামক পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন।

যুঝারু ফা ;---(৪৯ পৃঃ,---৬ পংক্তি)। যুঝারফা। নামান্তর হিমতি বা হামতার ফা। ইনি মহারাজ কীর্ত্তির পুত্র। চন্দ্র হইতে ১১৮ ও ত্রিপুর হইতে ৭৩ স্থানীয়। ইনি বীরপুরুষ ছিলেন। রাঙ্গামাটী জয় করিয়া রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশের কিয়দংশ জয় করিয়া, সেই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত ত্রিপুরাব্দের প্রচলন করিয়াছিলেন। ইঁহার লোকান্তরের পর, তৎপুত্র রাজচন্দ্র (জাঙ্গি ফা) রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির ;---(৩৩ পৃঃ,---৩ পংক্তি)। ইনি কুন্তির গর্ব্ভজাত ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন, মহারাজ পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র। দুর্য্যোধনাদি কর্ত্তৃক নানাভাবে বিড়ম্বিত

হইয়া ইনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটন করেন। এই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পাণ্ডবগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার নারায়ণী সেনাদল কৌরবগণের সাহায্যার্থে প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময় ভগবান সমর পরাঙ্মুখ অর্জ্জুনকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই 'শ্রীমদ্ভাগবদগীতা' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যুধিষ্ঠির সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুষ্ঠিত রাজসূয়-যজ্ঞ ভারত বিখ্যাত ঘটনা। যুধিষ্ঠিরের কাল নির্ণয় লইয়া অনেকে কথা বলিয়াছেন, অদ্যাপি তদ্বিষয়ের স্থির মীমাংসা হয় নাই। তিনি সার্দ্ধ চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, মোটামুটি ভাবে ইহা স্থির করা যাইতে পারে।

যোগেশ্বর ;---(৩৯ পৃঃ, ৩১ পংক্তি)। মহারাজ নাগেশ্বরের পুত্র। ইনি চন্দ্র হইতে ৭২ ও ত্রিপুর হইতে ২৭ স্থানীয়। ইঁহার পুত্র ঈশ্বর ফা পিতার অভাবে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন।

রংখাই ;---(৪০ পৃঃ,---৪ পংক্তি)। নামান্তর বসুরাজ। ইনি মহারাজ নীলধ্বজের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৭৪ ও ত্রিপুর হইতে ২৯ স্থানীয়। ইনি ধার্ম্মিক এবং দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন। পুত্র ধনরাজ ফাকে রাজ্যাধিকারী বর্ত্তমান রাখিয়া ইনি পরলোক গমন করেন।

রত্ন ফা ;---(৬১ পৃঃ,---৯ পংক্তি)। ইনি মহারাজ ডাঙ্গর ফাএর কনিষ্ঠ পুত্র। চন্দ্র হইতে ১৪৫ ও ত্রিপুর হইতে ১০০ স্থানীয়। পিতা ডাঙ্গর ফা ইঁহাকে গৌড়েশ্বরের দরবারে প্রেরণ করিয়া অপর সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। রত্ন ফা গৌড়ের সাহায্যে রাজ্য আক্রমণ এবং পিতাকে বিতাড়িত ও ভ্রাতাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া সিংহাসন লাভ করেন। অতঃপর ইনি গৌড়েশ্বরকে একটী বহুমূল্য ভেকমণি উপঢৌকন প্রদান করিয়া বংশানুক্রমিক 'মাণিক্য' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তদবধি ত্রিপুরেশ্বরগণ মাণিক্য উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন।

রাজা ফা ;---(৬২ পৃঃ,---৪ পংক্তি)। ইনি মহারাজ ডাঙ্গর ফাএর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইঁহার ভ্রাতা রত্ন ফা, রাজা ফা সহ সপ্তদশ ভ্রাতাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। সুতরাং ইনি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াও তাহা ভোগ করিতে পারেন নাই। অতঃপর রত্ন ফাএর বংশধরগণই ত্রিপুর সিংহাসনের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

রাজেশ্বর ;---(৪৪ পৃঃ,---৩ পংক্তি)। নামান্তর রাজ্যেশ্বর। ইনি মহারাজ বীরচন্দ্রের (নামান্তর তৈছরায়) পুত্র। চন্দ্র হইতে ১০৪ ও ত্রিপুর হইতে ৫৯ স্থানীয়। পুত্র নাগেশ্বরকে রাজ্যাধিকারী রাখিয়া ইনি স্বর্গগামী হইয়াছিলেন।

রুক্মাঙ্গদ ;---(৩৯ পৃঃ,---১৮ পংক্তি)। ইনি ধর্ম্মাঙ্গদের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৫৯ ও ত্রিপুর হইতে ১৪শ স্থানীয়। পুত্র সোমাঙ্গদের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ইনি স্বর্গগামী হন।

রূপবন্ত ;---(৪০ পৃঃ,---১৩ পংক্তি)। নামান্তর শ্রেষ্ঠ। মহারাজ সুমন্তের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৮১ ও ত্রিপুর হইতে ৩৬ স্থানীয়। পুত্র তরহোম বা তরহাম ইঁহার অভাবে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীতর ;---(৩৯ পৃঃ,---২৭ পংক্তি)। নামান্তর লক্ষ্মীতরু। ইনি ত্রিপুরেশ্বর শ্রীমান বা শ্রীমন্তের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৬৮ ও ত্রিপুর হইতে ২৩ স্থানীয়। পুত্র রূপবান্, ইঁহার পরিত্যক্ত সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন।

ললিত রায় ;---(৫৩ পৃঃ,---১৭ পংক্তি)। ইনি মহারাজ রামচন্দ্রের পুত্র এবং নৃসিংহের ভ্রাতা। চন্দ্র হইতে ১২৪ ও ত্রিপুর হইতে ৭৯ স্থানীয়। রাজা নৃসিংহ নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগামী হওয়ায়, ললিত রায় ভ্রাতার সিংহাসন লাভ করেন। ইঁহার পরে, পুত্র কুন্দ ফা বা মুকুন্দ ফা রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন।

লিকা রাজা ;---(৪৯ পৃঃ,---১৯ পংক্তি)। ইনি মঘের একটী শাখাসম্ভূত। রাঙ্গমাটী (বর্ত্তমান উদয়পুর) রাজ্যের রাজা ছিলেন। ত্রিপুরেশ্বর যুঝারু ফা ইঁহাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া, রাঙ্গামাটী স্বীয় রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট, এবং তথায় স্বীয় রাজপাট স্থাপন করেন। তদবধি দীর্ঘকাল উদয়পুরে ত্রিপুররাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল ; এই স্থান মহাপীঠ বলিয়া ভারত বিখ্যাত হইয়াছে।

লোমাই ;---(৬২ পৃঃ,---১৮ পংক্তি)। ইনি মহারাজ ডাঙ্গর ফা এর পুত্র। ডাঙ্গর ফা সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিবার সময় ইঁহাকে মুহুরী নদীর তীরে রাজা করিয়াছিলেন। রাজমালায় লিখিত আছে ;---

> "লোমাই নামেতে পুত্র বড় শিষ্ট ছিল।
> মোহরি নদীর তীরে নৃপতি করিল।।"

ইনি অধিক দিন রাজ্যসুখ ভোগ করিতে সমর্থ হন নাই। ইঁহার অনুজ রত্ন ফা অল্পকাল পরেই গৌড় বাহিনীর সাহায্যে ভ্রাতাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

শর্ম্মিষ্ঠা ;---(৫ পৃঃ,---৭ পংক্তি)। ইনি দানবরাজ বৃষপর্ব্বার দুহিতা এবং সম্রাট যযাতির মহিষী। ইনি শুক্রকন্যা দেবযানীর দাসীভাবে যযাতির

আলয়ে আগমন করেন। ইহার গর্ব্ভে, যযাতির দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামক তিনটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিবার দরুণ যযাতি শুক্রাচার্য্যের শাপে জরাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। দেবযানীর বিবরণ দ্রষ্টব্য।

শিক্ষরাজ ;---(৪০ পৃঃ,---২৭ পংক্তি)। নামান্তর শিখিরাজ। মহারাজ নাগেশ্বরের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৯০ ও ত্রিপুর হইতে ৪৫ স্থানীয়। ইনি একদা মৃগয়া উপলক্ষে বনে যাইয়া অকৃতকার্য্য ও পরিশ্রান্ত হইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পাচককে মাংস রন্ধনার্থ আদেশ করিলেন। পাচক অকস্মাৎ মাংস সংগ্রহ করিতে না পারিয়া ভীত হইল, এবং দেবতা সদনে বলি প্রদত্ত মনুষ্যের মাংস আনিয়া রন্ধন করিল। রাজা ভোজনকালে মাংস আহার আরম্ভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন---"ইহা কোন্ জাতীয় প্রাণীর মাংস?" এই প্রশ্নে পাচক অত্যন্ত ভীত হইল, এবং কম্পিত কলেবরে উত্তর করিল---"অন্য মাংস সংগ্রহ করিতে না পারিয়া নরমাংস রন্ধন করিয়াছি।" রাজা এই কথা শুনিয়া ভীত এবং দুঃখিত হইলেন। এবং বিষয়বিরাগবশতঃ পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। তাঁহার বনগমনের পর, পুত্র দেবরাজ রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন।

শিব রায় ;---(৫৩ পৃঃ, ---১০ পংক্তি)। নামান্তর সেবরায়। ইনি মহারাজ পার্থ বা দেবরাজের পুত্র। চন্দ্র হইতে ১২১ ও ত্রিপুর হইতে ৭৬ স্থানীয়। ইনি বিশেষ গুণবান এবং প্রজাবৎসল ছিলেন। দীর্ঘকাল রাজ্যপালন করিবার পর, পুত্র ডুঙ্গুর ফা (দানকুরু ফা) কে সিংহাসন প্রদান করিয়া স্বর্গগামী হইয়াছিলেন।

শুক্র ;---(৫ পৃঃ, ---৬ পংক্তি)। ইনি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য ; যযাতির মহিষী দেবযানীর পিতা। ইঁহার শাপে যযাতি জরাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইনি বামন ভিক্ষায় বলিরাজাকে দানকার্য্যে বাধা প্রদান করিয়া একটী চক্ষু হারাইয়াছিলেন, তদবধি "কাণা শুক্র" নাম হইয়াছে।

শুক্রেশ্বর ;---(৩ পৃঃ,---২০ পংক্তি)। ইনি শ্রীহট্টবাসী ব্রাহ্মণ। মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের শাসনকালে ত্রিপুর দরবারে সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি পণ্ডিত বাণেশ্বর ও চন্তাই দুর্ল্লভেন্দ্রের সহিত মিলিত ভাবে রাজমালার প্রথম লহর রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার বংশধর বিদ্যমান নাই। ধর্ম্মমাণিক্যের শাসনকাল আলোচনায় জানা যায়, ইনি পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

শ্রীমন্ত ;---(৩৯ পৃঃ,---২৬ পংক্তি)। নামান্তর শ্রীমান। ইনি শ্রীরাজের পুত্র, চন্দ্র হইতে ৭ ও ত্রিপুর হইতে ২২ স্থানীয়। ইঁহার রাজত্বের ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে না। পুত্র লক্ষ্মীতরুর হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পরলোকগামী হইয়াছিলেন।

শ্রীরাজ ;---(৩৯ পৃঃ,---১৪ পংক্তি)। ত্রিপুরেশ্বর বীররাজের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৬৬ ও ত্রিপুর হইতে ৪১ স্থানীয়। ইঁহার অসংখ্য ধনজন ছিল। পুত্র শ্রীমন্তের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সম্রাট ;---(৫৪ পৃঃ,---১২ পংক্তি)। মহারাজ বীরবাহুর পুত্র। চন্দ্র হইতে ১৩৬ ও ত্রিপুর হইতে ৯১ স্থানীয়। ইঁহার পরলোকগমনের পরে পুত্র চম্পকেশ্বর ত্রিপুরার রাজদণ্ড ধারণ করেন।

সহদেব ;---(৯ পৃঃ,--- ১৭ পংক্তি)। ইনি মাদ্রি গর্ব্ভে অশ্বিনী কুমার কর্ত্তৃক উৎপন্ন পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র। পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে ইনি সর্ব্বকনিষ্ঠ। রাজমালা মতে রাজসূয় যজ্ঞকালে ইনি ত্রিপুরেশ্বরকে জয় করিয়াছিলেন।

সাগর ফা ;---(৪২ পৃঃ, ---১২ পংক্তি)। ইনি মহারাজ বিরাজের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৯৪ ও ত্রিপুর হইতে ৪৯ স্থানীয়। ইনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া পুত্র মলয়চন্দ্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন।

সাধুরায় ;---(৫৩ পৃঃ,---২৬ পংক্তি)। ইনি মহারাজ যশ ফা এর পুত্র এবং উদ্ধবের ভ্রাতা। চন্দ্র হইতে ১৩০ ও ত্রিপুর হতে ৮৫ স্থানীয়। ইনি যশের সহিত রাজত্ব করিয়া, পুত্র প্রতাপ রায়কে সিংহাসনের অধিকারী বিদ্যমান রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

সুকুমার ;---(৪৩ পৃঃ,--- ২২ পংক্তি)। মহারাজ কুমারের পুত্র চন্দ্র হইতে গণনায় অধস্তন ১০২ ও ত্রিপুর হইতে ৫৭ স্থানীয়। ইঁহার অভাবে, পুত্র বীরচন্দ্র রাজা হইয়াছিলেন।

সুদক্ষিণ ;---(৩৯ পৃঃ, ---২ পংক্তি)। রাজা তরদক্ষিণ বা তৈদক্ষিণের পুত্র। চন্দ্রের অধস্তন ৪৯ ও ত্রিপুরের অধস্তন ৪র্থ স্থানীয়। ইঁহার পর তৎপুত্র তরদক্ষিণ সিংহাসন লাভ করেন।

সুধর্ম্ম; ---(৩৯ পৃঃ,---১২ পংক্তি)। নামান্তর সধর্ম্মা। মহারাজ ধর্ম্মপালের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৫৪ ও ত্রিপুর হইতে ৯ম স্থানীয়। ইঁহার শাসনকালে রাজ্যে সুখশান্তি বিরাজমান ছিল। পুত্র তরবঙ্গের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক ইনি পরলোক গমন করেন।

সুবড়াই ;---(১৫ পৃঃ,---১ পংক্তি)। মহারাজ ত্রিলোচনের নামান্তর সুবড়াই, ইনি ধরাভারবাহী দেবতা বলিয়া ত্রিপুরসমাজের বিশ্বাস ছিল। ত্রিলোচন শীর্ষক বিবরণ দ্রষ্টব্য।

সুমন্ত ;---(৪০ পৃঃ,---১২ পংক্তি)। মহারাজ তরফণাই ফা এর পুত্র। চন্দ্র

হইতে ৮০ ও ত্রিপুর হইতে ৩৫ স্থানীয়। রূপবন্ত নামক পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয় ইনি লোকান্তরিত হইয়াছেন।

সূর্য্যরায় ;---(৪২ পৃঃ, ---১৫ পংক্তি)। নামান্তর সূর্য্যনারায়ণ। মহারাজ মলয়চন্দ্রের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৯৬ ও ত্রিপুর হইতে ৫১ স্থানীয়। সূর্য্যরায়ের পরলোক গমনের পর তৎপুত্র ইন্দ্রকীর্ত্তি সিংহাসন লাভ করেন।

সোমাঙ্গ ;---(৩৯ পৃঃ, ---১৮ পংক্তি)। নামান্তর সুমাঙ্গ বা সোমাঙ্গদ। মহারাজ রুক্মাঙ্গদের পুত্র। চন্দ্র হইতে ৬০ ও ত্রিপুর হইতে ১৫ স্থানীয়। ইঁহার অভাবে পুত্র নৌগযোগ রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন।

হামরাজ ;---(৩৯ পৃঃ,---২২ পংক্তি)। ইনি রাজধর্ম্মার পুত্র। চন্দ্র হইতে ৬৪ ও ত্রিপুর হইতে ১৯ স্থানীয়। ইনি যশস্বী রাজা ছিলেন। ইঁহার পর, পুত্র বীররাজ রাজ্য লাভ করেন।

হামতার ফা ;---(৪৯ পৃঃ,---৫ পংক্তি)। যুঝারু ফা এর নামান্তর। ইনি রাঙ্গামাটী রাজ্য ও বঙ্গদেশের কিয়দংশ জয় করিয়া ত্রিপুর রাজ্যের পরিসর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। যুঝারু ফা শীর্ষক বিবরণ দ্রষ্টব্য।

হীরাবতী ;---(১৪ পৃঃ, ---১৮ পংক্তি)। ইনি মহারাজ ত্রিপুরের মহিষী এবং ত্রিলোচনের জননী। ত্রিপুর শিব কর্ত্তৃক নিহত হইবার কালে ইনি সন্তান সম্ভাবিতা ছিলেন। অতঃপর মহাদেব ও চতুর্দ্দশ দেবতার উপাসনা করিয়া শিববরে ত্রিলোচনকে পুত্ররূপে লাভ করেন। মতান্তরে ত্রিলোচন শিবের ঔরস জাত পুত্র। এতদ্বিষয়ক বিবরণ পূর্ব্বভাবে বিবৃত হইয়াছে।

হীরাবন্ত ;---(৫৫ পৃঃ,---৩ পংক্তি)। ইনি বঙ্গরাজ্যের অধীনস্থ এক জন চৌধুরী (শাসন কর্ত্তা) ছিলেন। মেহেরকুল রাজ্য (বর্ত্তমান কুমিল্লা প্রভৃতি দেশ) ইঁহার শাসনাধীন ছিল। ত্রিপুরেশ্বর ছেংথুম্ ফা ইঁহার ধনরত্ন এবং রাজ্য কাড়িয়া লওয়ায়, হীরাবন্ত গৌড়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সূত্রে গৌড়েশ্বর কেশবসেনের সহিত ত্রিপুরার ভীষণ সংগ্রাম হয়। এই সংগ্রামে ছেংথুম ফা এর মহিষী বীরকুল বরণ্যা মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী স্বয়ং সমর প্রাঙ্গণে অবতীর্ণা হইয়া অনেক বীরত্ব প্রদর্শন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে হীরানন্দ নামক এক বণিকের নাম পাওয়া যায়। উক্ত ইতিবৃত্ত প্রণেতা, এই হীরানন্দ ও রাজমালার বর্ণিত হীরাবন্ত অভিন্ন কিনা, সে বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছেন। দেখা যাইতেছে, হীরাবন্ত মেহেরকুল নিবাসী এবং উক্ত স্থানের শাসনকর্ত্তা এবং হীরানন্দ শ্রীহট্টবাসী ও বাণিজ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। সুতরাং ইঁহারা যে বিভিন্ন ব্যক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

অনুক্রমণিকা

(অ)

অক্রোধন—১৬৩

অগুরুকাষ্ঠ—১৬৯, ১৭০, ২১১, ২১২

অগ্নি—১৩২, ১৩৯

অগ্নিপুরাণ—১১২, ১২২, ১৩৩

অগ্নির ধ্যান—১৪২

অঙ্গদ্বীপ—২০২

অচ্যুতচরণ চৌধুরী—৭৭, ৭৮, ৮৬, ১৮১, ২০৭

অজমীঢ়—১৬৪

অথর্ব্ব বেদ—১২২

অদ্বৈত প্রকাশ—৮২

অদ্ভুত রামায়ণ—৫৮

অনন্ত শয্যা—২৯

অনশ্বা—১৬৪

অনু—৫, ৬, ২৭৪

অপ্সরা—১৮৫

অবন্তিকা—৭, ২৩৭

অবাচীন—১৬৩

অব্ধি—৩০, ১৩১, ১৩২

অভিযান—৫০, ১৮২, ১৮৩, ১৯০, ২০৫

অভিষেক প্রণালী—১২১, ১৯৬

অমরপুর—৫৩, ২৩৭

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—১৪৯, ১৫২, ১৫৩, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৮

অম্বর—১৪৯

অযুতনায়ী—১৬৩

অযোধ্যা—৭, ২৩৭

অরিজিৎ—১৬৩

অরিহ—১৬৩

অর্জ্জুন—৮৪, ১৪৯, ১৫২, ১৫৩, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৮

অহংযাতি—১৬৩

অহোম নৃপতি—৯১

(আ)

আইন-ই-আকবরী—১৬০, ১৮০, ১৮৮

আকবর—৬৮, ১৮৮

আগর—২১১

আগরতলা—৬২, ৭৯, ১৩৪, ১৩৮, ১৫৭, ১৮৭, ২১৩, ২৩৮

আগর ফা—৬২, ২৭৪

আগ্নেয়াস্ত্র—১৭৩

আচঙ্গ ফা—৪২, ৯২, ৯৩, ১১৫, ২৭৫

আচরঙ্গ—৬, ৬২, ১৮৬, ১৯০, ২৩৯

আচুঙ্গ ফালাই—৪২, ২৭৫

আচোঙ্গ ফা—৫৯, ৯৩, ২৭৫

আচোঙ্গ মা—৫৯, ৬২, ৯৩, ২৭৫

আত্মবিরোধ—১৮৮

আদম সুমারী—১১৬

আদিধর্ম্ম ফা—৭৭, ৯৯, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৫, ১০৯, ১১০, ১১১, ১৯৬, ২০৭, ২০৮

আদিনাথ তীর্থ—৮৬, ১৩৮

আদিশূর—১১১

আনন্দ—৯৯, ১০১, ১০৩, ১০৫, ১০৮, ১০৯

আনর্ত্ত—১৬৩

আনাম—২০২

আপাইয়া—২১৮

আবুল ফজল—১৮৮

আয়ু—১৬৩

আরঙ্গী—২২, ৩১, ১৫০, ১৫১, ১৫৩, ১৫৪.
১৫৮
আরাকান—৮৬, ১২৫, ১৪৮
আর্য্যাবর্ত্ত—৭, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ২৪১
আসা—১৬১
আসাম—৭৭, ৮৪, ৮৫, ৮৯, ১১২, ১৬৯, ২০৭,
২১১, ২১৫
আসামী—৮৯
আসামের ইতিহাস—১০২
আসামের বিশেষ বিবরণ—১০১

(ই)

ইটা—১০৮, ১০৯
ইটোয়া—১০৮
ইণ্ডো-এরিয়ান্—১৮০
ইন্দেশ্বর—১০৮
ইন্দ্রকীর্ত্তি—৪৫, ২৭৫
ইন্দ্রকুমার মিশ্র—৭৯
ইন্দ্রদ্বীপ—৮৪
ইন্দ্রনগর—১০৮
ইয়ুরোপ—১৪৯
ইলিন—১৬৩

(ঈ)

ঈশা খাঁ—৬৮
ইশানচন্দ্র মাণিক্য—২০৩
ঈশ্বর ফা—৪০, ৯০, ১৯৫, ২৭৫

(উ)

উইলফোর্ড সাহেব—১৭৮
উড়িয়া—৮৯
উড়িষ্যা—৮৯, ১৭৭
উৎকল—৭, ১৩৫, ২৪১
উত্তর—১৫৩
উত্তর গোগৃহ—১৫৩
উত্তরাধিকারী—১১৯
উদয়পুর—৯০, ১২৯, ১৩৪, ১৫৮, ১৮৬
উদয়মাণিক্য—৯২, ১৮৬
উদয়াচল—১৬৯
উদ্বাহ তত্ত্ব—২৩
উপপীঠ—১২৪
উমা—১৩৯
উমার ধ্যান—১৩৯
উমেশচন্দ্র বটব্যাল—১৭৮

(ঊ)

ঊনকোটী তীর্থ—৯৭, ৯৮

(ঋ)

খক্‌সংহিতা—২০১
ঋগ্বেদ—২
ঋক্ষ—১৬৩

(এ)

একডালা দুর্গ—১৮০
একাদশী ব্রত—৬০
এড়ুমিশ্র—১৮০
এরিয়ান্—৮৬

(ও)

ওঝাই—১১৭
ওয়াইজ সাহেব—১৭৮

(ক)

কংসনারায়ণ—৬৮
কক্সবাজার—৮৬
কঠোপনিষদ—২
কতর ফা—৪০, ২৭৬
কনীয়ান—১৬৪

কনৌজ—১০৫, ১০৬, ১০৮
কন্দর্পনারায়ণ—৬৮
কন্দর্পের ধ্যান—১৪৩
কপিধ্বজ—১৪৯, ১৫২
কপিল নদী—৬, ৩৬, ১৮৪, ২০৪
কপিলাশ্রম—১৩৮
কবন্ধ—৫৮, ২৩১
কমলপুর—১০৮
কমলরায়—৫৩, ২৭৬
কমলাঙ্ক—৮৭, ১৭৫
কম্বোজ—৮৫, ২০০, ২০১, ২০২
কম্বোডিয়া—২০২
করচা—৮২
করতাল—৩১
করান্তি—৮৫
করিমগঞ্জ—১৮৬
কর্ণসোনা—১৯৪
কর্ণাল—৩১
কলিকাতা—৯৫
কলিঙ্গ—১৬৪, ১৬৯
কলিন্দ—১৬৪
কলিন্দ—১৬৪
কলিযুগ—৪৪
কল্যাণপুর—১৮৬
কল্যাণমাণিক্য—২৭, ১৪৭, ১৯০
কল্যাণ সাগর—১২৭
কশেরুমান—৮৪
কাইচরঙ্গ—৬২, ১৮৬, ২৪০
কাইফেঙ্গ—৩২, ১৭৪, ১৮৭, ২৪২
কাকচাঁদ—১৮৫, ২০৮
কাকচাঁদের দীঘি—২১১
কাঁচলি—১১৪, ১১৬, ১১৭
কাছাড়—৮৩, ৮৬, ১৩২, ১৩৩, ১৮৫, ১৮৬
কাতাল—১৮৫, ২০৮
কাতালের দীঘি—১০৫, ২১১
কানিহাটি—১৮৬
কান্যকুব্জ—১০৫
কাপ্তান লেয়ার্ড—১৯৪
কাবতৈ—৬৬
কাবুল নদী—২০১
কামদেব—৩০, ১৩২
কামরূপ—২৯, ৯৯, ১৪৮
কামাখ্যা—৪৭, ১৮৫, ২৪২
কামাখ্যা তন্ত্র—২৯, ১৩৬
কামান দাগার জান—১০৫
কায়স্থ কৌস্তুভ—১১১
কারুষ—১৬৯
কার্ত্তিকেয়—১৩২, ১৩৯
কার্ত্তিকেয়ের ধ্যান—১৪১
কার্পাস—১৭৩
কার্ম্মুক—১৬৪
কালাতর ফা—৪০, ২৭৬
কালিকাপুরাণ—২১, ১২২, ১৪৮
কালিদাস—২০১, ২০২, ২১২
কালিয়া জুরী—১৯৪
কালী কচ্ছ—১৯৪
কাশী—৭, ২৪৭
কাশ্মীর—৭৬
কিরণ সুবর্ণ—১৯৪
কিরাত—১৯, ২২, ২৮, ৩৪, ৬৪, ৮৪, ৮৫, ৮৯, ৯৮, ১৪৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ২০২, ২১৩
কিরাত আলয়—৫, ৭, ৮, ১৭, ৪২, ৮৩, ৮৮, ৯৬, ১৮৭
কিরাত জাতির বিবরণ—২১৩
কিরাত দেশ—৮৩, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯৪, ১৬৮, ১৭০, ২১১, ২৪৬

কিরাত নগর—৬, ৮৩, ৯৮
কিরাদিয়া—৮৬
কিরীট—৯৯, ১৯৫, ২০৭, ২০৮
কিলহরণ (ডাক্তার)—১৭৮
কিষ্কিন্ধ্যা—১৬৬, ১৬৭
কীর্ত্তি—১৬৩, ১৯৫
কীর্ত্তিধর—১৭২, ১৭৫, ১৯৫, ১৯৬
কুকি—২৯, ৬৩, ৬৯, ৮৫, ৯৮, ১০৩, ১১৬, ১৮৩
কুকি সৈন্য—৫০
কুঞ্জহোম ফা—১১৫
কুন্দ ফা—৫৩, ২৭৬
কুব্জিকা তন্ত্র—১২৪
কুমার—৩০, ৯৬, ৯৭, ১৮৫, ২০৫, ২০৭
কুমার (রাজা)—৪২, ২৭৬
কুমিল্লা—৭৯, ৮০, ১২৮
কুয়াই তুইয়া—২১৭
কুরু—১৬৪
কুরুবিন্দ—১৬৮, ১৬৯
কুরুক্ষেত্র—৭, ২৪৭
কুলদেবতা—৯৫, ১২৯, ১৩৫, ১৩৯, ১৪৫, ১৪৮
কুলার্ণব—১১১
কুশিয়ারা নদী (ক্রোশিরা)—১০০, ১০১, ১০৮
কৃত্তিবাস—৮২
কৃত্তিবাসী রামায়ণ—৮২
কৃষ্ণ—৫৮, ৫৯
কৃষ্ণদাস—৫৩, ২৭৬
কৃষ্ণনাথ শর্ম্মা—৮০
কৃষ্ণমাণিক্য—১৩৬, ১৫৮
কৃষ্ণমালা—১৫১
কেদার রায়—৬৮
কের পূজা—১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৫৮
কেশব সেন—১৭৯, ১৮১
কৈলার গড়—১৮৫
কৈলাসহর—৬৭, ৯৭, ৯৮, ১০৫, ১০৬, ১১০, ১৫৯, ১৮৫, ১৮৬, ২০৫, ২০৭
কৈলাসচন্দ্র সিংহ—৮১, ৮৯, ১১৫, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৫৯, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৭৭, ১৭৮, ১৮১, ১৯০, ১৯১, ১৯৬, ২০০
কৈলাস বাবুর রাজমালা—৫৫, ৬১, ১১৫, ১৩১, ১৩২, ১৬৫, ১৯০, ২০০
কোচ—৬, ২০, ২১, ২৪৯
কোচীন—২০২
কোট অব্ আর্ম্মস্—১৫০, ১৫৫, ১৫৬
কোশল—১০
কৌতুক—৭৯, ৯০
ক্যামিং সাহেব—৮১, ১৯৬
ক্রম—১৬৪

(খ)

খড়্গা—৩৭
খণ্ডল—২৩২
খলংমা—৩৬, ৩৭, ৪৮, ৯৮, ১৭৩, ১৮৪, ১৮৫, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২৫০
খাড়ঙ্গ ফা—৫৩, ২৭৭
খাণ্ডব ঘোষ—১৯৪
খার্চ্চি পূজা—২৮, ১৩৮, ১৪৩, ১৫৮
খা হাম—৪০, ২৭৭
খিচোঙ্গ ফা—৫৯, ৯৩, ১১৫, ২৭৭
খিচোঙ্গ মা—৫৯, ৯৩, ১১৫, ২৭৭
খুটি মূড়া—৬২, ১৮৭, ২৫১
খুম্পই—১১৫
খুলঙ্গ—৩২, ১৭৪, ১৮৭, ২৫২

(গ)

গগন—৪৯, ২০৭, ২৭৭
গঙ্গা—১৩২, ১৩৯, ১৫০, ১৫২, ২০০
গঙ্গা নদী—৭, ৩০, ৮৬
গঙ্গা পূজা—১৫৮

গঙ্গার ধ্যান—১৪২
গঙ্গা রায়—৪৬, ২৭৭
গজ কচ্ছপ—৩৬
গজ কচ্ছপী যুদ্ধ—১৮৫, ২২৫
গজদন্ত—১৯২
গজ ভীম—৭৮
গজানন—৩০
গজেশ্বর—৪০, ১৯৯, ২৭৭
গড় মণ্ডল—১৮১
গণেশ—১৩২, ১৩৯
গণেশ রায়—৬৮
গণেশের ধ্যান—১৪১
গদাধর ঠাকুর—১৫৮
গন্ধর্ব্ব—৮৪
গবয়—২৪, ২৮, ৫৭, ৬৬
গবর্ণমেন্ট রিপোর্ট—১০৪, ১০৭
গভস্তিমান—৮৪
গয়া—১৭৮
গরাই পূজা—১১৭
গাওল—২২, ৩১, ১৫১, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৮, ১৫৯
গাতি ঘর—৫৯, ১৯২
গান্ধার—১৬৩
গারো—৮৫
গালিম—২৭, ১৪৫
গ্রাম মুদ্রা—৩৩, ৯৬, ১৪৪
গিয়াসউদ্দীন—১৮১
গিরীশচন্দ্র দাস—১০২
গুপ্তার্চ্চন চন্দ্রিকা—১৩৯
গেইট্ সাহেব—১০২
গোপথ ব্রাহ্মণ—১২২
গোপলা নদী—১০৮
গোবিন্দ—৯৯, ১০১, ১০৩
গোবিন্দচন্দ্রে গান—৭৫
গোবিন্দপাল দেব—১৭৮
গোবিন্দমাণিক্য—১৪৭, ১৪৮
গোরিয়া—২০১
গৌড়—৫৪, ৫৬, ৫৭, ৬৩, ৬৫, ১৭১, ১৭৯, ১৮৮, ১৮৯
গৌড় বাহিনী—১৭২, ১৭৩, ১৭৬, ১৮৬, ১৮৯
গৌড় রাজমালা—১৭৮
গৌড়ে ব্রাহ্মণ—১১২
গৌড়েশ্বর—৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ১১২, ১৪৬, ১৬০, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৮১, ১৮৮
গৌড়ের সহিত সমর—১৭২, ১৭৩, ১৭৬,১৮১, ১৯৫
গৌরী গুরু পর্ব্বত—২০১, ২০২
(ঘ)
ঘালিম—১৩৮, ২১৮
ঘোঙ্গ—২৩, ৩১
(চ)
চট্টগ্রাম—৮৫, ৮৬, ৯০, ৯৭, ১২৫, ১২৬,
চট্টল—১২৫, ১৪৬, ১৮৮
চট্টেশ্বরী—১২৫, ১২৬
চণ্ডিদাস—৮২
চণ্ডীমুড়া—১৯০
চতুর্দ্দশ দেবতা—৩, ১৫, ১৬, ২৬, ২৮, ৪১, ৪৪, ৫৩, ৫৮, ৭৬, ৭৭, ৯৫, ৯৬, ১২৯, ১৩১, ১৩২, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৫৮, ১৭২
চতুর্দ্দোল—৬৪
চন্তাই—৩, ৮, ১৬, ২৭, ২৯, ৩০, ৩১, ৪৪, ৭৬, ৭৭, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬
চন্দোরি রাজ্য—১৪৯
চন্দ্র—১৩৯, ১৬৩, ১৯৯
চন্দ্রধর—৯৬
চন্দ্রধ্বজ—১৫, ২২

চন্দ্র ফা—৪০, ২২৭
চন্দ্রবংশ—৫, ১৪, ১৪৯, ১৫১, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৮
চন্দ্রবাণ (চন্দ্রধ্বজ)—১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৮, ১৮২
চন্দ্রশেখর—১৯৫
চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরা—১০৮
চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ—১০৬, ১০৭, ১০৯, ১৯৭
চম্পক বিজয়—৯০
চম্পক রায়—৯০
চয় চাগ (রায়)—১৫৫
চরাতর—৪২, ২৭৮
চাকমা—৩২, ১৭৪, ১৮৭, ২৫৩
চাঁদ গাজী—৬৮
চাঁদ রায়—৬৮
চাম্পা—৫৪, ২৭৮
চিত্রবীর্য্য—১৬৪
চিত্ররথ—১৬২, ১৬৪
চিত্র শিল্প—১১৮
চিত্র সেন—১৬৪
চিত্রায়ুধ—১৬৪
চীন—৮৪, ২০২
চীন সমুদ্র—৮৫
চুয়ান্তাই—১৩৬
চৈতন্য চরিতামৃত—৮২
চৈতন্য ভাগবত—৮২
চৈতন্য মঙ্গল—৮২
চোপদার—১৬১
চৌগাম খেলা—৬৯
চৌয়াল্লিশ—১০৮

(ছ)

ছড়ি বরদার—৬৪
ছত্রতুইয়া—১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৪, ২১৮
ছয়চিরি—১০৮
ছাত্রুরায়—৪৬, ২৭৮
ছাগল—২৩, ২৮, ৫৭
ছাম্বুলনগর—৪২, ৫৩, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ২০৫, ২৫৩
ছায়ের নদী—৬৬
ছিলটিয়া—২১৭
ছেংথুম্ ফা—৫৪, ৫৫, ১১৫, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৭, ১৮৮, ১৯৫, ২৭৮
ছেঙ্কা ছাগ—৫৪, ১০৫, ১১০, ১৯৫, ২৭৮
ছেঙ্গ্‌ফলাই—৫৩, ২৭৯

(জ)

জন্মভূমি (মাসিক)—১৩৪
জন্মেজয়—১৬৩
জব্বলপুর—১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৯
জয়ৎ সেন—১৬৩
জয়নারায়ণ সেন—১৯৪
জয়ন্ত চন্তাই—১৩৬
জয়ন্তা—৪৭, ৮৫, ৯২, ১৬০, ১৬৯, ১৮৫, ২৫৫
জলোৎসব—৩৩, ৯৬
জাঙ্গে ফা—৫৩, ২৭৯
জাজনগর—১৭৭, ১৯২
জাজপুর—১৭৭
জামিউত্তারিখ—১৬০
জামির খাঁ গড়—৬৬
জাহ্নবী দেবী—১১৭
জিরা—৫৭
জীর্ণোদ্ধার—১৩৩
জুমক্ষেত্র—১০০
জুরী নদী—২০৭
জুলাই—২১৮
জেম্‌স্ লঙ্ সাহেব—১৮৯, ১৯০

(ঝ)

ঝড়—১০০
ঝান্সী—১৮১
ঝাপ্টার মোহনা—৮৭

(ট)

টমাস্ সাহেব—১৭৮
টলুয়া—১২৭
টলেমী—৮৫, ৮৬, ২০১, ২০২
টেঙ্গরী কুকি—১০০, ১০১

(ঠ)

ঠাকুর বাড়ী—৭৯

(ড)

ডগর—১৭২
ডঙ্কা—১৮২
ডাঙ্গর ফা—৬০, ৬৬, ৯৩, ১৮৬, ১৮৮, ১৯০, ১৯১, ২৭৯
ডাঙ্গর মা—৬০, ৯৩, ২৭৯
ডিও ডোরাস্—৮৬
ডুঙ্গুর ফা—৫৩, ৯৯, ১০৩, ১৯৫, ২৭৯

(ঢ)

ঢাকা দক্ষিণ—৭৯
ঢাকার ইতিহাস—৮৬
ঢোল—৩৫, ১৭২, ১৭৫

(ত)

তংসু—১৬৩
তনাউ—৩২, ১৭৪, ১৮৭
তন্দ্রচূড়ামণি—১২৪
তন্ত্রসার—৫৫
তপ্তকুণ্ড—৮৫
তবকাৎ-ই-নাসেরী—১৭৮
তর দাক্ষিণ—৩৯, ৯৮, ১৯৫, ২০৬, ২৮০
তর জুঙ্গ—৩৯, ২৮০
তরফলাই—৪০, ২৮০
তরবঙ্গ—৩৯, ২৮০
তররাজ—৩৯, ২৮০
তরলক্ষ্মী—৩৯, ২৮১
তরহাম—৪০, ২৮১
তলাবায়েক—১৯৪
তক্ষ শিল্প—১১৮
তাঁত—১১৬
তাভুরাজ—৪০, ২৮১
তাম্বুল পত্র—১৫০, ১৫৫, ১৫৬
তাম্র ফলক—১৪৭, ১৭৯, ১৮১
তাম্র বর্ণ—৮৪
তাম্র লিপ্ত—১৬৯
তাম্রশাসন—৯৮, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৮, ১০৯, ১৯৫, ১৯৭, ২০৭, ২০৮
তারকস্থান—৬২, ১৮৭
তিওর—১৬৫, ১৬৬, ১৬৭
তিষ্ণা—১৯৪
ত্রিনেত্র—৯৩
ত্রিপুর—৬, ৮, ১০, ১১, ১৩, ১৯, ২৭, ৭০, ৮৯, ৯০, ৯৩, ৯৮, ১০৯, ১১৭, ১২৯, ১৩০, ১৩৪, ১৫৯, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫, ১৭৩, ১৭৪, ১৯৪, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২৮১
ত্রিপুর নগরী—৪৮
ত্রিপুর বংশ—১৬২, ১৬৩
ত্রিপুর বংশাবলী—৮২, ৯২, ১২৬, ১২৯, ১৪৩, ১৫৫, ১৭৩, ১৭৭, ১৭৮, ১৮২
ত্রিপুর ভাষা—৭৭, ৮৩
ত্রিপুর সৈন্য—৫৭
ত্রিপুর ক্ষত্রিয়—৯০
ত্রিপুরা—৯, ১০, ২৯, ৫২, ৫৯, ৬৩, ৬৪, ৭৭, ৭৮, ৮২, ৮৩, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯৯, ১০১,

১১২, ১১৩, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১২৯, ১৩১, ১৩৩, ১৪৬, ১৫০, ১৫৪, ১৬০, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৮১, ১৮২, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৮, ১৮৯, ১৯২, ২০১, ২০২, ২১৫, ২৫৬

ত্রিপুরাব্দ—১০৫, ১০৯, ১১০, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০২, ২০৩, ২০৭, ২০৮

ত্রিপুরায় মৈথিল ব্রাহ্মণ—৭৮, ৯০

ত্রিপুরা সুন্দরী (বিগ্রহ)—৯, ৯৫, ১২৪, ১৩৬

ত্রিপুরা সুন্দরী (রাণী)—১৭৭, ১৮১, ১৮২, ১৮৮, ১৯৫

ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দির—১২৪

ত্রিপুরী—১৬৫

ত্রিপুরেশ শিব—৯

ত্রিবেগ—৬, ৯৮, ১৩২, ১৩৪, ১৭০, ১৮৪, ২০৪, ২০৭, ২৫৬

ত্রিলোচন—৩, ৯, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৬, ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৭০, ৭৬, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০৯, ১১৩, ১১৫, ১৩১, ১৩২, ১৩৪, ১৩৫, ১৪৯, ১৫১, ১৫৪, ১৫৭, ১৬১, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫, ১৭০, ১৭৪, ১৮৪, ১৮৭, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৭, ১৯৮, ২০৪, ২৮২

ত্রিশূল ধ্বজ—১৫, ১৮, ২২, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৮, ১৮২

তুগ্রল তুগন খাঁ—১৫৯, ১৭৭, ১৮০, ১৯২, ১৯৯

তুরস্ক—১৮০

তুর্ব্বসু—৫, ২৮১

তুলসীদাসের রামায়ণ—৫৮

তুলসীবতী মহাদেবী—১১৮

তুষের গড়—৫১

তৈছরাও—৪৪, ২৮১

তৈছুঙ্গ ফা—৪৫, ২৮১

তৈতানব—৬৬

তৈদাক্ষিণ—৩৮, ৯১, ২০৫, ২৮০

তৈয়ঙ্গ—৩২, ১৭৪, ১৮৭

তৈরঙ্গ নদী—৬

তৈলাইঙ্গ—৬৬, ৬৭, ১৮৭, ২৫৬

তৈলাইরুঙ্গ—৬২

ত্রৈপুর—১৬৬

(থ)

থানাংচি—৩২, ৬২, ৬৬, ১৫৫, ১৭৪, ১৮৭, ১৯০, ১৯১, ২৫৬

(দ)

দগরি—২৩, ৩৫

দত্তবংশ মালা—১১২

দনৌজ মাধব—১৮১

দক্ষ—৮, ১২২, ১২৩, ২৮২

দক্ষযজ্ঞ—১২২, ১২৩

দক্ষিণ সমুদ্র—১৬৭

দাউদ শাহ—১৪৬

দানকুরু ফা—৯৯, ১০০, ১০৫, ২০৭

দায়ভাগ—১১৯

দাক্ষায়ণী—১২২

দাক্ষিণ—৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ১৩২, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৮৪, ১৮৭, ১৯৫, ২০৪, ২০৫, ২৮২

দাক্ষিণাত্য—৮৬, ১৬৭, ১৬৯

দিগ্বিজয়—১৬১, ১৬৬, ১৬৭, ১৭৩, ১৭৪, ২০০

দিল্লীশ্বর—১৬০, ১৭৬, ১৭৭, ১৮১

দীনেশ চন্দ্র সেন—৯০

দুন্দুভি—৩১

দুরদুরিয়া—১৮০

দুরাশা—৪২, ২৮৩

দুর্গা—১৮, ২৬, ২৯, ৩০, ৩১, ৪৮, ৯৫, ১৩২, ২০৩

দুর্গাবতী—১৮১
দুর্গামঙ্গল—১১১
দুর্গোৎসব—৩৩, ৯৬, ১৫৮
দুর্ভিক্ষ—১৩১, ১৮৫, ২০৯
দুর্ম্মদ—১৬৩
দুর্য্যোধন—৩৩, ১৫৪, ১৬৯, ২৮২
দুর্ল্লভেন্দ্র—৩, ২৬, ৪৯, ৭৬, ৭৭, ৮২, ১২৯, ১৪৬, ২৮৩
দুষ্মন্ত—১৬৩
দৃকপতি—১৩২, ১৩৩
দেওড়াই—১৬, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮
দেওড়ি—১৩৬
দেবতার দর্শন লাভ—২৩৪
দেবযানী—৫, ২৮৩
দেবরাজ—৪২, ৪৩, ২০৩, ২৮৪
দেবরায়—৫৩, ১৩৬, ২৮৪
দেবল—১৩৬
দেবাঙ্গ—৩৯, ২৮৪
দেবাতিথি—১৬৩
দেবী পুরাণ—১২২
দেবী ভাগবত—১২৪
দৈত্য—৬, ৮৩, ৮৮, ৮৯, ১১২, ১২৯, ১৩০, ১৬৪, ২৮৪
দৈত্য সিংহ বা দুই সিং—২১৭
দৈববাণী—১০০, ১৩১
দোলোৎসব—৩৩, ৯৬
দ্বাপর—১১, ১৬৪, ১৬৫, ১৯৮
দ্বারবঙ্গাধীপ—৯৫, ৯৬
দ্বারিকা—৭, ২৫৭
দ্বিজ বঙ্গচন্দ্র—৮২, ১৪৩
দ্রুহ্যু—৫, ৬, ৩৪, ৮৩, ১৫০, ১৫৪, ১৬২, ১৬৩, ১৭০, ১৯৮, ২০০, ২৮৪
দ্রোণ—১৬৮, ১৬৯

(ধ)

ধন মাণিক—১৬০
ধনরাজ ফা—৪০, ২৮৫
ধনুর্ব্বাণ—১৭৩
ধন্য মাণিক্য—১২৪, ১২৫, ১৪৭, ১৫৫
ধর্ম্ম—১৬৩
ধর্ম্মতর—৩৯, ১১২, ২৮৫
ধর্ম্মধর—৯৮, ১০৫, ১০৬, ১১০, ১৯৫
ধর্ম্মনগর—৬২, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ২০৬, ২০৭, ২৫৭
ধর্ম্মপাল—৩৯, ১০৯, ১১০, ২৮৫
ধর্ম্মমত—৯৫
ধর্ম্মমাণিক্য—৮, ১৫৮, ২৮৫
ধর্ম্মমাণিক্যের তাম্র শাসন—৮১
ধর্ম্মসাগর—৭৯, ৮১
ধর্ম্মাঙ্গদ—৩৯, ২৮৬
ধর্ম্মাচরণ—৯৫
ধামাই জাতি—৪৯
ধৃত—১৬৩
ধৃতরাষ্ট্র—৩৩, ১৬৯, ২৮৬
ধোপা পাথর—৬২, ১৮৭, ২৫৮

(ন)

নওরায়—৪৯, ২০৭, ২৮৬
নকুল—১৬৫, ১৬৬
নগেন্দ্রনাথ বসু—৯৭, ১৭৮
নদীয়া—১৭৯
নবদণ্ড—২২, ৩১
নবরত্ন—৫৫
নবসেনা—৬৮, ৬৯
নব্যভারত (মাসিক)—১৩৪
নরবলি—৪১, ১২৮, ১৪৬, ১৪৮

নরসিংহ—১৩০
নরাঙ্গিত—৩৯, ২৮৬
নরেন্দ্র—৪৫, ২৮৬
নরেন্দ্র মাণিক্য—৯০
নল—১৫৪
নহুষ—১৬৩
নাওড়াই—৪৯, ১৮৩
নাকিবাড়ী—৬২, ১৮৭
নাগড়া ছড়া—১৮৬
নাগদ্বীপ—৮৪
নাগপতি—৪০, ১৯৯, ২৮৬
নাগপুর—৮৬
নাগরাই পূজা—১৪৪, ১৪৫
নাগা—২৮, ৮৫
নাগেশ্বর—৩৯, ২৮৬
নারদ পঞ্চরাত্র—১২২
নারায়ণ—১, ৫৮, ৬৯
নারীনিগ্রহ—৪৭, ৪৮
নিজের প্রতি দেবত্ব আরোপ—২২০
নিধিপতি—১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০
নীলধ্বজ—৯০, ১৯৫
নেপাল—৮৫
নৈমিষারণ্য—৭, ২৫৯
নোয়াখালী—৭৭, ৭৮
নৌগ যোগ—৩৯, ২৮৬

(প)

পঞ্চকষা—২৪
পঞ্চ খণ্ড—১০১, ১০৩, ১০৪, ১০৮
পঞ্চগ্রাস—৬১
পঞ্চ-শ্রী—১৫৬
পঞ্চাল—২০১
পণ্ডিত রাজ—১৯৪
পত্রকৌমূদী—১৫৬
পদাতি—৫৮
পদ্মপুরাণ—৫১
পদ্মাবতী—৩৩, ৯৬
পরাচী—১৬৩
পরাবসু—১৬৩
পরাশর সংহিতা—৬৮
পরীক্ষিৎ—১৬৪
পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—২০০, ২০২
পর্ত্তুগীজ—২০১
পলিটিক্যাল এজেন্ট—১৯৮
পাঁচা খেলা—৩৭
পাঞ্জা (হস্তচিহ্ন)—১৫০, ১৫৫, ১৫৬
পাঠান—১৪৬, ১৭৮
পাণ্ডু—১৬৪
পারণা—৬০
পারসীক—২০১
পারিবারিক কথা—৮৮
পারিষদ—১৬৩
পার্ব্বতী—৪৩
পিতৃধন বিভাগ—৩৪
পিশাচ—১৬৯
পীঠ দেবী—১২২, ১২৪
পীঠমালা তন্ত্র—৮, ৯, ১২৪
পীঠস্থান—৮, ১২৩, ১২৬, ১২৮
পুত্রেষ্টি যজ্ঞ—১১১
পুরু—৫, ১৬৩, ২৮৬
পুরুবংশ—১৬২
পুরুষোত্তমক্ষেত্র—৯৯, ১০১, ১০৩, ১৩৭
পুরুসেন—১৬৩

পুরূরবা—১৬৩
পূর্ব্ববঙ্গ—১৮১
পূর্ব্বভাষ—৮৯
পৃথিবীর ধ্যান—১৪২
পৃথ্বী—৩০, ১৩২, ১৩৯
পৃথ্বীনারায়ণ—২১৫
পেরিপ্লুস্—৮৬
পৌরব—১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ২৫৯
প্রচেতা—১৬৩
প্রতর্দ্দন—১৫৪, ১৬৪
প্রতাপ—৬৯
প্রতাপদিত্য—৬৮
প্রতাপগড়—১৮৬
প্রতাপমাণিক্য—৬৯, ১৮৪, ১৮৮, ১৯৬, ২৮৭
প্রতাপ রায়—৫৪
প্রতাপ সিংহ—৩২, ১৭৪, ১৮৭, ২৫৯
প্রতিজ্ঞা নিবন্ধ—৪৬, ৪৭
প্রতিস্বান—১৬৩
প্রতিপ—১৬৪
প্রতিশ্রবা—১৬৪
প্রতিষ্ঠ—১৬৪
প্রতীত—৪৬, ৪৭, ৪৮, ১৮৫, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২৮৭
প্রত্যাদেশ—১৪৬
প্রবন্ধচিন্তামণি—৭৬
প্রব্রজ্যা—১১২
প্রমথ—১৬৪
প্রয়াগ—৭, ২৬০
প্রস্তাবনা—৩
প্রাগ্‌জ্যোতিষ—৯, ৮৪, ১৬৮, ১৬৯, ২৬১
প্রাচীন রাজমালা—১৫১, ১৫৫, ১৬৩, ২০৪
প্রেমবিলাস—৮২

(ফ)

ফজল গাজি—৬৮
ফটিকউলি—১৮৬
'ফা' উপাধি—৯০, ৯১
'ফাদার' উপাধি—৯১
ফিরোজ তোগলক—৬৭, ১৬০
ফেণী নদী—৫৩
'ফ্রা' উপাধি—৯১
ফার্গুসন সাহেব—১৯৪

(ব)

বখ্‌তিয়ার খিলিজি—১৭৮, ১৭৯
বঙ্গ উপনিবেশ—৬৭
বঙ্গদর্শন (মাসিক)—১৫৯
বঙ্গদেশ—৬, ৫২, ৫৫, ৮২, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ১১২, ১৭৫, ১৭৯, ১৮৬, ১৮৭, ২০০, ২০৩, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২৬২
বঙ্গবিজয়—১৭৮, ১৭৯, ১৮১, ২০০, ২০৩, ২০৪, ২০৮
বঙ্গভাষা—৭৫
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—৭৫
বঙ্গ (মহারাজ)—৪৬, ২৮৮
বঙ্গসাহিত্য—৭৫, ৭৯
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—৯৯, ১০২, ১০৪, ১১১
বঙ্গোপসাগর—৮৬, ১৩৮
বনমালী সিদ্ধান্ত—১৩
বন্দী—৭৯
বভ্রু—১৬৩
বরমচাল—১০৮
বরাক নদী (বরবক্র)—৬২, ৮৬, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০৮, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ২০৪, ২০৫

বরাকের তীর—১৮৭
বরাহমিহির—৮৬, ১৩৪
বরেন্দ্র—১৬৯
বরেন্দ্র ভূমি—১৮০
বর্ব্বর—১০, ২৬২
বল্‌বন—১৮১
বলভদ্র সিংহ—৯৯
বলিদান—২৯, ৩১, ৩২, ৯৫, ৯৬, ১২৮, ১৪৮, ১৫৮
বল্লাল সেন—১৮০
বসুমান—১৬৩
বস্ত্র শিল্প—৫৯, ১১৩
বহুবিবাহ—৬০, ৯২, ১০৩, ১১৪
বাগড়ী—১৮০
বাগ্‌দেবী—১৩২
বাঙ্গালী—৮৯
বাঙ্গালী উপনিবেশ—১৯৩
বাচস্পতি মিশ্র—১০৪, ১১১
বাছাল—১৫৫, ২১৭
বাজপেয় যজ্ঞ—১১১
বানপ্রস্থ—৪২, ১১২, ১৩০
বাণা—১৫১, ১৫৬
বাণেশ্বর—৩, ৫৪, ৭০, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ২৮৮
বাণেশ্বর ছেগা—৮০
বাতিসা—১৯৪
বাণার নদী—১৮০
বানিয়া চঙ্গ—৭৯
বামন পুরাণ—৮৪, ৮৭
বায়ু পুরাণ—৮৬
বারঘর ত্রিপুর—২৫, ৮৯, ৯০
বার ঘরিয়া—৯০
বার বাঙ্গালা—৬৮
বার ভূঁইয়া—৬৮
বারণ্যকায় নির্ণয়—৪
বারাণসী—৭৯, ৯০
বারাহী সংহিতা—১৩৪
বারিবর্হ—১৬৪
বারুণ—৮৪
বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা—১১১
বালিশিরা—১০৮
বাঁশী—২৩
বিকর্ণ—১৬৩
বিকুণ্ঠ—১৬৪
বিক্রমপুর—১৮০
বিজয়কুমার সেন—১৪৯
বিজয় মাণিক্য—১২৯, ১৪৬, ১৬০, ২০০
বিজয় সাগর—১২৯
বিদুরথ—১৬৪
বিদ্যাপতি—৮২
বিদ্বান—৪৫
বিনাইগড় পূজা—১১৭
বিন্ধ্য শৈল—৮৬
বিবর্ণ—১৬৩
বিবাহ বেদী—৯২, ৯৩
বিমার—৪২, ৯৬, ৯৭, ২০৫, ২৮৮
বিরাজ—৪২, ১৯৯, ২৮৮
বিশালগড়—৫২, ৬২, ১৭৫, ১৮৬, ১৮৭, ২০৮, ২৬২
বিশ্বকোষ—৮৯, ৯৯, ১২৭, ১২৯, ১৩৫, ১৫৯, ১৯০, ১৯১, ২০৩
বিশ্বরূপ সেন—১৭৯, ১৮০
‘বিশ্বাস’ উপাধি—১৯৪
বিষু সংক্রমণ—২২৪
বিষ্ণু—২৯, ৩১, ৪৮, ৯৬, ১৪৫
বিষ্ণুপ্রসাদ—৫৪, ২৮৮

বিষ্ণুপুরাণ—৮৪, ১৬৪
বিষ্ণু সংক্রমণ—৩৩, ৯৬
বিহার—১৭৯
বীরবাহু—৫৪, ২৮৯
বীরভদ্র—১২৩
বীররাজ—৩৯, ৪০, ১১২, ১৩২, ১৭৪, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২৮৯
বীরাঙ্গনা—৫৬
বুকানন সাহেব—১৭৮
বুধ—১৬৩
বৃটিশ মিউজিয়ম্—১১৭
বৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহ—১৪৮
বৃন্দাবন শর্ম্মা—৮১
বৃষপর্ব্বা—৫, ৮৩, ২৮৯
বৃহৎ সংহিতা—৮৬, ৮৭
বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ—১২২, ১২৩
বৃহদ্বল—১৬৯
বৃহন্নলা—১৫৩
বৃহস্পতি—৯৪
বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট—১৮০
বেশ্যা—৬৪, ৬৫
বৈদিক সংবাদিনী—৯৯, ১০১, ১০২, ১০৮, ১১১
বৈশ্য—৮৪
বৈষ্ণব—৯৫, ৯৬
বৈষ্ণব পদাবলী—১০০
ব্রহ্মাত্র—১০৩, ১১২
ব্রহ্মদেশ—৮৪
ব্রহ্মদেশী—৯১
ব্রহ্ম পুরাণ—৮৪, ৮৭
ব্রহ্মপুত্র—১৬৯, ১৭০, ১৮৪, ২০৪
ব্রহ্মা—৩০, ১৩২, ১৩৯
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ—৮৪, ৮৭, ২০২
ব্রহ্মার ধ্যান—১৪১
ব্রাহ্মণ—৮৪
ব্লকম্যান—১৭৮

(ভ)

ভক্তি রত্নাকর—৮২
ভগদত্ত—৮৪, ১৬৮, ১৬৯
ভট্ট ব্রাহ্মণ—৭৯
ভরত—১৬৩
ভস্মাচল—৪
ভাট—৭৮
ভানুগাছ—৯৯, ১০৩, ১০৮
ভানুমিত্র—১৬৪
ভারতবর্ষ—৮৪, ৮৬, ৮৭, ১৬৫, ১৬৭
ভারতবর্ষ (মাসিক)—১৪৯
ভীম সেন—৩৩, ১৬১, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ২৮৯
ভীষণ—১৬৪
ভীষ্ম—১৫৪
ভুবনমোহন বিগ্রহ—১৪৮
ভুবনেশ্বরী বিগ্রহ—১৪৭
ভুলুয়া—১৬০
ভুটান—৮৫
ভূত বলি—৪৪, ৪৫
ভূমন্যু—১৬৩
ভূমিকম্প—১০০
ভেওর—৩১
ভেকমণি—১৫৯
ভেরী—৩৫, ১৭১, ১৭২
ভৈরব—১২৪, ১২৮, ১২৯
ভোমরাই—১৪৫

(ম)

মগধ—৭৯, ৯৮, ১০৫, ১২৬, ১৬৯, ১৭৮
মঘ—৮৫, ২০১

মঙ্গলপুর—৯৯, ১০৩, ১০৪, ১১০
মজঃফরপুর—১০৫
মণিকর্ণিকা—৭
মণিপুর—৬২, ৮৫, ৮৬, ৯১, ১৬৯, ১৮৭, ২৬৩
মণিপুরী—১১৬
মণ্ডল—৩২, ২৩২
মৎস্য পুরাণ—৪৫, ৮৪, ৮৭
মতিনার—১৬৩
মথুরা—৫, ৭, ৬৩
মদন—১৪, ১৩৯
মদন পাড়—১৭৯
মদ্যপান—২৩, ৩৭, ১৮৩, ২০৪
মধুগ্রাম—৬২, ১৮৭, ২৬৪
মধু সেন—১৮০, ১৮১
মনু—৪৩, ৮৭. ৮৮, ১১৬, ১১৭, ১১৯, ২৮৯
মনুকুল—১০৮
মনু নদী—৪৩, ৯৬, ৯৭, ১৮৫, ২০৭
ময়ূর পুচ্ছ—১৫৮
মলয়চন্দ্র—৪২, ২৮৯
মল্লবিদ্যা—২৬, ৩৭, ৯৪, ৯৫, ১৭৩
মল্লিনাথ—২০১
মহন্ত ত্রিপুর—৪৯
মহম্মদ খাঁ—১৪৬
মহম্মদ ঘোরী—১৭৮
মহাদেব—৪৩
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র—২
মহাপীঠ—৮, ১২৪, ১২৬
মহাপ্রভু—৭৯
মহাপ্রসাদ—১৩৭
মহাভাগবত পুরাণ—১২২
মহাভারত—৯, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ১২২, ১৪৯, ১৫৪, ১৫৮, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৯৮, ২০১, ২১১
মহাভৌম—১৬৩
মহামাণিক্য—৩, ৭০, ৭৬, ১৯৬, ২৮৯
মহামারী—১৩১
মহামুদ্রা—১৪৩, ১৪৪
মহিমচন্দ্র ঠাকুর—১১৩, ১১৮
মহিষ—২৪, ২৮, ৫৭
মহীশূর—৭৬
মহেশ্বর—১৩০
'মা' উপাধি—৯১
মাইচোঙ্গ ফা—৪০, ১৯৫, ২৮৯
মাইলক্ষ্মী—৩৯, ২৯০
মাগধী—৭৯
মাধব সেন—১৭৯
মাণিক—১৬০
মাণিকচাঁদের গান—৭৫
মাণিক ভাণ্ডার—৬৭, ১৫৯, ১৮৬
মাণিক্য—১৫৯, ১৬০, ১৯২
'মাণিক্য' খ্যাতি—৬৬, ৬৭, ৯১
মায়া—৭, ২৬৪
মার্কণ্ডেয় পুরাণ—৮৪, ১৭৪
মালছি—৪৯, ২৯০
মাহী মারিতিব্—১৫২
মাহীষ্মতী—১৬৫, ১৬৬, ১৬৭
মিত্রারি—১৬৪
মিথিলা—৭৭, ৭৮, ৯৯, ১০১, ১০৪, ১০৫, ১০৮, ১৮০
মিন্হাজ-ই-সিরাজ—১৭৮
মিরিছিম—২০৭
মীন-মানব (মাই মূরত)—১৪৯, ১৫২, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৮
মুকুট—৬৯
মুকুট মাণিক্য—৬৯, ৭০, ৯৫, ১৮৮, ১৯৬, ২৯০